ওঁ তৎ সৎ

আর্য্য-দর্পণ

(সনাতন ধর্ম্মের মুখপত্র)

আর্য্যশাস্ত্রগহনার্থদীপক-
শ্চেতসস্তিমিরবারবারকঃ।
দ্যোতয়ন্বিজয়তাং বিপশ্চিতা-
মচ্ছিয়া হৃদয়মার্য্যদর্পণঃ॥

সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং

আসাম-বঙ্গীয় সারস্বত মঠের তত্ত্বাবধানে

তত্রত্য ঋষি-বিদ্যালয় হইতে

ব্রহ্মচারী ছাত্রবৃন্দ দ্বারা পরিচালিত

---*---

ষোড়শ বর্ষ—১৩৩০

......*......

সম্পাদক—শ্রীবরদা ব্রহ্মচারী

বার্ষিক মূল্য—২৲ প্রতি সংখ্যা—৶০

যোরহাট

সারস্বত মঠস্থ "যোগমায়া-যন্ত্র" হইতে

ব্রহ্মচারী শশিভূষণ দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত

সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার

সূচী

(বর্ণমালানুসারে)

অগ্নির্নেতা ১৯৩
অগ্নির্বিশ্বরূপঃ ২৫৭, ২৮৯
অভিভাষণ ২৮১
আনন্দলহরী ১৮৯
আরণ্যক ২৭, ৬২, ৯৩, ১২৪, ১৫৭, ১৮৯, ২২১, ২৫৫, ২৮৪, ৩১৮, ৩৪৯, ৩৮০
ইন্দ্রঃ ৬৫
ঋত ও সত্য ৯০
কথানক ২২৭
কপালিনী ২০৯
কর্ম্মী ১৪৪
কালের স্বপন ২০৪
কৃপা ২৩৪
চতুষ্টয়ী ১৫২
জগতঃ পিতরৌ ১২৯
জাগরণ ২০৮
জ্ঞানেশ্বর ১১৯, ১৩৯, ১৭৭, ২১৬
দাম্পত্য জীবন ২৫৯
দিব্য দর্শন ৩৩৪
দুই পথ ৩১০
দেশের ও দশের কথা ৩১৬
দ্যাবাপৃথ্বী ৯৭
নববর্ষে ৩
নামদেব ৫৮, ৬৭
পথের ১৪, ৭৯, ২১২
প্রচার বনাম প্রকাশ ৭৫, ৯৯
প্রেম ১৬৭
প্রেমের বিধান ৩৫৫
প্রেমের রূপ ও শক্তি ৩০৭
বিচিত্র প্রসঙ্গ ১৩৯, ৩৪৫
বিজনে ও স্বজনে [illegible]
বিরহী [illegible]
বিরাগী ৬
বিশেষ দ্রষ্টব্য ৮৪
বিশ্রাম [illegible]
বিষ্ণুমায়া ২৪৭
বিস্মৃত ১৪০
বৃহস্পতিঃ ২২৫
বেদান্তসার ১৮, ৮৪, ১৫৩, ১৯২, ২[illegible], ৩৪[illegible]
ভাব ও কাজ ২৭৬
ভোক্তা ও দ্রষ্টা ১৯২
ভোগের দখল [illegible]
মঙ্গলাচরণম্ ১
মনের সাধন ৫২
মরুতঃ ৩৯
মাতৃমূর্ত্তি ১৬৩
মায়ের মায়া ১৭৫
মিলনে ২৪০
মূলসূত্র ২২
যমেবৈষ বৃণুতে ৪৫

যোগসূত্রবৃত্তি ১১, ৪০, ৭১, ১০৪, ১৪৮, ১৭০, ২১৮, ২৩১, ২৯১, ৩২৯, ৩৫৭,

রথযাত্রা ১৩৫

লুকোচুরি ২৬

শিক্ষামঙ্গল ১৮৫

শিক্ষার অন্তর্দৃষ্টি ২৫১

শিক্ষার গলদ ১১২

শিক্ষিত সমাজ ১৫৫

শুব ইন্দ্রং ৩১১

শ্রীনন্দ ২৪৪, ২৭৪, ৩১০, ৩২৩,

শ্রীশ্রীরূপসনাতন ৫৬, ১৩৭, ১৮১ ২৬৬, ৩৬৪

সখ ৫৬

সংবাদ ও মন্তব্য ৩১, ৯৬, ১২৮ ১৬০, ১৯২, ২২৪, ২৫৪, ২৮৭, ৩২০, ৩৫২, ৩৮১,

স জনাস ইন্দ্রঃ ৩৫৩

সত্যের প্রকাশ ২৫৩

সন্তানের শিক্ষা ২৯৭

সন্ধানী ৫৫

সভ্যতার বিকার ৬

সমালোচন ৩১০

সাক্ষী ১১১

সারস্বত-মঠ দর্শনে ৩০০

সেবক ২৬৬

ওঁ তৎ সৎ

আর্য্য-দর্পণ

(সনাতন ধর্ম্মের মুখপত্র)

১৩শ বর্ষ } বৈশাখ { ১ম সংখ্যা

মঙ্গলাচরণম্

[ঋগ্বেদসংহিতা—১।৯।৫]

অশ্বাবতী গোমতীর্বিশ্বসু
বিদো ভূরি চ্যবন্ত বস্তবে।
উদীরয় প্রতি মা সূনৃতা
উষশ্চোদ রাধো মঘোনাম্॥

বিশ্বান্ দেবাঁ আবহ সোম-
পীতয়েন্তরীক্ষাদুষস্ত্বম্।
সাস্মাসু ধা গোমদশ্বাবদ্
উকথমুষো বাজং সুবীর্য্যম্॥

যে চিদ্ধি ত্বামৃষয়ঃ পূর্ব্ব
উতয়ে জুহূরে বসে মহি।
সা নঃ স্তোমাঁ অভিগৃণীহি
রাধসোষঃ শুক্রেণ শোচিষা॥

উষো যদদ্য ভানুনা
বি দ্বারা বৃণবো দিবঃ।
প্র নো যচ্ছতাদবৃকং পৃথু
চ্ছর্দিঃ প্র দেবি গোমতী রিষঃ।

হে বিশ্বজননী উষা, বীর্য্যময়ি—প্রজ্ঞা-নিরমলে—
ঋদ্ধি তব হৃদিচ্যুত অফুরন্ত দিয়েছ সকলে;
হে জননী, বিশ্ববাণী চিত্তে মম কর উদীরিত,
দাও সে সম্পদ মোরে নিখিলের নিত্য-আরাধিত।

অন্তরীক্ষ হতে আন, ওগো উষা, করি আবাহন,
যেখানে যে রয়েছেন সোমপীতী বিশ্বদেবগণ;—
বীরভোগ্য ভোগ যাহা, প্রজ্ঞালোকে নিত্য প্রভাসিত,
দাও তাহা আমাদের—শক্তিসার, ভুবনশংসিত।

তোমার স্নেহের অন্ন, যাচিয়া মা তোমার শরণ—
বন্দনীয়া তোমারে মা ডেকেছেন পূর্ব্ব ঋষিগণ;
সেই তুমি আমাদেরো আকুলতা শোন মন দিয়া—
শুভ্র, শুচি অন্নভাগ সন্তানেরে দাও মা বাঁটিয়া।

দিব্যভাতি মূরতিতে চরাচর করি উদ্ভাসিত,
দ্যুলোকের দ্বার আজি, ওগো উষা, করেছ বিবৃত;
তোমার করুণ বক্ষে ভয়হীন বিশাল আশ্রয়
লভি যেন, হে জননী, অন্নভাগ প্রজ্ঞাজ্যোতির্ম্ময়।

নববর্ষে

ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে॥
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

পূর্ণ ওই—পূর্ণ এই—পূর্ণ হইতেই পূর্ণ উদ্গত হইয়াছে। পূর্ণের পূর্ণ গ্রহণ করিয়া পূর্ণই অবশিষ্ট রহিয়াছে।

বর্ষারম্ভে অখণ্ডমণ্ডলাকারে চরাচরব্যাপ্ত শ্রীশ্রীগুরুব্রহ্মকে আমরা স্মরণ মনন ও ধ্যান করি। তাঁহার বন্দনা করিয়া তাঁহাকে ভজনা করিয়া এবং তাঁহাকেই নমস্কার করিয়া আমরা যেন তাঁহাকেই প্রাপ্ত হই।

কাল অনন্ত পূর্ণ এবং নিরুপাধিক; তাহাতে বর্ষরূপ উপাধি কল্পনা পরমার্থতঃ সত্য নহে। কিন্তু এই উপাধির উপরেই লোকব্যবহার প্রতিষ্ঠিত। লোক কর্ম্ম দ্বারা সৃষ্ট, কর্ম্মও বীজাঙ্কুর পরম্পরায় অনাদি—তাহাকে স্বীকার করিতেই হইবে। কিন্তু ইহার আদি খুঁজিয়া না পাইলেও অন্ত একদিন মিলিবেই, এমন আশা আমরা করি। ইহাই শ্রদ্ধা—সাধন পথের সম্বল।—শ্রদ্ধার ইঙ্গিতে বুঝি জ্ঞানেই সমস্ত কর্ম্মের পরিসমাপ্তি। এই পরিসমাপ্তিকে লক্ষ্য করিয়া কর্ম্ম করা চাই—তবেই কর্ম্মের সার্থকতা। কর্ম্ম শুধু বন্ধনের নিমিত্তমাত্রই নহে; যে শক্তি বন্ধন করে, সেই শক্তিই বন্ধন মোচনও করে। কিন্তু বন্ধন মোচনের সঙ্কেতটী জানা চাই ভাবাশ্রয়ে তাহার সন্ধান মিলে।

কালে যখন উপাধির কল্পনা স্বীকার করিতেছি, প্রাতিভাসিক লোকব্যবহার যখন স্বীকার করিতেছি, তখন তাহার ক্ষেত্রে ভাবকেও স্বীকার করিতে হইবে। আজ সে কথা বিশেষ করিয়া স্বীকার করার দিন, কেননা কর্ম্মের প্রেরণায় আজ অখণ্ডকে খণ্ড করিয়াছি, নিরুপাধিতেও উপাধির আরোপ করিয়াছি। এই স্বীকৃতি যেন দিন দিন আমাদের কর্ম্মবন্ধন শিথিল করিয়া দেয়।

আজ আমরা কি ভাব আশ্রয় করিব?—শান্তিপাঠেই তাহার সূচনা। আমরা স্মরণে, মননে, অনুধ্যানে পূর্ণস্বরূপকে উপলব্ধি করিতে চেষ্টা করিব। উপলব্ধির মাঝে পর্য্যায় আছে, সে কথা পরে বলিতেছি, আগে পূর্ণভাব স্বরূপটী হৃদয়ে ধারণ করিবার চেষ্টা করি।

চক্ষু মেলিলেই দেখি, বহুরূপে জগৎ ছাইয়া রহিয়াছে; কাণ পাতিলেই শুনি, অগণিত ধ্বনিতে আকাশ স্পন্দমান। এমনি করিয়া প্রতি ইন্দ্রিয়ের দুয়ারে হাজার উমেদারের হানা পড়িয়া গিয়াছে। কাহাকে রাখি, কাহাকে তাড়াই—সকল সময় তাহা ঠিক করিয়া উঠিতে পারি না। নিমেষের সংশয়ে নিমেষের ভ্রমে কর্ম্মের বোঝা সহস্রগুণ ভারী হইয়া উঠে। তখন আর শান্তি পাই না—স্বস্তি পাই না—জগৎ জুড়িয়া মনে হয়, কেবল একটা প্রমত্ত বিকট কোলাহল।—

এই বোধ হইতেই মনে হয়, আমরা অপূর্ণ; কই, যাহা চাহিয়াছিলাম, তাহা তো পাইলাম না। এমন তৃপ্তি তো জগতে মিলিল না, যাহা পাইয়া চিত্ত নিরঙ্কুশ হইয়া গেল!—তবে কোথায় সেই তৃপ্তি?—কেবল

চাইলেই তো তা মিলে না—পাইলেও তো মিলে না। তবেই বুঝি, এই চাওয়া আর পাওয়ার কলরব, এই বহির্জ্জগতের অস্বস্তি আর অশান্তি—ইহার মাঝে পূর্ণতার নিদর্শন নাই কোথাও।

বহুর কোলাহলে যদি পূর্ণতার সন্ধান না পাই তবে একের মাঝে মগ্ন হইয়া একবার দেখিতে হইবে। যে ইন্দ্রিয়-দুয়ার উন্মুক্ত পাইয়া হাজার উমেদার আসিয়া কলরব জুড়িয়া দেয়, তাহা রুদ্ধ করিয়া দাও। ইন্দ্রিয়, মন, প্রাণ, সবার আস্ফালন থামিয়া যাক; অন্তরে প্রবেশ করিবে, কি বাহিরে বিথাবিয়া পড়িবে, সে কথা পরে, আগে ইহাদের অতীত হইতে চেষ্টা কর। নির্ব্বাত, নিষ্কম্প, নিস্তরঙ্গ ভাব, অথচ যুগপৎ তাহা সর্ব্বত্র প্রত্যোতিত। সর্ব্বত্রই না বলি কেন, দেশের সীমা, দেশের কল্পনা সেখানে নাই—কালের সঙ্কোচও নাই। বিন্দুর সিন্ধুর সব স্থান—সিন্ধুতে বিন্দুর লয়; মুহূর্ত্তের মাঝে মহাকালের অধিষ্ঠান—মহাকালে মুহূর্ত্তের বিসর্জ্জন। সমস্ত দ্বৈতের সমাবেশ, অথচ নির্ব্বিরোধ সে ভূমি। আদি অনাদি অন্ত অনন্ত—সমস্ত একাকার; দীপ্ত, স্নিগ্ধ, চিদানন্দ ময় সে ভূমি। এই ভূমা, এই পূর্ণ। ওঁ

এই তো ভাব; কিন্তু লোকে ইহার প্রতিষ্ঠা হইবে কিরূপে? উপনিষদের শান্তি-পাঠে সে ইঙ্গিত থরে থরে সাজান রহিয়াছে। শুদ্ধ চিত্তে আমাদিগকে তাহা মনন করিতে হইবে।

প্রথম পাঠ—পূর্ণমদঃ। এই অদঃ বলিতে যে কি বুঝিব, তাহা আমরা জানি না। কিন্তু তবু পূর্ণতার সন্ধান যদি করিতে হয়, তাহা হইলে আগে অদঃ-লোকেই তাহা করিতে হইবে। অদঃ বলিতে সুস্পষ্ট সীমা পাই না বটে, কিন্তু তাহা যে ইদং-ব্যতিরিক্ত, তাহা অনায়াসেই বুঝিতে পারি। সুতরাং অদঃ-কে পূর্ণ বলিয়া ভাবনা করিতে হইলে ইদং-এর উপর বৈরাগ্য হওয়া চাই। ইদংকে ছাড়িয়া চিত্তের মোড় ফিরাইতে পারিলে তবে অদঃ-কে পূর্ণ বলিয়া জানিবার অধিকার জন্মে। এই ত্যাগের মন্ত্র, বৈরাগ্যের সাধনা প্রথম পাঠের প্রথম তাৎপর্য্য।

তবুও আর একটা কথা থাকিয়া যায়। পূর্ণমদঃ এ তো কেবল ব্যতিরেকী সাধনা নয়। একটাকে ছাড়াইয়া আর একটাতে চিত্ত না মজাইতে পারিলে পূর্ণতার সাধনা হইবে কি করিয়া? পূর্ণস্বরূপই লক্ষ্য, অদঃ তাহার আশ্রয়। আশ্রয়ের সীমা সম্পূর্ণ না জানিয়াও আশ্রয়ীর অনুধ্যান চলে, বিশেষতঃ আশ্রয়ী যেখানে পূর্ণস্বরূপ। সুতরাং অদঃ-অংশে যেমন ব্যতিরেকী সাধনা করিতে হইবে, তেমনি পূর্ণম্ অংশে অন্বয়ী সাধনাও করিতে হইবে। এই দুই-এ মিলিয়া তবে প্রথমপাঠের তাৎপর্য্য সম্পূর্ণ হইবে।

কিন্তু অন্বয়ের সাধনা করিব কি করিয়া?

শ্রদ্ধা সহায়। শ্রদ্ধা বুদ্ধি নয়, যুক্তি নয়, তর্ক নয়—পূর্ণজ্ঞানের পূর্ব্বাভাস—ঊষার আলোকের মত ফুটি ফুটি ভাব। চিত্তে যদি অনুরাগের উন্মেষ হইয়া থাকে, তবে শ্রদ্ধা আপনি আসিবে। সে স্পষ্ট করিয়া কিছু বলিবে না—কিন্তু অস্পষ্ট ভাষায় এমন অনেক কথা বলিবে, যাহা স্পষ্ট কথায় কোনও দিন ব্যক্ত হইবার নয়। বুদ্ধি দিয়া বুঝি, যুক্তি দিয়া বুঝি—এ মিথ্যা কথা। বোঝা যায় বিশ্লেষণে নয়—সংশ্লেষণে। তর্কের বুদ্ধি বিশ্লেষণের বুদ্ধি—বহুশাখ অব্যবসায়ীর বুদ্ধি। এমন বুদ্ধি চাই—যাহা ভাঙ্গে না, কিন্তু গোটা জিনিষটাকেই বেড়িয়া পায়। এই বুদ্ধিই

ব্যবসায়ীর "একা বুদ্ধিঃ"—ইহাই শ্রদ্ধা -ইহার পরিপাকেই জ্ঞান। পূর্ণকে ধরিতে হইলে পূর্ণ করণেরই সহায়তা লইতে হয়। শ্রদ্ধা সেই পূর্ণ করণ। শ্রদ্ধা আসে শুদ্ধি হইতে, শরণাগতি হইতে -এই মাত্র কথা, ইহার বিস্তারে এখন প্রয়োজন নাই।

এখন মোটের উপর এইটুকু পাইলাম, পূর্ণতার সন্ধান লইতে হইলে আগে ইন্দ্রিয়াতীত অদঃলোকের দিকেই দৃষ্টি ফিরাইতে হইবে এবং এই সাধনার দুইটী পক্ষ -এক পক্ষে ত্যাগ বৈরাগ্য, অপর পক্ষে শ্রদ্ধা। শুদ্ধ চিত্তে ইহাদের রাসায়নিক সংমিশ্রণেই প্রথমপাঠের উপলব্ধি।

ইন্দ্রিয়াতীতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া তার পর আবার ইদং-লোকে ফিরিয়া আসিতে হইবে। ইহাই দ্বিতীয় পাঠ—পূর্ণমিদং—এই লোকও পূর্ণ। কি করিয়া, তাহার কোনও যুক্তি নাই। উপলব্ধির স্বারসিকী অবস্থা বলিয়া দিতেছে—এই লোকও পূর্ণ। নয়নে ভাবের অঞ্জন লাগিয়াছে—এখন "যাহাঁ যাহাঁ নেত্র পড়ে, তাহাঁ তাহাঁ কৃষ্ণ স্ফুরে।" এক ভাব হইতে আর এক ভাবের পরিণতিতে এই দৃষ্টি বটে, কিন্তু সাধকের নিকট এই পরিণাম প্রবাহ এখনও প্রত্যক্ষ হইয়া দেখা দেয় নাই। অদঃলোকে যে আকর্ষণ করিয়া নিয়াছিল, সেই আবার ইদং-লোকে ফিরাইয়া আনিয়াছে—কে সে, তাহা কেহ জানে না; কোথায় অদঃ আর ইদং-এর পার্থক্য, তাহাও কেহ বলিতে পারে না। কেবল ঊর্দ্ধলোক হইতে দৃষ্টি নামিয়া আসিলে দেখা গেল—এ-ও পূর্ণ। ইদংলোকের এই স্বারসিকী পূর্ণতোপলব্ধি হইল দ্বিতীয় পাঠ।

তার পর তৃতীয় পাঠ—পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে। এইবার সম্বিৎহারা ভাবের প্রথম আবেশ কাটিয়া গেল—সাধক পাইল পরিণাম দৃষ্টি। এই যে জগতে কলায় কলায় পূর্ণতার বিন্যাস, খণ্ডে খণ্ডে অখণ্ডের বিলাস—ইহার মূল কোথায়? ভাবের আবেশে সকল একাকার হইয়া গিয়াছিল—কর্ম্ম অকর্ম্ম কিছুই ছিল না। কিন্তু ইদং লোকের সংস্পর্শের যখন পরিপাক ঘটিল, তখন লীলা-রসের আশ্রয়ে আনন্দের প্রেরণায় আবার যে বন্ধনহীন কর্ম্ম জাগিয়া উঠিল। এইবার আনন্দের স্রোতে ভাসিতে গেলে পরিণাম দৃষ্টি না হইলে তো চলে না। লোক-ব্যবহার কার্য্যকারণের পরিণাম শৃঙ্খলায় বাঁধা। ভাবুকেরও সেই পরিণামবোধ চাই—নতুবা কর্ম্ম সঞ্জীবিত হয় না।

এই পরিণাম দৃষ্টি হইতেই মূলের সন্ধান। তখন দেখি, পূর্ণ হইতেই পূর্ণের উদ্ভব। এই যে বহির্জ্জগতের মধু -অন্তর্জ্জগতেই যে তার "মধ্ব উৎসঃ।" প্রশান্ত মহাসাগরে কর্ম্মের বীচিমালা নৃত্য করিতেছে, জীবনও তাহার তালে তালে দুলিতেছে—দুইই-সুন্দর; প্রশান্তিও সুন্দর আর এই তরঙ্গনৃত্যও সুন্দর। কিন্তু প্রশান্তির ভূমিকাতেই নৃত্যের সৃষ্টি—এই কথাটী স্মরণ রাখিতে হইবে, এই নৃত্য-বিলাস হইতে বারবার সেই প্রশান্তির দিকে দৃষ্টি ফিরাইয়া লইতে হইবে। কর্ম্মের মাঝে মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে মনন করিতে হইবে—পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে। এই মননেই জীবন সিদ্ধ, কর্ম্ম সিদ্ধ। ইহাই তৃতীয় পাঠ।

তারপর চতুর্থ পাঠ—পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে। তৃতীয় স্তরে ছিল ভাব লোক হইতে অবরোহণ—এর পর আবার ভাবারূঢ় অবস্থায় প্রতিষ্ঠা। এই দুটী ভাবই কর্ম্মসাধনার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত—কর্ম-যন্ত্রের কীলক এই দুইটী উপনিষদ্। কিন্তু

যাহাকে নামাইয়া আনিয়াছিলাম, তাহাকে ছাড়িয়াও দেখি, পূর্ণস্বরূপের পূর্ণতার কোনও ব্যত্যয় হয় নাই। এই তো সম্যক্ দৃষ্টি। পূর্ণের উৎস হইতে পূর্ণের ধারা বহিয়া চলিয়াছে—এই পরিণামদৃষ্টি ছিল আমাদের কর্ম্মের উপনিষদ্। কিন্তু কর্ম্মের সঙ্গে সঙ্গেই পূর্ণ বিশ্রাম চাই—নতুবা কর্ম্ম যে বন্ধন হইয়া উঠিবে। তাই চতুর্থ পাঠে বিশ্রামের উপনিষদ্। পূর্ণ হইতে পূর্ণের ধারা নামিয়া আসিয়াছে, অথচ পূর্ণ অবশেষ: কর্ম্মের এই দুই পক্ষ—এক পক্ষ গতি, আর এক পক্ষ স্থিতি।

এমনি করিয়া চারি পর্ব্বে পূর্ণতার সাধনা প্রকট হইয়াছে। উপনিষদ বলিলেন, বৈরাগ্য ও শ্রদ্ধা, এই তোমার প্রবর্ত্ত সাধনার উপাদান। ইহার উপর ভাবকে প্রতিষ্ঠিত কর—দৃশ্যাদৃশ্য সমস্তই ভাবরূঢ়, ভাববিলীন হইয়া যাইবে; ইহাই পূর্ণতার স্বরূপ। তারপর এই ভাবকে কর্ম্মে নামাইয়া আন—পূর্ণানন্দের প্রবাহে কর্ম্মের তরণী ভাসাইয়া দাও। আবার দৃষ্টি রাখ সেই সাবশেষ পূর্ণতায়, সেই শাশ্বতী স্থিতিতে, সেই ত্রিপাদ অমৃতলোকে। শুদ্ধি, বৈরাগ্য ও শ্রদ্ধা—ভাব, গতি ও স্থিতি—ইহাদের উপর জীবনের প্রতিষ্ঠা।

এই আমাদের সনাতন আদর্শ। এই আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া আমাদিগকে যাত্রা করিতে হইবে। আমরা পূর্ণতা চাই যুক্তি দিয়া নয়, শুদ্ধ বুদ্ধি দিয়া। অন্তরে, বাহিরে, বিশ্বচরাচরে তিনি সৎস্বরূপে, চিৎস্বরূপে, আনন্দস্বরূপে সমস্ত পূর্ণ করিয়া রহিয়াছেন। আমরা কোথায় যেন তাঁহার ন্যূনতা না দেখি। আমাদের সম্যকদৃষ্টিতে প্রাকৃত লোকের তুচ্ছ বস্তুটীও যে পূর্ণস্বরূপের ভূমিকা হইয়া দেখা দেয়। সত্যদর্শী ঋষিগণ আমাদিগকে উদ্বুদ্ধ, সঞ্জীবিত ও অকুণ্ঠবীর্য্য করুন। ওঁ শান্তিঃ।

সভ্যতার বিকার

এক দেওদারকুঞ্জে বালির উপর একটা পাথরে মাথা রেখে আয়েসে রাম শুয়ে আছেন—একখানা পায়ের উপর আর একখানা পা তুলে দিয়ে। তাঁর নিঃশ্বাসে নিঃশ্বাসে বাতাস হতে পরিপূর্ণ আনন্দ উথলে উঠছে, সৌর কিরণের মদিরস্পর্শে আনন্দস্নাত তনু-মন—কণ্ঠে প্রণবের সুধাঝঙ্কার, আর তারি তালে তালে কুলু কুলু স্বরে পাদমূলে তরঙ্গিণী নেচে চলেছে। এমন সময় একটু বিদ্রূপের সুরে রামকে একজন জিজ্ঞাসা করল—বোধ হয় নূতন সভ্যতার একটী ফুঁইফোঁড় নমুনা লোকটা—

"এসিয়ার কুঁড়েমি আপনি আমেরিকায় আমদানী করছেন কেন? তার চেয়ে বেরিয়ে পড়ুন না—লোকের একটু হিত করুন না!"

রাম। "আমারি আত্মস্বরূপ তুমি!—তার পর, লোকের হিতের কথা বলছ তো?

কিন্তু ও ব্যরসাতে অনেক বেণিয়াই তো জুটেছে—আর বেশী লোক হলে দম আটকে যাবে যে! আমাকে আর রামকে নিয়ে তার মাঝে টেনে ফেল্‌ছ কেন?

খুঁড়েমির কথা বল্‌ছিলে কি? পূবদেশের কুঁড়েমি? কেন? কাকে তোমরা কুঁড়েমি বল?

আচ্ছা, এই যে সামাজিক মিথ্যাচারের চোরাবালিতে দিন দিন তলিয়ে যাচ্ছ, ফ্যাসানের স্রোতে নিজকে ভাসিয়ে দিচ্ছ, পাষাণখণ্ডের মত মোহের কূপে ডুবে যাচ্ছ, ভোগের পঙ্কে মজে যাচ্ছ, ভগবানের দেওয়া অবসরটুকু স্বর্ণমোহের কাছে বিকিয়ে দিচ্ছ, আর তাকেই বলছ—"জনসেবা"—এ কি তোমার কুঁড়েমি নয়? এই যে শুধু পরের গরজে বেঁচে রয়েছ—খাওয়া-পরা, শোওয়া বসা, হাসি কান্না কোনও কিছুতেই যে তোমাদের একটু স্বাতন্ত্র্য নাই—এমন কি প্রাণ খুলে দুটো স্পষ্ট কথাও বলতে পার না—এ কি কুঁড়েমি নয়? তোমার ব্রহ্মত্বকে ভুলে থাকা কুঁড়েমি নয়? এই যে হুড়োহুড়ি—ঘাড়-মটকানো হাড়-পটকানো তাড়াতাড়ি—জ্বর বিকারের আইঢাই—এ কিসের জন্য? পরম যত্নে যে সর্ব্বশক্তিমান্ রজতচক্র সঞ্চয় করেছ—কিন্তু ততঃ কিম্? আর সবার মত ভোগ করবে তা? না—তা তো হবার নয়; ভোগের পিছনে ছুটাছুটী করতে থাকলে ভোগ হবে কোথা থেকে?—

হায় রে অন্ধ আচারের দাস, অমন করে ভোগকে তোমরা দূরে ঠেলে দিচ্ছ কেন? তার চেয়ে বসে যাও না প্রকৃতির এই মনোরম উপবনে—এই মঞ্জুভাষিণী গিরিনির্ঝরিণীর কূলে—এইখানেই তো তোমার প্রাণের দোসরদের পাবে, যারা তোমার সগোত্র—তোমার সাথে যাদের রক্তের যোগ আছে—এই যে খোলা হাওয়া, রূপালী আলো, ছল্‌কে ওঠা জল আর সবুজমাখা এই পৃথিবী—এরাই না তোমার দেহের প্রতি রক্তবিন্দুটা গড়ে তুলছে।

কিন্তু জগতের সভ্যতাভিমানী জাতিরা হচ্ছে জাতিভেদের নাগপাশে বাঁধা। আপন জন হতে তারা পৃথক হয়েছে উদার উন্মুক্ত প্রকৃতি হতে নিজকে বিচ্ছিন্ন করে, প্রাকৃতিক জীবনের সমস্ত মধু, সমস্ত সৌরভ হতে বঞ্চিত হয়ে বৈঠকখানা ঘরের বদ্ধ বাতাসে প্রমোদের অন্ধকূপে আপনাকে অবরুদ্ধ করেছে। এই উদার জগৎ হতে তারা বিচ্ছিন্ন, সমস্ত সৃষ্টির অপাংক্তেয়, পশু-পাখী গাছ-পালার সংস্পর্শ হতে বঞ্চিত। শ্রেষ্ঠতার, গৌরবের, সম্মানের গুমোরে তারা ফেটে মরে—কিন্তু এদিকে নিঃসঙ্গ জড়ত্বের মাঝে যে আপনাকে তলিয়ে দিয়েছে, সেদিকে কারু খেয়াল নাই।—ওগো দয়া কর, দয়া কর—দয়া করে নিজের দিকে একবার তোমরা তাকাও।

ধনের যাদের বাস্তবিক প্রয়োজন, তাদের কাছ থেকে বিধিমত কৌশলে তা কেড়ে নিয়ে নিজের ঘরের পুরেছ বটে; কিন্তু এতে লাভ হল কি? এর বদলে পাচ্ছ হোটেলে হোটেলে শ্রান্তিতে ভরা অবসাদে ঘেরা ভোজন ব্যসন, শুষ্ক মুখ, প্রাণহীন চাহনি! এতে ঘরের নামে তুমি বাক্সবন্দী হচ্ছ শুধু, কৃত্রিমতার পূতিগন্ধে তোমার শ্বাসরোধ হয়ে আস্‌ছে, অস্বাভাবিক উত্তেজনায় তোমার চিত্ত কেবল চঞ্চল হয়ে বেড়াচ্ছে; মানসিক শারীরিক উভয়বিধ উত্তেজনায় তুমি অবসন্ন। নিজকে প্রবঞ্চিত করতে এত আয়োজন উদ্যোগ তোমাদের! কল্পিত সুখের আশায়

তোমরা বাস্তব আনন্দ হতে বঞ্চিত হয়ো না; শুধু হাতড়ে বেড়িয়ে লাভ কি? এই যে আনন্দের পসরা—এখানে—এস, এখনি তার আস্বাদ নাও! এস, আমার সঙ্গে এই তৃণশয্যা গ্রহণ কর।”

“কেবল কাঞ্চনের উপাসনা করেই মনে করো না, তোমার জীবনের একটা সুরাহা হবে—ওতে শুধু সময়ের অপব্যয় হবে মাত্র। খুব টাকা জমাতে আর দুহাতে তা ওড়াতে পারলেই কি জীবন কায়েমী হল মনে কর? অমন কথা স্বপ্নেও ভেবো না। হায়রে প্রবঞ্চিত, অমৃতের পুত্র যে তুমি! আপাত-মোহকর তুচ্ছ জঞ্জালের জন্য তাড়াহুড়ো করে জীবনটাকে ভারিয়ে তুলতে চাও কেন?”

* * *

ইউরোপ আর আমেরিকার তথাকথিত সমুন্নত জাতিরা কেবল মৃত্যুর দিকেই এগিয়ে এসেছে। উন্নতি বলতে মানসিক বা আধ্যাত্মিক উন্নতিই বোঝায় শুধু। বাস্তবিক উন্নতি যা, তা একেবারে মানুষের অন্তস্তল স্পর্শ করবে, শুধু তার খোসাটা নিয়ে হৈ চৈ বাধিয়ে দেবে না। পার্থিব ধন-সম্পদের সঞ্চয়ে বা নিরর্থক প্রয়োজনের সংখ্যাবাহুল্যে উন্নতির পরিমাপ হয় না। প্রাচীন আর্য্যেরা জগতের কোনও সম্পদের অধিকারী ছিলেন না, তাঁরা সরল, উদার জীবন যাপন করতেন, অথচ কত অত্যাশ্চর্য্য গ্রন্থ রচনা করে গিয়েছেন। তাঁরা যে জীবনের আদর্শ দেখিয়ে গিয়েছেন, ইতিহাসে আবার তার পুনরাবৃত্তি হবে অবশ্য সাময়িক একটু রদ্‌বদল হয়ে। কিন্তু বর্তমান সভ্যতা মূল লক্ষ্য হতে বিচ্যুত হয়ে গিয়েছে। ধান-চালের যেমন দরদস্তুর চলে, আজকাল মানুষের তেমনি দরদস্তুর চলছে; দর একবার উঠছে, আবার পড়ছে। কিন্তু এ সব ছাড়িয়ে উঠতে হবে যে তোমাকে!—তোমার ওপর দর কষতে যাবে কে?

হায়রে অন্ধ, মিথ্যা জাঁকের পরম ভক্ত তোমরা, সন্ন্যাসের ত্যাগের আর্য্য আদর্শ তো তোমাদের কাছে স্বপ্নাবেশ বলেই মনে হবে। —কিন্তু হুঁসিয়ার সব! তোমাদেরও সময় হয়ে এসেছে, মহাকালের ঝাঁকুনিতে জাগতে হবে তোমাদের—তখন বুঝবে কি নিদারুণ দুঃস্বপনের মাঝে বন্দী হয়েছিলে তোমরা। মানুষ সভ্য হয়েছে অথচ প্রেমের ভিতর দিয়ে ত্যাগী হতে পারেনি—এ কেবল অসভ্যতারই উন্নত সংস্করণ মাত্র।

এই যে সভ্যতার বাহ্য চাকচিক্য, এই যে তার বাঁধা গৎ-এর চালচলন, আর এই যে তার টাকার নেশা—এ দেখে ভুলে যেও না। এ যে নিষ্ফল, তা প্রমাণ হয়ে গিয়েছে। এদের অগ্নিপরীক্ষা হয়ে গিয়েছে। আর জীর্ণ কাষ্ঠ-খণ্ডের মত, তৃণখণ্ডের মত অগ্নিদহনে তারা ভস্ম হয়ে গিয়েছে। এ জগতের অর্দ্ধেক লোক না খেতে পেয়ে শুকিয়ে মরছে, আর বাকি অর্দ্ধেক দুঃসহ অপব্যয়ে, গৃহসজ্জার আতিশয্যে, গন্ধদ্রব্যের বিলাসে, কৃত্রিম আড়ম্বরে, বহুব্যয়ে সঞ্চিত আবর্জনার ভারে, অর্থের উচ্ছৃঙ্খল ও অস্বাস্থ্যকর অপব্যয়ে আকণ্ঠ নিমজ্জিত হয়ে রয়েছে।

স্বাস্থ্য ও দীর্ঘ জীবনের সঙ্গে শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রমের কোনও বিরোধই হতে পারে না, যদি এ দুটোর একটাকে খুইয়ে আর একটাকে বজায় রাখবার কোনও চেষ্টা না হয়। কিন্তু আজকালকার যুগে কেবলমাত্র কায়িক পরিশ্রমেই কেউ কেউ বেঁচে

[stamp]

আছে (বরং বলা উচিত মরে আছে); আবার কেউ বা বিলাসব্যসনে ও অত্যাচারে শুধু মনের ওপর জবরদস্তি করে জাহান্নমের পথে চলেছে। এ যেন একই পরিবারের লোকের মাঝে কাউকে দিলে শুধু ভাত, আর কাউকে দিলে শুধু তরকারী।

এ জগতে সঞ্চয় করেছে যারা, তারাই হল আদত কাঙ্গালী—নিজের ফিকিরে তারা কাঙ্গাল বনেছে। কেবল দাবীদাওয়া যাদের, তারাই হল বাস্তবিক শূদ্র; ধনে জনে জড়িয়ে রয়েছে যারা, আপন হাতে তারাই পূতিগন্ধে ভরা কারাগারের সৃষ্টি করেছে; স্তূপাকার বিত্তসঞ্চয়ের নেশায় ভরপুর যারা—তারাই কীটাণুকীটের অধম; ঐশ্বর্য্যের ধূলিজালে রুদ্ধ-শ্বাস হয়ে আত্মহত্যা করে মরছে যারা—তারাই আপনাকে রাজা ও রাষ্ট্রপতি বলে জাঁক করে। অবিদ্যার অতল গহ্বরে ডুবে গেল যারা, তারাই হল আচার্য্য আর দার্শনিক। হৃদয় দৌর্ব্বল্য আর চিত্ত চাঞ্চল্যের চোরা-বালিতে তলিয়ে গেল যারা, তারাই করে বীর্য্যের আস্ফালন! হায়রে, ভাঁড়ের মত হাসির উপাদান যুটিয়েই এরা নিজকে ভাবছে বড়—নিজকে নিজে সম্মোহিত করে শুকনো ডাঙ্গায় মাছ ধরছে এরা—কেবল নিশ্চেষ্ট হয়ে ঐশ্বর্য্য আর বিলাসের দুঃস্বপন দেখছে দিন-রাত! অদ্ভুত আত্মপীড়ক তপস্বী এরা—এদের ত্যাগধর্ম্ম শেখাতে হবে, জাগাতে হবে যে! দূর হোক তোর ধন মান বিদ্যা প্রতি-পত্তির কামড়ানি আর বড়াই! সমধং সুখ-মুচ্যতে। দুর্জ্জয় লোভ, কেবল আঁকড়ে ধর-বার পাশব প্রবৃত্তি, কেবল দখলের আর পুঁজির কাৎরানি—এতেই তো মানুষ, বেদম, বেহুঁস্, বেফাঁস হয়ে পড়েছে। ঔদ্ধত্য আর উচ্চাকাঙ্ক্ষার জ্বরবিকার শান্ত হোক তোমা-দের! এই অখণ্ড্য সত্য প্রতি কর্ণে বজ্রনাদে ধ্বনিত হয়ে উঠুক—"ধন আর জন যত তুমি পেয়েছ বলে মনে কর—অবিদ্যা তোমাকে ততখানি পেয়ে বসেছে।"

হে সত্যসন্ধানী, সভ্যতার চাপে মুসড়ে পড়ো না—চারদিকে সংসারের হাল-চাল দেখে দমে যেও না। তথাকথিত সুসভ্য সমুন্নত জাতির জাঁকজমক আর আড়ম্বর দেখে কুণ্ঠিত হয়ো না। তাদের পাকা হিসাবে ঢের গলতি আছে—ওসব ভুয়ো ফাঁকী-বাজী, ঠান-দিদির গল্প শুধু। তারা যাকে নগদ তহবিল বলছে, তার বেবাক ফাঁকী; তাদের সত্যের জাঁক আলেয়ার আলো শুধু। এই বিংশ শতাব্দীতে এমন দিন বড় বেশী দূর নয়, যখন সমস্ত উন্নতিশীল জাতিকেই রাষ্ট্রের আদর্শ বা জীবনের ধারা বদলে বেদান্তের আদর্শে তা গড়ে তুলতে হবে। অধিকার-লোলুপতা ছেড়ে বৈদান্তিকের সুনির্ম্মল ত্যাগধর্ম্ম গ্রহণ করলে তবেই জাতির মুক্তি, ব্যক্তিরও মুক্তি। নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে!

সভ্যতাভিমানী পাশ্চাত্যভূমি সঞ্চয়ের তৃষ্ণায় আজ শুষ্ককণ্ঠ হয়ে উঠেছে, কিন্তু সব জায়গাতেই ভিতরে ভিতরে প্রাকৃতিক শক্তির ক্রিয়া আরম্ভ হয়ে গিয়েছে। সঞ্চয়ের মোহে মুগ্ধ রুদ্ধশ্বাস এই সব জাতিকে জাগতেই হবে। ত্যাগের রাজ্য জগতের উপর আশিষ বর্ষণ করবে—মুক্তির জয় জয়কার হবে।"

"আপনি কি কোনও নূতন মত প্রচার করতে চান?"

"রাম কোনও মতের প্রচারক নন। সত্যের প্রচার আপনা হতেই হয়। রাম মহাশক্তিকে কোনও বাধা দিচ্ছেন না—আপনাকে তিনি স্বচ্ছ করে ফেলেছেন—তাঁর আলো নির্ম্মুক্তভাবে তাঁর ভিতর দিয়ে প্রকাশ

হবে বলে। সে আলো যে ভাবেই ফুটুক না কেন!—দেহ, মন, প্রাণ সব সে আলোতে ঝলকে উঠুক। এর চেয়ে বড় ভাগ্য আর কি আছে? দূতের বার্ত্তা জেনেছ—এবার দূতকে তবে বধ কর।"

"আপনি কি প্রবক্তার আসন গ্রহণ করতে চান?"

"না। তাতে আমার গৌরবের লাঘব হবে। সোঽহং—তত্ত্বমসি; আমি ব্রহ্ম—তুমিও তাই। দেহ আমার বাহন মাত্র।"

"আপনার বাণী সফল হবে না। লোকে তা গ্রহণ করবার জন্য এখনও তৈরী হয়নি।"

"তাতে আমার কি? আমি সত্যস্বরূপ—কাণাকড়ির হিসাব খতিয়ে আমি পথ চলি না। যুগযুগান্তর আমার—অনন্ত কাল আমার। খৃষ্টকে তাঁর আপন জনে প্রত্যাখ্যান করল বটে, কিন্তু জগৎ তাঁকে মাথায় তুলে নিল। তাঁর যুগে তিনি প্রত্যাখ্যাত বটে, কিন্তু পরবর্ত্তী সমস্ত যুগই তো তাঁর।"

"ইতিহাস তো আপনার কথায় সায় দেয় না।"

"তোমাদের ইতিহাস অসম্পূর্ণ। ইতিহাসের যে অধ্যায়ে এই সত্য লেখা হবে, সে অধ্যায় তোমরা এখনো পড়নি। ইচ্ছাশক্তির সামনে তোমাদের ইতিহাস কুণ্ঠিত, সঙ্কুচিত, বিশীর্ণ হয়ে যায়—এমন কি একের ইচ্ছার সাক্ষাতেই। তোমাদের ইতিহাস নিদান খোঁজে না, কেবল উপসর্গ নিয়েই সে ব্যস্ত।"

"ইমার্সন বলেন, সমানুভূতিই প্রেমের মূল। কিন্তু আপনি তো আদত স্বষ্টছাড়া—কারু সঙ্গে আপনার মিল খুঁজে পাওয়া ভার। আপনার জীবন প্রেমের অভাবে না জানি কত বিড়ম্বনাময়।"

"এ জগৎ আমারি আঁকা ছবি। আমি নানা দিক হতে তাকে পরখ করে খুসী। একবার গোঁড়ার মত পেছন থেকে দেখ্‌ছি; আর একবার দেখ্‌ছি উদারনৈতিকের মত সামনে থেকে; রাম হয়ে দেখি ডান দিক থেকে; আবার সমালোচক হয়ে দেখি বাঁ দিক থেকে। যতরকম দেখার নমুনা—সব আমারি। গয়লানী যখন মাখন তোলে, তখন ডান হাতের দড়িটাতেও টান দেয় আবার বাঁ হাতের টাতেও দেয়। তেমনি সব দৃষ্টিই আমারি দৃষ্টি। এক হতে আর পৃথক করব আমি কি করে? প্রেমপারাবার আমি—হাজার ঢেউএ উথলে উঠেছি। সবার সঙ্গে আলাদা হয়েই আমি সবার সাথে এক। ন্যায়শাস্ত্রের 'অনৈক্যে ঐক্য' যদি বুঝ্‌তে চাও, তবে আমার কাছে এস।"

"কিন্তু এ সব দুর্জ্ঞেয় আধ্যাত্মিকতার বুলি নয় কি? একজন আর একজন থেকে সম্পূর্ণ আলাদা থেকেও কি করে হয়ে এক হবে?"

"আচ্ছা, হোক না। আমিও অবাক হয়ে ভাবি, বাইরে দেখছি আমরা এক হতে পারি না কিছুতেই—অথচ আমরা এক কি করে? তোমার দর্শন তো খোঁড়া, সে এ তত্ত্বের নাগাল পাবে না। ইন্দ্রিয় এর খবর দিতে পারবে না। কিন্তু তবু এ সত্য—নিছক সত্য। সত্যের সাক্ষাৎ মিললে মায়া মিলিয়ে যায়। প্রেম তার সাক্ষী। তত্ত্বমসি—তুমি তাই।"

"আপনি ঈশ্বরকে 'তৎ' বলেন কেন?"

"কেউ ঈশ্বরকে 'স্বর্গস্থ পিতা' বলে উপাসনা করে, সে বলে তাঁকে 'সঃ।' কেউ তাঁকে মাতারূপে উপাসনা করে, সে তাঁকে বলে 'সা।' ফারসী কবিদের কেউ তাকে

প্রিয়তম বলে উপাসনা করে। কাজেই তাঁর সর্ব্বনামটী কি হবে, সে বিচার করবার আগে দেখ্‌তে হবে, তিনি মিস্‌ না মিসেস্‌ না মিষ্টার।"

"তিনি কি?"

"তিনি মিসও নন, মিসেসও নন, মিষ্টারও নন—তিনি MYSTERY—রহস্যম্‌।"*

* স্বামী রামতীর্থ

যোগসূত্রবৃত্তি

সাধনপাদ

যে অনাগত দুঃখকে হেয় বলা হইল, তাহার হেতু কি? দ্রষ্টা এবং দৃশ্যের সংযোগই হেয়-হেতু। চিদ্রূপ পুরুষ **দ্রষ্টা** এবং বুদ্ধিতত্ত্ব **দৃশ্য**। এতদুভয়ের মধ্যে বিবেক না করায় ভোক্তা ও ভোগ্যরূপে তাহাদের যে সান্নিধ্য বোধ হয়, তাহাই **সংযোগ**। হেয় দুঃখরূপ গুণপরিণাম হইতে যে সংসারের উদ্ভব হয়, এই সংযোগই তাহার কারণ। সংযোগের নিবৃত্তি হইলেই সংসারেরও নিবৃত্তি হয়। (১৭)

দ্রষ্টা এবং দৃশ্যের সংযোগের কথা বলা হইয়াছে। এখন দৃশ্যের স্বরূপ, কার্য্য ও প্রয়োজনের কথা বলা হইতেছে। প্রকাশ সত্ত্বগুণের ধর্ম্ম, প্রবৃত্তিরূপা ক্রিয়া রজোগুণের ধর্ম্ম এবং নিয়মনরূপা স্থিতি তমোগুণের ধর্ম্ম। এই প্রকাশ, প্রবৃত্তি এবং স্থিতিই দৃশ্যের স্বরূপ বা স্বাভাবিক রূপ। গ্রাহ্য ও গ্রহণরূপ ভূত এবং ইন্দ্রিয় দৃশ্যেরই স্বরূপ হইতে অভিন্ন পরিণাম—সুতরাং, ইহারাই দৃশ্যের কার্য্য। তন্মধ্যে স্থূলসূক্ষ্মভেদে ভূত দুই প্রকার—পৃথিবী প্রভৃতি স্থূল এবং গন্ধতন্মাত্র প্রভৃতি সূক্ষ্ম; জ্ঞানেন্দ্রিয়, কর্ম্মেন্দ্রিয় এবং অন্তঃকরণ ভেদে ইন্দ্রিয়ও তিন প্রকার। ভোগ এবং অপবর্গই দৃশ্যের প্রয়োজন। ভোগের লক্ষণ পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে (১৩শ সূত্র দ্রষ্টব্য); বিবেকখ্যাতি পূর্ব্বক যে সংসারনিবৃত্তি, তাহাই **অপবর্গ**। (১৮)

এই দৃশ্য নানা অবস্থায় পরিণত হয়। সমস্ত অবস্থাপরিণামই হেয়, অতএব তাহাদের লক্ষণ জানা প্রয়োজন। দৃশ্যের চারিটি অবস্থাবিশেষ রহিয়াছে, তাহাদিগকে গুণপর্ব্ব বা গুণেরই অবস্থাবিশেষ বলা যায়। তাহারা যথাক্রমে এই—মহাভূত ও ইন্দ্রিয় **বিশেষ**, অন্তঃকরণ ও তন্মাত্র **অবিশেষ**, বুদ্ধি **লিঙ্গমাত্র** এবং প্রকৃতি **অলিঙ্গ**। মহাভূত ও ইন্দ্রিয়াদি চূড়ান্ত বিকার বলিয়া স্ব স্ব বিকৃতি দ্বারাই তাহারা বিশিষ্ট; এইজন্য তাহাদিগকে বিশেষ গুণপর্ব্ব বলা হইল। তন্মাত্র ও অন্তঃকরণ উক্ত বিকৃতি সমূহের সাধারণ ও সূক্ষ্ম উপাদান, অতএব তাহারা অবিশেষ। বুদ্ধিতত্ত্ব অব্যক্ত ও আত্মার গমক বা সঙ্কেতস্থানীয়; অতএব তাহা লিঙ্গমাত্র। অব্যক্ত প্রকৃতির কোনও কারণ নাই, সুতরাং তাহা কাহারও সঙ্কেতক নহে; অতএব তাহা অলিঙ্গ। দৃশ্যের এই

চারিটী পর্ব্বেই গুণরূপ অব্যক্ত অন্বিত রহিয়াছে এবং প্রতি পর্ব্বেই তাহার প্রত্যভিজ্ঞান হইয়া থাকে। যোগকালে এই চারিটী পর্ব্বের জ্ঞান আবশ্যক বলিয়া এখানে তাহাদের নির্দ্দেশ করা হইল। (১৯)

দৃশ্য হেয়; সুতরাং তাহার কথাই প্রথমে জানিতে হইবে। তাই তাহার স্বরূপ, কার্য্য, প্রয়োজন ও অবস্থাপরিণাম সমূহ ব্যাখ্যাত হইল। এক্ষণে হেয়ের বিপরীত উপাদেয় যে দ্রষ্টা, তাঁহাকে বুঝিতে হইবে। পুরুষই দ্রষ্টা—তিনি দৃশি মাত্র অর্থাৎ চেতনা মাত্র। মাত্র পদ দ্বারা পুরুষ সম্বন্ধে ধর্ম্ম ও ধর্ম্মীর ভাব নিরস্ত করা হইল। কেহ কেহ চেতনাকে আত্মার ধর্ম্ম বলিতে চাহেন—সূত্রকারের তাহা অভিপ্রায় নহে; মাত্র পদ দ্বারা তিনি ইহাই বুঝাইলেন। পুরুষ শুদ্ধ, তাঁহার পরিণাম হয় না, অতএব তিনি সুপ্রতিষ্ঠিত। তথাপি তাঁহাকে প্রত্যয়ানুপশ্য বলা হইতেছে। ইহার অর্থ এই—বিষয়ে উপরক্ত যে জ্ঞান, তাহাকে প্রত্যয় বলে; নিজ হইতে অব্যবহিত রাখিয়া অথচ প্রতিসংক্রান্ত না হইয়া পুরুষ এই সমস্ত প্রত্যয় দর্শন করেন। অর্থাৎ বুদ্ধিতে যখন বিষয়ের উপরাগ জন্মে, তখন পুরুষ শুধু তাহার সন্নিহিত থাকিয়া তাহা দর্শন করেন—এই মাত্র তাঁহার দ্রষ্টৃত্ব এবং এই জন্যই তিনি **প্রত্যয়ানুপশ্য**। (২০)

পুরুষই ভোক্তা। পূর্ব্বে যে দৃশ্যের কথা বলা হইয়াছে, তাহার স্বরূপ পুরুষের ভোক্তৃত্ব-সম্পাদনেই পর্য্যবসিত, তাহার স্বার্থ কিছুই নাই, সমস্তই পুরুষার্থে উৎসৃষ্ট। প্রকৃতি প্রবর্ত্তমান হন, নিজের কোনও প্রয়োজন লক্ষ্য করিয়া নহে, পরন্তু পুরুষের ভোগ সম্পাদন করিবেন বলিয়াই। (২১)

এখানে সন্দেহ হইতে পারে, পুরুষের ভোগসম্পাদনই যদি প্রকৃতির প্রয়োজন হয়, তবে সেই প্রয়োজন নিষ্পন্ন হইলে প্রকৃতির ব্যাপার-বিরতি ঘটিবে, এবং প্রকৃতি পরিণাম-শূন্য হইলে সমস্ত দ্রষ্টাই শুদ্ধ ও বন্ধবিরহিত হইবেন। ইহাতে তো সংসারের উচ্ছেদ হইবে। ইহার উত্তরে বলা হইতেছে—প্রকৃতি সমস্ত পুরুষের পক্ষেই সাধারণ; সুতরাং বিবেকখ্যাতি পর্য্যন্ত ভোগসম্পাদন করিয়া কোনও পুরুষের পক্ষে নিষ্প্রয়োজন হইলেও, সকলের পক্ষেই তো প্রকৃতির ব্যাপার-বিরতি ঘটিবে না। অতএব সকল ভোক্তার পক্ষে সাধারণ বলিয়া প্রকৃতির কখনও বিনাশ হইতে পারে না কিম্বা একের মুক্তিতে সকলের মুক্তি হইতে পারে না। (২২)

দৃশ্য ও দ্রষ্টা বোঝা গেল; এখন সংযোগ কাহাকে বলি? স্বশক্তি ও স্বামিশক্তির স্বরূপোপলব্ধির যে হেতু, তাহাই **সংযোগ**। এখানে কার্য্য দেখিয়া সংযোগের লক্ষণ করা হইল। স্বশক্তি অর্থে দৃশ্যের স্বভাব। আর স্বামিশক্তি দ্রষ্টার স্বরূপ। এই দুইটী সংবেদ্য ও সংবেদকরূপে ব্যবস্থিত। স্বশক্তি সংবেদ্য ও স্বামিশক্তি সংবেদক। ইহাদের স্বরূপোপলব্ধির কারণই সংযোগ অর্থাৎ সংযোগ প্রকৃতি-পুরুষের সহজ ভোগ্যভোক্তৃভাব ব্যতিরিক্ত আর কিছুই নহে। প্রকৃতি ও পুরুষ নিত্য এবং ব্যাপক, সুতরাং তাহাদের স্বরূপাতিরিক্ত আর কোনও সংযোগ হইতে পারে না। এই যে ভোগ্যের ভোগ্যত্ব এবং ভোক্তার ভোক্তৃত্ব অনাদিসিদ্ধ হইয়া রহিয়াছে—ইহাই সংযোগ। (২৩)

অবিদ্যা সংযোগের কারণ; অবিদ্যা মোহরূপা, বিপর্য্যাস তাহার স্বভাব। সংযোগের কারণ অবিবেকখ্যাতিরূপা এই অবিদ্যাই হেয়,

ইহাই হানক্রিয়ার কর্ম্ম। (২৪)

সম্যকজ্ঞান অবিদ্যার স্বরূপের বিরুদ্ধ। সম্যকজ্ঞান দ্বারা অবিদ্যা উন্মূলিত হইলে তাহার কার্য্য সংযোগেরও অভাব হয়। ইহাকেই বলে **হান**। তাৎপর্য্য এই, হান যে ত্যাগ বুঝায়, তাহা কোনও মূর্ত্ত দ্রব্যের ত্যাগের মত নয়। যদি বিবেকখ্যাতি জন্মে, তাহা হইলে অবিবেকের দরুণ যে সংযোগ ঘটিয়াছিল, তাহা আপনা হইতেই নিবৃত্ত হয়; ইহাই তাহার হান বা ত্যাগ। যাহা সংযোগের হান, তাহাই পুরুষের কৈবল্য—যদিও কৈবল্য পুরুষের নিত্য-স্বরূপ। (পুরুষের কৈবল্য কথায় যে বিকল্প ধ্বনিত হয়, তাহার নিরাসের জন্যই এই কথা বলা হইতেছে)। (২৫)

হানের স্বরূপ, কারণ ও কার্য্যের কথা বলা হইল। এখন হানের উপায় বলা হইবে। ইহা হইতেই উপাদেয়ের কারণও বুঝা যাইবে। দৃশ্যের পরিত্যাগই হান। গুণসমূহ পৃথক এবং পুরুষও পৃথক—এই প্রকার বিবেকের খ্যাতি বা প্রকাশই হানের কারণ। এই বিবেকখ্যাতি অবিপ্লবা—ইহার মাঝে বিপ্লব বা মধ্যে মধ্যে ব্যুত্থানদশার প্রাদুর্ভাববশতঃ কোনও বিচ্ছেদ নাই। তাৎপর্য্য এই—প্রতিপক্ষ-ভাবনার বশে যখন অবিদ্যা লয় হইয়া যায়, বুদ্ধি রজস্তমঃসংস্পর্শে আর অভিভূত হয় না, জ্ঞাতৃত্ব ও কর্ত্তৃত্বের অভিমান দূর হইয়া যাওয়াতে বুদ্ধি অন্তর্ম্মুখী হইয়া চিচ্ছায়াতে সংক্রান্ত হয়, তাহাকেই বলে **বিবেকখ্যাতি**। এই বিবেকখ্যাতি যখন অবিচ্ছিন্ন ধারায় প্রবর্ত্তিত হয়, তখন পুরুষের উপর দৃশ্যের অধিকার নিবৃত্ত হইয়া যায়—ইহাই **কৈবল্য**। (২৬)

বিবেক উৎপন্ন হইলে পুরুষের প্রজ্ঞা এইরূপ হয় বটে, কিন্তু বিবেকখ্যাতির স্বরূপ কি, তাহা বুঝাইয়া বলা আবশ্যক। এই বিবেকজ্ঞানেরও সপ্তধা প্রজ্ঞা রহিয়াছে—তাহা জ্ঞাতব্য বিষয়েরই বিবেকরূপা এবং তাহার অধিকার প্রান্তভূমি অর্থাৎ সকল সাবলম্বন সমাধির ভূমি পর্য্যন্ত বিস্তৃত। এই সপ্ত প্রকার প্রজ্ঞাকে দুইভাগে বিভক্ত করা যায়—কার্য্যবিমুক্তিরূপা ও চিত্তবিমুক্তিরূপা। কার্য্যবিমুক্তিরূপা প্রজ্ঞা চারিপ্রকার। ১ জ্ঞেয় বস্তু আমি জানিয়াছি—আর জ্ঞাতব্য কিছু নাই, ২ আমার ক্লেশ সমূহ ক্ষীণ হইয়াছে—আর ক্ষয় করিবার কিছু নাই, ৩ হান বা জ্ঞান অধিগত করিয়াছি, ৪ আমি বিবেকখ্যাতি প্রাপ্ত হইয়াছি—প্রত্যয়ান্তর দ্বারা অবিচ্ছিন্ন এই প্রকার যে প্রজ্ঞা, তাহাই **কার্য্যবিমুক্তিরূপা**—ইহা কার্য্যবিষয়ক নির্ম্মল জ্ঞান। চিত্তবিমুক্তিরূপা প্রজ্ঞা তিন প্রকার। ১ আমার বুদ্ধি চরিতার্থ হইয়াছে, গুণসমূহের অধিকার নিবৃত্ত হইয়াছে, গিরিশিখর হইতে বিচ্যুত পাষাণখণ্ড যেমন কিছুতেই প্রতিষ্ঠা প্রাপ্ত হয় না, তেমনি গুণসমূহও আর আমাতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিবে না, ২ মোহই গুণসমূহের কারণ ছিল, সে মূল কারণ নষ্ট হইয়া গিয়াছে, গুণের প্রয়োজনও নিবৃত্ত হইয়াছে; সুতরাং সমস্ত গুণই কারণে লয়াভিমুখী হইয়াছে; তবে আর তাহাদের অঙ্কুরোদ্গম হইবে কোথা হইতে? ৩ সমাধি আমার স্বভাবের অঙ্গীভূত হইয়াছে, অতএব আমি স্বরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছি।—এই তিন প্রকার প্রজ্ঞাকে **চিত্তবিমুক্তি** বলে। এইরূপ সপ্তবিধ প্রান্তভূমি প্রজ্ঞা উৎপন্ন হইলেই পুরুষ **কেবল** হন। (২৭)

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, বিবেকখ্যাতি সংযোগাভাবের হেতু। বিবেকখ্যাতির উৎপত্তির

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ গ্রন্থাগার ক্রমিক সং

নিমিত্ত কি ? ক্লেশরূপ যে অশুদ্ধি চিত্তসত্ত্বের প্রকাশকে আবৃত করিয়া রাখিয়াছে, বক্ষ্যমাণ যোগাঙ্গসমূহের অনুষ্ঠান অর্থাৎ জ্ঞানপূর্ব্বক অভ্যাস দ্বারা তাহা দূর হইয়া যায় এবং জ্ঞানদীপ্তিরূপ চিত্তের সাত্ত্বিক পরিণাম ঘটিয়া থাকে। বিবেকখ্যাতির পূর্ব্ব পর্য্যন্ত আধারের বিশুদ্ধিভেদে ইহার তারতম্য হইয়া থাকে। এই জ্ঞানদীপ্তিকেই বিবেক-খ্যাতির হেতু বলা যায়। (২৮)

যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি—এই আটটী যোগাঙ্গ। ইহাদের মাঝে ধারণা প্রভৃতি কতকগুলি সাক্ষাৎভাবে সমাধির উপকারক, অতএব তাহারা যোগের অন্তরঙ্গ। যম, নিয়ম প্রভৃতি অঙ্গ সমাধিবিরোধী হিংসাদি বিতর্ক সমূহ উন্মূলিত করিয়া সমাধির সহায়তা করিয়া থাকে, অতএব তাহারা বহিরঙ্গ। ইহার মধ্যে আসনাদি অঙ্গকে উত্তরোত্তর সমাধির উপকারক বলিয়া বুঝিতে হইবে, যেমন আসন জয় হইলে প্রাণায়াম স্থৈর্য্য ইত্যাদি। (২৯)

পথের সঙ্কেত

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

এইবার শেষের কথা। ভাবের কথা বলিয়াছি, কিন্তু তাহার রূপ দিই নাই। অবশ্য অরূপের তত্ত্ব জানা চাই—রূপ দিয়া প্রাণের পিপাসা মিটাইতে চাহিলেও কি করিয়া রূপকে অরূপে বিলীন করা যায়, তাহার সঙ্কেতটী না জানিলে, বাস্তবিক পিপাসা কখনো মিটিবে না, সত্যদর্শনের মাঝেও এক-দেশ-দর্শিতা থাকিয়া যাইবে। চিত্তের এই সঙ্কোচ ঘুচাইয়া বিশ্বপ্রসার ঔদার্য্যের মাঝে তাহাকে ব্যাপ্ত করিবার জন্যই নির্ব্বিশেষ ভূমার আলোচনা। অরূপ তোমার মর্ম্মে মর্ম্মে; তোমার সামান্যতঃ দৃষ্টি যেখানে পৌঁছে না, তাহারও সুগভীর অন্তরালে তিনি প্রচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছেন—তাঁহাকে দেখিতে পাও না, অথচ মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে তাঁহার সত্তার আভাসে পুলকিত হইয়া ওঠ—এই অনুভূতির আনন্দ-বেগ বাহিরে না ছড়াইয়া পড়িয়া আবর্ত্তের মত মর্ম্মের মাঝে দিন দিন তলাইয়া যাক্—অন্তর গভীর, রসসান্দ্র, আত্মহারা হইয়া যাইবে।

কিন্তু এই অনুভূতির আভাস জানিয়া রাখা ভাল হইলেও প্রথমেই ঠিক ইহার মাঝেই প্রতিষ্ঠা লাভ করা যায় না। চরম কথা আমরা জানিয়া রাখি আদর্শ বলিয়া, লক্ষ্য বলিয়া। কিন্তু কাজ সুরু করিতে হয় আরও পিছন হইতে। এক্ষেত্রেও ঠিক তাই। অরূপের কথা জানিলেও, আভাসে ইঙ্গিতে বুঝিলেও তাহার পাওয়ার পথ কিন্তু সুরু হইয়াছে রূপের রাজ্য হইতে। রূপ বলিতে শুধু চক্ষুরিন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎকেই লক্ষ্য করিতেছি না। অনুভূতির মাঝে যাহা কিছু বিশিষ্ট, তাহাই রূপ—দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধির যতগুলি বিকার তোমার চৈতন্যতে প্রতিফলিত হইতেছে—তাহার সকলেরই সমষ্টিতে তোমার রূপ। তুমি কে, তাহার একটা সুস্পষ্ট ধারণা সঞ্চার

তোমার নাই। তুমি ব্রহ্ম, কি তুমি ভগবানের অংশ—এ সমস্ত খুব বড় কথা, আর সত্য কথা হইলেও শোনা কথা। ওই কথাগুলিকে জীবনে একদিন বাস্তব করিয়া তুলিবার জন্যই সাধনা বটে—কিন্তু আজ সে কথা ছাড়িয়া দিয়াও একবার নিজের নিত্যকার অনুভূতিতে ধরা পড়ে যে বর্ত্তমান বাস্তব রূপটী, তোমাকে তাহারই সন্ধান লইতে হইবে।

জগতে চলিতে ফিরিতে হইলে একটা না একটা রূপের আশ্রয় লইতেই হয়। সেই হিসাবে, তোমার কাছেও তোমার একটা বাস্তব রূপ আছে। কিন্তু মুস্কিলের কথা এই যে, এই বাস্তব রূপটাও তোমার কাছে খুব স্পষ্ট নয়, কিম্বা সব সময় সেটা অবিকৃতও থাকে না। অবস্থার আবর্ত্তনে পড়িয়া বহুরূপীর মত ক্ষণে ক্ষণে তোমার রূপ বদলাইতেছে, অথচ তুমি তাহার কোনও খবর রাখ না। বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্ন প্রকৃতির বিকাশে তোমার যে রূপ দেখা দেয়, আলাদা আলাদা করিয়া তুমি দুটাকেই সত্য বলিয়া মান; কিন্তু স্মৃতির সাহায্যে দুইকে এক করিয়া তাহার মাঝে কোনও সামঞ্জস্য করিতে জান না। মানুষ যে অবস্থার বিপাকে পড়িয়া এক অকাণ্ড হইতে আর এক অকাণ্ডে গড়াইয়া পড়ে, তাহার মূলে এই সামঞ্জস্য-বোধের অভাব।

বড় অনুভূতির কথা দূরে থাকুক। সংসারের দৈনন্দিন কর্ম্মক্ষেত্রেও যে বহুরূপীর খেলা তোমার মাঝে দেখা দেয়, তাহার সকলগুলিও গুছাইয়া গুটাইয়া এককেন্দ্রে সংহত করা তোমার পক্ষে বিশেষ প্রয়োজন। এ বিশেষ কঠিন কাজ নয়, অথচ ইহাতে তোমার অন্তরের বহু গোপন রহস্যের সাক্ষাৎ মিলে। একটা রূপ বা এক একটা অবস্থা আলাদা করিয়া দেখিলে দেখি দুটাতেই তুমি আত্মহারা তন্ময়—তোমার স্বভাবের আর সকল দিক ঢাকিয়া একটা দিকই বড় হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু ইহার মাঝে কোনটাকেই তো একান্ত ভাবে সত্য বলা চলে না। তুমি ঠিক এ-ও নও, ও-ও নও। অথচ এই দুইটী অবস্থাকে একত্র জুড়িয়া দিতে গেলে উভয় দিক হইতেই কিছু কাটিয়া ছাঁটিয়া ফেলিতে হইত—তাহাতে প্রমাণ হইত তোমার অতি ভালর মাঝেও মন্দের ওই বীজটা রহিয়া গিয়াছে, সুতরাং ভালর বিচ্যুতি সম্ভব—অতএব সাধু সাবধান। কিম্বা তোমার অতিমন্দের মাঝেও ওই ভালর বীজটুকু আছে, অতএব হতাশ না হইয়া আরও সামনে চল।

নিজের বিভিন্নরূপের মাঝে সামঞ্জস্য করিতে গিয়া শুধু যে তোমার অন্তঃপ্রকৃতির রহস্যেরই সন্ধান পাইবে তাহা নয়; ইহার চেয়েও একটা বড় লাভ হইবে—নিজের সম্বন্ধে তোমার একটা অখণ্ড বোধ। সামঞ্জস্য করিতে হইলেই ব্যাপ্তির প্রয়োজন—দুটী বিভিন্ন অবস্থার মাঝে খাপ খাওয়াইতে হইলেই তোমাকে তাহাদের চেয়েও বড় হইতে হইবে। বড় হইলেই প্রত্যেকটার উপর আসক্তির টান ঢিলা হইয়া যায়। ফলে অন্তঃপ্রকৃতির উপর জয় লাভ করা সহজ হইয়া উঠে। তাহা ছাড়া সকলকে জোড়িতে গিয়া যে বৃহৎ ভাবের মাঝে নিজকে প্রতিষ্ঠিত করিলে, সেটাও তো একটা বস্তু। ওই হইল তোমার তুমি। এখনও তার রূপ স্পষ্ট নয় বটে, কিন্তু অন্ততঃ এটুকু সত্য যে তোমার নিম্নকেন্দ্রের বহু রূপের মাঝে ওই হচ্ছে তোমার শাস্তা, তোমার দ্রষ্টা। যদি আত্মোদ্বোধন করিতে হয়, তবে উহার আশ্রয়েই করিতে হইবে, আর যদি আত্মনিবেদন করিতে হয়, তবে উহাকে লুটাইয়া দিয়াই করিতে হইবে।

এমনি একটী "আমি"র সন্ধান তোমাকে পাইতে হইবে, যাহার মাঝে তোমার সব। সে আমি আদর্শে থাটো হোক্, ক্ষতি নাই, কিন্তু তাহাকে পাওয়া চাই।

তোমার এই কেন্দ্রীকৃত সত্তাকে ঊর্দ্ধে প্রেরণ করিতে হইবে। যেমন প্রাকৃত সত্তার আশ্রয় এই প্রাকৃত দেহমন, তেমনি অপ্রাকৃত দেহমনের ভাবনা দ্বারা ঊর্দ্ধকেন্দ্রিক সত্তাকে ধারণা করিতে হইবে। সমস্ত বিকার মন্থন করিয়া যে সার বস্তুটীকে "আমি" বলিয়া পাইলে, চিন্ময় তনুমনের আশ্রয় দিয়া তাহাকে প্রতিষ্ঠিত কর। স্থূল দেহ-মনের ভাবনা আমরা অজ্ঞাতসারে বহন করিয়া চলি। কিন্তু এই দিব্য দেহমনের ভাবনাকে সম্পূর্ণ সচেতন-ভাবে উদ্বুদ্ধ করিতে হইবে। নিমেষে নিমিষে মনন করিতে হইবে, "আমার দিব্য দেহ—দিব্য মন—সর্ব্বতোভাস্বর দেবজ্যোতিঃতে সন্দীপিত আমার সত্তা।" এই মনন দ্বারা ভূতগ্রামের সহিত যুদ্ধ করিতে হইবে,—পার আর না পার, ভূতের সকল দাবী দাওয়ার মাঝেই একবার তাল ঠুকিয়া দেখিতে হইবে।

তোমার মননলব্ধ দিব্য জ্যোতির্ম্ময় রূপ—সেই হইল সন্তানের রূপ। তুমি সন্তান, ভূমা মাতৃস্বরূপিণী—এই আদি রূপ, আদি ভাব। দেহের বিকার, মনের বিকার, সব ভুলিয়া যাও—উদ্ধত অভিমানের উন্নত শির আহত করিয়া সন্তানের নিরভিমান ভূমিকায় নামাইয়া আন। তোমার নিত্য মননলব্ধ তীব্র দৃষ্টি এই বিশ্বের আবরণ ভেদ করিয়া তাহার মর্ম্মস্থলে অনন্ত-জ্যোতিরুদ্ভাসিতা, অনন্ত স্নেহাবিগলিতা মাতৃসত্তাকে আবিষ্কার করিয়া তাহাতেই তন্ময় হইয়া যাক্। আপনাকে যেমন বিশ্লেষণ করিয়া একটী কেন্দ্রে সংহত করিয়াছ, আবার সেই কেন্দ্রবিন্দুকে জ্যোতির্ম্ময় ভাবনা করিয়া দিব্য রূপ তাহাতে ফুটাইয়া তুলিয়াছ, তেমনি সেই জ্যোতির্ম্ময় সত্তাকে নির্ব্বাধে দিকে দিকে ছড়াইয়া দাও—বিশ্বপ্রসার মহান আশ্রয় লাভ করিয়া তাহা সার্থক হউক। এই বিশ্বের জড়রূপ তখন খসিয়া যাইবে, মহাজ্যোতিঃতে তাহার সত্তা উদ্ভাসিত হইয়া উঠিবে—অনুভব করিবে, এই বিশ্বের সঙ্গে মর্ম্মে মর্ম্মে তোমার যোগ—মাতৃ-গর্ভে ভ্রূণ যেমন করিয়া মাতৃসত্তায় নিমজ্জিত হইয়া থাকে, তেমনি তুমি অখিলাধার বিশ্ব-জননীর সত্তায় নিমজ্জিত।

সমস্ত ইন্দ্রিয়দুয়ারে তোমার ভূমার স্পর্শ—মা তোমাকে বেড়িয়া রহিয়াছেন—নিখিলের রূপে অনন্ত স্নেহমাধুরিমায় নিত্য তোমাকে স্পর্শ করিতেছেন। ভৌতিকদেহের বন্ধন তোমার নাই, কিন্তু ইন্দ্রিয়ের অনুভূতি এখনও আছে, তবে সে অনুভূতি জড় সংস্পর্শে উত্তে-জিত বা মোহগ্রস্ত নয়, তাহা দিব্য স্পর্শে পুলকিত—এই ইন্দ্রিয়ের দুয়ার দিয়াই তাহা দিব্যধামের বারতা বহিয়া আনিতেছে। সবার মাঝে তাঁর ছায়া, সকল যোগেই মায়ের সঙ্গে যুক্ত তুমি। উদার আকাশ মায়েরই অখণ্ড মন রূপে তোমার মনের মাঝে ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে, বায়ুর অনন্ত প্রবাহ তাঁহারই অনন্ত প্রাণ-শক্তিরূপে তোমার প্রাণকে সঞ্জীবিত করিতেছে, চরাচরে ব্যাপ্ত এই আলোকরাশি তাঁহারই অপরূপ তনু আভারূপে তোমার অণু-পরমাণুতে অনুপ্রবিষ্ট রহিয়াছে—তোমার সকলই যে তিনি। জগতে রূপ, রস, শব্দ, স্পর্শ, গন্ধের খণ্ডলীলা আর নাই তোমার কাছে—সকলই একরসে সংযুক্ত—বিশ্ব চরাচরে পরি-ব্যাপ্ত; তাহাতেই নিখিলানন্দঘন মায়ের মূর্ত্তি গড়িয়া উঠিয়াছে—আর সেই মায়েরই হৃৎপদ্মস্থিত শিশিরবিন্দুটীর মত অপরূপ দেহের

বিন্দুটী তুমি—তাঁহারি দোলায় দুলিতেছ, তাঁহারি আভায় জ্বলিতেছ, তাঁহারি প্রেমে গলিতেছ!

এই তুমি—এই মা। তোমার কেন্দ্র হইতে পরিধির পানে এক আকুল রসের পিপাসা ছুটিয়া চলিয়াছে বিশ্বময় আপনাকে ছড়াইয়া দিতে, আর অনন্ত পরিধি হইতে এক আকুল মমতার প্রবাহ কেন্দ্রের পানে ছুটিয়া আসিতেছে তোমাকে বেড়িয়া ধরিতে!—এই তো মায়ের আর সন্তানের চিরন্তন রস বিলাস। নিত্য এই ভাবনায়, এই মননে তোমাকে সিদ্ধ হইতে হইবে।

এই যে মায়ের উপাসনা, এই যে সন্তানত্বের সাধনা—ভগবানের সঙ্গে এই তোমার আদি যোগ। প্রাকৃত জগতে যেমন মাকে ধরিয়া এই জীবনের পত্তন হইয়াছে, অধ্যাত্মজগতেও তেমনি। কিন্তু প্রাকৃত জীবনের মাঝে সন্তানত্বের ভাব ক্ষণস্থায়ী, কেননা একটা সঙ্কীর্ণ সময়ের সীমার মাঝে জড়ের আইন অনুযায়ী তোমাকে সবগুলি ভাব বিকশিত করিয়া লইতে হইবে, সুতরাং এক একটা ভাবের পরিণতির জন্য অফুরন্ত সময় তোমার মিলে না। কিন্তু প্রাকৃত জগৎ তো সেই অপ্রাকৃত জগতেরই আভাস লইয়া গড়া। এখানে জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত একটা বেষ্টনীর মাঝে তোমার দেহের পরিণতি ঘটে এবং দেহের সেই পরিণামধর্ম্মের অনুযায়ী মনেও কতকগুলি অসম্পূর্ণ ভাবের বিকারমাত্র খেলিয়া যায়—কোনও একটা ভাবই নিত্যলোকের পরিপূর্ণতা লইয়া ফুটিয়া উঠিবার অবসর পায় না। এমনি খণ্ডে খণ্ডে পরিণতির একটা মালা গাঁথিয়া জন্ম হইতে জন্মান্তরে তোমার সমগ্র জীবনের অনুবর্ত্তন চলিতেছে। এই অনুবৃত্তিক একটা অখণ্ড ভাব-পরিণতির সহিত যুক্ত করিয়া দেখিতে না শিখিলে তোমার প্রাকৃত জীবনেরও যেমন সার্থকতা ঘটিবে না, তেমনি অধ্যাত্মজীবনেরও কোনও সন্ধান মিলিবে না। মর্ত্ত্য জীবনের ভূমিকাস্বরূপ যে অমর্ত্ত্যজীবন, জন্ম হইতে জন্মান্তরে তাহাকে যদি প্রসারিত করিয়া দেখ, তবে দেখিবে, জড়জগতের সংস্কার যাহাই বলুক না কেন, অধ্যাত্মজগতে মাতৃসত্তাকে আশ্রয় করিয়া মায়ের ছেলে হইয়াই তোমার অধ্যাত্মজীবনের উন্মেষ হইয়াছে।

কিন্তু এই কথাটা বুঝিতে গেলে জড়ের সংস্কার তোমাকে বাধা দিবেই। দেহটা একটা জীবনের গণ্ডীর মাঝেই যতটুকু বাড়িবার বাড়িয়া ঝরিয়া পড়ে, কিন্তু অন্তরটা তো এক জীবনের মাঝেই পরিপুষ্ট হয় না। অথচ দেহের পরিণতির জের তাহাকেও টানিয়া চলিতে হয়। এই তো বিষম সঙ্কট। অন্তর তোমার অবোলা শিশুর মত, অথচ এদিকে দেহের কূলে যৌবনের বান ডাকিয়া গেল; অন্তর যখন স্তন্যপিপাসায় কাতর, দেহ তখন যৌবনোন্মাদের তীব্র সুরাপানে দিশাহারা—এ বিপর্য্যয়ের মাঝে সামঞ্জস্য আসিবে কি করিয়া? আবার অন্তরের মাঝে রসের পিপাসা মিটিতে না মিটিতেই হয়ত জরাজীর্ণ বার্দ্ধক্যের ভারে দেহ ভাঙ্গিয়া পড়িল—অন্তরের নবজাগ্রৎ আকুলতার সঙ্গে দেহের স্তিমিত অবসাদের মিল হইবে কি করিয়া? (ক্রমশঃ)

বেদান্ত-সার

—*—

[চতুর্থ খণ্ড—বিবৃতি—কর্ম্মবিচার]

——*——

"কর্ম্মণা পিতৃলোকঃ"

"কর্ম্মণা পিতৃলোকঃ"—এই বাক্যের বিচার-প্রসঙ্গে আমরা বলিয়াছিলাম, নিত্যাদি কর্ম্মের মুখ্য ফল চিত্তশুদ্ধি বটে, কিন্তু অবান্তর ফল হিসাবে, তাহাদের দ্বারা পিতৃলোকপ্রাপ্তিও ঘটিতে পারে। কিন্তু পিতৃলোক যে নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম্মের অবান্তর ফল, এই সম্বন্ধে এই আপত্তি হইতে পারে যে, পিতৃলোক তো শ্রাদ্ধাদি কর্ম্মসাধ্য, সুতরাং নিত্যাদি কর্ম্মের সঙ্গে তাহাকে জড়িত করা কেন? এ বিষয়ে উত্তরপক্ষীও পাল্টা প্রশ্ন করিতে পারেন যে, শ্রাদ্ধাদিকে তুমি নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম্ম বলিবে না কাম্যকর্ম্ম বলিবে? শ্রাদ্ধাদিও যদি নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম্মের অন্তর্ভুক্ত হয়, তবে পিতৃলোককে নিত্যাদি কর্ম্মসাধ্য বলিতে দোষ হইল কি? আর শ্রাদ্ধাদিকে যদি কাম্য কর্ম্ম বলিতে চাও, তবে যেখানে সে কাম্য-কর্ম্মের বিধি উদ্দিষ্ট রহিয়াছে, সেখানেই তো তাহার ফলেরও উদ্দেশ রহিয়াছে, নতুবা কাম্য কর্ম্মের বিধান হয় কি করিয়া? শ্রাদ্ধাদি কর্ম্মের ফলাকাঙ্ক্ষা যদি কাম্যবিধির উদ্দেশ দ্বারাই চরিতার্থ হয়, তাহা হইলে আর উপস্থিত শ্রুতিবাক্যের সহিত তাহার যোগ কল্পনা করিবার সার্থকতা কি? সুতরাং শ্রাদ্ধাদিকে নিত্য, নৈমিত্তিক কিংবা কাম্য—এর যে কোনও কর্ম্মেরই অন্তর্ভুক্ত করিয়া দেখ না কেন, ইহাদ্বারা "কর্ম্মণা পিতৃলোকঃ" এই শ্রুতিবাক্য দ্বারা বোধিত পিতৃলোকের নিত্যাদি-কর্ম্ম-সাধ্যত্ব নিরস্ত হইতেছে না।

"বিদ্যয়া দেবলোকঃ"

উল্লিখিত শ্রুতিবাক্যের আর একটি অংশ বিচার্য্য আছে—"বিদ্যয়া দেবলোকঃ।" দেবলোক বা ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত ঘটাইতে হইলে বিদ্যার প্রয়োজন, শুধু কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা তাহা হইবার নয়। কিন্তু স্মৃতি বলিতেছেন—"অষ্টাশীতিসহস্রাণাম্ মুনীনামূর্দ্ধরেতসাম্, উত্তরেণার্য্যম্ণঃ পন্থাঃ—অষ্টাশীতিসহস্র ঊর্দ্ধরেতা মুনি দেবযান পথে উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। (বিষ্ণু পুরাণ ২, ৮, ৯০)। ইহাতে প্রমাণিত হয় যে নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য্যারূপ আশ্রমধর্ম্ম অনুষ্ঠান দ্বারা ঊর্দ্ধরেতা হইতে পারিলেই দেবলোকপ্রাপ্তি ঘটে, তাহার জন্য বিদ্যা বা জ্ঞানের সাধনার কোনও প্রয়োজন হয় না।

কিন্তু এ কথা যথার্থ নহে। বিদ্যা বা জ্ঞান ব্যতিরেকে কেবল মাত্র আশ্রমধর্ম্ম অনুষ্ঠান দ্বারা উত্তরমার্গপ্রাপ্তি ঘটিতে পারে না। শ্রুতি স্পষ্টাক্ষরেই বলিতেছেন—"বিদ্যয়া তদারোহন্তি যত্র কামাঃ পরাগতাঃ, ন তত্র দক্ষিণা যন্তি নাবিদ্বাংসস্তপস্বিনঃ—যেখান হইতে সমস্ত কামনা পরাবৃত্ত হইয়াছে, বিদ্যা-দ্বারাই সাধক সেই ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যাহারা কেবল মাত্র কর্ম্ম করিয়া

তপস্যা করিয়াছে, কিন্তু জ্ঞান লাভ করিতে পারে নাই, তাহারা সেখানে যায় না।" ব্রহ্মসূত্রের গুণোপসংহার পাদে "অনিয়মঃ সর্ব্বাসামবিরোধঃ শব্দানুমানাভ্যাম্" এই সূত্রাধিকরণে ভাষ্যকার ইহা প্রতিপন্ন করিয়াছেন।

উল্লিখিত স্মৃতিবাক্যে ঊর্দ্ধরেতাদিগের ব্রহ্মলোকে যাওয়ার কথা মাত্র বলা হইয়াছে, কিন্তু সেখান হইতে তাঁহারা যে আর ফিরিয়া আসিবেন না, এমন কথা বলা হয় নাই। পরন্তু শ্রুতি ব্রহ্মলোককেই দেবলোক শব্দে উল্লেখ করিয়া বিদ্বান বা জ্ঞানীর সেখান হইতে পুনরাবৃত্তি ঘটে না—এই কথাই বলিতেছেন। যথা—"এতেন প্রতিপদ্যমানা ইমং মানবমাবর্ত্তং নাবর্ত্তন্তে" (ছান্দোগ্য ৪, ১৫, ৬.) "তেষামিহ ন পুনরাবৃত্তিঃ" [বৃহদারণ্যক ৬. ১. ১৮]।

তবে এখানেও একটা কথা আছে। শ্রুতিবাক্যে যে "ইমং", "ইহ"—এই দুইটী পদ রহিয়াছে, তাহা এই কল্পেরই দ্যোতক বলিয়া বুঝিতে হইবে। সুতরাং সাধকের এই কল্পে পুনরাবৃত্তি না হইলেও কল্পান্তরে তো তাহা হইতে পারে। কিন্তু সে কথা স্বীকার করিলেও অবিদ্বানের পক্ষেই আমরা তাহা স্বীকার করিব, কল্পান্তরে তাহাদেরই পুনরাবৃত্তি মানিয়া লইব। কিন্তু যাঁহারা বিদ্বান, তাঁহারা ক্রমমুক্তিপথে চলেন, সুতরাং তাঁহাদের আর পুনরাবৃত্তি হয় না—শ্রুতির ইহাই তাৎপর্য্য।

কিন্তু এই প্রসঙ্গে আর একটা কথা উঠে। ছান্দোগ্যোপনিষদের দশম খণ্ডে পঞ্চাগ্নিবিদ্যার কথা আছে। তাহার শেষে বলা হইতেছে—যে সমস্ত গৃহস্থ এই পঞ্চাগ্নিবিদ্যা জানেন এবং যে সমস্ত বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাসিগণ অরণ্যে শ্রদ্ধাকে তপস্যারূপে উপাসনা করেন, তাঁহারা দেবযান পথের অধিকারী হন। এই অংশের ভাষ্য করিতে গিয়া ভাষ্যকার শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য বলিতেছেন, যে সমস্ত গৃহস্থ বিদ্যারহিত, তাহারা স্বভাবতঃ মিথ্যা, হিংসা, মায়া, দম্ভ, অব্রহ্মচর্য্য প্রভৃতি দ্বারা কলুষিত অতএব অশুচি, সুতরাং তাহারা কেবলমাত্র আশ্রম ধর্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারা উত্তর মার্গের অধিকারী হইতে পারে না। অপর পক্ষে নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাসিগণ কোনও ক্রিয়াবাহুল্যের অনুষ্ঠান না করিয়াই কেবলমাত্র স্বীয় আশ্রম ধর্ম্মে নিষ্ঠাবশতঃই উত্তরমার্গগতি লাভ করিয়া থাকেন; এবং তাঁহাদের পুনরাবৃত্তি হয় না; তাঁহাদের শুদ্ধিই ইহার মূল। এই প্রসঙ্গে ভাষ্যকার আরও বলিতেছেন, "ন তত্র দক্ষিণা যন্তি," ইত্যাদি শ্রুতি আত্যন্তিক অমৃতত্বরূপ পরমমুক্তিকেই লক্ষ্য করিতেছে। এই শ্রেণিবিভাগের তাৎপর্য্য কি? আশ্রম ধর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারাই ঊর্দ্ধরেতাগণের কি করিয়া উত্তরমার্গগতি লাভ হয়?

ইহার উত্তরে আমরা বলি, ছান্দোগ্য ভাষ্যের এই অংশে বিদ্যা ছাড়াও ঊর্দ্ধরেতাগণের ব্রহ্মলোক গমন হয়, এইটুকুমাত্র বলা হইয়াছে—তাঁহাদের যে আত্যন্তিকী অপুনরাবৃত্তি ঘটিবে, এমন কথা বলা ভাষ্যকারের অভিপ্রেত নয়। অপুনরাবৃত্তি শব্দে যে অমৃতত্ব সূচিত হয়, তাহা আপেক্ষিক; স্মৃতিও বলিতেছেন, "আভূতসংপ্লবং স্থানমমৃতত্বং হি ভাষ্যতে—প্রলয় পর্য্যন্ত যে প্রতিষ্ঠা তাহাই অমৃতত্ব।" সুতরাং ইহাদিগের অপুনরাবৃত্তি এক প্রলয় পর্য্যন্তই বুঝিতে হইবে। এই কথাটাই পরিস্ফুট করিবার জন্য ভাষ্যকার আরও বলিয়াছেন যে "ইমং মানবমাবর্ত্তং নাবর্ত্তন্তে" "ইহ ন পুনরাবৃত্তিরস্তি"—ইত্যাদি স্থলে ইমং ও ইহ পদদ্বারা আপেক্ষিক অমৃতত্বই

সূচিত হইতেছে; ঐকান্তিক অনাবৃত্তির প্রসঙ্গ হইলে ন ও ইহ বিশেষণদ্বয়ের কোনও সার্থকতা থাকিত না। সুতরাং কেবলমাত্র আশ্রমধর্ম্মনিষ্ঠ উৰ্দ্ধরেতাগণের এই কল্পে পুনরাবৃত্তি না হইলেও কল্পান্তরে হইবে।

এই যেমন এক দিকের কথা, তেমনি পূর্ব্বোক্ত গুণোপসংহার অধিকরণের ভাষ্যেও ভাষ্যকার বলিতেছেন, "ছান্দোগ্যোপনিষদের পঞ্চাগ্নিবিদ্যা প্রসঙ্গে যে শ্রদ্ধা-তপের কথা রহিয়াছে, তাহা উপলক্ষণ বলিয়া বুঝিতে হইবে। আত্যন্তিক অপুনরাবৃত্তির পক্ষে কেবলমাত্র শ্রদ্ধা ও তপস্যাই পর্য্যাপ্ত নহে। বিদ্যার্জ্জন ছাড়া এই গতি লাভ হইতে পারে না। (অনন্তর "ন তত্র দক্ষিণা যন্তি" ইত্যাদি শ্রুতি উল্লেখ করিয়া বলিতেছেন) কাজেই বুঝিতে হইবে, এখানে শ্রদ্ধা ও তপস্যা বিদ্যান্তরের উপলক্ষণ মাত্র।

"বৃহদারণ্যকোপনিষদ পঞ্চাগ্নিবিদ্যাধিকারে আছে —য এবমেতদ্বিদুঃ, যে চ অরণ্যে শ্রদ্ধাং সত্যম্ উপাসতে ইত্যাদি। ইহার ব্যাখ্যা হইবে, যে সমস্ত শ্রদ্ধাযুক্ত ব্যক্তিরা সত্যের অর্থাৎ ব্রহ্মের উপাসনা করেন; কেননা ব্রহ্ম বহুবার সত্য শব্দদ্বারা সূচিত হইয়াছেন।" সুতরাং এখানেও দেখিতেছি বিদ্যা ব্যতিরেকে পুনরাবৃত্তি-প্রতিষেধের উপায় নাই।

যাজ্ঞবল্ক্য বলিতেছেন—"সপ্তর্ষিমণ্ডল এবং নাগবীথী (অর্থাৎ অজবীথীর উত্তর ও সপ্তর্ষির দক্ষিণদেশবর্ত্তী তারকাপুঞ্জ) ইহার মধ্যস্থল দিয়া অষ্টাশীতিসহস্র সর্ব্বারম্ভবিবর্জ্জিত মুনিগণ তপস্যা, ব্রহ্মচর্য্য, সঙ্গত্যাগ ও মেধাদ্বারা দেবলোক আশ্রয় করিয়া প্রাকৃতপ্রলয় পর্য্যন্ত সেখানে অবস্থান করেন।"

সুতরাং যাহারা বিদ্যাবান, তাহাদেরই আত্যন্তিকী অপুনরাবৃত্তি ঘটিয়া থাকে। অতএব বিদ্যা যে ক্রমমুক্তির হেতু হইবে, ইহাও যুক্তিযুক্ত।

তবে এখানে আর একটা কথার মীমাংসা হওয়া প্রয়োজন। ক্রমমুক্তিকেই যদি বিদ্যার পরম প্রয়োজন বলিয়া স্বীকার করিতে হয়, তবে চিত্তৈকাগ্রতাই বিদ্যার প্রয়োজন, এই পূর্ব্বোক্তি সিদ্ধ হয় কি করিয়া? এ সম্বন্ধে বক্তব্য এই, যাঁহারা সগুণ ব্রহ্মকে জানিয়া কৃতার্থ হন, তাঁহাদের পক্ষে মুক্তি বিদ্যার প্রয়োজন স্থানীয়, এ কথা খাটিতে পারে। কিন্তু নির্গুণ ব্রহ্মাধিকারীর পক্ষে চিত্তৈকাগ্রতাই বিদ্যার প্রয়োজনরূপে গণ্য হয়। বিদ্যাফল যে ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি, নির্গুণ ব্রহ্মাধিকারীর পক্ষে ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের পূর্ব্বেই তাহা ঘটিতে পারে। গীতাতেও ভগবান বলিয়াছেন—"প্রাপ্য পুণ্যকৃতান্ লোকান্ বিত্বাউ শাশ্বতীঃ সমাঃ—পুণ্যকৃত লোকসমূহ প্রাপ্ত হইয়া বহুকাল তথায় বাস করিয়া" ইত্যাদি।

ব্রহ্মলোকগত ভোগ বিদ্যার অবান্তর ফল। যাঁহারা সগুণ ব্রহ্মবিদ্, তাঁহারাও ব্রহ্মলোকে গিয়া এই সমস্ত বিদ্যাফল ভোগ করার পর, চিত্তৈকাগ্রতা লাভ করিয়া থাকেন। ব্রহ্মলোকে যাওয়ার পরও তাঁহাদের পক্ষে এইরূপ নিয়ম আছে যে, সেখানে চিত্তের একাগ্রতা উৎপন্ন হইলে পর বেদান্ত বাক্যের অর্থ যখন আপনা হইতে তাঁহাদের চিত্তে উদ্ভাসিত হইয়া থাকে, তখনই তাঁহারা মুক্তির অধিকারী হইয়া থাকেন। সুতরাং এ ক্ষেত্রেও আমরা দেখিতেছি চিত্তৈকাগ্রতাই উপাসনার পরম প্রয়োজন।

নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম্মের ও উপাসনার ফল বিচার করিয়া আমরা এই বুঝিলাম, "কর্ম্মণা

পিতৃলোকঃ"—এই শ্রুতিবাক্যে নিত্যাদি কর্ম্মের অবান্তর ফলরূপে পিতৃলোকের যে উদ্দেশ রহিয়াছে, তাহা যুক্তিযুক্তই বটে। কেননা "সর্ব্ব এতে পুণ্যলোকা ভবন্তি" (ছান্দোগ্য ২।২৩।১) এই শ্রুতি হইতে নিত্যাদি কর্ম্মানুষ্ঠাতা ব্রহ্মচারীর পক্ষে সামান্যতঃ কর্ম্ম-ফলের উদ্দেশ দেখিতে পাই। পূর্ব্বে কাম্য প্রভৃতি কর্ম্মের যেরূপ ভিন্ন লক্ষণ করা হইয়াছে, তাহাতে তাহার ফল যে নিত্যাদি কর্ম্মের ফল হইতে ভিন্ন, তাহাও বোঝা যায়। সুতরাং "কর্ম্মণা পিতৃলোকঃ" এই শ্রুতিতে কাম্য কর্ম্মের প্রসঙ্গ হইতে পারে না। নিত্যকর্ম্মের বিশেষ কোনও ফলের উদ্দেশ আমরা অন্যত্র পাই নাই; অথচ বর্ত্তমান শ্রুতিতে ফলাত্মক পিতৃলোকেরও আকাঙ্ক্ষিত কর্ম্মবিশেষের কোনও স্পষ্ট বিধান নাই। সুতরাং কর্ম্মের ফলাকাঙ্ক্ষা এবং ফলের কর্মাকাঙ্ক্ষা—এই দুইটীকে নষ্টাশ্বদগ্ধরথন্যায়ে একত্র জুড়িয়া দিলে বর্ত্তমান শ্রুতি হইতে পিতৃলোক যে নিত্যাদি কর্মেরই অবান্তর ফল, আমাদের এই সিদ্ধান্তই প্রমাণিত হয়।

(নষ্টাশ্বদগ্ধরথ ন্যায়টী এই—দুইজন রথী রাত্রির জন্য একই গ্রামে প্রবাসী হইয়াছিল। গ্রামে দৈবাৎ আগুন লাগায় একজনের রথ খানা পুড়িয়া যায়, আর একজনের ঘোড়া দুইটা পলাইয়া যায়। তখন অগত্যা অবশিষ্ট রথখানিতে বাকী ঘোড়া দুইটী জুড়িয়া দিয়া দুটীতে একই রথে গ্রামত্যাগ করে। উপস্থিত ক্ষেত্রে নিত্য কর্ম্মের ফল উদ্দিষ্ট নাই; আবার পিতৃলোকরূপ ফলের বিশিষ্ট কর্ম্ম উদ্দিষ্ট নাই। অথচ দুইটীকে মিলাইয়া কর্ম্ম ও ফল উভয়ই সিদ্ধ হইল। সুতরাং এখানে নষ্টাশ্বদগ্ধরথন্যায় খাটিতেছে।)

"বিদ্যয়া দেবলোকঃ"—এই শ্রুতি-ব্যাখ্যারও যৌক্তিকতা এইরূপে দেখান যাইতে পারে—কাম্য কর্ম্ম ফলবিশেষের উদ্দেশ্যে বিহিত হয়, প্রায়শ্চিত্ত কর্ম্ম কেবলমাত্র পাপক্ষয়েই পর্য্যবসিত হয়; সুতরাং ইহাদের অন্য ফলের প্রতি আকাঙ্ক্ষা থাকিতে পারে না। আবার উপাসনা যেখানে অন্য কর্মের অঙ্গরূপে আবদ্ধ, সেখানে তাহা কর্মেরই সমৃদ্ধির প্রয়োজক। প্রতীকোপাসনারূপ কর্ম্ম অন্য কর্মের অঙ্গস্বরূপ না হইলেও তাহা মুখ্যতঃ ব্রহ্মোপাসনারূপে গণ্য হইতে পারে না; সুতরাং তাহার ফলও মানবাত্মার অভ্যুদয়ের অতিরিক্ত কিছু হইতে পারে না। এখন বাকী থাকে সাক্ষাৎভাবে কার্য্যব্রহ্ম ও কারণ ব্রহ্মের উপাসনা। কেবল ইহাদেরই অবান্তর ফলরূপে সাধকের ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তি ঘটিতে পারে। শ্রুতি ব্রহ্মলোককে দেবলোক শব্দ দ্বারা অভিহিত করিয়া থাকেন। সুতরাং "বিদ্যয়া দেবলোকঃ", বেদান্তী এই বাক্যের যে ব্যাখ্যা করেন, তাহা যুক্তিযুক্তই বটে। (১৪)

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং
কলিকাতা

মূলসূত্র

—※—

এক একটা জাতির ভিতর ভগবান এক একটা আদর্শের বীজ দিয়েছেন—সেই বীজটীকে অঙ্কুরিত করবার জন্যই তার সকল কর্ম্মচেষ্টা। একটা জাতির সংহতি কোথায়, তা খুঁজতে হলে তার সকল চেষ্টার পরিণামে কোন আদর্শকে সে মনের সামনে জাগ্রত রেখেছে, তারই সন্ধান নিতে হয়—ওই আদর্শের সংকেত বাক্যে তার চিত্তদুয়ার খুলে যায়, অন্য হাজার নামে ডাকলেও সে সাড়া দেয় না।

ভারতবর্ষের আদর্শ হচ্ছে ধর্ম্ম। চিরকাল ধরে এরই সাধনা করে আসছে বলে এই ধর্ম্ম নিয়ে তার মাঝে যেমনি বৈচিত্র্য, তেমনি দেখি ঐক্য। ধর্ম্মের সাধনা তার কাছে অতি অন্তরঙ্গ বলেই অন্তরের বিচিত্র প্রেরণায়, অধিকারের বিশিষ্টতায় ধর্ম্মের সে বহুরূপের সৃষ্টি করেছে। অথচ জাতিতে ভাষায় আচারে বহুধা খণ্ডিত ভারতবর্ষের মাঝে ঐক্য কোথায়, একথা জিজ্ঞাসা করলে ধর্ম্মের এই বহুরূপের মাঝেও যে সর্ব্বসমঞ্জস সনাতন আদর্শ মর্ম্মগত হয়ে রয়েছে, তাকেই আমাদের দেখিয়ে দিতে হবে। ভারতের সমস্ত ধর্ম্মের মূল প্রতিষ্ঠা বেদে—আবহমান কাল ওই একটী সুরে তার প্রাণের তারে ঝঙ্কার উঠছে।

এই বেদবিদ্যায় সিদ্ধ হয়ে ভারতের ভাগ্যবিধাতারূপে যিনি আবির্ভূত হয়েছেন—তিনি ব্রাহ্মণ, ভারতসাধনার চরম পুরস্কার তিনি। এই ব্রাহ্মণের কাছেই সমস্ত ভারতবর্ষ নিঃসঙ্কোচে মাথা লুটিয়ে দিয়েছে, ব্রাহ্মণের ডাকেই বার বার তার সমগ্র চিত্ত আলোড়িত হয়ে উঠেছে। ভগবান শঙ্করাচার্য্য কিম্বা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যেমন করে বিচ্ছিন্ন ভারতকে "একের মন্ত্রে" উদ্বুদ্ধ করেছিলেন আর কোনও কিছুর প্ররোচনায় ভারতবর্ষ তেমন করে সাড়া দিয়েছে কি?

এই প্রসঙ্গে বর্ত্তমানযুগের আন্দোলনের কথা মনে পড়ে। অবশ্য স্বদেশী আন্দোলনের মূলটা হচ্ছে পেট্রিয়টিজম্—ওটা এদেশে নূতন এসেছে, ব্রাহ্মণ্যের আদর্শ দ্বারা ওটা অনুপ্রাণিত নয়। অনুপ্রাণিত নয় বলেই ও আদর্শ এখন পর্য্যন্ত সর্ব্বসাধারণের বোধগম্য হল না—দেশের প্রতিনিধি হয়ে যাঁরা খেটে মরছেন, অন্য দেশের মত এ দেশের লোক তাদের জন্য পাগল হয়ে উঠল না। কেবল একবার ভারতবর্ষকে নড়ে চড়ে উঠতে দেখলাম মহাত্মা গান্ধীর ডাকে—কেননা তাঁর মাঝে ভারতবর্ষ তার সনাতন রুচির অনুকূল একটু জিনিষ পেয়েছিল; রাজনীতির কুইনিন্ বড়ীর ওপর একটু আধ্যাত্মিকতার চিনির পোঁছ ছিল, তাই তার যত আগ্রহ।

তার পর স্বদেশীর গোড়াতে যাঁরা উগ্রপন্থী ছিলেন, তাঁরাও দেখ্ছি, ধীরে ধীরে আধ্যাত্মিকতায় আস্থাবান্ হয়ে উঠলেন। মূলতঃ এই উত্তেজনাটা শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সৃষ্টি—বিলাতের প্রভাবে ও অনুকরণে তাঁদেরই দ্বারাই পেট্রিয়টিজমের আমদানী হয়েছিল। কিন্তু ক্রমেই দেখ্ছি, শিক্ষিত সমাজেরও এই বিলাতী ঝাঁঝটা কমে আসছে—তিন পুরুষ আগের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের চেয়ে আধুনিক শিক্ষিতের মেজাজটা অনেকটা আধ্যাত্মিক হয়ে উঠছে। প্রথম যৌবনের রক্তের

জোরটা একটু কমে আসলেই দেখছি, মানুষ একটু ঘুরে দাঁড়ায়।

এই সমস্ত ভেবে দেখলে, এমন কথা কিছুতেই মন মানতে চায় না যে হাজার মারলে পিটলেও ভারতবর্ষ আধ্যাত্মিক না হয়ে আর কিছু হয়ে দাঁড়াবে। যেটা তার নিয়তি, পরের প্ররোচনায় প্রলুব্ধ হয়ে সেটা থেকে তাকে আকর্ষণ করলে তার লক্ষ্যে পৌঁছানটাই বিলম্বিত হবে শুধু। বার বার বলছি, আমাদের যে দুর্গতি, তা শুধু আমাদের স্বভাব হতে ভ্রষ্ট হয়েছি বলে। অন্য দেশের অন্য কোনও ফন্দীবাজী আমরা কিছুতেই আয়ত্ত করতে পারব না—যে ফন্দীটা যুগযুগান্তরের চর্চ্চায় আমাদের আয়ত্ত হয়ে রয়েছে—সেইটা খাটিয়েই আমরা যদি কিছু নিজেদের শ্রীবৃদ্ধি করতে পারি। আজ কাল চারদিকেই সংস্কারের চীৎকার শুনছি—কিন্তু গাধাকে সংস্কৃত করে ঘোড়া বানানো যায়—এ কথা বিশ্বাস করি কি করে? আমাদের ধর্ম্মের সাধনা, ব্রহ্মণ্যের সাধনা আগে; সেটা হয়ে অর্থাৎ নিজের স্বভাবটা ফিরে পেয়ে তার পর যদি শ্রীবৃদ্ধির সুযোগ ও অবসর ঘটে, তখন দেখা যাবে। যদি বল ততদিন খাবে কি?—এতদিন যা খাচ্ছি, তখনও তাই খাব। অনাহারের মাধুর্য্যরস হতে ভগবান যে আমাদের বঞ্চিত করবেন, এমন তো মনে হয় না। না খেয়ে মর তাও ভাল, তবু সং সেজে বেঁচে থাকতে চাই না—আপন স্বভাব আর স্বরূপটা ফিরে পেতে চাই।

আমাদের তাক লেগে যায়, যখন প্রতীচ্যের সঙ্গে প্রাচ্যের তুলনা করি। এতদিন তো অসাড়ে ঘুমিয়েছিলাম—পুঁজিপাটা নিজের যা কিছু ছিল, তা কোথায় গিয়েছে, খোঁজ নেই। তাই আজ পরের দিকে তাকিয়ে কেবল ভাবি, তারা এই করছে, ওই করছে—আর আমরা? কিন্তু আমাদেরও যে এর চেয়ে বড় কিছু করবার ছিল, আর সেটা যে আমাদের সনাতন রীতিতেই সিদ্ধ হত, তা আমাদের বুঝিয়ে দেবে কে? শবখামিত্রের লোভ তো আমাদের আদর্শ নয়, আমাদের আদর্শ হচ্ছে—বশিষ্ঠের অস্তেয়। অস্তেয় প্রতিষ্ঠা হলে সমৃদ্ধির কামধেনু আপনি আমাদের দুয়ারে বাঁধা থাকত—তাকে ছিনিয়ে আনবার মত দুর্ব্বুদ্ধি হত না। কিন্তু সে কথা আমাদের বোঝায় কে?

পূর্ব্বপুরুষের জ্ঞান বিজ্ঞান এখনো লোপ পায় নি। জড় শক্তির ক্ষেত্র হতে অধ্যাত্মশক্তির ক্ষেত্র কতদূর বিস্তৃত, তা দেখাবার লোকের অভাব এখনো হয়নি। কিন্তু অধ্যাত্ম শিক্ষা গ্রহণ করবার যোগ্যতা আমাদের কতটুকু আছে? আর এই যোগ্যতা না থাকবার দরুণ কতটুকু ক্ষতি আমাদের হয়েছে, তাই বা আমরা বুঝি কয়জনা? আমরা যে মরতে বসেছি, একথা সবাই বলছে; কিন্তু এ অপঘাত মৃত্যু কিসে হচ্ছে, সে কথা তো কেউ স্পষ্ট করে বলছে না। সব ব্যাপারেই কেবল পাশ্চাত্য সমাজের সঙ্গে তুলনা করে সেই অনুযায়ী ব্যবস্থা করলে চলবে কেন? তাদের ধাত আলাদা, ইতিহাসের ধারাও স্বতন্ত্র। আমাদের ইতিহাস তো ঠিক তাদের মত গড়ে ওঠেনি।

গড়ে ওঠেনি বলেই তাদের আদর্শে আমরা যা কিছু করতে যাচ্ছি, তার ফল কিছুতেই ভাল হচ্ছে না। যদি সংস্কার করতে হয়, আমাদের স্বরূপটা আবিষ্কার করবার জন্যই তা করতে হবে—একটা জারজ সভ্যতার সৃষ্টি করে তো শান্তি পাব না। আপ-

নাকে চিনতে পেরে তারপর মরি আর বাঁচি, তাতে দুঃখ নাই।

আপনাকে চিনবার চেষ্টা ও আয়োজন যে না হচ্ছে, তা নয়। কি ছিলাম—আর কি আছি—কোন্‌টা আমাদের মর্ম্মসত্য, তা নিয়ে শিক্ষিত সমাজের মাঝে গবেষণা হচ্ছে যথেষ্ট। কিন্তু এই গবেষণাতে আমরা তৃপ্ত হতে পারি না এই জন্য যে, বিজাতীয়-প্রভাব আমাদের এতটা প্রভাবান্বিত করেছে যে নিজের সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়েও আমরা অজ্ঞাতসারে তাদের সিদ্ধান্তগুলিই আওড়িয়ে যাই। সংস্কারান্ধ হওয়ার সম্ভাবনা সত্ত্বেও সম্পূর্ণভাবে বিজাতীয় সংস্পর্শ ত্যাগ করে নিজের জীবনের সাধনা দিয়ে নিজকে যদি যাচাই করতে পারি, তবেই আমাদের সম্বন্ধে আসল কথাটা আমরা জান্‌তে পারব। বুদ্ধি যা বুঝিয়ে দেবে, তার চেয়ে সাধনা করে যা পাব, তার দাম নিশ্চয়ই অনেক বেশী।

কিন্তু সাধন করবার সামর্থ্যও তো আমাদের বড় বেশী নাই। অথচ দেখছি, কি শিক্ষিত কি অশিক্ষিত সকল সমাজেই আপন ঘর চিনে নেবার জন্য একটা আকুলতা জন্মেছে। পথ দেখিয়ে আপন ঘরে নিয়ে যেতে পারেন, গত শতাব্দীর মাঝে এমন প্রবর্ত্তক উপদেষ্টারও তো অভাব হয়নি। কিন্তু আসলে অভাব হয়েছে সেই উপদেশ ধারণ করতে পারে, এমন যোগ্য আধারের। ধর্ম্মের ভিতর দিয়েই আমরা আমাদের স্বরূপ দেখতে পাব বটে, কিন্তু ধর্ম্ম বস্তুটাকে কেবল তো বুদ্ধি দিয়ে বেড়ে পাওয়া যায় না। ও যদি একটা খেয়াল হত বা জীবনের একদিকের কথাই হত, তা হলে কোনও রকম করে তার একটা হদিস্ মিলত। কিন্তু প্রত্যক্ষ দেখ্‌ছি, যা আমাদের জীবনের সবখানি জুড়ে রয়েছে, তাকে পেতে হলে তো সমস্ত জীবন দিয়েই চেষ্টা করতে হয়। আজন্মশুদ্ধ আধার না হলে ধর্ম্ম অখণ্ড হয়ে দাঁড়াবেন কোথায়?

কিন্তু আজন্মশুদ্ধ আধার মিলবে কোথায়? বর্ত্তমান সমাজের যে দুর্গতি, তার মাঝে থেকে শুদ্ধির চেষ্টা করা বৃথা। সমাজে থেকে এ কথা যে আমারা বুঝি না, তা নয়, কিন্তু কি করব, বহু সমস্যায় আমাদের হাত পা এমনি বাঁধা যে ভালটা বুঝেও তা করবার যো আমাদের নেই। সমস্তটা সমাজ পরিশুদ্ধ হলে সে তো আনন্দের কথাই হতো, কিন্তু তা যখন হবার যো নেই, তখন অন্ততঃ আংশিক পরিশুদ্ধির জন্যও আমাদের চেষ্টিত হতে হবে। পিতার ইচ্ছা ছিল, তাঁর জীবনকে তিনি শুদ্ধ করবেন. কিন্তু অবস্থার চাপে তাঁর তা হয়ে উঠ্‌ল না। এখন তাঁর দশটা সন্তানের মাঝে একটা সন্তানকেও তাঁর আদর্শ সফল করবার অবসর দিয়ে উৎসর্গ করতে তিনি পারেন না কি?

ভগবান সমাজশুদ্ধির ভার যাঁদের উপর দিয়েছেন, কথাটা এখন তাঁদের দিক দিয়ে দেখি। আত্মস্বরূপ না জানলে আমাদের দুর্গতি যাবে না। এই স্বরূপ আমরা জানব বিজ্ঞান দিয়ে নয়, রাজনীতি দিয়ে নয়, অর্থনীতি দিয়ে নয়—স্বরূপ জানব ধর্ম্মের সাধনায়। ধর্ম্মের বাহ্যরূপ বিচিত্র হলেও, তার মূল কথাটা যে এক—সে কথা আমরা সামান্যতঃ সবাই জানি। আবার আমরা এও মানি যে, এই মূল কথাটা স্পষ্ট জানিয়ে দেবার লোকও মিলে। তিনিই আমাদের গুরু—তিনি সত্যদর্শী, ধর্ম্মের বাহ্যরূপের যে বিরোধ, তার সমাধান তাঁর মাঝে হয়েছে। সত্যদর্শী গুরুতে যখন আমরা আত্মসমর্পণ করতে পারব, তখনই আমাদের পরিশুদ্ধি আরম্ভ

হবে। কিন্তু বর্ত্তমানে যারা সমাজের ভার বহন করছে, ইচ্ছা থাকলেও তাদের দ্বারা হয়ত সমষ্টি সমাজের উদ্বোধনের সময় আর নাই। তখন দৃষ্টি পড়ে, সমাজের মাঝে থেকেও এখনো তার সংস্কার যাদের স্পর্শ করেনি, তাদের উপর। আজ তারা শিশু, কিন্তু ভবিষ্যতের সমাজপতি তাদের ভিতর দিয়ে আত্মপ্রকাশ করবে, তাই গুরুর কৃপা-দৃষ্টি বিশেষ করে এদের উপরেই পড়বে। এদের সকলকেই অবশ্য পাওয়া যাবে না—কিম্বা এক পুরুষের চেষ্টাতেই হয়ত বহু পুরুষার্জ্জিত কলুষের ক্ষালন হবে না। কিন্তু তবুও আধার হিসাবে এরা যত বিশুদ্ধ, এমন তো আর কেউ নয়। সমাজের কল্যাণে এদের উৎসর্গ করেও তো পিতামাতা ঋণমুক্ত হতে পারেন।

এখানেই শিক্ষার কথা ওঠে। আজকাল সমাজের যে দুরবস্থা, তাতে সমাজ থেকে ধর্ম্মশিক্ষা হওয়া কঠিনই বলতে হবে। আগে বর্ণধর্ম্ম আর আশ্রম ধর্ম্মের ওপর ছিল সমাজের প্রতিষ্ঠা। কিন্তু আশ্রমধর্ম্মের বালাই তো অনেক দিন থেকেই সমাজ থেকে ঘুচে গেছে, বর্ণ ধর্ম্মের যা একটু শাসন ছিল, নানা ব্যাভচারে আর অনাচারে আজ তারও ভিত্ টলে গিয়েছে। সমাজ ছেড়ে যদি অধুনা প্রচলিত শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের দিকে তাকাই, তবে সেখানে দেখি ধর্ম্মের আরও দুর্গতি। ধর্ম্ম সম্বন্ধে রাজা উদাসীন থাকছেন প্রজার স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করবেন না বলে, কিন্তু এই ঔদাসীন্যের সঙ্গে বিজাতীয় আদর্শের সংযোগ হয়ে প্রজার উচ্ছৃঙ্খলতাই দিন দিন বাড়িয়ে তুলছে। অথচ এই বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়ার আর কোনও পথ আমরা দেখ্ছি না—বিশেষতঃ শিক্ষা যেখানে অন্নসমস্যার সঙ্গে জড়িয়ে গিয়েছে। এই সমাজে থেকে, এই শিক্ষায় কি করে আমাদের যেমনটী থাকা উচিত তেমনটী থাকব?

অতীতকে যাঁরা অতীত বলেই দূরে ঠেলে রেখে ভবিষ্যতের উজ্জ্বল কল্পনায় মুগ্ধ থাকতে চান—তাঁরা এদেশকে বুঝেননি, বুঝবার চেষ্টাও করেন নি। এ দেশ সম্বন্ধে যাঁরই একটু দৃষ্টি খুলেছে—তিনিই দেখতে পান—এই বিংশ শতাব্দীর সভ্যতায় আমাদের উন্নতি হচ্ছে না—অবনতিই হচ্ছে। এই অধঃপতনের আশঙ্কা যে সাধারণ মানুষের মাঝে সংস্কারের আকারে দেখা দেয়, শিক্ষিত সমাজ তাকে গোঁড়ামী বা কুসংস্কার বলে লজ্জা দিতে চান। কিন্তু সত্যপিপাসী হৃদয় ছাড়া দেশের অধঃপতনের আশঙ্কায় ব্যাকুল হবে কে?

এর একমাত্র প্রতীকার শিক্ষা—দেশের মহান্ অতীত বর্ত্তমানের মাঝে যাতে মূর্ত্ত হয়ে ওঠে—তারই অনুকূল শিক্ষা। শিক্ষাতে যদি আধার শুদ্ধ হয়—তবেই সত্যের আবির্ভাব হবে—আমরা যা চাই, তার সন্ধান মিলবে। আমাদের শিশুরাই আমাদের আশা—বর্ণাশ্রমোচিত জাতীয় শিক্ষায় তারা যদি মানুষ হয়ে উঠতে পারে—তবেই এ দেশের কল্যাণ।

...পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং
কলিকাতা

লুকোচুরী

লুকিয়ে চল দিবানিশি,
চোখের কোনে দাও না ধরা—
ভালবাস আড়াল থেকে,
স্নেহে তোমার হৃদয় ভরা।

জান্‌তে মোরে দাও না কভু
তোমার প্রাণের গোপন ব্যথা ;
তুমি কেবল নিচ্ছ জেনে
আমার বুকের করুণ কথা।

কোথাও খুঁজে পাইনি তোমায়—
ঘুরছি সদাই কেঁদে কেঁদে,
দ্বারের পাশে দাঁড়িয়ে ওগো,
গেছি ফিরে কতই সেধে।

থাক সদাই দূরে দূরে,
একলা বসে আপন মনে,
আমি যদি একলা চলি,
বাধা জাগাও প্রাণে প্রাণে।

বাঁধ্‌ছ আমায় স্নেহের ডোরে
নিজে মোটেই দাও না ধরা—
তোমায় কেন গোপন রেখে,
আমায় কর পাগলপারা ?

পায়ে ধরি প্রাণের ঠাকুর,
এসো তুমি একটী দিন—
বাজবে সেদিন করুণ সুরে,
ক্ষুদ্র মোর এ হৃদয়-বীণ্‌।

আরণ্যক

—*—

"যজ্ঞেন বাচঃ পদবীয়মায়ন্ তামন্ববিন্দন্ ঋষিষু প্রবিষ্টাম্ ।"

—ঋগ্বেদ সংহিতা ১০।৬।৩

অনুভূতি বলিতে কি বুঝিব?—যে সব ভাব হঠাৎ মনের ভিতর আসিয়া আবার হঠাৎ কোথায় অদৃশ্য হইয়া যায়, তাহারা কখনো অনুভূতি নহে। প্রকৃত অনুভূতি একবার জাগিলে তাহা সমস্ত চিত্তের মাঝে একটা পুলক স্পন্দন জাগাইয়া তোলে—আর হৃদয়ের নিভৃত কন্দরে এমন একটা অভিজ্ঞান রাখিয়া যায় যে, যখনই মনকে আমরা একটু একাগ্র ও অন্তর্ম্মুখীন করি, তখনই দেখি—সকল অনুভূতির মূল জনয়িতা যিনি, সে অভিজ্ঞান আকুল আবেগে তাঁহার দিকেই আমাদের চিত্তকে আকর্ষণ করিতেছে। কাজেই চিত্তে যখন যাহা জাগে, তাহাকেই একটু বহিয়া সহিয়া যাচাই করিয়া লইতে হয়;—নতুবা কোনটা অন্তরের নিরুদ্ধ কামনা আর কোনটা তাঁর প্রেরণা, তাহা সব সময় বুঝিয়া উঠা যায় না। এই না বোঝাটাই জীবনে একটা দুঃসহ বিপদ্।

*

আজ যাহা দেখিতেছ ভাল, কালই হয় ত তাহা আবার তোমার কাছে মন্দ হইয়া দাঁড়াইবে; কাজেই যখন তখন যা-খুসী তা একটা উচ্ছ্বাসের বশে জীবনে ভালকেও গ্রহণ করিতে যাইও না—কিম্বা মন্দকেও প্রত্যাখ্যান করিও না। এই ভাল-মন্দের বাছাই মানবজীবনের একটা সমস্যা। আর সেই সমস্যার নিদান হইল অন্তরের সত্যশক্তিপ্রকাশে দুর্ব্বলতা। অন্তরে সত্যকে যে যত পরিস্ফুট করিয়া তুলিতে পারে, এই বিবেকবিচারও তাহার পক্ষে তত স্পষ্ট হইয়া আসে। এই বিবেক লাভ করিতে হইলে চাই দৃঢ় সত্যগ্রাহিতা ও অটুট্ ধৈর্য্য।

*

আমিত্বের দুর্লঙ্ঘ্য প্রাকারে নিজকে কারারুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছ, নিজের পায়ে নিজেই শিকল পরাইয়াছ। মুক্তির পথ—আলোকের পথ সম্মুখেই দিগন্তবিস্তৃত। ওঠো! জাগো!—ভাঙ্গ এ রুদ্ধ কারার দৃঢ় অর্গল—অন্ধ সংস্কারের কঠিন শৃঙ্খল! উদার উন্মুক্ত আকাশের তলে নিঃশঙ্ক বিহরণেই তোমার জীবনের সার্থকতা। ভয়, সঙ্কোচ, সঙ্কীর্ণতা—সে যে তোমার অন্তর-দেবতার দুঃসহ অপমান। মুক্ত তুমি, এই তুচ্ছ দেহের বন্ধনে সঙ্কীর্ণ মনের গণ্ডীতে নিজকে ঘিরিয়া রাখিবে কেন? প্রেমের বিপুল প্রসারণের মাঝেই তোমার জীবনের পরিপূর্ণ সার্থকতা।

*

কত দীর্ঘ দিন ধরিয়া যে ধূলা কাদা গায়ে মাখাইয়াছ, দুই একদিনের চেষ্টাতেই তাহা ধুইয়া মুছিয়া পরিষ্কার হইয়া যাইবে না। এমনি দীর্ঘকাল ধরিয়াই আবার তাহাকে মার্জ্জিত করিতে হইবে। ময়লা লাগে অতি সহজেই, কিন্তু তাহা হইতে নির্ম্মুক্ত হওয়াই বড় কঠিন। প্রাণের জাগ্রত চেষ্টা যেখানে, সুফল সেখানে শীঘ্রই ফলিবে। কিন্তু

এই চেষ্টার মাঝেও যদি আত্মম্ভরিতা থাকে—অহমিকা উদগ্র হইয়া উঠে, তাহা হইলে সে চেষ্টা কখনও সাফল্য লাভ করিতে পারে না। সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণেই জীবন সার্থক হইয়া উঠে। সমুদ্রের বিরাট্‌ত্বকে আপনাকে স'পিয়া দিতেছে বলিয়াই স্রোতস্বিনী এত নির্ম্মল—অফুরন্ত তার জলধারা, প নিদাঘ তাপেও সুস্নিগ্ধ। যিনি বিরাট, বসধারার অফুরন্ত উৎস, তাঁর সঙ্গে তোমার ক্ষুদ্র শক্তিটুকু যুক্ত না হইলে, সে যে অবরুদ্ধ জলাশয়ের মতই পূতিগন্ধ ও পঙ্কিল হইয়া উঠিবে। তোমার আর তাঁর মিলনের পথে যে নিদারুণ বাধা, আত্মসমর্পণ দ্বারা তাহাকে অতিক্রম করাই তোমার জীবনের সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য।

*

চাই বিদ্যাকে—অবিদ্যাকে নয়। বই পড়িয়া কথা কণ্ঠস্থ করিয়া যে বিদ্যা হয়, আবার আলোচনা বন্ধ হইলেই যাহা ভুলিয়া যাইতে হয়—সেই ক্ষণস্থায়ী অবিদ্যা আমাদের কাম্য নয়, অমৃতময়ী পরাবিদ্যা বা ব্রহ্মবিদ্যাকেই আমরা লাভ করিতে চাই। অপরাবিদ্যা আমাদের ক্ষণেকের পাথেয় হইতে পারে কিন্তু উহাই আমাদের লক্ষ্য নয়।—অবিদ্যা দিয়া আমরা মৃত্যুর পারে যাইব আর বিদ্যা দ্বারা অমৃতত্ব লাভ করিব।

*

জগৎ জুড়িয়া মায়ের খেলা। দিকে দিকে যে আনন্দ-নৃত্য, যে পুলক-চঞ্চলতা—কে তাহার রহস্যভেদ করিবে? এই আনন্দ-লীলায় যে মায়ের আঁচল ধরিয়া নাচিয়া চলিয়াছে, জীবন তাহারই সার্থক। কিন্তু সে সৌভাগ্য হয় ক'জনার? সংসার-বিক্ষোভও মায়ের ইচ্ছাতেই সৃষ্ট। কেহ এই তরঙ্গ-ভঙ্গে হাবুডুবু খাইতেছে, কেহ বা আনন্দে তাহার ফেনচক্রে ভাসিয়া চলিয়াছে। জীব তাঁহারই শক্তির ক্রীড়নক—শক্তির এই প্রচণ্ড স্পন্দন যেখানে নিস্তরঙ্গ হইয়া উদার নীলিমার মত স্থির প্রশান্তি লাভ করিয়াছে, এই আনন্দ-লীলার গূঢ় রহস্য সেখানেই সমাহিত। কিন্তু সে পুরীর পথরোধ করিয়া মা আমার ভৈরবী মূর্ত্তিতে বিরাজিতা। তিনি পথ ছাড়িয়া না দিলে কেহই প্রবেশের অধিকার পায় না। অভিমানের আস্ফালন সেখানে সম্পূর্ণ নিরর্থক। মায়ের উপর যখন শিশুর মত সরল অকপট নির্ভর জন্মিবে, করুণাময়ী মা আমার সন্তানকে তখনই বুকে তুলিয়া লইবেন।

*

ত্যাগের এত গৌরব কেন? কি ত্যাগ করিতে হইবে? কেনই বা ত্যাগ করিব?

ক্ষুদ্রকে ত্যাগ করিয়া বৃহৎকে অবলম্বন করিতে হইবে। ভূমাকে পাইবার জন্যই খণ্ডকে, অংশকে ত্যাগ করিতে হইবে। দেহ অপেক্ষা মন বড়, সেই জন্য মনকে পাইতে হইলে দেহকে ত্যাগ করিতে হইবে অর্থাৎ দেহজ্ঞানকে ভুলিতে হইবে। এইরূপে বুদ্ধির জন্য মনকে ত্যাগ করিতে হইবে; আর মনবুদ্ধির পরপারে যিনি, তাঁহাকে পাইতে হইলে বুদ্ধিকে অহঙ্কারকেও ত্যাগ করিতে হইবে। তত্ত্বমসি—তুমি তাই—তুমি সব চেয়ে বড়। তাই তোমার স্বরূপ পাইতে হইলে সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিতে হইবে। ত্যাগ অর্থ একেবারে রিক্ত হওয়া নয়—বড়কে পাইব বলিয়া ছোটকে ত্যাগ করাই প্রকৃত ত্যাগ।

*

তাঁর সঙ্গে যোগ না রেখে আপন জোরে

চল্‌বে কতক্ষণ?—এক জায়গায় না এক জায়গায় ঠেক্‌তে হবেই। তাও তাঁরি দয়া। চল্‌তে চল্‌তে পদে পদে অভিমান আহত হলে তবেই না প্রাণ কেঁদে উঠ্‌বে—তাঁর পায়ে লুটিয়ে পড়ে বল্‌বে, "হে দয়াল ঠাকুর, আমার সমস্ত চেষ্টা দিয়েও তোমাতে প্রাণ সমর্পণ কর্‌তে তো পার্‌ছি না। যতক্ষণ চেষ্টার জোর থাকে, ততক্ষণ যে আমার স্তবেই আমি মুখর হয়ে থাকি। এত ঠেকি, তবুও তো শিখি না। আর আমি আমার বোঝা বইতে পারছি না, এবার তুমি আমার হাত ধরে চল।"

*

দুঃখ ততক্ষণ দুঃখ, যতক্ষণ আমরা স্বেচ্ছায় তাহাকে বরণ করিয়া না লই; সুখও ততক্ষণই সুখ, যতক্ষণ আমরা তাহাকে ভালবাসি। দুঃখকে বরণ করিয়া লইলে আর সুখকে ত্যাগ করিলে, দুঃখ সুখ সব একরস আনন্দময় হইয়া উঠে—দুঃখের দুঃখত্ব ঘুচিয়া যায়, সুখের সুখত্বও চলিয়া যায়। দুঃখ সুখ সব আমাদের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। আমাদের ইচ্ছার তারতম্যে একই বস্তু কখনও দুঃখময় কখনও সুখময় বোধ হয়। ইহাতেই প্রমাণ হয়, দুঃখ সুখ বাহিরের কোনও বস্তুতে নাই—আছে আমাদের অন্তরে। দুঃখ সুখ সমস্তকে অতিক্রম করিবার জন্য—সমস্তের ঊর্দ্ধে নিজকে অনুভব করিবার জন্য চিত্তকে প্রস্তুত করিতে হইবে। চিত্তকে খাটাইতে পারিলে জগতের সবই মধুর আনন্দময় হইয়া উঠিবে।

*

নিজকে আগে তমোবিকারের আবরণ হইতে মুক্ত করিয়া লও, তারপর সেই শুদ্ধসত্ত্ব মনপ্রাণ লইয়া কর্মে আত্মনিয়োগ কর—স্বার্থহীন আত্মনিবেদন দিয়া কর্ম্মের প্রেরণাকে উদার ও সর্ব্বাবগাহী করিয়া লও, দেখিবে, কর্ম্মে তোমার রুচি-অরুচির বিচার আসিতেছে না—সুখ-দুঃখের দ্বন্দ্ব তোমার সত্ত্বপ্রতিষ্ঠিত চিত্তকে কোনদিকে বিক্ষিপ্ত করিতে পারিতেছে না। কর্ম্মফলের লাভেও যে তুমি, অলাভেও সেই তুমি—কোথায়ও তোমার আনন্দমণ্ডিত কর্মচেষ্টার বৈরূপ্য ঘটিতেছে না। এমনি কর্মেই তুমি সার্থক—কর্মফলের জন্মজন্মান্তরব্যাপী বন্ধন হইতে এই কর্মের দ্বারাই তুমি অনায়াসে আপনাকে মুক্ত করিয়া লইতেছ।

*

প্রত্যেক কার্য্যে, ভাবে, চিন্তায় সংযমের প্রয়োজন। অন্তর বাহির সংযত থাকিলে কার্য্য ও চিন্তা চারিদিকের বাধাবিঘ্ন হইতে সহজে রক্ষা পায়। সংযম ব্যতীত সাধনা অসম্ভব। মানুষের দৈহিক পুষ্টিতে যে শক্তি জাগে, তাহা অন্ধ, দুর্নিবার;—তাহার গতিও হয় বাহিরের দিকে। এই শক্তিকে বাহির হইতে ফিরাইয়া অন্তরমুখী করাই হইল সংযম। সংযমই মনুষ্যত্বের পরিচয়। খাঁটী মানুষ হইতে হইলে সর্ব্বাগ্রে চাই দেহ-মনের সুদৃঢ় সংযম।

*

বাইরে থেকে শুনতে গেলে সারাটা বাজারের মধ্য থেকে কেবল একটা অস্পষ্ট কোলাহল শোনা যায়। কিন্তু ভিতরে ঢুকে একটা কিছু নিয়ে কেনাবেচা আরম্ভ করে দিলে কোলাহলটা আর কানে বাজে না। সাধনরাজ্যেও তেমনি। বাইরে থেকে শুনি এর জন্য কত আয়োজন-আড়ম্বর, কত ডাক হাঁক—শুনে শুনে প্রাণ আমাদের আশা-

নিরাশায় এগোয় পিছোয়। কিন্তু নিজের ধাতটা বুঝে নিয়ে একটা কিছু ধরে কিছুদিন লেগে থাকলে যা কঠিন বলে মনে হয়েছিল, তাও ক্রমশঃ আমাদের কাছে সহজ হয়ে আসে। "সাধ্য বস্তু সাধনে পাই শ্রীগুরুর শ্রীচরণমূল"—এ কথার অর্থ কি, তা তখনি বুঝতে পারি।

*

বাহিরের কাজ করিয়া আমরা যে পরিশ্রম হয় মনে করি, এটা নিতান্ত ভুল। যে কোন কাজই একাগ্রচিত্তে করিতে গেলে সুন্দর আনন্দও পাওয়া যায়, আর মনকে বিশ্রাম করানও যায়। অবিরাম কর্ম্মেই মনের বিশ্রাম—ইহাই মনস্থির করিবার একটী সহজ উপায়—চিত্তশুদ্ধির সরল পন্থা। আমাদের মনকে অকেজো রাখিলেই তাহা বিক্ষিপ্ত হইয়া নানা বিষয়ে ছুটিয়া যাইবে, তাহাতে মনের বিশ্রাম না হইয়া পরিশ্রমই অধিক হইবে। একটী কাজ যখন মন প্রাণ দিয়া করিতে থাকি, তখন ষড়রিপুর অত্যাচার হইতে আমরা মুক্ত—মানুষের কামনা বাসনার জঞ্জাল হইতে আমরা মুক্ত। কর্ম্মের ভিতর দিয়া চিত্তকে শুদ্ধ ও একাগ্র করা অতি সহজ ও সরল যোগপথ।

শ্বাসের তাল ঠিক রাখিয়া, আর চিত্তে ধৈর্য্য ও হৃদয়ে আত্মবিশ্বাস লইয়া কাজ করিলে কষ্টবোধ হইবে না, ক্লান্তি আসিবে না—উৎসাহ ও আনন্দে মন-প্রাণ ভরিয়া উঠিবে। ইহাই সেবা—ইহারই নাম কর্ম্মযোগ।

*

যে ন্যূনতা জীবন-গঠনের পথে দুর্লঙ্ঘ্য বাধার সৃষ্টি করে, তাহাকে যতই অপরাজেয় বা অসাধ্য মনে কর না, আসলে তাহা ততখানি নয়। এ বাধাও তোমারই কল্পনার সৃষ্টি। এই পঞ্চভূতের ক্ষুদ্র আবেষ্টনেই তুমি সীমাবদ্ধ নও—তোমার সত্তা সকল জীবে, সকল বস্তুতে অনুস্যূত। সেই বিরাট সত্তাকে উপলব্ধি করিবার চেষ্টাই তোমার একমাত্র সাধনা। নিজকে তুমি হীন কল্পনা কর কেন? ইচ্ছাশক্তি প্রভাবেই অরূপের রূপে অবতরণ—এই বিচিত্র বিশ্বের সৃষ্টি। সেই মহান্ত জ্যোতিঃরই একটী স্ফুলিঙ্গ তুমি—তোমার ভাবনা তোমার ইচ্ছাও যে সত্য—সে-ও বাস্তবের রূপে ফুটিয়া ওঠে। তোমার ঐকান্তিক ইচ্ছাশক্তির প্রভাবেই তোমার অভাবের পূরণ হইবে—আর কিছুতে তাহা মিটিবার নয়।

*

সাধনে নিষ্ঠা চাই। প্রথমে নিষ্ঠা গড়ে তুলতে খুবই বেগ পেতে হবে। কিন্তু তা বলে হাল ছেড়ে দিতে নাই। দোলনার দড়ি কিছু দূর টেনে ছেড়ে দিলে সে যেমন শূন্যে উঠেও আবার নেমে যায়, সাধনাতেও কিছু দূর এগিয়ে গা ছেড়ে দিলে, যেমন বেগে উঠেছিল, তেমনি বেগে আবার নেমে পড়বে। আবার হয়ত তুমি উঠবে, কিন্তু উঠতেও তো কম সময় লাগবে না। তাই সাধনের একটা সূত্রবৎ অনুস্যূতি থাকা দরকার—শুধু যেমন তেমন করে ছুঁয়ে থাকা নয়, ভিতরে রীতিমত জোর করে ধরে থাকতে হবে। তখন যদি পরীক্ষায় পড়ে তাঁকে ডাক, তবেই তোমার ডাক তিনি শুনবেন।

সংবাদ ও মন্তব্য

—*—

আশ্রমসংবাদ—জগদ্‌গুরু শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যের আবির্ভাব এবং অত্রত্য সারস্বত মঠান্তর্গত শান্তআশ্রমের ১৬শ বার্ষিক মহোৎসব উপলক্ষ্যে ৬ই বৈশাখ হইতে ৮ই বৈশাখ পর্য্যন্ত আসামবঙ্গীয় সারস্বত মঠে শ্রীশ্রীগুরুব্রহ্মের পূজা, হোম, আরত্রিক, বেদমন্ত্র, গীতা, চণ্ডী এবং স্তোত্রাদি পাঠ এবং নামযজ্ঞাদি যথারীতি সুসম্পন্ন হইয়াছে। ঢাকা, ফরিদপুর, শ্রীহট্ট, গোয়ালপাড়া, নওগাঁ, কলিকাতা, খুলনা, বাঁকুড়া ও মানভূম হইতে ভক্তদিগের সমাগম হইয়াছিল—যোরহাটের প্রবাসী বাঙ্গালী ও মঠের নিকটবর্ত্তী ভক্তমণ্ডলী যোগদান করিয়াছিলেন। পূজা ও যজ্ঞান্তে সমাগত ভক্তবৃন্দ যজ্ঞীয় তিলক ধারণ করেন। পরে ফলমূল, খেচরান্ন, মিষ্টান্ন ও মিঠাই প্রভৃতি প্রসাদ বিতরিত হয়। দরিদ্রনারায়ণ সেবারও ব্যবস্থা হইয়াছিল।

৺কাশীধামে, ঢাকা ও বগুড়া আশ্রমে এবং সন্দ্বীপ প্রভৃতি স্থানে ভক্তগণ কর্ত্তৃক বিশেষভাবে মহোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

মঠাধিষ্ঠাতা শ্রীমৎ পরমহংসদেব বিগত ৪ঠা বৈশাখ মঠে পদার্পণ করিয়াছেন। সম্প্রতি তিনি কিছু দিন মঠেই অবস্থিতি করিবেন।

পণ্ডিতের দান—আসাম কামরূপের পরলোকগত মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত ধীরেশ্বর ভট্টাচার্য্য মহাশয় পাণিনি ব্যাকরণ অধ্যাপনা হেতু একটী টোল খুলিবার জন্য তাঁহার সমুদায় বিষয়সম্পত্তি উইল করিয়া গিয়াছেন। গত আশ্বিন মাসে টোল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে; মজঃফরপুরের শ্রীযুক্ত গণেশ ঝা উক্ত টোলের পণ্ডিত নিযুক্ত হইয়াছেন। বর্ত্তমানে ছাত্র সংখ্যা তের জন—ক্রমেই বাড়িতেছে। শ্রীযুক্ত অভয়রাম চৌধুরী নামে এক সদাশয় ব্যক্তি তিন জন উপযুক্ত ছাত্রকে বৃত্তি দিবার জন্য একজিকিউটারদের হাতে দুই হাজার টাকা দিয়াছেন। ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সংস্কৃত শিক্ষার জন্য এমন দান করেন, ইহাতে স্বধর্ম্মনিষ্ঠ মাত্রেই আনন্দিত হইবেন।

৺দেউগোপাল আশ্রম—"অসমীয়া"র জনৈক সংবাদদাতা লিখিয়াছেন, আসামের গড়মুরীয় সত্রাধিকার গোস্বামী তাঁহার সত্রে ৺দেউগোপাল আশ্রম নামে একটী ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম প্রতিষ্ঠা করিতেছেন। সংস্কৃত, অসমীয়া, গীতা, ভাগবত, কীর্ত্তন-ঘোষা ইত্যাদি বিষয়ে শিক্ষা দিয়া ছোট ছোট ছেলেদিগকে মনুষ্যত্বের আদর্শে উন্নীত করাই আশ্রমের মূল উদ্দেশ্য। আসামে সংস্কৃতশিক্ষার কিম্বা ধর্ম্মশিক্ষার ব্যবস্থা বড় বিশেষ নাই। শিক্ষাকে ধর্ম্মের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠা করিয়া সেই আদর্শে বাল্যকাল হইতে সন্তানকে গড়িয়া তুলিতে না পারিলে দেশের কল্যাণ নাই—ইহা বুঝিয়াই আমরা অত্র সারস্বত মঠে প্রাচীন ঋষিদিগের পবিত্র আদর্শে একটী শিক্ষাশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়াছি। আসামবাসীরাও যে সেই আদর্শে উদ্বুদ্ধ হইতেছেন, ইহা অতীব আনন্দের বিষয় সন্দেহ নাই।

সতী।—সেদিন কলিকাতা সহরের ১০নং বাদুড়বাগান ষ্ট্রীটে—সমরেন্দ্রনাথ মিত্র নামক এক ভদ্রলোক মারা যান; তাঁহার পতিব্রতা স্ত্রী শতদলবাসিনী পতিবিরহ অধিক

ক্ষণ সহিয়া থাকিতে পারিলেন না—ঘণ্টা দুইয়ের ভিতর তিনিও সতীদেহ সম্বরণ করিলেন; ফলে পতি ও সতীর দুই দেহই এক চিতায় সংস্কৃত হইল। এমন আদর্শ সতীত্ব—বিমল সতীত্বের দেশ—এদেশেই সম্ভবে!

গ্রাহকগণের প্রতি—সারস্বত মঠের বার্ষিক উৎসবের দরুণ পত্রিকা প্রকাশে এবার অনেক বিলম্ব হইল। আগামী মাসের পত্রিকা প্রকাশেও কিঞ্চিৎ বিলম্ব হইতে পারে।

উৎসবে সাহায্য-প্রাপ্তি

শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার দাসগুপ্ত ১০৲, " অন্নদাচরণ মাইতি ১০৲, " অধরচন্দ্র পাল ১০৲, " বৈকুণ্ঠনাথ সোম ১০৲, " তারানাথ দাস মণ্ডল ১০৲, সন্দীপবাসী ভক্তগণ মাঃ শ্রীযুক্ত করুণাকান্ত মুখোপাধ্যায় ১০৲, শ্রীযুক্ত কুমুদনীকান্ত সাহা ৫৲, " জনৈক ভক্ত ৫৲, শ্রীযুক্ত ভবেশচন্দ্র মুখার্জ্জী ৫৲, " দুর্গাচরণ দত্ত ৫৲, " গোবর্দ্ধন কুণ্ডু ৫৲, " কৃষ্ণচন্দ্র চন্দ্র ৫৲, " বিরজাচরণ মিত্র ৫৲, " লালতচন্দ্র সরকার ৫৲, " প্রভাকর চৌধুরী ৫৲, " হরিনারায়ণ বন্দোপাধ্যায় ৫৲, " চন্দ্রনাথ ভৌমিক ৫৲, " খগেন্দ্রনাথ দে ৫৲, " নরেশচন্দ্র পাকড়াশী ৫৲, " অনুকূলচন্দ্র দত্ত ৪৲, " গগনচন্দ্র দে ৪৲, " ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ৪৲, " অক্ষয়কুমার রায় ৩৲, " সূর্য্যনারায়ণ বাগ, " জ্যোতীন্দ্রনাথ কুণ্ডু, " নারায়ণচন্দ্র প্রামাণিক ও মহেন্দ্রনাথ কুণ্ডু ৩৲, " নীলরতন বন্দোপাধ্যায় ২৲, " লালতকুমার দত্ত ২৲, শ্রীযুক্তা হেমাঙ্গিনী দেবী ২৲, শ্রীযুক্ত আদিত্যচন্দ্র কাষী ২৲, " গোপালচন্দ্র গুহ ২৲, " নগেন্দ্র দেব রায় চৌধুরী ২৲, " নর্ম্মদাকুমার সেন ২৲, " রাজেন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ২৲, " গোবিন্দচন্দ্র পুততুণ্ড ২৲, " ফাকরচন্দ্র ঘোষ ২৲, " বিশ্বেশ্বর বসু ২৲, " পূর্ণচন্দ্র গোস্বামী ২৲, " বসন্তমোহন চক্রবর্ত্তী ১৷০, " অতুলচন্দ্র ব্রহ্মচারী ১৲, " চন্দ্রকান্ত দাস ১৲, " নালনীকান্ত মুখোপাধ্যায় ১৲, " নবীনচন্দ্র কুড় ১৲, " হেমেন্দ্রলাল কুড় ১৲, " মহেন্দ্রলাল সিংহ ১৲, " ঘনশ্যাম দলই ১৲, " বঙ্কিমচন্দ্র বসু ১৲, ভারতচন্দ্র দলই ১৲, " কমলাকান্ত দলই ১৲, " শ্রীনাথ বসু ১৲, " বিশ্বম্ভর কর্ম্মকার ১৲, " শরচ্চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ১৲, " ক্ষেপাদাস ভট্টাচার্য্য ১৲, " কৃষ্ণেন্দ্রচন্দ্র দাস ১৲, " হরপ্রসাদ রায় ১৲, " শশিকুমার দাসগুপ্ত ১৲, " সুরেন্দ্রমোহন দাসগুপ্ত ১৲, " শরচ্চন্দ্র গুহ নিয়োগী ১৲, " কালীপদ দত্ত ১৲, " হরিনাথ কর ১৲, " হেমচন্দ্র গুহ ১৲ " নারায়ণচন্দ্র নন্দী ১৲, " নরেন্দ্র নাথ গাঙ্গুলী ১৲, " যদুনাথ মুখোপাধ্যায় ১৲, " প্রভাত চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১৲, " কেশবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ১৲, " তারকচন্দ্র মোদক ১৲, " সুরেন্দ্রনাথ মিত্র ১৲, " নৃসিংহপদ পাল ১৲, শ্রীযুক্তা তরঙ্গিনী গুপ্তা ১৲, শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ মিত্র ১৲, " সতীশচন্দ্র লাহিড়ী ১৲, " রাধাগোবিন্দ মাল ১৲, " মৃগেন্দ্রনাথ চৌধুরী ১৲, " সুরেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায় ১৲, " চণ্ডীচরণ পাল ১৲, " প্রাণেশ্বর লাহিড়ী ১৲, শ্রীযুক্তা মনোরমা দেবী ১৲, শ্রীযুক্ত অমূল্যচন্দ্র দে ৷৷০, " জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ৷৷০, " হরিধন গাঙ্গুলী ৷৷০, " সন্তোষকুমার দত্ত ৷৷০, " অমূল্যচন্দ্র দাস ৷৷০, " গিরিজাবন্ধু কর ৷৷০। শ্রীযুক্ত বিন্দুচরণ দাস উৎসবের এক দিনের সম্পূর্ণ ব্যয়ভার বহন করিয়াছেন।

—*—

ওঁ তৎ সৎ

আর্য্য-দর্পণ

(সনাতন ধর্ম্মের মুখপত্র)

১৩শ বর্ষ } জ্যৈষ্ঠ { ২য় সংখ্যা

মরুতঃ

[ঋগ্বেদসংহিতা—১।৯৫]

তন্নু বোচাম রভসায় জন্মনে
পূর্ব্বং মহিত্বং বৃষভস্য কেতবে।
ঐধেব যামন্ মরুতস্তুবিষ্বণো
যুধেব শক্রাস্তবিষাণি কর্ত্তন॥

নিত্যং ন সূনুং মধু বিভ্রত উপ
ক্রীলন্তি ক্রীলা বিদথে ঘৃষ্বয়ঃ।
নক্ষন্তি রুদ্রা অবসা নমস্বিনং
ন মর্দ্ধন্তি স্বতবসো হবিষ্কৃতম্॥

যস্মা ঊমাসো অমৃতা অরাসত
রায়স্পোষং চ হবিষা দদাশুষে।
উক্ষন্ত্যস্মৈ মরুতো হিতা ইব
পৃথু রজাংসি পয়সা ময়োভুবঃ॥

আ যে রজাংসি তবিষীভিরব্যত
প্র ব এবাসঃ স্বযুতাসো অধ্রজন্।
ভয়ন্তে বিশ্বা ভুবনানি হর্ম্যা
চিত্রো বো যামঃ প্রযতাস্বৃষ্টিষু॥

পূর্ব্বের মহিমা যত, হে মরুৎ, কহি বিবরিয়া—
এস ত্বরা—যজ্ঞভূমি কর পুণ্য পদরেণু দিয়া।
সমিদ্ধ ইন্ধন সম যাত্রাপথে শুনেছি গর্জ্জন—
যোদ্ধা যেন রণভূমে, বীর্য্যবলে কর আস্ফালন।

কভু রুদ্রমূর্ত্তি—পুনঃ মধুধারা বরিষ সতত,
যজ্ঞভূমে খেল এসে আমারি যে শিশুটীর মত!
করেছ করুণা তারে, তোমাদেরে নমেছে যেজন—
সম্বরিয়া রুদ্রতেজ, দুঃখ তার করেছ হরণ।

অনাবিল ভক্তিহেতু পেয়ে প্রীতি অমরের গণ,
দিয়াছে যে হবি, তারে দিব্যধন করে বিতরণ;—
বন্ধু হেন মরুতের স্নেহধারা পড়িছে ঝরিয়া,
নিখিল ভুবনখানি সুমঙ্গলে রেখেছে ভরিয়া।

মরুতের তুরঙ্গম বীর্য্যভরে ছেয়েছে গগন,
ইচ্ছাসুখে যুক্ত রথে স্পর্দ্ধাভরে করে বিচরণ;—
হর্ম্ম্য কাঁপে পদভরে—ভীত-ত্রস্ত কাঁপিছে ভুবন,—
ছোটে যেন রণভূমে চিত্রগতি দিব্য প্রহরণ।

ভোগের দখল

তুমিই না ভাই জিজ্ঞাসা করেছিলে, "স্বত্ব-স্বামিত্ব" সম্বন্ধে রামের কি অভিমত? স্বত্বের জোরটাকে রাম অধিকার বলতে চান না, তিনি বলেন ওটা অনধিকার। আচ্ছা, যে কেউ প্রশ্ন করে থাক্ না কেন, রামের কাছে মনে হচ্ছে, সে তো ভাই তোমারই স্বরূপ—এই বিগ্রহ না ধরে অন্য বিগ্রহ ধরে রয়েছে।—কেমন কিনা?

"স্বত্ব" বলে কাকে? যে জিনিষ কারু আপন, তাই তার স্ব; আপন জিনিষের উপর যে অধিকার, তাকেই বলে স্বত্ব।

স্বাভাবিক লঘুত্ব, দাহকত্ব—এই সমস্ত হল উদজান বাষ্পের স্বত্ব; কিন্তু যে আধারের মাঝে সে বাষ্প রয়েছে, তাকে কখনো তার 'স্ব' বলা চলে না। তেমনি মনুষ্যত্ব বা ব্রহ্মত্ব হল তোমার স্বত্ব—কিন্তু যে বাড়ীতে তুমি আছ বা যে সব অলঙ্কারে সেজেছ, তাতে তোমার "স্বত্ব" নাই। মানুষ তার আজন্মসিদ্ধ অধিকারটুকু পর্য্যন্ত খোয়াবে, যা তার স্বাভাবিক স্বত্ব তা পর্য্যন্ত হারাবে—ব্রহ্মত্ব হতে বিচ্যুত হবে—কিন্তু তার ঘর বাড়ী টাকা-পয়সা এগুলোর ওপর দাবী করে কি করে যে কামড়ে পড়ে থাকে—সে এক ভারী মজা দেখতে। নিয়তির কি নিদারুণ পরিহাস!

ধন-সম্পত্তির পরিমাণ দিয়ে যে মানুষের শ্রেণীবিভাগ করা হয়, সেটা একটা নিছক মিথ্যা—তার চেয়ে জুতো দেখে মানুষের জাত ঠিক করলে হয় না?

রাম মুক্তকণ্ঠে প্রচার করছেন, মানুষের জনসাধারণ স্বত্ববোধ, তার যে পোঁটলা-পুঁটলীর দাবী—এই হচ্ছে তার স্বরূপোপলব্ধির পক্ষে একমাত্র বাধা। যে মুহূর্ত্তে আমরা একটা কিছু নিজ দখলে আনতে চাই, সেই মুহূর্ত্তেই আত্মপ্রবঞ্চনার প্রেত আমাদের ওপর দখল দাবী করে। ত্যাগই বল কিম্বা তাকে সর্ব্বগ্রহই বল, সত্যের সঙ্গে একাত্ম হয়ে তাকে পাওয়াই হচ্ছে খাঁটী বেদান্ত। পূর্ণ গণতন্ত্র, পূর্ণ সাম্য—বহির্জ্জগতের প্রভুত্বকে অগ্রাহ্য করা, পদাঘাতে সমস্ত সুখ-সুবিধার বিশেষাধিকার দূর করা—হামবড়ার অভিমান ছেড়ে দেওয়া, আবার তেমনি আমি অধমের ভাবও ছেড়ে চলা—এই হচ্ছে বাস্তব জীবনের বেদান্ত সাধনা।

বেদান্তের এই ভাব মনোজগতে এবং অধ্যাত্মজগতেও প্রসার লাভ করেছে। সব জিনিষের উপর থেকে দাবী দাওয়া একদম ছেড়ে দেওয়া, দেহ-মন বুদ্ধি, ঘরবাড়ী, খ্যাতি-প্রতিপত্তি—সবার মোহ কাটিয়ে ওঠা—এই তো হল বেদান্ত। এক কথায়: সকল সঙ্কীর্ণতার বেড়া তোমায় ভাঙ্গতে হবে, ব্রহ্মরূপে জগতের সমস্ত শক্তির, তার প্রতি অণু পরমাণুর, গ্রহ নক্ষত্র, গাছপালা সকলেরই অধিষ্ঠাতা হতে হবে তোমায়—এই তোমার বেদান্ত সাধনা। সমগ্র জগৎ যাতে এই বেদান্তের ধর্ম্ম গ্রহণ করতে পারে, তার আয়োজন করতে অনেক মণ্ডলীর সৃষ্টি হচ্ছে আজকাল। সন্ন্যাসীর ঝাণ্ডা একদিন জগতের উপর রাজত্ব করবে।

কত বেদান্তী আছেন, তাঁরা প্রেমের রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করে প্রেমের জীবন যাপন

করছেন। আবার কোথাও কোথাও এই প্রেমের শিখা প্রাগৈতিহাসিক যুগ হতে দীপ্ত রয়েছে।

ঋষি গঙ্গাতীরে বসে আছেন—পশু, পক্ষী জলচর সব তাঁর প্রেমে নির্ভয় হয়ে পাশের কাছে এসে জুটেছে, তাঁর হাত থেকে নির্ভয়ে আহার গ্রহণ করছে—একবার ঐ চিত্রটা ভাব দেখি! আচ্ছা এ সম্বন্ধে আমি একটা চরম দৃষ্টান্তের উল্লেখ করছি।

আমি একজন স্বামিজীকে জানতাম, তাঁর দেহে একটা বিষম ক্ষত হয়েছিল। ঘায়ে পোকা পড়ে গিয়েছে, কিন্তু তবুও তিনি কোনও ওষুদ ব্যবহার করবেন না। পোকা গুলো পুঁজ খেয়ে খেয়ে মাটীতে পড়ে যেত, তিনি আবার স্নেহভরে হাসতে হাসতে তাদের তুলে ঘায়ে বসিয়ে দিতেন। আমার এই ক্ষুদ্র দেহের উপর একটা ক্ষুদ্র কীটাণুকীটেরও দাবীদাওয়া চলে জানি—আবার এই বিশাল বিশ্বও যে আমার, এ-ও জানি। এই বিশ্বই আমার দেহ—বায়ু আমার আচ্ছাদন, পৃথ্বী আমার পাদপীঠ।

যিনি অবিরাম দান করছেন, তিনিই তো "স্বামী।" কেবল সত্যকে আঁকড়ে ধরো—আর সবকে যেতে দাও। সন্ন্যাসী ভিক্ষা যা পান, তা তিনি তাঁর চেয়েও অভাবগ্রস্তকে বিলিয়ে দেন; তারপর দেবার যখন আর কিছু থাকে না—তখন কীট-পতঙ্গ, দংশ মশক-কেও তিনি তাঁর দেহটা বিলিয়ে দেন; আবার সবারই আত্মস্বরূপে গ্রহীতারূপে তিনি সে দান গ্রহণ করেন। কীট যখন তাঁর দেহের গলিত মাংস ভক্ষণ করছে, তখন তিনিই যে কীট হয়ে সে আনন্দের ভাগ নিচ্ছেন; তিনিই বায়ুরূপে তাপরূপে দেহকে শুষ্ক করছেন!

দান-খয়রাৎ—স্বত্ব-স্বামিত্বের দাবী মানুষের মাঝে এত উগ্র হয়ে উঠেছে যে, আজ-কাল সমাজের এক অংশকে রিক্ত, উৎপীড়িত, অধঃপাতিত করে, বিপুল অর্থ সঞ্চয় করে, তারি এক কণিকা ফিরিয়ে দেওয়াকেই মানুষ বলছে মহৎ দান। যেন মুমূর্ষের মুখে এক ফোঁটা জল দিয়ে তার যন্ত্রণার কাল বাড়িয়ে দেওয়াতে বড় পুণ্য। "ব্যাজ" (সংস্কৃতে তার অর্থ ছলনা, চালাকী, আর আধুনিক অর্থ "সুদ") গ্রহণ না করাটাই গরীবের প্রতি বেজায় অনুগ্রহ কিনা—কেননা আজকাল যে সুদেরই পূরা মরসুম।

এই হচ্ছে ইয়োরোপ ও আমেরিকার খয়রাতের নমুনা। ভারতবাসীর খয়রাত আবার উপোষী চাষাভূষার জন্য মাথা ঘামায় না—জগতের ভাণ্ডারে খেয়ে খেয়ে যে সমস্ত আলসে কুঁড়ের পেট মোটা হয়ে গিয়েছে, তাদেরই আবার খাইয়ে পরিয়ে দেশের লোকেরা স্বর্গে যাবার সিঁড়ি গড়ে—পাথরের মত অসাড় হয়ে গিয়েছে যে ধর্ম্ম, তাদেরই রক্ষকদের পেট ভরায়।

সাদাসিদে সাজপোষাককেই আমি ফ্যাসান বলে চালাতে চাই, বুঝেছ? তোমার সাজ-পোষাক যে তোমায় ঢেকে রাখে, আর তোমার লাবণ্য তোমায় প্রকাশ করে। সাজ পোষাকের কাছ থেকে ধার করা সৌন্দর্য্য পেয়ে লাভ? অকপট হাসি, অটুট স্বাস্থ্য, সজীব আনন্দ—এই সব দিয়ে সাজ না কেন?

নিক্ না চোরে সব চুরী করে। সবার সব গ্রাস করে থাকুন না রাজা বসে। তোমার তাতে কি? তোমার ভাগ তো তুমি দিচ্ছ না। তুমি যে সত্যস্বরূপ; সংসার-সুখের লোনাজলে চুবুনী খাবার জন্য তো তোমার

সৃষ্টি হয়নি—তুমি দাঁড়াবে সত্যের গৌরবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনও ডিগ্রীর প্রয়োজন আছে কি আমাদের?—ডক্তোর ডিগ্রী!—চরম ডিগ্রী পাব আমরা আমাদের কাছ থেকেই! স্বপ্নের বাঘকে তাড়াতে হলে স্বপ্নের তরোয়াল যে চাই, এ কথা মানি। কিন্তু জাগ্রৎ অবস্থা থেকে বাঘ আর তরোয়াল কোনটারও তো কিছু মাত্র সার্থকতা নেই। অপরাবিদ্যার বেলাতেও তাই। সাংসারিক বুদ্ধির কাছে তার যতই কদর থাকুক না কেন, তা নিয়ে ভগবানের মাঝে কেউ জাগ্রৎ রয়েছে বলতে পারে না।

মনের ভোগের তহবিল ফাঁপিয়ে তোলবার প্রতি যে মানুষের আত্যধিক আগ্রহ ও শ্রদ্ধা—তাই হচ্ছে অধ্যাত্মসিদ্ধির পক্ষে একটা বিষম বাধা; মানুষ চায় ইউনিভার্সিটীর ডিগ্রী, সার্টিফিকেট, নাম, খেতাব ইত্যাদি মানসিক ভোগের উপকরণ। অধ্যাত্মদৃষ্টি যাঁর খুলেছে, তিনি দেখছেন—এ জগৎ যে মানুষের আত্ম সম্মোহনের সৃষ্টি—নিজেরাই তারা একটা পাগলাগারদের সৃষ্টি করে পরস্পরের খেয়ালের খোরাক জুটিয়ে আসর সরগরম রাখছে। সম্মোহিত মানুষ যেমন শুকনো মেঝেতে খাল বিল দেখে, এ জগৎটাও তেমনি। অধ্যাপক আর আচার্য্যেরা যে সমস্ত বিদ্যা আয়ত্ত করেছেন বলে ধরাকে সরা জ্ঞান করছেন, তাও তো সম্মোহনের খেলা ছাড়া আর কিছু নয়। এ জগৎটা যেমন ফাঁকা, মানুষের বিদ্যাও তেমনি। কিন্তু যে জ্ঞানী এই বিশ্ব প্রতিভাসের মূলে গিয়ে পৌঁছেছেন, এই চন্দ্র সূর্য্য, গ্রহ-নক্ষত্র, নদী পর্ব্বত দেখে তাঁদের তাক লেগে যায় না—কিম্বা জ্যোতির্ব্বিদ, গণিতবিদ, উদ্ভিদবিদ, প্রাণিবিদ, ভূবিদ পণ্ডিতেরা এই বিশ্বপ্রতিভাসের যেটুকু বিদ্যা অর্জ্জন করেছেন, তার মাঝে যে কোনও পুরুষার্থ রয়েছে, তা তাঁরা মানেন না। তাঁরা জানেন এ সব শুধু খেলা, আমোদ ছাড়া আর কিছু নয়।

যারা জগতে ভোগের উপকরণ সংগ্রহ করেছে, কিম্বা যারা সেই উপকরণের বিদ্যাটুকু আয়ত্ত করেছে তাদের তুলনারই একদর, তারা প্রাতিভাসিক জগতের উপরে আর উঠতে পারেনি। আচার্য্য, পণ্ডিত, আর অধ্যাপকের ভ্রূকুটী আর প্রসাদ, সমালোচন আর উপদেশ ব্রহ্মজ্ঞানীকে স্পর্শও করতে পারে না—তাঁর কাছে এ সব একেবারে ভুয়া। এই যে বিশ্ববিদ্যালয়ের মেলা—এ কেবল মানুষের সম্মোহিত অবস্থাকে দীর্ঘস্থায়ী করবার জন্য নানারকম কৌশল মাত্র। গির্জ্জা, মন্দির সভা সমিতি সবই জগতের মোহনিদ্রা বাড়াবার উপায়মাত্র। সূর্য্য যদি বরফের মত ঠাণ্ডা হয়ে যায়, বা চন্দ্র যদি আগুনের মত তেতে ওঠে, তাতে জীবন্মুক্ত পুরুষ বিস্ময় বোধ করেন না। এমন কি আগুনের শিখা ঊর্দ্ধগামী না হয়ে যদি অধোগামী হয়, একখানা কাগজের মত যদি জগৎটা গুটিয়ে তাল পাকিয়ে যায় তবেই বা তাঁর কি?

এমন একদিন গিয়েছে, ব্রাহ্মণের পৌরোহিত্য যেদিন জগৎকে শাসন করেছে; তারপর ক্ষত্রিয়ের শৌর্য্য একদিন জগৎকে শাসন করেছে। আর আজ বৈশ্যের অর্থলালসা জগৎকে শাসন করছে। এরপর আসবে শূদ্রের পরিচর্য্যাধিকারের যুগ; কিন্তু শূদ্রের মাঝে থাকবে তখন সন্ন্যাসীর ভাব।

ইউরোপ ও আমেরিকাতে বংশানুক্রমিক

বিধান বা ধর্ম্মবিধি দিয়ে শূদ্রজাতিকে মার্কা মারা করে দেওয়া হয়নি বটে, কিন্তু তবুও এখানকার অবস্থা বড় সুবিধা নয়। আর ভারতবর্ষ একে তো সমাজ আত্মসংস্থাপনে মুগ্ধ হয়ে রয়েছেই, তার উপর জাতিভেদের বিধানে অন্যায় ও ক্ষতির মাত্রা আরও বাড়িয়ে তুলছে। অবশ্য এতে সেখানে ধর্ম্মঘট হচ্ছে না বটে, কিন্তু সমস্তটা জাত একেবারে মেষের চেয়েও ভীরু ও অসহায় হয়ে পড়েছে।

এ পর্য্যন্ত বেদান্ত কেবল গুটীকতক লোকের একচেটিয়া সম্পত্তি হয়ে ছিল। বন্দির মাঝেই তার বাস ছিল। হিমালয়ের গর্ভে ভ্রূণরূপে এ শিশু বহু দিন ধরেই সঙ্গোপনে ছিল। তারপর গঙ্গার ধারা ধরে উপত্যকা ভূমিতে সে নেমে এসেছে, তার পুণ্য স্পর্শে ব্রাহ্মণ শূদ্র সকলকেই পবিত্র করছে — সকল রকম অস্বাভাবিক ভেদের নিশানা মুছে দিয়েছে। যথার্থ প্রাণবন্ত মানুষ হচ্ছে এক — কিন্তু এমন অনুভূতি তো বড় কেউ পায় না। খাওয়ার সময় তোমাকে দেখে শুনে সজ্ঞানে খেতে হয়; কিন্তু সেই খাদ্যবস্তু পরিপাক করে দেহের বিভিন্ন অংশ যখন তাকে অঙ্গীভূত করতে চায়, তখন সে কাজটা তোমার অজ্ঞাতসারেই হয়ে থাকে। ঠিক তেমনি ভাবে ঐক্য ও সংহতির সাধনা প্রেম ও ব্রহ্মের সাধনা যখন করবে, তখন তোমাকে সজ্ঞানেই তা করতে হবে; ভেদ বা বৈচিত্র্যের যে লীলা, সে আপনা হতেই চলবে।

হে ভারতের ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, শূদ্র! কি যে হবে ভারতে দু'চার বছর পরে তা তোমরা কেউ জান কি? আমার কথা তোমরা যত অদ্ভুতই মনে কর না, আমি দেখছি— দিব্যচক্ষে আমি দেখছি, বিরাট সন্ন্যাসিসঙ্ঘের অভ্যুত্থান!—দেখছি দেবতা মানুষ হয়ে নেমে এসেছে পৃথিবীর বুকে!—মানুষজাতের কাদায় গড়া ভেদের বিধান কোথায় চুরমার হয়ে গিয়েছে।—ভারতবর্ষ, চীন, আমেরিকা, ইংলণ্ডের মাঝে ভেদের চিন্ নাই কোথাও! —নূতন নূতন বুদ্বুদ গড়ে উঠছে, আবার তারা কোথায় মিলিয়ে যাচ্ছে।

ওরে আমার ঘুমন্ত যাতরা! একবার চোখের বাঁধন ছিঁড়ে ফেলে দেখ, সন্ন্যাসীরা সমাজের মাথা হয়ে আজ অধঃপতিত শূদ্রের হাত ধরে দাঁড়িয়েছেন — ভিক্ষাপাত্র আজ হল-যন্ত্রে পরিণত হয়েছে! তথাকথিত সন্ন্যাসীর তামসিক জড়তা ঘুচে গিয়েছে — আর শূদ্রের পরিচর্য্যা ধর্ম্ম আজ কর্ম্মসন্ন্যাসের গৌরব লাভ করছে — তাদের মহিমায় সকলে উদ্বুদ্ধ আজ। বারবিলাসিনীর নির্লজ্জ ধৃষ্টতা — তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে রামের নিষ্কলুষ পবিত্রতা; মেষপালকের নম্রতার সঙ্গে সিংহের অপ্রধৃষ্য বীর্য্যের যোগ হয়েছে; সকল বৈপরীত্যের সন্ধি হয়েছে — মাঝখানকার সকল অস্বাভাবিক পার্থক্য ঘুচে গিয়েছে — সমস্ত জগৎ এক পরিবারে গেঁথে উঠছে! দেখ্ তোরা এই সব — চোখ মেলে চা।

আমাদের কিসের দরকার? আগুনের না তরবারির? — কিছুরই নয়। শাসনের জন্য পুলিশ চাই? — না। তবে এ কি কল্পলোকের কাহিনী? — না, আচমকা জেগে ওঠা খেয়াল তো নয় এ। এ কি সংঘবাদ? — হতে পারে। কিন্তু ভারতবর্ষের পক্ষে এ হচ্ছে স্বাভাবিক পরিণতি — এ তার বেদান্ত ধর্ম্মের অতি বাস্তব স্বাভাবিক প্রয়োগ। হে ভারতবাসী, আপনাকে জেনে এই ত্যাগ ধর্ম্ম যদি তোমরা গ্রহণ করতে, তবে তোমাদের ব্যাধি থাকত কোথায়? মনের ব্যাধি যদি আরাম হয়ে যায়, তবে দেহের ব্যাধিও

আরাম হবেই হবে। তলে তলে কিছু কর্‌বার প্রয়োজন নাই—চালবাজী ফন্দীবাজীর প্রয়োজন নাই—সন্দেহ বা ভয়ের প্রয়োজন নাই। যারা ব্রহ্ম-ঘাতী, তারাই তা করুক গে।

আমি বাদশা রাম—তোমাদের হৃদয়ই আমার সিংহাসন। আমি যখন বেদবাণী প্রচার করেছিলাম, কুরুক্ষেত্রে, জেরুজিলামে, মক্কাতে যখন আমার বাণী ঘোষিত হয়েছিল, তখন আমাকে ভুল বুঝেছিলে তোমরা; আজ আবার আমার কথা তোমাদের শোনাচ্ছি—আমার কণ্ঠ তোমাদের কণ্ঠ হোক—তত্ত্বমসি—যা দেখ্‌ছ সবই তুমি।

কেউ কেউ তোমরা ভ্রূকুটী করছ। দেখছি তোমাদের কারু কারু নাক ত্রিশ ডিগ্রী উঁচু হয়ে উঠছে—কেউ বা বিরক্ত হয়ে হাতের কাগজখানা ছুঁড়ে ফেলেছ।—যা খুসী তাই কর না কেন—কিন্তু বিধান যা হয়েছে, তা ফলবেই। কোনও শক্তিই তাকে প্রতিরোধ করতে পারবে না—রাজা, দেবতা, কারু সাধ্য নাই যে তাকে ঠেকায়। সত্যের হুকুম মানতেই হবে যে! মূর্চ্ছা যেও না। আমার মস্তক তোমাদেরই মস্তক; ইচ্ছা হয় কেটে ফেল একে—কিন্তু এর ঠাঁইতে হাজারটা গজিয়ে উঠবে তখন।

এই গান শামসি তবরেজ গেয়েছিলেন। পাঞ্জাবের বুল্লার কাকলীতে আর গোলাপ সিং এর বজ্রকণ্ঠে কি এই রাগিণী বেজে উঠেছিল? যিশুর আধ আধ ভাষা কি এই সত্যই প্রকাশ করতে চেয়েছিল? মহম্মদ কি এই চন্দ্রকলার দর্শন পেয়েছিলেন?—সে সব খবর তো আমি রাখি না। আমার "ইদ্" তখন, আমার "তাকে" দেখি যখন। সত্য প্রাচীন হয়েও চিরনবীন। তোমার অধ্যাত্মসিদ্ধি তোমার "ইদ্।" তোমার স্বরূপে, তোমার ব্রহ্মসত্যে যখন তুমি জেগে ওঠ, তখন সমস্ত সাধু প্রবক্তা তোমার মাঝেই মিশিয়ে যান—কেননা তোমার তুমিকে না জানাতেই তো তাদের সৃষ্টি হয়েছিল। ওম্—ওম্—ওম্!

---

* স্বামী রামতীর্থ

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং
কলিকাতা।

যোগসূত্রবৃত্তি

—॥—

সাধনপাদ

অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য্য ও অপরিগ্রহ এই কয়টী **যম**। যে ব্যাপার বা চেষ্টার প্রয়োজন অপরের প্রাণবিয়োগ—তাহা হিংসা। হিংসাই সমস্ত অনর্থের হেতু। হিংসার একান্ত অভাবই **অহিংসা**। সর্ব্বপ্রকারে হিংসা পরিহার করিতে হইবে বলিয়া প্রথমেই অহিংসার নির্দ্দেশ। বাক্য ও মনের যথার্থই **সত্য** অর্থাৎ যেমন দেখিয়াছ, অনুমান করিয়াছ বা শুনিয়াছ, ঠিক সেইরূপ কথন ও চিন্তনই সত্য। নিজের বোধ অপরের মধ্যে সংক্রামিত করিবার উদ্দেশ্যে যে বাক্য উক্ত হইয়াছে, তাহা যদি শ্রোতার নিকট বঞ্চক, ভ্রান্ত বা অর্থশূন্য বলিয়া বোধ না হয়, পরন্তু সেই বাক্য কোনও প্রাণীর পীড়া উপস্থিত না করিয়া সমস্ত প্রাণীর উপকারার্থে প্রবৃত্ত হয়, তবেই তাহা সত্য। স্তেয় পরদ্রব্য অপহরণ; **অস্তেয়** তাহার বিপরীত। উপস্থ-সংযমই **ব্রহ্মচর্য্য**। ভোগের উপকরণসমূহ অঙ্গীকার না করাই **অপরিগ্রহ**। (৩০)

অহিংসা প্রভৃতি যমরূপ যোগাঙ্গ যদি চিত্তের সমস্ত ভূমিতেই জাতি, দেশ, কাল ও সময় দ্বারা অনবচ্ছিন্ন হইয়া অনুষ্ঠিত হয়, তবে তাহারা মহাব্রত বলিয়া গণ্য হইতে পারে। সময় অর্থে নিমিত্ত যেমন—ব্রাহ্মণের প্রয়োজন ইত্যাদি। ব্রাহ্মণকে বধ করিব না (জাতি), তীর্থে বধ করিব না (দেশ), চতুর্দ্দশীতে বধ করিব না (কাল), দেব-ব্রাহ্মণের প্রয়োজন ব্যতিরেকে বধ করিব না (সময়)—এইরূপ চারিটী অবচ্ছেদ ব্যতিরেকে আর কোথাও কখনও কাহাকে কোনও কারণে বধ করিব না—এইরূপ যে প্রবৃত্তি, তাহাই অনবচ্ছিন্না। এই যেমন অহিংসার সার্ব্বভৌম মহাব্রত রূপ, তেমনি সত্য প্রভৃতি অন্যান্য যমের সম্বন্ধেও বুঝিতে হইবে। এইরূপে সমস্ত ভূমিতে, সমস্ত বিষয়ে সর্ব্বপ্রকার ব্যভিচারশূন্য হইয়া অনুষ্ঠিত হইলেই ইহাদিগকে মহাব্রত বলা যায়। (৩১)

শৌচ, সন্তোষ, তপঃ, স্বাধ্যায় ও ঈশ্বর প্রণিধান ইহারা **নিয়ম**। বাহ্য ও আভ্যন্তর ভেদে শৌচ দুই প্রকার। মৃত্তিকা, জল প্রভৃতিদ্বারা কায়ক্ষালন হইল বাহ্য শৌচ; আর মৈত্রী প্রভৃতিদ্বারা চিত্তমল প্রক্ষালন হইল আভ্যন্তর শৌচ। অন্যান্য নিয়ম পূর্ব্বেই ব্যাখ্যাত হইয়াছে। (৩২)

যোগের পরিপন্থী হিংসা প্রভৃতিকে **বিতর্ক** বলা হয়; ইহারা যম-নিয়মের বিরুদ্ধ কর্ম্ম। প্রতিপক্ষ-ভাবনা দ্বারা যখন ইহাদের বাধা জন্মায়, তখন যোগ সহজসাধ্য হইয়া থাকে; সুতরাং যম নিয়মকেও যোগাঙ্গ বলিয়া গণ্য করিতে হয়। (৩৩)

বিতর্ক সমূহের স্বরূপ, কারণ ও ফল কি? কৃত, কারিত ও অনুমোদিত ভেদে প্রথমত হিংসাদি বিতর্ককে তিনভাগে ভাগ করা যায়। স্বয়ং যাহা করা হইয়াছে, তাহা কৃত; "কর" বলিয়া অপরের প্রয়োজক ব্যাপারদ্বারা যে বিতর্ক উৎপাদিত হইয়াছে, তাহা কারিত;

আর অন্যে করিলে পর "ভালই হইল" বলিয়া যাহার স্বীকার করা হইল, তাহা অনুমোদিত। বিতর্ককে এইরূপে তিন ভাগে ভাগ করিবার উদ্দেশ্য এই, ইহাতে অনেকের ভ্রান্ত ধারণা দূর হইয়া যাইবে; নতুবা এমন নির্ব্বোধও কেহ থাকিতে পারে যে নিজ হাতে কোনও কুকর্ম্ম করে নাই বলিয়া মনে করিতে পারে, আমি যখন স্বয়ং একাজ করি নাই, তবে আর আমার কোন দোষ নাই।

লোভ, ক্রোধ এবং মোহ বিতর্কসমূহের কারণ। সূত্রকার যদিও লোভ এবং ক্রোধের প্রথমে উল্লেখ করিয়াছেন, তথাপি মোহকেই সমস্ত ক্লেশের নিদান বলিয়া জানিতে হইবে। অনাত্মাতে আত্মাভিমানই মোহ—মোহ হইতে আত্মপর-বিভাগ জন্মিলে তারপর ক্রোধ ও লোভের উৎপত্তি হইয়া থাকে। সুতরাং সমস্ত দোষেরই মূল হইতেছে মোহ। বিষয়-তৃষ্ণাই লোভ; যে বৃত্তির বশে মানুষের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের বিবেকজ্ঞান উন্মূলিত হইয়া যায়, চিত্তে যেন আগুন জ্বলিয়া উঠে, তাহা ক্রোধ। কৃত, কারিত ও অনুমোদিত ভেদে বিতর্কসমূহকে তিন ভাগে ভাগ করিয়া আবার মোহাদি কারণ অনুযায়ী তাহাদের প্রত্যেককে তিন ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে।

অবস্থাভেদে আবার বিতর্ক তিনপ্রকার—মৃদু, মধ্য ও অধিমাত্র। ইহারা আবার মৃদু, মধ্য ও তীব্র ভেদে প্রত্যেকে তিন প্রকার। সুতরাং অবস্থাভেদে বিতর্কসমূহ সাতাশ প্রকার এবং সর্ব্বসমেত তাহারা একাশী প্রকার। আবার অপরিসংখ্যেয় প্রাণীতে নিয়ম, বিকল্প ও সমুচ্চয় ভেদে বিতর্কসমূহ অসংখ্য প্রকার।

দুঃখ এবং অজ্ঞান হইল বিতর্কসমূহের অনন্ত ফল। চিত্তের যে রাজস ধর্ম্ম আমাদের নিকট প্রতিকূলরূপে অবভাসিত হয়, তাহা দুঃখ। সংশয় ও বিপর্য্যয়স্বরূপ মিথ্যাজ্ঞানই অজ্ঞান।

বিতর্কসমূহের স্বরূপ ও কারণ জানিয়া প্রতিপক্ষভাবনা দ্বারা যোগিগণ তাহাদের পরিহার করিবেন। (৩৪)

প্রতিপক্ষভাবনার অভ্যাসবশতঃ যম নিয়ম-সমূহ ক্রমশঃ আয়ত্তীকৃত হইলে তাহাদের উৎকর্ষ বশতঃ যে সমস্ত সিদ্ধি লাভ হইয়া থাকে, এখন তাহাদেরই বর্ণনা করা যাইবে।

যিনি সর্ব্বদা অহিংসার ভাবনা করেন, তাঁহার নিকটে সর্প নকুলাদিও তাহাদের সহজ বৈরিভাব ত্যাগ করিয়া শান্তভাবে অবস্থান করে। (৩৫)

সত্যপ্রতিষ্ঠা হইলে ক্রিয়াফলের আশ্রয়ত্ব লাভ হয়। বৈদিক যাগযজ্ঞ অনুষ্ঠান করিলে পর স্বর্গাদি ফল লাভ হইয়া থাকে, ইহাই সাধারণ নিয়ম। কিন্তু যে যোগী সত্য অভ্যাস করিয়াছেন, তাঁহার সত্যনিষ্ঠা এমন উৎকর্ষ লাভ করে যে ক্রিয়া না করিয়াও তিনি ফল লাভ করিয়া থাকেন। এমন কি তাঁহার কথায় অপরেও ক্রিয়া না করিয়া ফলভাগী হইয়া থাকে। (৩৬)

অস্তেয় প্রতিষ্ঠা হইলে সর্ব্বরত্নোপস্থান হয় অর্থাৎ যোগীর অভিলাষ না থাকিলেও সকল দিক হইতে তাঁহার নিকট সমৃদ্ধি যাচিয়া আসিয়া উপস্থিত হয়। (৩৭)

ব্রহ্মচর্য্য প্রতিষ্ঠায় বীর্য্যলাভ হয় অর্থাৎ ব্রহ্মচারী শরীর, ইন্দ্রিয় ও মনে নিরতিশয় সামর্থ্যবান হইয়া থাকেন। (৩৮)

অপরিগ্রহ প্রতিষ্ঠায় জন্মকথান্তের জ্ঞান হয়। কেমন ছিল—এইটুকু বুঝা হইল কথন্তা।

জন্মান্তরে আমি কে ছিলাম, কিরূপ ছিলাম, কি কার্য্য করিতাম ইত্যাদি বিষয় জানিতে ইচ্ছা হইলে অপরিগ্রহসিদ্ধ যোগী সহজেই তাহা জানিতে পারেন। অপরিগ্রহের বিপরীত পরিগ্রহস্বরূপ বিতর্ক। পরিগ্রহ বলিতে কেবল ভোগোপকরণেরই পরিগ্রহ বুঝিতে হইবে না। আত্মার শরীর পরিগ্রহকেও পরিগ্রহবিতর্কের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া জানিতে হইবে কেননা শরীরই তো ভোগের সাধন বা উপায়। শরীর থাকিলে রাগ বা অভিমান লাগিয়াই থাকিবে এবং প্রবৃত্তি সর্ব্বদা বহির্ম্মুখে আকর্ষণ করিবে। এমন অবস্থায় তত্ত্বজ্ঞান জন্মিতে পারে না। কিন্তু যোগী যখন শরীর পরিগ্রহবিষয়েও নিরপেক্ষ হইয়া মধ্যস্থ বা উদাসীনভাব অবলম্বন করিবেন, তখন রাগদ্বেষ প্রভৃতি দূর হইয়া যাওয়ায় তাঁহার তত্ত্বজ্ঞান আবির্ভূত হইবে এবং পূর্ব্বাপর জন্ম সম্বন্ধে সম্যক্ জ্ঞান জন্মিবে। (৩৯)

যমসিদ্ধির কথা বলা হইল, তারপর নিয়মসিদ্ধির কথা। শৌচ প্রতিষ্ঠায় শরীরের কারণ ও স্বরূপ পর্য্যালোচনা হেতু নিজের শরীরের প্রতি ঘৃণা জন্মায়— মনে হয়, এ শরীর অশুচি, ইহার প্রতি মানুষের আগ্রহ হয় কেন? ঠিক এই কারণে অপর কোনও দেহধারীর সঙ্গ করিতেও ঘৃণা হয়। নিজ শরীরের বিভিন্ন অবস্থা দেখিয়া তাহার উপর যাঁহার ঘৃণা জন্মিয়া যায়, অপরের শরীরকেও নিজের শরীরের মতই দোষদুষ্ট জানিয়া কি করিয়া তাহার সংসর্গে তাঁহার প্রবৃত্তি হইবে? সুতরাং শৌচপ্রতিষ্ঠ ব্যক্তির সর্ব্বপ্রকার সংসর্গ পরিবর্জ্জন হইয়া থাকে। (৪০)

ইহা ছাড়া শৌচ প্রতিষ্ঠায় প্রকাশসুখাত্মক সত্ত্বগুণের শুদ্ধি হইয়া থাকে অর্থাৎ সত্ত্বগুণ রজস্তমঃস্পর্শ হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত হয়। সৌমনস্য, একাগ্রতা, ইন্দ্রিয়জয় ও আত্মদর্শনের যোগ্যতা—ইহারাও শৌচেরই ফল। চিত্তে কোনও খেদ নাই—চিত্ত সর্ব্বদাই প্রীতিযুক্ত —ইহাই সৌমনস্য। ইন্দ্রিয় নিয়মনপূর্ব্বক কোন বিষয়ে চিত্তকে স্থির করার নাম একাগ্রতা। ইন্দ্রিয়সমূহ বিষয় হইতে পরাঙ্মুখ হইয়া স্বরূপে অবস্থান করে, ইহাই ইন্দ্রিয়জয়ের লক্ষণ। প্রকৃতিপুরুষের বিবেকখ্যাতিই আত্মদর্শন। শৌচ প্রতিষ্ঠায় আত্মদর্শনের যোগ্যতা লাভ হয়। এই সমস্ত অবস্থা পর পর লাভ হইয়া থাকে। যেমন, শৌচ প্রতিষ্ঠা হইলে সত্ত্বশুদ্ধি, সত্ত্বশুদ্ধি হইতে সৌমনস্য, সৌমনস্য হইতে একাগ্রতা, একাগ্রতা হইতে ইন্দ্রিয় জয় ও ইন্দ্রিয়জয় হইতে আত্মদর্শনের যোগ্যতা জন্মিয়া থাকে। (৪১)

সন্তোষের প্রকর্ষ হইতে যোগীর এমন সুখ অনুভব হয়, যাহা বাহ্যবিষয়সুখের শতগুণ হইতেও অধিক। (৪২)

তপঃ প্রতিষ্ঠায় ক্লেশ প্রভৃতি অশুদ্ধি ক্ষয় হইয়া দেহ এবং ইন্দ্রিয়ের উৎকর্ষ হইয়া থাকে। চিত্তের ক্লেশ ক্ষয় হইলে ইন্দ্রিয়-সমূহের সূক্ষ্মদর্শন, ব্যবহিতদর্শন, দূরদর্শন প্রভৃতি সামর্থ্য জন্মিয়া থাকে। শরীরেও অণিমা মহিমা প্রভৃতি সিদ্ধিলাভ হয়। (৪৩)

অভিপ্রেত মন্ত্রাদি জপ দ্বারা স্বাধ্যায়ে প্রতিষ্ঠা লাভ করিলে ইষ্টদেবতার সাক্ষাৎকার মিলে। (৪৪)

ঈশ্বর প্রণিধান দ্বারা সমাধিলাভ হইয়া থাকে। ঈশ্বরের প্রতি সমর্পিত ভক্তিবিশেষ দ্বারা ঈশ্বর পরিতুষ্ট হইয়া ক্লেশরূপ যোগবিঘ্ন সমূহ দূর করিয়া যোগীর সমাধি উদ্বোধিত করিয়া দেন। (৪৫)

তারপর তৃতীয় যোগাঙ্গ আসনের কথা। পদ্মাসন, দণ্ডাসন, স্বস্তিকাসন প্রভৃতি

নানাপ্রকার আসন আছে। আসন যখন স্থির, অর্থাৎ নিষ্কম্প এবং অনুদ্বেগকর হয়, তখনই তাহা যোগাঙ্গরূপে গণ্য হইয়া থাকে। (৪৬)

প্রযত্ন শৈথিল্য ও অনন্ত-সমাপত্তি দ্বারা আসন স্থির ও সুখকর হইয়া থাকে। আসন করিবার সময় প্রযত্ন শিথিল করিতে পারিলে অর্থাৎ আসনের ব্যাঘাত না করিয়া শরীর ছাড়িয়া দিতে পারিলে আসন সিদ্ধি হয়। অনন্ত আকাশ প্রভৃতিতে চিত্ত সমাপন্ন করিয়া অনন্তে তাদাত্ম্যবোধ জন্মাইতে পারিলে দেহাভিমান নষ্ট হইয়া যাওয়ায় আসন আর দুঃখকর বলিয়া মনে হয় না। আসন সিদ্ধ হইলে অঙ্গমেজয়ত্ব প্রভৃতি সমাধির অন্তরায় দূর হইয়া যায়। (৪৭)

আসন জয় হইলে শীতোষ্ণ ক্ষুধাতৃষ্ণা, প্রভৃতি দ্বন্দ্বদ্বারা যোগী আর অভিভূত হন না। (৪৮)

আসন জয় হইলে প্রাণায়ামরূপ যোগাঙ্গ অনুষ্ঠান করিতে হয়। শ্বাস প্রশ্বাসের গতিবিচ্ছেদই প্রাণায়াম। রেচন আক্ষেপণ ও পূরণ দ্বারা তিন প্রকার গতিবিচ্ছেদ হইতে পারে এবং তাহার ফলে ভিতরে ও বাহিরে শ্বাসপ্রশ্বাসের প্রবাহ রুদ্ধ হইয়া থাকে।

বাহ্যবৃত্তি শ্বাসই রেচক; অন্তর্বৃত্তি প্রশ্বাস পূরক; কুম্ভক স্তম্ভবৃত্তি। কুম্ভে অবস্থিত জলের ন্যায় প্রাণ তখন নিশ্চল হইয়া থাকে বলিয়া তাহার নাম কুম্ভক। এই তিন প্রকার প্রাণায়াম দেশ, কাল ও সংখ্যা দ্বারা উপলক্ষিত হইয়া দীর্ঘ ও সূক্ষ্ম হইয়া থাকে। দেশদ্বারা উপলক্ষিত প্রাণায়াম, যথা—নাসা হইতে দ্বাদশাঙ্গুলি পর্য্যন্ত যাহার গতি। কাল দ্বারা উপলক্ষিত—যেমন ৩৬ মাত্রা পরিমাণ। সংখ্যাদ্বারা উপলক্ষণ যেমন এতবার প্রাণায়াম অনুষ্ঠান করা হইল। কিম্বা এতবার শ্বাস-প্রশ্বাসের পর প্রথম উদ্ঘাত হইল জানা গেল ইত্যাদি। নাভিমূল হইতে প্রেরিত বায়ু যে মস্তকে অভিহত হয়, তাহাকেই বলে উদ্ঘাত। (৫০)

এই তিনটী ছাড়া চতুর্থ আর একটী প্রাণায়াম আছে—তাহা বাহ্য ও আভ্যন্তর বিষয়ের পর্য্যালোচনা সহকারে অনুষ্ঠিত হয়। পূর্ব্বোল্লিখিত দেশ ইত্যাদি প্রাণায়ামের বাহ্য বিষয়। চক্র প্রভৃতি আভ্যন্তর বিষয়। এই দুইটী বিষয়ের পর্য্যালোচনা দ্বারা প্রাণকে স্তম্ভিত করিয়া যে গতিবিচ্ছেদ ঘটান হয়, তাহাই পূর্ব্ববাহ্যবিক্ত চতুর্থ প্রাণায়াম। কুম্ভক প্রাণায়ামে বাহ্যাভ্যন্তর কোনও বিষয়ের পর্য্যালোচনা না করিয়া সহসা তপ্ত পাষাণে নিক্ষিপ্ত জলবিন্দুর মত যুগপৎ প্রাণকে স্তম্ভিত করা হয়। কিন্তু এই প্রাণায়ামে বাহ্য ও আভ্যন্তর বিষয়ের পর্য্যালোচনার অপেক্ষা থাকে। তবে ইহাও পূর্ব্ববৎ দেশ, কাল ও সংখ্যা দ্বারা উপলক্ষিত। (৫১)

প্রাণায়ামের ফলে চিত্তসত্ত্বগত প্রকাশের ক্লেশরূপ আবরণ ক্ষয় হইয়া যায় এবং তাহাতে মনের দোষসমূহ ক্ষীণ হইয়া গেলে, যেখানে মনকে ধারণা করা যায়, সেখানেই তাহা স্থির হইয়া থাকে, আর বিক্ষিপ্ত হয় না। (৫২, ৫৩)

যে যোগাঙ্গ ইন্দ্রিয়সমূহকে স্ব স্ব বিষয় হইতে প্রতিকূল দিকে আকর্ষণ করিয়া আহরণ করে, তাহাকে বলে প্রত্যাহার। রূপ প্রভৃতি চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের বিষয়। সাধারণতঃ ইন্দ্রিয়সমূহ বিষয়াভিমুখী হইয়া থাকে। বিষয়বিমুখ হইয়া স্বরূপে অবস্থান করিলে তাহারা কেবলমাত্র চিত্তস্বরূপেরই অনুকারী

হইয়া থাকে। মধুমক্ষিকারা যেমন সর্ব্বদা তাহাদের রাজার অনুবর্ত্তী হইয়া থাকে, তেমনি ইন্দ্রিয়সমূহও চিত্তের অনুবর্ত্তন করে বলিয়া চিত্ত নিরুদ্ধ হইলে ইন্দ্রিয়ও প্রত্যাহৃত হয়। ইন্দ্রিয়সমূহের এই চিত্তস্বরূপের অনুকরণই প্রত্যাহার। (৫৪)

প্রত্যাহার অভ্যাসের ফলে ইন্দ্রিয়সমূহ এমন বশীভূত হয় যে বাহ্যবিষয়ের প্রতি তাহাদিগকে আকর্ষণ করিলেও আর তাহারা সেদিকে যাইতে চাহে না। (৫৫)

বস্তু-সংক্ষেপ

যোগের লক্ষণ কি, তাহা প্রথম পাদেই উক্ত হইয়াছিল। ক্রিয়াযোগ তাহারই অঙ্গীভূত—ক্লেশসমূহ ক্ষীণ করাই তাহার উদ্দেশ্য। ক্রিয়াযোগের কথা বলিয়া সূত্রকার ক্লেশের নাম, স্বরূপ কারণ, ক্ষেত্র ও ফলের কথা বলিলেন। তারপর কর্ম্মের ভেদ, স্বরূপ ও ফল এবং বিপাকের স্বরূপ ও কারণ বলা হইল।

ক্লেশ প্রভৃতি ত্যাজ্য বটে, কিন্তু জ্ঞানব্যতীত ত্যাগ সম্ভবপর নহে। জ্ঞান শাস্ত্রলভ্য। জ্ঞানশাস্ত্র চতুর্ব্যূহে বিভক্ত হইয়া হেয়, হেয়ের কারণ, উপাদেয় ও উপাদেয়ের কারণ এই চারিটী তত্ত্ব নিরূপণ করিতেছে। হান ব্যতিরেকে হেয়ের স্বরূপ নিরূপিত হয় না। সুতরাং কারণ সহিত উক্ত চতুর্ব্যূহ নিরূপণ কালে হানের স্বরূপও নিরূপণ করা হইয়াছে। বিবেকখ্যাতিই হইল উপাদেয়ের কারণ। বিবেকখ্যাতির কারণ আবার যোগাঙ্গ। যোগাঙ্গ অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ ভেদে দুই প্রকার। ইহাদের স্বরূপ ও ফল ব্যাখ্যা করিয়া সূত্রকার আসন হইতে ধারণা পর্য্যন্ত যোগাঙ্গসমূহ যে পরস্পরের সহিত অঙ্গাঙ্গিভাবে নিবদ্ধ, তাহা তাহাদের লক্ষণ নির্দ্দেশ পূর্ব্বক প্রতিপন্ন করিলেন।

এই রূপে যোগের বীজ আসন-প্রাণায়ামে অঙ্কুরিত হইয়া প্রত্যাহারে কুসুমিত হইল। ধারণা ও সমাধিতে তাহা ফলবন্ত হইবে।

ইতি যোগশাস্ত্র বৃত্তিতে
সাধনপাদ।

বিরাগী

—*—

মরমের মাঝে যত আকুলিত ক্রন্দন,
উথলিয়া ওঠে তার—ছিঁড়ি সব বন্ধন
দেওয়ানার মত ছোটে এলায়িত অন্তর—
পশেছে কানেতে কার মোহমাখা মন্তর!

বরিষার বারিধারা—ঘনঘোরগর্জ্জন—
আঁধারের বিভীষিকা—মরণের তর্জ্জন—
মানে নাই—শোনে নাই অলসের জল্পন—
গৃহকোণ-মুখরিত মিছে যত কল্পন!
বাঁধে নাই তারে কভু সোহাগের গুঞ্জন—
প্রিয়ামুখমদিরার নিরিবিলি ভুঞ্জন।
তারে আজি ভুলাবে কে ভোগসুখসজ্জায়,
ফুলধনু মরে যার বিভূতির লজ্জায়?
মহাকাল ডমরুতে ধ্বনে তার বন্দন—
প্রলয়ের বুকে ফোটে বিরাগীর নন্দন!

—*—

যমেবৈষ বৃণুতে

—*—

নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো
ন মেধয়া বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য-
স্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বাম্॥

—অনেক বেদপাঠ করিয়াও এই আত্মাকে পাওয়া যায় না—মেধা দ্বারাও নয়, অনেক শুনিয়াও নয়। এই আত্মা যাহাকে বরণ করেন, সেই ইঁহাকে পায়—তাহার কাছেই এই আত্মা আপনার তনু প্রকাশিত করিয়া থাকেন।

কথাটার যথাশ্রুত অর্থগ্রহণ করিলে এই দাঁড়ায়, নিজের চেষ্টা দ্বারা কেহ আত্মাকে লাভ করিতে পারে না—পরন্তু তিনি যদি করুণা করিয়া কাহারও কাছে তাঁহার স্বরূপ উদ্ঘাটিত করেন, তবেই তাঁহার দেখা মিলে। ঈশ্বরে যে অত্যন্ত নির্ভরশীল, সে এই কথাতেই সান্ত্বনা পায় বটে, কিন্তু সংসারীর পাকা-বুদ্ধি এর মাঝেও একটা ছল খুঁজিয়া ফিরে। আমার চেষ্টায় যদি তাঁহাকে না-ই পাইলাম, তবে আর আমার চেষ্টার প্রয়োজন কি?—খুশী হইলেই তো তিনি আসিয়া দেখা দিবেন। —এই বলিয়া ভগবান্ সম্বন্ধে হাত পা গুটাইয়া বসিয়া থাকিতেও কেহ উপদেশ দেয়।

কিন্তু এ হইল উপর চালাকীর কথা। তর্ক এক জিনিষ, অনুভব আর এক জিনিষ। সদ্যঃ পুত্রশোককাতরা জননীর নিকট বিজ্ঞের সকল তর্ক, সকল সান্ত্বনা ভাসিয়া যায়—তর্কের ধারা নির্দোষ হইলেও পুত্রশোক তাহাতে চাপা পড়ে না। কিন্তু এমন ধারা শোক যে পাইয়াছে, এই গভীর ব্যথার দরদী যে, তাহার বুকে বুক রাখিয়া তবে এই দুঃখের একটা সান্ত্বনা মিলে—সেখানে যুক্তি তর্কেরও প্রয়োজন হয় না। ভগবান সম্বন্ধে, সাধনা সম্বন্ধেও ঠিক এই কথা। নিজের বুকে ব্যথা না বাজিলে কি করিয়া বুঝিবে, কিসে তোমার প্রয়োজন, কিসেই বা নয়।

খুঁটীতে বাঁধা গরুর মতন সংসারে একটু নড়িয়া চড়িয়া বেড়াইতে পারি, আমার খুসী মত দু'চারিটা কাজও হাঁসিল করিয়া ফেলিয়াছি—এই অহঙ্কারে আমাদের আর কাণ্ডজ্ঞান থাকে না। মনে হয়, চেষ্টা করা না করা, চেষ্টার ফল ধরানো না ধরানো—এ বুঝি আমারই এক্তেয়ারের সামিল। আমি কি, আমার চেষ্টাই বা কি, তাহা জানি না; ভগবান কি, তাঁহার স্বেচ্ছায় বরণ করিয়া লওয়ার রহস্যটাও বা কি, তাহাও জানি না। অথচ কিছু না জানিয়াও তো তর্ক করিতে বাধে না।

আমাদের চেষ্টায় যে কোনও সার্থকতাই নাই, এমন কথা বলিতেছি না। একটু স্বাতন্ত্র্য, একটু সার্থকতা তার মাঝে আছেই। কিন্তু সে যে কত তুচ্ছ, আর তার বাইরের অদৃষ্ট শক্তিটা যে কতটা বড়, তাহা কোনও দিনই হিসাব করিয়া দেখি নাই। অদৃষ্ট আর দৃষ্টকে তো কোনও দিন একত্র মিলাইয়া দেখিবার সুযোগ ঘটে না—তাই দুয়ে যে কত বড় তারতম্য, তা আর চোখে পড়ে না। শুধু দেশের ব্যাপকতা দিয়াই একটা হিসাব খতাইয়া দেখি না কেন। অগণিত নক্ষত্রখচিত আকাশের নীচে দাঁড়াইয়া জ্যোতির্ব্বিদের কাছে শুনি, ওই এক এক বিন্দু নক্ষত্র এক একটা ব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্র।

এমনি অনন্তকোটী ব্রহ্মাণ্ডেও অনন্ত আকাশ পরিব্যাপ্ত দেশের সীমা মিলে না—অথচ সেটা জড়ের রাজ্যমাত্র।

আবার এই অনন্তকোটী ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে ক্ষুদ্রতম একটী ব্রহ্মাণ্ডের একটী ক্ষুদ্রায়তন গ্রহ এই পৃথিবী—তাহারই আয়তনের কোটী কোটী ভাগের এক ভাগে আমার এই সার্দ্ধ ত্রিহস্তপরিমিত মানুষ দেহ। যে বিপুল শক্তিতে ওই আকাশভরা অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড নিয়ন্ত্রিত হইতেছে, সেই শক্তিরই একাংশ আমার এই দেহের পিঞ্জরে আটক পড়িয়াছে। কিন্তু সে অংশ কতটুকু! অনন্ত কোটী ব্রহ্মাণ্ড পরিচালনার যে শক্তি আর আমার এই দেহ পরিচালনার যে শক্তি—এই দুয়ের মাঝে যে পার্থক্য, কোন গণিতজ্ঞ তাহা অঙ্ক কষিয়া বাহির করিয়া দিতে পারেন কি? অথচ দেহের সেই শক্তিরও সবটুকু আমার আয়ত্ত নয়। একটু আধটু হাত পা নাড়িতে পারি বটে, কিন্তু একটা রোগের বীজাণুকে শরীর হইতে তাড়াইয়া দিবার সামর্থ্যটুকুও রাখি না। কাজেই আমার হাতে যে শক্তিটুকু ভগবান খরচ করিতে দিয়াছেন, তাহার পরিমাণ কতটুকু, তাহা ভাবিলে মানুষের সকল অহঙ্কার চূর্ণ হইয়া যায় না কি? অথচ আমরা যে দিক লইয়া এতক্ষণ তুলনায় আলোচনা করিলাম, তাহাও মাত্র জড়রাজ্যের দেশের দিক। তুলনায় আরও ঠাঁই তো আছে।

অনন্ত বিস্তারের মাঝে একটী বিন্দুর বিন্দু—এই না হইল মানুষ! তার চেষ্টার সাধ্য কি যে চতুষ্পার্শ্বের এই অনন্ত শক্তির লীলাকে স্তম্ভিত করিয়া দিয়া একটা কিছু মনমত গড়িয়া তুলিবে? তাই শক্তির বড়াই, কর্তৃত্বের বড়াই মানুষের মাঝে খাটে না। মহাকালের স্রোত উন্মত্ত গর্জ্জনে অনন্তের পথে চলিয়াছে—কার সাধ্য যে তাহার উজান বহিয়া চলে। তবুও তার গতিতে একটা লীলাভঙ্গী আছে—সে এই কালস্রোতেরই স্পন্দন। যতটুকু আধার, ততটুকু স্পন্দন সে ধরিয়া রাখিতে পারে বটে—কিন্তু এই ধরিয়া রাখার মাঝে তাহার বাহাদুরী তো কিছুই নাই। সে নিমিত্ত—সে ক্রীড়নক—আর কিছু নয়।

এক দিকে মানুষ এত তুচ্ছ, আবার আর এক দিকে মানুষের মর্য্যাদার সীমা নাই। সে তার অনুভূতির দিক। লীলাময় আর সব দিক দিয়া মানুষকে খর্ব্ব করিয়াছেন, কিন্তু তার অনুভবের শক্তিকে করিয়াছেন অসীম, অনন্ত। মহাসিন্ধু আর বিন্দুর মাঝে শক্তির দিক দিয়া যে পার্থক্য, অনুভূতির মাঝে কিন্তু তাহার সমন্বয় হইয়াছে। মানুষও ব্রহ্মস্ফুলিঙ্গ—তারও ব্যাপ্তির একটা পথ আছে। কিন্তু সে পথের খোঁজ কেউ তো নেয় না। যে শক্তি বহিঃপ্রকৃতির মাঝে স্পন্দিত হইয়া উঠে, মানুষ তাহারই সেবা করে—সেবা করিয়া লাঞ্ছিত হয়, তবুও মোহ কাটাইতে পারে না। কিন্তু অন্তরমূলে যে শক্তি দিব্যানুভূতির দিকে মানুষকে টানিতেছে—তাহার আকর্ষণে তো সাড়া দেয় না কেউ।

শুনিয়াছি, অগণিত কোষের সমষ্টিতে আমাদের এই দেহ গঠিত। ইহারা অণু প্রমাণ, তবুও ইহাদের একটা স্বতন্ত্র সত্তা আছে। কিন্তু সে স্বাতন্ত্র্য পরস্পরের অপেক্ষিত মাত্র—সমগ্রটা জড়াইয়া আমার যে 'আমি'র উদ্ভব হইয়াছে, অণুকোষের আমিত্ব তাহার মাঝে এমন নিঃশেষে মিশিয়া গিয়াছে যে আমা হইতে তাহার স্বাতন্ত্র্যের চিহ্নমাত্রও নাই। অণুর সঙ্গে মহতের সম্পর্ক এমনি

নিবিড়। এখানকার উপমাটা জড় জগতের—আমার আমিত্ব এখানে অপরিস্ফুট! সেই মহান্ত পুরুষের দিব্যদেহের এক একটী অণু পরমাণু যে তুমি-আমি—ভাবিয়া দেখ, তাঁর সঙ্গে তোমার সম্বন্ধ কত নিবিড়—এত নিবিড় যে, বৈদান্তিকের অনুভূতি আত্মহারা হইয়া বলিতেছে—তত্ত্বমসি, সোঽহং!

এই মাঝে স্পর্দ্ধা নাই কোথায়ও। শিবের সঙ্গে যে জীবের সাম্য, বহির্ব্যাপ্ত শক্তির তারতম্য তুলনা করিয়া তো কেহ তাহার বিচার করিতেছে না। কথাটা হইতেছে অন্তরের অনুভূতির বিষয়। তাঁর সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক এত মধুর, এত নিবিড় যে, মাঝে আর কিছু ফাঁক রাখা চলে না—আত্মহারা অনুভূতিতে আমি আর তিনি, তিনি আর আমি—সব একাকার হইয়া যায়।

অথচ তিনি আর আমির মাঝে ব্যবধানটা যে কত বড়, তাও একবার স্মরণ কর। অনুভূতির সঙ্গে এই সূক্ষ্ম স্মৃতিটী থাকিলেই বুঝি সে একাকারের অনুভূতি কি তীব্র, কি প্রচণ্ড-তার পীড়নে যে মায়াময় এই বাহ্যজগৎ চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া যাইবে, তাহার আর আশ্চর্য্য কি? এত দূর তিনি, অথচ এত নিকটে—এই স্মৃতিতেই প্রেমাসিন্ধু উথলিয়া উঠিল, প্রেমিক বলিয়া উঠিল—"আদি অন্ত কোথারে তাহার, কোথা তার কূল!" জ্ঞানীর মাঝে এই স্মৃতির পীড়নে সমস্ত অভিমানের সঙ্কীর্ণতা চূর্ণ হইয়া বিশ্বব্যাপী আমিত্বের জ্যোতিঃ ছড়াইয়া পড়িল—তখন কোথায় কোন কোনে যে দেহরূপ একটা মাটীর খাচা পড়িয়া রহিল, তাহার খোঁজ কি কেহ রাখে যে তাহাকে লইয়া স্পর্দ্ধা করা চলিবে?

বাহিরের সঙ্গে তুলনা করিয়া দেখ—আমি কত ছোট; আবার ভিতরে ঢুকিয়া বুঝিয়া দেখ—আমি কত বড়। এ দুটাই সত্য। কেউ তার একটাকে মানে, আর একটাকে মানে না—তাই শাস্ত্র-সমন্বয় করিতে লাঠি চালাইতে হয়। কিন্তু অনুভবের মাঝে দুয়েরই তো সামঞ্জস্য হইয়া রহিয়াছে। বাহিরে আমি অল্প, অন্তরে আমি ভূমা—ভূমৈব সুখম্, নাল্পে সুখমস্তি। সুতরাং অল্পকে ত্যাগ করিতে হইবে। এই ত্যাগই হইল সাধনার সূত্রপাত। কেবল ছাড়িয়া চল বা বিলাইয়া দাও—একই কথা। দিতে দিতে পরখ কর—সমস্ত বাহিরের অবলম্বন ছাড়িয়াও একটা স্থিতি মিলে কিনা। এই চেষ্টাতেই সাধন-সম্পদ আয়ত্ত হইবে—তখনই শাস্ত্রসমন্বয়ী বুদ্ধির আবির্ভাব হইবে, কুতর্কের ইচ্ছা থাকিবে না।

উপনিষদ্ যে বলিতেছেন, প্রবচন, মেধা, শ্রুতি দ্বারা তাঁহাকে পাওয়া যায় না—এ কথাও যেমন সত্য, তেমনি প্রবচন, মেধা ও শ্রুতিরও যে প্রয়োজন আছে একসময়ে—এ কথাও সত্য। তেমনি আমরা চাহিলে তবে তাঁহাকে পাইব, এ কথাও সত্য, আবার তিনি খুসী হইলে দেখা দিবেন—এ কথাও সত্য। দুইটাই সত্য হয় কি করিয়া? সেই কথাই এতক্ষণ বলিতেছিলাম। তাঁর স্বরূপ আর আমার স্বরূপ—আর এই দুয়ের সম্পর্ক সম্বন্ধে যার একটু সত্য সংস্কার আছে, সে-ই এ কথা বুঝিতে পারে।

একটা রবারের থলের মাঝে ফুঁ দিয়া খানিকটা বাতাস ঢুকাইয়া দিলে থলেটা ফাঁপিয়া উঠিবে। বাইরে তার বাতাসের সমুদ্র—ভিতরে কিন্তু এতটুকু মাত্র বাতাস। বাইরে ভিতরের সম্পর্কটা কি এখানে? ভিতরের বাতাস সর্ব্বদা ঠেলিয়া বাহির হইতে চাহিতেছে তাই থলেটা অমন ফাঁপিয়া উঠিয়াছে—

তাহাকে মাটীতে ছুঁড়িয়া ফেলিলে সেই আঘাতে সে লাফাইয়া উঠিবে। কিন্তু কোনও রকমে থলেটীতে একটা ছিদ্র করিয়া দিলে, ভিতরের বাতাস ঠেলিয়া বাহির হইয়া পড়িবে—থলেটাও চুপ্সিয়া নিশ্চেষ্ট হইয়া যাইবে।

আমাদের মাঝেও এমনি একটা বাহির হইয়া পড়ার প্রেরণা রহিয়াছে—এখন একটু ছিদ্রপথ পাইলেই হয়। বাহির হইয়া পড়িবার চেষ্টাটা কৃত্রিম নয়—উহা স্বাভাবিক প্রেরণা—বাহিরে ভিতরে একই বস্তুর যোগাযোগ আছে বলিয়া ভিতরটা যেমন বিকর্ষণধর্ম্মী, বাহিরটাও তেমনি আকর্ষণধর্ম্মী। এ তো একই শক্তির দুইটা পিঠ। বিকর্ষণকে বল সাধনশক্তি আর আকর্ষণকে বল করুণা—তাতে আপত্তি তো কিছুই নাই। একা-ত্মানুভূতিতে দুয়েরই সমন্বয়।

এই অনুভূতির ভূমি হইতেই উপনিষদ্ বলিতেছেন, তিনি যাকে চান, সেই তাঁকে পায়। তিনি চাহিলেই যে তবে তাঁকে মিলে—এ-ও গভীর অনুভূতির কথা—সাধনশক্তির উপর নির্ভর করিয়া কিছু দূর পর্য্যন্ত চলার পরের কথা। হাত পা গুটাইয়া বসিয়া থাকিয়া ও কথা আওড়াইলে নিজেই ঠকিবে মাত্র। শ্রুতি প্রবচন মেধার অভিমান যতক্ষণ আছে, ততক্ষণ তাহাদের সাহায্যেই অগ্রসর হইয়া যাও—প্রয়োজন মিটিয়া গেলে তাহারা আপনা হইতেই সরিয়া যাইবে—অন্তরে বাহিরে যোগাযোগ হইলে তখন বুঝিবে—শ্রুতি, প্রবচন, মেধা দিয়া তাঁহাকে পাওয়া যায় না—তিনি যাকে চান, সেই তাঁকে পায়।

নামদেব

মধ্যযুগে দাক্ষিণাত্যের পন্ধরপুরের খ্যাতি ছিল কম নয়। এই খ্যাতির মূলে ছিলেন পন্ধরপুরের ঠাকুরটী—ভক্তের কাছে তিনি নাম পাইয়াছিলেন "বিট্ঠল।" পণ্ডিতেরা বলেন, বিষ্ণুর অপভ্রংশ বিট্ঠু শব্দের সহিত আদরার্থক 'লা' প্রত্যয়টা জুড়িয়া দিয়া এই নামকরণ হইয়াছে। সে যাহাই হউক, এই ঠাকুরটীর আকর্ষণে একদিন মহারাষ্ট্রের বুকের উপর দিয়া যে ভক্তির জোয়ার বহিয়া গিয়াছিল, আমরা তাহারই একটী কাহিনী আজ বলিব।

চতুর্দ্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগে পন্ধরপুরে বিট্ঠলের চরণাশ্রয়ে এক ভক্তদম্পতী বাস করিতেন—তাঁহাদের মধ্যে স্বামীর নাম দাম শেঠ, স্ত্রীর নাম গোণা বাই। দরজীর ব্যবসায় ছিল তাঁহাদের উপজীবিকা। আমরা যাঁহার কথা বলিব, মহারাষ্ট্রের সুধানির্ঝর সেই নামদেব ইঁহাদের ঘরেই আসিয়াছিলেন। কেহ কেহ বলেন, নামদেব এই দম্পতীর ঔরস সন্তান নন—চন্দ্রভাগার স্রোতে এই ভক্তির নির্ম্মাল্যটী ভাসিয়া যাইতেছিল, বিট্ঠলের করুণায়, দাম শেঠ তাহাকে ঘরে আনিয়া পুত্র-নির্ব্বিশেষে পালন করিয়াছিলেন।

ফুল ফুটলে তাহার সৌরভ লুকাইয়া থাকে না। শেঠের আঙিনায় যে অপরূপ ফুলটী

ফুটিয়াছে, তাহার সৌরভে পন্ধরপুর আমোদিত হইয়া উঠিল। শিশুর অলৌকিক কীর্ত্তিকলাপে গ্রামবাসী বিট্‌ঠলের অপার করুণা স্মরণ করিয়া বিস্মিত পুলকিত হইল। একদিনের একটা কাহিনী বলিতেছি।

শেঠ দম্পতী দরিদ্র হইলেও বিট্‌ঠলের প্রতি তাঁহাদের ভালবাসা অগাধ—প্রতিদিনই তাঁহার সেবার জন্য দাম শেঠ নিজহাতে ক্ষুদ-কুঁড়া যা হোক একটু কিছু নিয়া বিগ্রহকে নিবেদন করিয়া আসেন। একদিন কোনও কাজে তাঁহাকে গ্রামান্তরে যাইতে হইল। বিট্‌ঠলকে আজ ভোগ নিবেদন করিয়া দিবে কে? ভাবিয়া-চিন্তিয়া শিশু নামদেবের উপর তিনি সে ভার দিয়া গেলেন। নামদেবের বড় আনন্দ—বিট্‌ঠলকে আজ তিনি নিজ হাতে খাওয়াইবেন। ভোগ লইয়া যখন মন্দিরে উপস্থিত হইয়াছেন, তখন মন্দির নির্জ্জন। নামদেব ভাবিলেন, ভালই হইল।

মন্দিরদ্বার রুদ্ধ করিয়া বিগ্রহের সম্মুখে ভোগের থালাটা রাখিয়া শিশু আবদারের সুরে বলিল, "ঠাকুর, তোমার জন্য খাবার আনিয়াছি—খাও।" শিশুর বিশ্বাস, ঠাকুর এখনই হাত বাড়াইয়া খাবার তুলিয়া লইবেন; কিন্তু কই পাষাণ তো টলিল না। তবে কি ভোগের আয়োজনে কোনও ত্রুটী হইয়াছে? শিশু ব্যাকুল হইয়া বলিতে লাগিল, "ঠাকুর, খাও না কেন? রোজ তো বাবা তোমার প্রসাদ লইয়া যান, তাঁহার সামনে খাইতে পার, আর আমার সামনে পার না? আমি ছেলেমানুষ—না জানিয়া যদি কোনও অপরাধ করিয়া থাকি, আজকার মত আমায় মাপ কর। লক্ষ্মীটি, একবার একটু তুলিয়া মুখে দাও, আমি দেখি।"

কিন্তু হায়, কিছুতেই কিছু হইল না—পাষাণের মন গলিল না। শিশু অস্থির হইয়া উঠিল; কত অনুনয়-বিনয়, কত কাকুতি-মিনতি, কত চোখের জল—কিন্তু তবুও ঠাকুর খায় না কেন? মন্দিরের কোণে একখানা কাটারী পড়িয়াছিল; নিরুপায় দেখিয়া অবশেষে শিশু পাগলের মত সেই খানা তুলিয়া লইয়া বলিল, "ঠাকুর, না খাও যদি, তবে আজ এই তোমার সামনে গলায় ছুরী দিব।" এই বলিয়া ছুরী উঠাইতেই পাষাণ-বিগ্রহের মুখে স্নিগ্ধজ্যোতিঃ ফুটিয়া উঠিল, হাস্যচ্ছটায় গৃহ আলোকিত হইয়া গেল—পাষাণের ঠাকুর হাসিতে হাসিতে থালা হইতে খাবার তুলিয়া মুখে দিলেন।

নামদেবের আনন্দ আর ধরে না। প্রসাদী থালা লইয়া তিনি ঘরে ফিরিলেন। পিতা তখন ফিরিয়া আসিয়াছেন। নামদেব তাঁহাকে সকল কথা বলিলেন। দাম শেঠ পুত্রকে চিনিতেন, তাহার কথায় অবিশ্বাসের কোনও কারণই দেখিতে পাইলেন না। পুত্রের কীর্ত্তিতে, ততোধিক আপনাদের সৌভাগ্যে দম্পতীর চোখে আনন্দাশ্রু বহিতে লাগিল। গ্রামময় বিট্‌ঠলের সেই শ্রীমুখের প্রসাদ বিতরিত হইল—ভক্তসমাজ আনন্দে অধীর হইয়া পড়িলেন।

ক্রমে নামদেবের যৌবনকাল উপস্থিত হইল। পিতামাতা দেখিয়া শুনিয়া একটী সুশীলা কন্যার সহিত তাঁহার বিবাহ দিলেন। এই বিবাহে নামদেবের একটী পুত্র ও একটী কন্যা জন্মগ্রহণ করে। কিন্তু পুত্রকন্যার জনক হইয়াও নামদেব সংসারী হইতে পারিলেন না। ভজনে-সঙ্কীর্ত্তনে তাঁহার সমস্ত দিন কাটিয়া যাইত—সংসারের দিকে বড় একটা নজর দিতেন না। এদিকে পিতামাতা ক্রমশঃ বৃদ্ধ

হইয়া পড়িয়াছেন, আর তেমন খাটিতে পারেন না। পুত্রকে এ সম্বন্ধে অনুযোগ করিলে তিনি অবনতমস্তকে সকল কথা শোনেন—কিন্তু কি করিবেন, সংসারের কাজে ঘরের বাহির হওয়াই যে তাঁহার পক্ষে এক বিষম দায়। কে তাঁহাকে এমন করিয়া ঘরের মমতায় বাঁধিয়া রাখিয়াছে? তিনি তো ঘর ছাড়িয়া বাহির হইতে চান—কিসে দুটা কড়ি আসে, পিতামাতার কষ্টের লাঘব হয়, তাহার উপায় করিতে চান। কিন্তু ঘরের বাহির হইলেই কে যেন অলক্ষিতে তাঁহাকে বিট্‌ঠলের মন্দিরের দিকে আকর্ষণ করিয়া লইয়া যায়। কাজ করিতে বাহির হইয়া সারাদিন বিট্‌ঠলকে ভজন শুনাইয়া রিক্তহস্তে সন্ধ্যায় তিনি ঘরে ফিরিয়া আসেন।

ক্রমে সংসার আর চলে না। বৃদ্ধা গোণা বাই একদিন আর সহ্য করিতে পারিলেন না। পুত্রের এই নিদারুণ ঔদাসীন্য—এর জন্য কাহার কাছে তিনি অভিযোগ করিবেন? বিট্‌ঠলই নামদেবকে তাঁহার ঘরে পাঠাইয়াছিলেন, আজ আবার সেই বিট্‌ঠলই ছেলেকে ভুলাইয়া নিয়াছেন। যত অভিমান-অভিযোগ—সব তাঁর বিট্‌ঠলের পায়েই। তাই এক দিন বৃদ্ধা মন্দিরে গিয়া বিট্‌ঠলের সম্মুখে দাঁড়াইয়া অভিমানক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলিতে লাগিলেন, "এ কি তোমার বিচার ঠাকুর! বৃদ্ধ বয়সে আমার একমাত্র সম্বল ওই ছেলেটা, তাহাকে ভাঙ্গাইয়া আনিয়া তোমার কি সুখ? তুমি তো পাষাণবেদীতে পাষাণ হইয়া বসিয়া আছ—মায়ের প্রাণ যে কি দিয়া গড়া, সে তুমি কি বুঝিবে ঠাকুর!"

শোনা যায়, বৃদ্ধার এই অভিযোগে বিট্‌ঠল স্বয়ং নামদেবের বাড়ীতে লুকাইয়া কিছু টাকাকড়ি রাখিয়া আসেন, কিন্তু তাহাতেও সংসারের দুঃখ ঘুচিল না। গোণাবাই ঘরে ফিরিবার পূর্ব্বেই নামদেব সে টাকার সন্ধান পাইয়া গরীবদুঃখীকে তাহা বিলাইয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া আছেন!

নামদেবের আর কোনও ভাবনা চিন্তা নাই—বিট্‌ঠলই এখন তাঁর সর্ব্বস্ব। তুলসীর মালা গলায়, করতাল বাজাইয়া বিট্‌ঠলের অঙ্গনে তিনি মধুর কণ্ঠে ভজন গান করেন—ভাবের আবেশে নৃত্য করেন। পর্ব্ব উপলক্ষ্যে নানা স্থান হইতে ভক্ত সমাগম হইলে নামদেবের আনন্দ যেন কূল ছাপাইয়া উঠে—আহার নিদ্রা ভুলিয়া তিনি ভক্তসঙ্গে নামতরঙ্গে ভাসিতে থাকেন।

এই সময় হইতে নামদেব কিছু কিছু গান রচনা করিতে আরম্ভ করেন। গ্রামের অনুরাগী ভক্তগণ মিলিত হইয়া একটী সঙ্ঘ গড়িয়া উঠে, তাহাতে ভগবদ্ভজনের যথেষ্ট অবকাশ ঘটিত। একদিন এই সঙ্ঘে, একজন প্রবীণ সাধক নামদেবের মস্তকে হস্তার্পণ করিয়া বলিলেন, "বাছা, ভগবানে তোমার ভক্তি আছে সত্য, কিন্তু এখনও তুমি কাঁচা আছ—গুরু খোঁজ, গুরু খোঁজ।" নামদেবেরও চমক ভাঙ্গিল; সদ্‌গুরুলাভের জন্য মন ব্যাকুল হইয়া উঠিল। কিন্তু বেশীদিন তাঁহাকে ছুটাছুটী করিতে হইল না—মল্লিকার্জ্জুনের সন্ন্যাসী বিষোবা কেশরকে তিনি গুরুরূপে পাইয়া কৃতার্থ হইলেন।

গুরুর কথা নামদেব তাঁহার অনেক গানেই বলিয়া গিয়াছেন। বিষোবা কেশর বৈদান্তিক সন্ন্যাসী ছিলেন—মল্লিকার্জ্জুনের শিবমন্দিরে তাঁহার আসন ছিল। নামদেবের সঙ্গে যখন তাঁহার প্রথম সাক্ষাৎ হয়, তখন তিনি দেখেন, বিষোবা মন্দিরে শিবলিঙ্গে

সম্মুখে ধ্যানস্থ হইয়া আছেন—শিবলিঙ্গের গায়ে তাঁহার পা ঠেকিয়া রহিয়াছে। দেখিয়া নামদেব স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। ধ্যানভঙ্গে বিষোবাকে বলিলেন, "প্রভো, এ কি—আপনি শিবলিঙ্গে পা ঠেকাইয়া আছেন?" বিষোবা একটু হাসিয়া বলিলেন, "কি করিব বাছা—এই তো জরাজীর্ণ শরীর, কোথায় কখন কি ভাবে থাকি, তাহার হুঁস থাকে না। তা যেখানে ভগবানের বিগ্রহ নাই, তুমিই সেখানে পা'টা সরাইয়া দাও না।"

নামদেব তখন বিষোবার পাখানি সরাইতে গেলেন, কিন্তু সরাইয়া যেখানে রাখিলেন, অমনি, কি আশ্চর্য্য, সেখানেও যে মাটী ফুঁড়িয়া এক শিবলিঙ্গ বাহির হইয়া পড়িল। বিব্রত হইয়া নামদেব পাখানি আর এক জায়গায় সরাইতে গেলেন, অমনি সেখানেও দেখেন এক শিবলিঙ্গ। বারবার এই ব্যাপার দেখিয়া নামদেব বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া পড়িলেন—সাশ্রুলোচনে বিষোবার চরণে লুটাইয়া পড়িয়া তাঁহার আশ্রয়ভিক্ষা করিলেন, বিষোবা সস্নেহে তাঁহাকে তুলিয়া লইয়া অভয় দিলেন।

যথাসময়ে বিষোবা কেশরের নিকট দীক্ষিত হইয়া ও তাঁহার নিকট হইতে সাধন-ভজন শিক্ষা করিয়া নামদেব এবার 'পাকা' হইয়া আবার গৃহে ফিরিয়া আসিলেন।

কিছু দিন পরে নামদেবের তীর্থ-ভ্রমণের ইচ্ছা হইল। দাক্ষিণাত্যের ও উত্তর ভারতের প্রায় সমস্ত তীর্থই তিনি দর্শন করেন। ইতিমধ্যে বিশেষ কোনও ঘটনা ঘটে নাই। কেবল অবিঙ্গ নাগনাথের মন্দিরে একটী আশ্চর্য্য ঘটনার কথা চরিতকার মহীপতি উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন।

নাগনাথের মন্দির শৈবদিগের একটী প্রধান তীর্থস্থান। সহযাত্রীদিগের সহিত এখানে আসিয়া নামদেব যথারীতি স্নানাদি সমাপন করিয়া বিগ্রহ দর্শন করিতে যান। দর্শনান্তে মন্দিরের অঙ্গনে দাঁড়াইয়া তিনি করতাল বাজাইয়া ভজন গাহিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার সুধাকণ্ঠে যেন দিগন্ত পরিপূরিত হইয়া উঠিল। মধুলুব্ধ ভ্রমরের মত ভক্তগণ আসিয়া নামসুধা পান করিবার জন্য নামদেবকে বেড়িয়া ধরিলেন। মহীপতি লিখিয়াছেন, "পূর্ণচন্দ্রের উদয়ে সমুদ্র যেমন উচ্ছসিত হইয়া উঠে, এই দক্ষিণী সাধুর ভজন গানে শ্রোতৃবৃন্দের হৃদয়েও তেমনি ভাব-সমুদ্র উথলিয়া উঠিল।"

ক্রমে কীর্ত্তন খুব জমিয়া উঠিল। সকলেই নামরসে বিভোর, এমন সময় মন্দিরের শৈব পুরোহিতেরা গায়ে ভস্ম লেপন করিয়া রুদ্রাক্ষ মালা গলায় পূজোপকরণ লইয়া মন্দির দুয়ারে উপস্থিত হইলেন। মন্দিরের সম্মুখে নীচশ্রেণীর লোকের জনতা দেখিয়া অশুচি স্পর্শের ভয়ে তাঁহারা হাঁকিয়া উঠিলেন—"সরে যা—সরে যা—ছুঁস্‌নে।"

জনতার মধ্য হইতে একজন বলিয়া উঠিল, "কেন ঠাকুর, আমরা তো একপাশ হইয়া রহিয়াছি—ছোঁয়াছুয়ির ভয় কি?" পুরোহিত কর্কশ কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "বড় আস্পর্দ্ধা দেখি ছোটলোকদের! রেখে দে তোদের ভজন-টজন—যা করতে হয় মন্দিরের পিছনে গিয়ে কর।"

কথাগুলি শুনিয়া নামদেব মর্ম্মাহত হইলেন। তাঁর স্বগ্রামের বিট্‌ঠলের কথা মনে পড়িল। সেখানে তো এমন করিয়া ভক্তের ভক্তিস্রোতে কেহ বাধা দেয় না—তাঁর বিট্‌ঠল যে সবারি ঠাকুর—সবারি যে তাঁর উপর

সমান অধিকার। যাহা হউক, কীর্ত্তনের দল লইয়া নামদেব অগত্যা মন্দিরের পিছনেই চলিলেন।

কিন্তু ভক্তের অপমান ভগবান তো সহিতে পারেন না। মন্দিরের পিছনে কীর্ত্তন আরম্ভ হইতেই সবিস্ময়ে সকলে দেখিল, দেবতার বিগ্রহ ঘুরিয়া কীর্ত্তনের দিকে ফিরিয়া পশ্চিম-মুখী হইয়া গেল। আজও নাগনাথের বিগ্রহ তেমনি পশ্চিমমুখীই আছে।

তীর্থভ্রমণ সারা করিয়া নামদেব আবার পন্ধরপুরে তাঁহার বিট্‌ঠলের চরণে ফিরিয়া আসিলেন।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং
কলিকাতা

মনের সাধন

—*—

(১)

গুরুর কাছে এসে আবদার করে বল্‌ছ, মন স্থির করে যে ভগবানকে ডাকতে পারছি না—তবে আমার কি করে কি হবে? কিন্তু এই হচ্ছে একটা মস্ত ভুল। তুমি মন বলছ কাকে? তোমার চঞ্চল স্বভাবটাই না মন। মন তো অস্থির থাকবেই—তাকে স্থির করবার জন্যই তো সাধনা। যোগ বল, জপ বল, তপ বল, যা কিছু সবই তো ওই মনটাকে স্থির করবার জন্যই। আগে যদি মনটাকে স্থির করে নিয়েই সাধন করতে হয়, তবে সাধনের প্রয়োজনই বা থাকে কোথায়? মন স্থির হইলেই তো সে আত্মা হয়ে গেল—ওতেই তো সব পেলে, তবে আর সাধন করবে কি?

মনে কর, তুমি আর আমি মুখোমুখী বসে আছি। এখন আমাদের মাঝে যদি একটা যন্ত্র খুব বেগে ঘুরতে থাকে, তবে আমাকে তুমি দেখতে পাবে না। কিন্তু যন্ত্রটা থেমে গেলেই তুমি আমায় অতি সহজে দেখতে পাবে, তোমার আর কোনও রকম চেষ্টা করতে হবে না। তেমনি তোমার আর ভগবানের মাঝে রয়েছে এই চঞ্চল মনের চক্রটা। ওটা ঘুরছে বলেই ভগবানকে দেখতে পাচ্ছ না; যেদিন ওটা থেমে যাবে, সেইদিনই ভগবানকে দেখতে পাবে। কাজেই ভগবানকে দেখবার সাধনাই হচ্ছে এই চঞ্চল মনটাকে থামানোর সাধনা।

অতি স্বচ্ছ সরোবরের তলে যেন একটা রত্ন রয়েছে। সরোবরের জলটাও স্বচ্ছ, রত্নটীও উজ্জ্বল। কিন্তু জলে যদি ঢেউ ওঠে, জলটা যদি কাঁপে, তবে রত্নটী কেউ দেখতে পায় না। কিন্তু সেই জলটা স্থির হবে, অমনি রত্নটীর দেখা মিলবে। তেমনি মন স্থির হলেই ভগবানের সাক্ষাৎ পাবে। কাজেই স্থির মন নিয়ে তাঁকে ডেকে তাঁকে পাবে—অস্থির মন থাকলে আর ডাকবার ধৈর্য্য থাকবে না—এ তোমার অসঙ্গত আবদার বই কি?

(২)

মন তো বারে বারে ছুটে যাবেই এদিকে-সেদিকে! তাকে ফিরিয়ে আনবার জন্য যে চেষ্টা-যত্ন তাকেই না বলি সাধনা। মন তোমার

কখনও নিষ্ক্রিয় থাকে না—একটা না একটা কিছু নিয়ে নাড়াচাড়া সে করবেই। যখন জেগে আছ, তখন যেমন সে তোমায় পাঁচশ দিকে টেনে নিয়ে যাবে, তেমনি যখন ঘুমিয়ে পড়েছ, তখনও তো তার হাত থেকে নিস্তার পাবে না—স্বপ্নের মাঝেও যে তোমায় কত দিকে সে টেনে নিয়ে বেড়াবে। আর সুষুপ্তি অবস্থায় তো সবই একেবারে জড় হয়ে গেল। কাজেই ওই মনটাকে ফিরিয়ে একমুখী করবার জন্যই তোমার যা কিছু চেষ্টা-যত্ন।

বরং সচরাচর সাংসারিক বিষয় নিয়ে মনটা থাকে ভাল। কেননা, তখন যা কিছু ভাবনা চিন্তা, তা একটা নির্দ্দিষ্ট বিষয় নিয়ে—তার একটা পরিমাণ আছে। হয়ত তো মন টাকার কথাই ভাবছে, না হয় ছেলেমেয়ের কথা ভাবছে—না হয় অন্য একটা কিছু নিয়ে আছে। কিন্তু এই সমস্ত সাংসারিক চিন্তা হতে মনটাকে ফিরাতে গেলেই মুস্কিল। একবারের চেষ্টায় তো আর সে একমুখী হবে না অথচ তাকে আর সমস্ত নিত্যকার ভাবনা চিন্তা হতে টেনে এনে একমুখী চিন্তায় বেঁধে দিতে চাও। এমন অবস্থায় নির্দ্দিষ্ট একটা কিছু অবলম্বন তার না থাকলে সে যে আরও বিগড়ে যায়—তার ছট্‌ফটি আরও বেড়ে যায়।

যারা মন-স্থির করতে একটু চেষ্টা করেছে, তারাই এটা লক্ষ্য করেছে—অমনি যদি মনটা কিছুও ভাল থাকে, ভগবানকে ডাক্‌তে গেলে সে যেন আরও বানচাল হয়ে যায়। তখন এমন সব ভাবনা-চিন্তা তার ভিতর ঢুক্‌তে থাকে যে, সাধারণ অবস্থায় সে সব চিন্তা কোনও দিন মনে উঠেনি। তা হবেই তো। এই মনটা তোমার তো আর কালকার জিনিষ নয়। ওর ভাণ্ডারে যে তোমার কত সংস্কার পুঁজি হয়ে রয়েছে—তার কি ঠিক-ঠিকানা আছে। আজ যদি তার উপস্থিত ভাবনা-চিন্তাগুলি তুমি রোধ করলে, তখন কাজেই সে তার ভাণ্ডার থেকে একটা কিছু বের করে তাই নিয়ে তুলো ধুনতে থাকবে।

মন বার বার ছুটে যাবে, আর তুমিও বার বার তাকে ফিরিয়ে এনে লক্ষ্য বস্তুতে বসিয়ে দেবে—এরই নাম হল প্রত্যাহার সাধনা। মনটা যে কখন চলে যায়, তা তো তুমি জানবে না—কেননা তা জানতে পেলে তো আর মন ছুটে যেত না। কিন্তু যখন হুঁস হবে যে মনটা চলে গিয়েছে, তখনই আবার তাকে ফিরিয়ে এনে খাঁচায় পূরবে।

(৩)

সাধন করতে গেলেই গুরুর আশ্রয় নিতে হয়। সামান্য ক-খ শেখা, তারও মাষ্টার লাগে; আর পরা বিদ্যা লাভ, বিনা গুরুতেই হয়ে যাবে? কতটুকু পথের খবরই বা তুমি রাখ? কোন পথই বা তোমার ঠিক পথ, তোমার জন্মজন্মান্তরের সাধনার সঙ্গে মিলিয়ে কে তোমায় তা বেছে দেবে? শুধু অমনি একটা যা কিছু করলেই তো হয় না। সাধনারও শক্তি চাই—শক্তির ভাণ্ডারের সঙ্গে যদি তোমার যোগ না থাকে, তবে শক্তি আসবে কোথা থেকে?

ভগবানই গুরুরূপে তোমার কাছে ধরা দেন। তাঁর রাজ্যে অব্যবস্থা নাই কোথায়ও। সঙ্কটমোচনের উপায় রেখে তবে তিনি সঙ্কটের সৃষ্টি করেছেন—অষুধ করে রেখে তবে রোগ সৃষ্টি করেছেন। আগে গুরু হয়ে মুক্তির পথ খুলে রেখে তবে জীব হয়ে বন্ধনের সৃষ্টি করেছেন। এই জন্যই গুরু

অনাদি—তাঁকে ছেড়ে আর দোসরা পথ নাই।

(৪)

সাধন ক'রতে হ'লে নিশ্চিন্ত বিশ্বাস থাকা চাই। যখন গুরু পেয়েছি, পথ পেয়েছি, তখন আজ হোক, কাল হোক্, শতজন্ম পরে হোক্, একদিন ভগবানকে পাবই—এমনি বিশ্বাসকে বলে নিশ্চিন্ত বিশ্বাস। এই বিশ্বাসের সঙ্গে থাক্‌বে, উৎসাহ, নিষ্ঠা, ধৈর্য্য। গা ছেড়ে দিয়ে কাজ কর্‌লে সামান্য একটা সংসারের কাজও হয়ে ওঠে না—আর ভগবানকে পাওয়া তো দূরের কথা। এক দিন নিশ্চয়ই পাব, ঠিক ঠিক এ বিশ্বাস যার জন্মেছে, তার উৎসাহের অভাব হবে না।

ছুদিন কাজ করলাম, তার পর আবার ছমাস ছেড়ে দিলাম—হয়ত সাংসারিক ঝঞ্ঝাটের অজুহাত দেখালাম—ওতেও কোন ফল হবে না। কাজে নিষ্ঠা থাকা চাই। বেশী না পারি—একটু করব—তবুও একটা দিনও ফাঁক দেব না বা নির্দ্দিষ্ট সময়ের ব্যতিক্রম করব না—এমনভাবে কাজ করতে থাকলে যতটুকু ফল হবে, ছ'মাস ছ'মাস অন্তরে একদিন আধদিন খুব সোরগোল করলেও তা হবার নয়।

কাজ করতে হবে ধৈর্য্য ধরে। ছুদিন জপ করে বা ছুবার ধ্যান করেই কিছু হল না বলে হাল ছেড়ে দিলে চলবে কেন? ভগবান কি তোমার এমনি হাতধরা যে খোসখেয়ালে একবার ডাকলেই তিনি এসে দেখা দেবেন? একটা মানুষকেই ডেকে দেখ না—কত ডাকে সে সাড়া দেয়। আর অখিল ব্রহ্মাণ্ড জুড়ে যাঁর রাজত্ব, সেই রাজোশ্বরকে তুমি এক ডাকেই টেনে আনবে নাকি?

(৫)

ছুবার চারবার একটু ডেকেই মানুষ যখন দেখল, ভগবানের সাড়া মিলল না, তখন তাঁকে নিষ্ঠুর বলে গাল দিয়ে বস্‌ল। কিন্তু নিষ্ঠুর বরং মানুষ হতে পারে, কিন্তু ভগবান তো নিষ্ঠুর নন। তাঁর দৃষ্টিতে সবই ভাসছে, কিন্তু সময় না হলে তিনি তো কাউকে দেখা দেন না। তাঁকে দেখতে পাবে, তাঁর দর্শনকে সহ্য করতে পারবে, এমন কতটুকু শক্তি তোমার জন্মেছে যে দর্শন পাবার জন্য এত উতলা হয়ে উঠেছ? মানুষ সামান্য একটা ভূত দেখলে ভয়ে মূর্চ্ছা যায়, আর ভগবান দেখে স্থির থাকা তো দূরের কথা। এই যে কালীকে মা মা বলে দেখা দেবার জন্য অমন সাধাসাধি করছ, তিনিই যদি ওই মূর্ত্তিতে খাণ্ডাখর্পর নিয়ে এসে তোমার সামনে দাঁড়ান, তবে মায়ের ও রূপ দেখে ছেলের যে কি হবে, তা তো ভেবেই পাই না।

অমন যে অর্জ্জুন, ভগবান যাঁর রথের সারথি, যাঁর মত বীর ভূভারতে হয়নি, তিনিই যখন বিশ্বরূপ দর্শন করলেন, তখন দিশেহারা হয়ে এতদিন যাকে সখা বলে ডেকে এসেছেন, তাঁকে বাবাই ডেকে ফেল্‌লেন—আর তাঁর সামনে না পিছনে কোথায় যে তাঁকে নমস্কার করবেন, তাই দিশেই পেলেন না।

তাই বলি, ভগবানকে দেখবার সখ করলে হবে কি—দেখবার মত শক্তি অর্জ্জন করা তো চাই।

(৬)

তা ছাড়া ভগবানকে ডাকার অভিমান করো না। তোমার কতটুকু শক্তি যে তুমি তাঁকে ডাক্‌বে? আর এতদিনে কতটুকুই বা ডেকেছ? হিন্দুর পুরাণে শুনি,

এক এক ঋষি উর্দ্ধপদে হেঁটমুণ্ডে ষাট্ হাজার বছর তপস্যা করেছেন, সমস্ত শরীরটা উইয়ের ঢিবি হয়ে গিয়েছে, তবু তাঁর সাক্ষাৎ পান নি—আর তুমি সময় মাফিক দুবার চার বার ডেকেছ বলে তাঁকে পেয়ে ফেলবে?

তবে তোমারও যে করবার কিছু নেই—তা নয়। ভরসা তাঁর কৃপা। কিন্তু তাঁর কৃপা আকর্ষণ করবার মত যোগ্যতা তো তোমাকেই অর্জ্জন কর্‌তে হবে। তা না হলে তাঁর কৃপা তো সর্ব্বত্রই ছড়িয়ে আছে, কিন্তু সবাই তা পায় না কেন? বৃষ্টির জল সব জায়গাতেই সমান ভাবে পড়ে, কিন্তু এক জায়গায় যদি একটা গর্ত্ত থাকে তবে উঁচু জমীর জলটাও গিয়ে গর্ত্তের মাঝে জমা হয়।

এক গুরুর যত শিষ্য, সবাই গুরুর সমান স্নেহের পাত্র। কিন্তু তবুও কারু মাঝে কৃপার স্ফূর্ত্তি বেশী হয়—কেননা তার যোগ্যতা বেশী। যোগ্যতা আছে বলে অপরের ভাগটুকুও সে আকর্ষণ করে আনে—ওই গর্ত্তটায় যেমন জল টেনে নেয়। তাই কৃপা পাবারও যোগ্যতা থাকা চাই। সেইটুকুই তোমার হাত। তবে তার মাঝেও যেন অভিমান না জন্মে যায়। যা করবে, শিশুর মত সরল সহজ চেষ্টায় করবে।

সন্ধানী

ওরে পাগল, আত্মভোলা, সর্ব্বনাশের পান্থ রে—
কোন্ সে অরূপ রূপের আলোক মরণ-গহন প্রান্তরে
খুঁজিস্ নিয়ে উদাস আঁখি?—রসের সায়র সন্তরি,
কোন্ অজানার কূলে রে তোর পাড়ি জমায় মন-তরী?

বাদল রাতে দেওয়ার সাথে প্রভঞ্জনের ঝঞ্জনা,
আশার স্বপন ব্যর্থ হলে স্বার্থসেবীর গঞ্জনা—
তাও কি তোরে মাতায় ওরে সোহাগভরে গুঞ্জরি?
রুদ্রদেবের বজ্রাঘাতে মর্ম্ম ওঠে মুঞ্জরি?

বঁধুর সাথে মিলন কি চাস্ আলস-বিভোল শয্যাতে—
জ্যোছনা রাতের মদের ফেনায়—গভীর ঘুমের লজ্জাতে?
আশার কাঁদন মনের বেদন অনেক যুগের সঞ্চিত—
কোন্ উদাসীর আশায় করিস্ আপনারে তায় বঞ্চিত?

শুন্‌লি কি তার প্রলয়বিষাণ গর্জ্জি ফিরে অম্বরে—
রুদ্র তালে নাচে যে প্রাণ—আপনারে কে সম্বরে!
স্বার্থসুখের অন্ধকারায় রইবি কি আর কুণ্ঠিত—
রাজার মুকুট দেখ্‌বি কি বল্ ভিখারীর পায় লুণ্ঠিত?

শ্রীশ্রীরূপ-সনাতন

—*—

৭ (শ্রীমন্মহাপ্রভুসূত্রিত অভিধেয়সাধনভক্তিতত্ত্ব)

—*—

অঙ্গ-সাধন

ভক্তির যে সমস্ত অঙ্গের কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, তাহার সকলগুলিরই যে সাধন করিতে হয়, এমন নহে। রুচি ও সাধ্য অনুযায়ী কেহ একটীমাত্র অঙ্গের অথবা কেহ বহু অঙ্গের সাধনা করিয়া সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। তাই দাক্ষিণাত্যের একজন বৈষ্ণব মহাজন বলিয়াছেন—

শ্রীবিষ্ণোঃ শ্রবণে পরীক্ষিদভবং
বৈয়াসকিঃ কীর্ত্তনে
প্রহ্লাদঃ স্মরণে তদাঙ্ঘ্রিভজনে
লক্ষ্মীঃ পৃথুঃ পূজনে।
অক্রূরস্ত্বভিবন্দনে কপিপতি
র্দাস্যেঽথ সখ্যেঽর্জ্জুনঃ
সর্ব্বস্বাত্মনিবেদনে বলিরভূৎ
কৃষ্ণাপ্তিরেষাং পরম্॥

পরীক্ষিৎ শ্রীকৃষ্ণকে পাইলেন তাঁহার লীলা শ্রবণ করিয়া, শুকদেব পাইলেন লীলা কীর্ত্তন করিয়া, প্রহ্লাদ পাইলেন স্মরণ করিয়া, লক্ষ্মী পাইলেন পদসেবা করিয়া, পৃথু পাইলেন পূজা করিয়া, অক্রুর পাইলেন বন্দনা করিয়া, হনুমান পাইলেন দাস্যে, অর্জ্জুন পাইলেন সখ্যে; আর বলি রাজা পাইলেন সর্ব্বস্ব তাঁহার পায়ে নিবেদন করিয়া।

শ্রীমদ্ভাগবতে শুকদেব পরীক্ষিৎকে রাজা অম্বরীষ ও রাজা মুচুকুন্দের দৃষ্টান্ত দেখাইয়া বলিয়াছেন (৯, ৪, ১৫ – ১৭)—

স বৈ মনঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়ো-
র্বচাংসি বৈকুণ্ঠগুণানুবর্ণনে।
করৌ হরের্মন্দিরমার্জ্জনাদিষু
শ্রুতিঞ্চকারাচ্যুতসৎকথোদয়ে॥

—রাজা অম্বরীষ তাঁহার মনটী দিলেন শ্রীকৃষ্ণের কমল চরণ দুখানিতে, বাক্য নিযুক্ত করিলেন বৈকুণ্ঠের গুণানুবর্ণনে; হরিমন্দির মার্জ্জনে তাঁহার দুটী কর লিপ্ত রহিল, আর কর্ণ রহিল অচ্যুতের প্রসঙ্গ শ্রবণলালসায়।

মুকুন্দলিঙ্গালয়দর্শনে দৃশৌ
তদ্ভৃত্যগাত্রস্পর্শেঽঙ্গসঙ্গমম্।
ঘ্রাণঞ্চ তৎপাদসরোজসৌরভে
শ্রীমত্তুলস্যা রসনাং তদর্পিতে॥

—রাজা মুচুকুন্দ দুটী চক্ষুকে শ্রীভগবানের মন্দির দর্শনে ব্যাপৃত করিলেন, অঙ্গসঙ্গকে হরিসেবকের গাত্রস্পর্শে, ঘ্রাণকে তাঁহার চরণকমল সৌরভসম্পৃক্ত তুলসীর গন্ধ গ্রহণে এবং রসনাকে তাঁহারি প্রসাদের আস্বাদনে নিযুক্ত করিলেন।

পাদৌ হরেঃ ক্ষেত্রপদানুসর্পণে
শিরো হৃষীকেশপদাভিবন্দনে।

কামং কৃষ্ণ-দাস্যে ন তু কামকাম্যয়া
যথোত্তমশ্লোকজনাশ্রয়া রতিঃ ।।

—তিনি হরিমন্দির গমনে তাঁহার পদ দ্বয় ও হরিপদ বন্দনায় তাঁহার মস্তককে নিযুক্ত করিতেন। তিনি ভোগকে গ্রহণ করিতেন শ্রীকৃষ্ণের প্রসাদস্বরূপ, নতুবা ভোগের প্রতি তাঁহার লিপ্সা ছিল না। যাহাতে শ্রীভগবানের প্রতি তাঁহার রতি গাঢ় হয়, ইহাই ছিল তাঁহার লক্ষ্য।

নিষ্ঠা

ভগবদনুরাগ চিত্তে এখনও উছলিয়া উঠে নাই, অথচ সাধু ও শাস্ত্রের শাসন মানিয়া তাঁহাকে পাইবার সাধনা করিতেছি—এই তো হইল বৈধী ভক্তির স্বরূপ। সুতরাং ইহার মূল কথাই হইতেছে নিষ্ঠা। নিষ্ঠা অশান্ত উচ্ছৃঙ্খল চিত্তকে শৃঙ্খলিত করিবে। ভক্তির যে অঙ্গেরই সাধনা করি না কেন, তাহা নিষ্ঠা সহকারে করা চাই। নিশ্বাস-প্রশ্বাস যেমন সহজ, সেবার প্রবৃত্তিও যেদিন তেমনি সহজ হইয়া আসিবে, সেই দিন নিষ্ঠার উদ্‌যাপন। আর তখন বিদ্রোহী চিত্তের উপর পাহারা বসাইয়া রাখিবার কোনও প্রয়োজন হইবে না।

চিত্ত যদি উদ্‌ভ্রান্ত থাকে, তবে সেবার মাঝে যে মাধুর্য্য আছে, তাহার উপলব্ধি হয় না। মনের সকল গুলি ভাব এলোমেলো হইয়া ছড়াইয়া পড়িয়াছে—এ অবস্থায় কিছু করিতে গেলে কেবল কাজ বাড়িয়া যায় বই তো নয়। চিত্তটীকে গুটাইয়া এক-ঠাঁই করিতে পারিলে, তবে তাহাকে লইয়া রসের খেলা চলিতে পারে। তখন সমস্ত বৃত্তিরই সামর্থ্য পরিপূর্ণরূপে পরিস্ফুট হয়, অথচ একটী বস্তুকে বেড়িয়া তাহারা সংহত হয় বলিয়া নিত্য নূতন মাধুর্য্যের উন্মেষ উপলব্ধি করা তাহাদের পক্ষেই সম্ভব।

ভক্তের নিষ্ঠা চিত্তকে শুধু যে একাগ্র করে, তাহা নয়—চিত্তকে মজায়ও। নিষ্ঠা হইতে চিত্ত-বিশ্রাম এবং চিত্ত-বিশ্রাম হইতেই মাধুর্য্যের উপলব্ধি—এই হইল প্রেমের পূর্ব্বাভাস। সেবার মাঝে তখন দেখি কত খুঁটী-নাটী—অথচ তার প্রত্যেকটাই অপরূপ রসে ভরা। এই রসাল সেবার আদি কথাই হইল নিষ্ঠা।

প্রাকৃত মানুষ খোঁজে কেবল নিজের সুখ। আত্মসুখপরায়ণতাই হইল কাম—কাম প্রেমের বিরোধী। তোমার মাঝে ফুটাইতে হইবে প্রেম—কিন্তু এখন তুমি মত্ত আছ কাম লইয়া—নিজের গণ্ডীর বাইরে নিজেকে বিস্তার করিতে শিখ নাই। কিন্তু বিস্তার করা তো চাই, তাই শাস্ত্র তোমার কর্ত্তব্য বুদ্ধিকে সজাগ করিয়া দিবার জন্য বলিলেন, তুমি ঋণী—তুমি দাস। ঋণী তুমি দেবতার কাছে, ঋষির কাছে, পিতৃপুরুষের কাছে, মানুষের কাছে, সর্ব্বভূতের কাছে। কাজেই প্রতিদিন কিছু না কিছু আত্মোৎসর্গ করিয়া, সেবা করিয়া এই ঋণ তোমাকে শোধ করিতে হইবে—নতুবা তোমার মুক্তি নাই।

শাস্ত্রের যে এই অনুশাসন, ইহা হইল সঙ্কোচশীল কামকে প্রেমের উদার ক্ষেত্রে প্রসারিত করিবার সঙ্কেত। ইহা আশ্রম-ধর্ম্ম; তুমি যখন মনুষ্যসমাজের একজন, তখন তোমাকে এই ধর্ম্ম মানিয়া চলিতে হইবে। ইহাতেই তোমার শ্রেয়ঃ, ইহাই শাস্ত্রের উপদেশ।

কিন্তু অনুরাগের অনুশাসনের সঙ্গে বিধি-শাস্ত্রের তো অক্ষরে অক্ষরে মিল হয় না।

ঋণের দায় কাঁধে চাপাইয়া বিধি-শাস্ত্র মানুষের নিকট হইতে যাহা আদায় করিতে চাহিয়াছে —তাহা হইতেছে স্বার্থবুদ্ধির বিনাশ অর্থাৎ তাহা অনুরাগের আগের পাঠ। কিসের জন্য এই জগতের খেলা, সে কথা যতক্ষণ না বুঝিয়াছ, ততক্ষণ অপথ-বিপথ হইতে বাঁচাইবার জন্য তোমাকে বাঁধাধরা কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করিয়া দিতে হয়। কিন্তু যে জন্য এই কর্ত্তব্যের পাঠ, তাহা যদি মিলিয়া যায়, তাহা হইলে বিধি নিষেধের বাঁধন তো আপনা হইতেই খসিয়া পড়ে। কর্ত্তব্য হয় তখন সেবা; সেবার প্রেরণা আসে সেবকের অন্তরের মাধুর্য্য হইতে। সে প্রেরণা অসঙ্কুচিত, ক্ষেমকর ও নির্ভয়। তখন তো আর আশ্রমধর্ম্মানুশাসিত ঋণের জোয়াল কাহারও কাঁধে চাপাইয়া রাখিবার প্রয়োজন পড়ে না। তাই শ্রীমদ্ভাগবতে করভাজন জনককে বলিয়াছিলেন (১১ ৫, ৩৭)—

দেবর্ষিভূতাপ্ত নৃণাংপিতৄণাং
ন কিঙ্করো নায়মৃণী চ রাজন্।
সর্ব্বাত্মনায়ং শরণং শরণ্যং
গতো মুকুন্দং পরিহৃত্য কর্ত্তম্॥

—শাস্ত্রবিহিত বিধিধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া যিনি সর্ব্বতোভাবে গোবিন্দচরনে আশ্রয় লইয়াছেন, তিনি না দেবতা, না ঋষি, না মানুষ, না পিতৃপুরুষ, না কোনও প্রাণী—কাহারও কাছে ঋণী নহেন, কিম্বা কাহারও তিনি ভৃত্য নহেন।

অপ্রমাদ

সংশয়ীর মনে এখানে প্রশ্ন উঠিতে পারে, যদি বিধিশাস্ত্রের শাসনই না মানিলাম, তবে আমার উচ্ছৃঙ্খলতাকে ঠেকাইয়া রাখিবে কে? কিন্তু অনুরাগের সাধনায় শাস্ত্রের শাসন মানা না মানা লইয়া তো কোনও তর্ক উঠিতেছে না। প্রবৃত্তিমার্গে যতক্ষণ পর্য্যন্ত মানুষ চলে, ততক্ষণ তাহাকে শাস্ত্রবিধি দিয়া নিয়ন্ত্রিত করিতে হয়। সে ক্ষেত্রে শাস্ত্র তাহার অন্তরঙ্গ বস্তু নয়—শাস্ত্রের শাসন তাহার পক্ষে বাইরের শাসন। পূর্ব্বপুরুষানুষ্ঠিত যৎকিঞ্চিৎ প্রাকৃত আচার, শ্রদ্ধা ইত্যাদির প্রেরণাতেই সে শাস্ত্র মানে; নতুবা শাস্ত্র বিহিত অনুষ্ঠানের তাৎপর্য্য তলাইয়া দেখিবার বা শাস্ত্রকে অন্তরের বস্তু বলিয়া গ্রহণ করিবার ক্ষমতা তাহার নাই। সে প্রবৃত্তির দ্বারা পরিচালিত মাত্র।

অথচ মানুষকে ভগবানের দিকে লওয়াইতে হইবে। এই জন্যই তাহার পূর্ব্বার্জ্জিত সংস্কারের উপর নির্ভর করিয়া, শাস্ত্রবিধি দিয়া তাহাকে বাঁধিতে হয়। শাস্ত্র শাসন মানিয়া বুদ্ধি যদি শুদ্ধ হয়, তবে আপনিই সে শাস্ত্রের তাৎপর্য্য বুঝিয়া কল্যাণের পথে নিজেই নিজকে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারিবে। কিন্তু ভগবৎ-কৃপায় তাঁহার দিকে যাহার মন গলিয়াছে; তাহার পক্ষে তো শাস্ত্রবিধির প্রধান প্রয়োজনই সিদ্ধ হইয়া গিয়াছে। শাস্ত্র ভগবৎ-প্রেরণার প্রতিনিধি। স্বয়ং ভগবানই যদি আমার জীবনের কর্ণধার হইয়া বসিলেন, তবে আর আমার শাস্ত্র খুঁজিবার প্রয়োজন কি? ইহাতে শাস্ত্রের সহিত বিরোধের বা শাস্ত্রকে উপেক্ষা করিবার কোনও কথা হইতেছে না—বরং ইহাতেই শাস্ত্রের পূর্ণতা ঘটিতেছে—শাস্ত্রবিধির সার্থকতা সম্পাদিত হইতেছে।

ভিতরে যিনি পাইয়াছেন, বাহিরে তাঁহার কখনও বেতালে পা পড়ে না। আমরা বেচাল চলি, আমাদের দৃষ্টি সঙ্কীর্ণ অথচ আমাদের একটু স্বতন্ত্র ইচ্ছা আছে বলিয়া

এই ইচ্ছার বালাই দূর হইয়া গেলে, কায়-মনোবাক্যে শরণাগত হইতে পারিলে, আমার যাহা ভাবিবার, আমার যাহা করিবার, তাহা তিনিই নির্দ্দেশ করিয়া দিবেন। সুতরাং তাঁহার ইচ্ছাকে উল্লঙ্ঘন করিয়া বেতালে পা পড়িবেই বা কেন? যদিও বা পূর্ব্বার্জ্জিত সংস্কারবশে ভুল পথেও একবার পা পড়ে, তথাপি ভগবান শরণাগতকে নিশ্চয়ই রক্ষা করেন—বিদ্রোহীর প্রতি যে দণ্ড, অজ্ঞানতঃ অপরাধীর প্রতি সে দণ্ড বিধান করেন না। দণ্ডের পরিমাণ নিরূপিত হয় দণ্ডিতের মনের গতি দিয়া। বিদ্রোহী আর শরণাগতের মনোভাব তো এক রকম নহে। সুতরাং, বাহ্যতঃ যে কর্ম্মের যে ফল নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহা ঘটিলেও তাহার ভোগের তারতম্য হয় বই কি? শ্রীমদ্ভাগবতে করভাজন জনককে বলিতেছেন, (১১, ৫, ৩৮)—

স্বপাদমূলং ভজতঃ প্রিয়স্য
ত্যক্তান্যভাবস্য হরিঃ পরেশঃ।
বিকর্ম্ম যচ্চোৎপতিতং কথঞ্চিৎ
ধুনোতি সর্ব্বং হৃদি সন্নিবিষ্টঃ॥

—শ্রীহরির যে প্রিয় ভক্ত তাঁহার শ্রীচরণ আশ্রয় করিয়াছে, যাহার মনে আর কোনও ভাব প্রবেশ করিতে পারে না, তাহারও যদি কখনও কোনও কারণে পাপ সংস্পর্শ ঘটে, তবে সর্ব্বশক্তিমান শ্রীহরি, তাহার হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হইয়া সে পাপকে দূরীভূত করিয়া দেন।

১

সঙ্ঘ

আত্মপ্রত্যয় সমস্ত বেদান্তের মূল ভিত্তি—ইহাই ভারতের প্রাচীনতম শিক্ষা। আত্মপ্রত্যয় দৃঢ় হইলেই মায়িক সমস্ত বন্ধন খসিয়া গিয়া এক বিরাট একাকিত্বের মাঝে আমরা ডুবিয়া যাই। সুতরাং জ্ঞানরাজ্যের এই পরম সত্যের আদর্শের সঙ্গে আমাদের কর্ম্মজীবনের পরম প্রয়োজন যে সঙ্ঘসৃষ্টি, তাহার একটা বিরোধ বাধিয়া যায়। এই বিরোধের মীমাংসা না করিতে পারিলে আমাদের পথ নির্দ্দেশ সহজ হইবে না।

শাস্ত্র বলিয়াছেন, "সংঘশক্তিঃ কলৌ যুগে।" এ কথাটীর গুরুত্ব আমরা সব সময় অনুভব করি না। নিজকে ক্ষুদ্র ভাবিতে আমরা এতদূর অভ্যস্ত হইয়াছি যে, সঙ্ঘের কথা বলিলেই আমাদের "তৃণৈর্গুণত্বমাপন্নৈঃ"র কথা মনে পড়িয়া যায়। কলিযুগকে আমরা অপরাপর যুগের পাদপীঠরূপেই কল্পনা করিয়া থাকি। তাহার স্বাভাবিক মহত্ব যদি কখনও ফুটিবার অবকাশ পায়, তবে আমরা তাহাকে সংশয়ের চোখে না দেখিয়া পারি না। কিন্তু জগৎকে এমন পূর্ব্বাপরসম্পর্ক-বর্জ্জিত একটা খণ্ড পিণ্ডরূপে দেখার কোনও সার্থকতা আছে কি?

উদার দৃষ্টি লইয়া দেখিলে বুঝিব, সৃষ্টি আর প্রলয়ের মাঝে কোনও পার্থক্য নাই—তাহারা একই মহাশক্তির অনুলোম ও বিলোম গতি

মাত্র। বিশ্লেষণে যাহা চরম বস্তুতত্ত্বের সীমানায় আসিয়া পৌঁছিতেছে, সংশ্লেষণে তাহাই আবার প্রলয়ের পথ ধরিয়া "আপনার" ভাস্বর স্বরূপে লীন হইয়া যাইতেছে। বিশেষ বিশেষ ভূমিতে দাঁড়াইয়া এই গতিকেই আমরা সৃষ্টি ও প্রলয় বলি। জড়ত্বের দিক দিয়া আমাদের এই জগৎ অনাত্মা বা সৃষ্টির চরম পীঠে আসিয়াছে, সুতরাং এখানে আর তাহার দাঁড়াইবার স্থান নাই—বিলোমক্রমে আবার তাহাকে আপনার শুদ্ধস্বরূপে ফিরিয়া যাইতে হইবে। যে দিন হইতে মানুষ এই প্রলয়ের পথে পা দিয়াছে, সেই দিন হইতে ইতিহাসের সৃষ্টি। এ তাহার পথে বাহির হইবার ইতিহাস নয়—ঘরে ফিরিবার ইতিহাস। "বহু স্যাম্" বলিয়া যে চৈতন্যশিখা জগৎরূপে আপনাকে বিচ্ছুরিত করিয়া দিয়াছিলেন, তিনিই আবার "সোঽহং" বলিয়া নিজকে বিরাটস্বরূপে লয় করিতে চাহিতেছেন—এইখানেই আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্কেত।

আমাদের ভূমিতে দাঁড়াইয়া ইহাকেই আমরা বলি, মানুষের অন্তর্নিহিত আকুলতা। কলিযুগ এই সত্য সন্ধানেরই পথিক। তার আত্মপ্রত্যয় আর তাহাকে ঘরে তিষ্ঠিতে দিতেছে না—উন্মত্ত ব্যাকুলতায় সে তার পাষাণ প্রাচীর ঠেলিয়া বাহির হইয়া পড়িয়াছে—কোন্ মহাশক্তি যে তাহাকে ঘরছাড়া করিয়াছে, আমরা তাহার সন্ধান রাখি কি? আজ অরণ্যপথের সম্মুখের আলোকরেখাকে আলেয়া বলিয়া নিজকে ভুলাইতে চেষ্টা করিতেছি, কিন্তু জানি না, এ আগুন শুধু অরণ্যের একস্থানে নয়, এ তার শত স্থানে অজস্র পত্রসঞ্চয়ের মাঝে সন্দীপিত হইয়া উঠিতেছে—তার নিখিলব্যাপী দাবানলের এই তো সূচনা মাত্র।

প্রাচীন যুগে প্রলয়ের আদিমুহূর্তে জড়ত্বের গ্লানি দূর করিয়া স্বমহিমায় যাঁহারা উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিলেন, তাঁহাদের সম্মুখে ভক্তিতে বিস্ময়ে আমরা নত হইতেছি। কিন্তু তাঁহাদের কল্যাণসম্ভার বিশেষ করিয়া যে কেবল সত্যযুগেরই সঞ্চয় হইয়া থাকিবে, এমন কথা কেমন করিয়া আমরা হৃদয়ে স্থান দিলাম? কেমন করিয়া বিশ্বাস করিলাম যে তাঁহাদের পুণ্য আশীর্ব্বাদ কেবল সেই যুগেরই ললাট ছুঁইয়া গিয়াছে, তাঁহাদের বহ্নিশিখা কেবল তাঁহাদিগকেই আলোকিত করিয়াছে—তাহার স্পর্শে অপরকেও অগ্নিময় করিয়া তোলে নাই? আজ আমাদের এই যুগে যে আধ্যাত্মিক দৈন্য উপলব্ধি করি, তাহাকেও আমাদের দীর্ঘাপরাধের নৈসর্গিক বিধান বলিয়াই মনে করি। আমরা বিশ্বাস করি মায়ের অক্ষয় ভাণ্ডার আজ বভুক্ষিত বিশ্ববাসীর সম্মুখে উন্মুক্ত হইয়া রহিয়াছে। একের ধন যদি আজ আমরা দশে ভাগ করিয়া খাই, তবে তাহাকে দৈন্য বলিব, না সম্পদ বলিব। আমাদের পিতৃপিতামহগণ সারাজীবন সাধনার ফলে প্রাণের অক্ষয়ভাণ্ডারে যে ব্রহ্মণ্যতেজ সঞ্চয় করিয়া গিয়াছেন, আজ যে শুধু ভারতকে নয়, বিশ্বকে সে সম্পদ বাঁটিয়া দিবার সময় আসিয়াছে। তাঁহাদের সে অফুরন্ত প্রাণের ধারা তাঁহাদের মাঝেই শুষ্ক হইয়া গেল, দেবতার প্রসাদ শুধু তাঁহাদিগকেই ধন্য করিয়া গেল, তাঁহাদের সন্তানেরা মন্দিরদ্বারে করুণ নেত্রে বৃথাই তাহার দিকে চাহিয়া রহিল—এমন অশ্রদ্ধার কথা, এমন অনাত্মীয়তার কথা কি একবারও আমাদের বিবেকবুদ্ধিকে পীড়িত করিল না?

আজ ভাইয়ে ভাইয়ে আমরা আমাদের সেই পূর্ব্বপুরুষগণের মন্দিরপ্রাঙ্গনে হাত ধরা-

ধরি করিয়া দাঁড়াইয়াছি—তাঁহাদের পুণ্য-জ্যোতিঃ আজ আমাদের সকলকেই দীপ্ত করিয়া তুলিয়াছে। তাঁহাদের গম্ভীর উদাত্ত কণ্ঠের আহ্বানধ্বনি আজ আমাদের প্রতি-জনার প্রাণের তন্ত্রীতে ঝঙ্কার দিয়া উঠিয়াছে,—আজ আমরা তাঁহাদের স্নেহের ছায়ায় সকলে আসিয়া মিলিত হইয়াছি। এই আমাদের সঙ্ঘ। এ শুধু প্রয়োজনের তাড়নায় আপনার অন্তরের শক্তি দৈন্যকে দূর করিবার প্রয়াস নয়, এ নিতান্তই অপ্রয়োজনে আনন্দের উৎসব কলরবে সকলের কণ্ঠকে মুখরিত করিয়া তোলা। এ সঙ্ঘ শুধু শক্তির বাহন নহে, এ আনন্দের বাঞ্জনা। আমরা দুর্ব্বল বলিয়া আত্মরক্ষার জন্যই সংঘের সৃষ্টি করি না—আমাদের প্রাণে আনন্দের ফোয়ারা উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে বলিয়াই উৎসবে, আনন্দে, গানে সকলের প্রাণকে মাতাইয়া তুলিতে চাহিতেছি।

এইজন্যই সংঘশক্তিকে আমরা আত্মপ্রত্যয় যেন নিজধর্ম বলিয়া মনে করি। সমস্ত ক্ষুদ্রতাকে পরিহার করিয়াছি বলিয়া আমরা একক, কিন্তু সত্যের কল্যাণলোকে যে আমরা এক। সংঘ তো শুধু মত্ত দন্তীকে বাঁধিবার জন্য তৃণগুচ্ছকে একত্র করে নাই—সে যে শ্যামলশষ্পসম্ভারে তাহাকে ধরিত্রীর কোমল বুকে বিছাইয়াও দিয়াছে—প্রাণের স্পর্শে তাহাকে প্রয়োজনের অতীত সৌন্দর্য্যালোকে সঞ্জীবিত করিয়া রাখিয়াছে। আমাদের তুচ্ছ প্রয়োজনের গণ্ডীর মাঝে তাহাকে টানিয়া আনিয়া নিজের বুদ্ধির দৈন্যে তাহাকে মলিন দেখিব কেন?

ভারতে আজ নবজাগরণের দিন আসিয়াছে—আমাদের এই ভবনকুঞ্জবীথিকায় আজ নূতন সুরে প্রভাতী কাকলি বাজিয়া উঠিয়াছে। অচেতন ভাবে, অনায়াস নিশ্চেষ্টতায় এত দিন একলা যে ধন ভোগ করিয়া আসিয়াছিলাম, আজ বিশ্বের অগ্নিপরীক্ষায় তাহার পরখ হইবে—আমার জিনিসকে কেবল আমার বলিয়া আর বিশ্বের দাবীকে ঠেকাইয়া রাখিতে পারিব না। এই নবীন ঊষার সম্মুখ পানে যে আকর্ষণ অর্দ্ধচেতন ভাবে আমরা অনুভব করিয়াছি, স্বপ্নবিজড়িত চক্ষে আজ আমরা তাহারই নির্দ্দেশ মানিয়া পথ চলিয়াছি—কিন্তু এখনও কি কোথায় আমাদের এ যাত্রা শেষ হইবে, তাহা জিজ্ঞাসা করিবার সময় আসে নাই? এই পথ চলার প্রয়োজনটুকু যদি আমাদের আপন স্বার্থের মাঝেই নিঃশেষ হইয়া যাইত, তাহা হইলে তো আর সংঘরূপ মহাশক্তির লীলানিকেতনে আমরা স্থান পাইতাম না।

হয়ত আপনার প্রয়োজনেই আমরা ঘরের বাহির হইয়াছিলাম, কিন্তু সে প্রয়োজন সিদ্ধির এমন অপূর্ব উপায় দেখাইয়া দিল কে? মুক্তির নির্জ্জন সাধনার স্থানে কর্ম্মের মুখর উচ্ছ্বাস জাগাইয়া তুলিল কে? শুধু নিজকে নিয়া সাধ মিটানোই যদি আমাদের উদ্দেশ্য হইত, তবে সংঘভূমিতে আমাদের মন টিকিত কি? যেদিন হইতে একের স্থানে দশের ভালমন্দকে আমরা বরণ করিয়া লইয়াছি, সেই দিন হইতে আমাদের জীবনের ধারা অলক্ষ্যে পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে—সে দিন হইতে নিজের মোক্ষকেও আমরা তুচ্ছ করিতে শিখিয়াছি। আমরা কেহ হয়ত এ কথা জানি, কেহ জানি না। কিন্তু এক দিন এই কথাই আমাদের জীবনে এমন নিঃসংশয় হইয়া দেখা দিবে যে, সেদিন তাহার কাছে আত্মসমর্পণ

না করিয়া এক পা অগ্রসর হওয়াও আমাদের পক্ষে অসম্ভব হইবে। কিছু মাত্র না বুঝিয়া কেবল ভালবাসার আকর্ষণে যদি আমরা সংঘে প্রাণ ঝাঁপিয়া থাকি—তবে সেইদিনই আমাদের ভালবাসার পরীক্ষা হইবে। সেই দিনই বুঝিব, ভালবাসা শুধু চোখের দেখাতে শেষ হয় না, অন্তর দিয়া না দেখিলে ভালবাসা নিষ্ফল। ভালবাসা শুধু বাঞ্ছিতকে পাইয়া আপনাকে চরিতার্থ মনে করা নয়—আপনাকে বাঞ্ছিতের মাঝে বিলাইয়া তাহারই আনন্দ সায়রকে উদ্বেলিত করিয়া তোলাতেই ভালবাসার সার্থকতা।

আরণ্যক

"যজ্ঞেন বাচঃ পদবীয়মায়ন্ তামন্ববিন্দন্ ঋষিষু প্রবিষ্টাম্ ॥"

—ঋগ্বেদ সংহিতা ১০।৬।৩

কর্ম্মের সঙ্ঘাতে দেহ মন নৃত্য করিয়া উঠুক, কিন্তু তাহার মাঝে নিজকে হারাইয়া ফেলিও না। একটি মনকে যেমন কাজের মাঝে ডুবাইয়া রাখিবে, আর একটি মনকে তেমনি সতর্ক পাহারায় নিযুক্ত করিবে। কাজে অহং জন্মিতে থাকিলে বুঝিবে বাধন আল্গা হইতে বসিতেছে। এই প্রহরী মনকেই জীবনের সাক্ষী পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া ভাল-মন্দের নিরপেক্ষ বিচারের ভারার্পণ করিও। তখন ক্রমশঃ বুঝিতে পারিবে, এই মনই কেমন করিয়া তোমার আত্মার সঙ্কেতস্থানীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

*

কেবল দিনের মাঝে দু'চার বার আড়ম্বর করে বসলেই ধ্যান অভ্যাস হয় না। সব সময়েই ধ্যান করা প্রয়োজন। হাঁটতে চলতে শুতে বসতে মনকে ধ্যেয় বস্তুতে তন্ময় রাখতে হবে। মনের বিক্ষিপ্ত গতিকে নিয়ন্ত্রিত করে কেন্দ্রীকৃত করার জন্যই ধ্যানের আবশ্যক। আতসকাচে সূর্য্যের বিক্ষিপ্ত রশ্মিগুলি সংহত হলে যেমন তাদের তাপ প্রচণ্ড হয়ে ওঠে, তেমনি মনের বিক্ষিপ্ত শক্তি একটা লক্ষ্যে স্থির হলে অন্তরে এমন একটা জ্যোতির্ম্ময় শক্তির আবির্ভাব হবে, যা অনায়াসে তোমার স্বরূপলাভের সমস্ত বাধা দূর করে দেবে। শত কর্ম্ম-কোলাহলের মাঝেও যদি লক্ষ্যে মনটী স্থির রাখতে পার, তবে দেখবে যোগিজনদুর্ল্লভ অবস্থা তোমার মাঝে স্বতঃস্ফূর্ত্ত হয়ে উঠবে।

*

দুঃখ-জ্বালা, বিপদ-আপদের ভিতর দিয়া তিনি যে-কত কথাই বলেন, কত ইঙ্গিতই দেন, তা যে বুঝিতে না পারে সেই দুঃখে বিপদে অভিভূত হইয়া পড়ে। আর বুঝিতে

যিনি পারেন, দুঃখসুখ বিপদ-সম্পদ তাঁহার কাছে সমান।

*

বহির্মুখীনতা হইতে মনকে গুটাইয়া লও। সাধনপথ ধরিয়া ক্রমশঃ তোমাকে অগ্রসর হইতে হইবে, ইহাই মঙ্গলময়ের মঙ্গল বিধান। সমস্ত বাধা অতিক্রম করিয়া তাঁরই ইচ্ছা তোমার মাঝে মূর্ত্ত হইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে। চিত্তের প্রবৃত্ত অভিমুখী গতি রুদ্ধ করিলেই এ কথা বুঝিতে পারিবে। নিজের জীবনকে যদি ভালবাস, তবে তার উন্নতির জন্য যত বড় কঠোরতাই করিতে হউক না কেন, তাহা করিতে কুণ্ঠিত হইবে কিসের জন্য? যে কোনও প্রলোভনে পড়িয়া তোমার আপন দেহ-মনের উপর দরদ আসে, তাহাই তোমার ঘোর শত্রু—বন্ধনের তাহাই প্রধান নিমিত্ত। ক্ষণিকের ও ক্ষণস্থায়ী প্রলোভনের মোহে মজিয়া ভবিষ্যৎ জীবনের অনন্ত উন্নতির পথ রুদ্ধ করিও না। বার বার তোমার এই ভিতরের কলুষের কাছে পরাভব স্বীকার করিতে হইবে, বার বার তোমার সদিচ্ছা পণ্ড হইয়া যাইবে। কিন্তু তবুও যদি এই অবস্থা হইতে মুক্ত পাওয়ার সাধু ইচ্ছা নিষ্ঠার সহিত ধরিয়া থাক, তবে একদিন সহসা দেখিতে পাইবে, তাঁরই অদৃশ্য শক্তির অলক্ষ্য প্রেরণায় চিত্তের সমস্ত মলিনতা ধুইয়া গিয়াছে। আর সেই স্বচ্ছ চিত্তে তাঁর ইচ্ছাই পরিস্ফুট হইয়া আপন কার্য্য সাধিয়া লইতেছে। কুরুক্ষেত্র মহাযুদ্ধের প্রধান নায়কের মত তুমি নিমিত্ত হইয়া রহিয়াছ মাত্র।

বাঁচতে যিনি চান, তিনি নিজকে নিজে মেরে ফেলতে শিখুন। আমাদের, আমিত্বকে মেরে না ফেললে ক্ষুদ্রের মাঝেই আমি আবদ্ধ থাকবে, আর সেই জন্য বার বার আমাকে মরতে হবে। কিন্তু আমিত্বের নাশ হলে মহানের মাঝে—ব্রহ্মের মাঝে আমার প্রাণ প্রতিষ্ঠা হবে, সুতরাং মরণের ভয় আর থাকবে না। জীবন-মরণের এই তত্ত্ব যিনি উপলব্ধি করিতে পেরেছেন, তিনই জীবনসমুদ্র মথন করে অমৃত পানে অমর হয়েছেন, আর তা যারা পারে না, তারা জীবন্মৃত।

*

বাস্তব জীবনের মত্ততা হইতে নিজকে দূরে সরাইয়া রাখিও। এই বিপুল কর্ম্মচাঞ্চল্যময় জীবনের অন্তরালে যিনি "বৃক্ষ ইব স্তব্ধঃ" হইয়া আছেন, তিনিই তোমার লক্ষ্য। যৌবনের উচ্ছাসে প্রমত্ত থাকিয়া তাঁহাকে পাইবে না—তাঁহাকে পাইবে একমাত্র বৈরাগ্যসাধনে। এই বৈরাগ্য কেবল কম্বল সম্বল করিয়া বৃক্ষতলে আশ্রয় নেওয়া নয়—প্রবৃত্তিপথের প্রতি তোমার যে স্বাভাবিক অনুরাগ রহিয়াছে, তাহা হইতে নিবৃত্ত হইয়া মনের ভিতর ভোগে যথার্থ বিরাগ আনয়ন করার নামই বৈরাগ্য। "বৈরাগ্যমেবাভয়ম্"—এই বৈরাগ্যই তোমাকে ত্রিতাপভীতি হইতে মুক্তি দিয়া জরামরণাতীত অমৃতরাজ্যে লইয়া যাইবে—ইহাতেই তোমার স্ব-স্বরূপে অবস্থান।

*

বাহিরের দিক দিয়া দেখিলে প্রত্যেক মানুষকেই স্বতন্ত্র বলিয়া মনে হয়। কিন্তু চিত্তকে শুদ্ধসত্ত্ব করিলে দেখিতে পাইবে, বিশ্বের সঙ্গে পরস্পরের অবিচ্ছিন্ন-যোগ—একই সূত্রে সকলে বাঁধা। একই ঘাটে

বাঁধা বীণার একটি তারে আঘাত করিলে যেমন অপর বীণাতেও তার ঝঙ্কার উঠে, তেমনি তোমার মাঝে যে ভাবের ক্রীড়া চলিতেছে, তোমাতেই তাহা অবরুদ্ধ থাকে না—বিশ্বের মাঝে তাহা ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। এই যে এক এক সময় তোমার মাঝে এক এক ভাবের লহরী খেলিয়া যায়, এগুলি মানুষের পূর্ব্বতন চিন্তাতরঙ্গেরই এক একটি ঢেউ; তোমার জীবনের সুরের সঙ্গে ইহার সুর মিলিয়াছে বলিয়াই তোমার চিত্তে তাহারা স্থান পাইয়াছে। নিজকে কুচিন্তায় কুভাবনায় নিয়োজিত রাখিবার অধিকার তোমার নাই। তাহাতে যে শুধু তোমারই অনিষ্ট তাহা নয়—অপরকেও তাহা প্রভাবান্বিত করিবে। গায়ে একটা ফোঁড়া উঠিলে তাহাতে যেমন সমস্তটা শরীরই বিষ হইয়া যায়, তেমনি এই বিরাট বিশ্বদেহের ক্ষুদ্রতম অঙ্গ যে তুমি—তোমার অন্তরের কলুষ জগতকে আরও কদর্য্য করিয়া তোলে। এতখানি দায়িত্ব স্কন্ধে লইয়াই মানবত্বের অধিকার পাইয়াছ, ইহার গৌরব রক্ষা করাই জীবনের সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য বলিয়া স্মরণ রাখিও।

*

ভগবদ্বাণী অতি নীরব, নিথর, শান্ত, স্নিগ্ধ। তাই সে বাণী শুনিতে হইলে নিজ হৃদয়ের নীরব প্রদেশে ধ্যানমগ্ন হইয়া যাও, কিম্বা প্রকৃতির অনন্ত নীরবতার মাঝে নিজকে লয় করিয়া দাও।

*

ভগবানকে যা নিবেদন করিতে হইবে, তা শুধু মুখের কথা, মনের খেয়াল বা বুদ্ধির কেরামত হইলে চলিবে না। আমাদের অন্তরের অন্তস্তলের শুদ্ধ মৌন ভাবরাশিই তাঁহাকে নিবেদন করিয়া দিতে হইবে। এই ভাবশুদ্ধি না হইলে সমস্ত প্রার্থনা, সমস্ত সমর্পণ বৃথা হইয়া যাইবে।

*

ভগবানের দিকে যখন চলিতে থাকিবে, তখন তটিনীর মৃদুমধুর কল্লোল, মলয়ানিলের সুখকর স্পর্শ, চন্দ্রের অমিয়স্নিগ্ধ কিরণ তোমার নিকট প্রাণবন্ত হইয়া উঠিবে—তারা তোমার কাণে কাণে কত কত কথাই যে বলিয়া যাইবে, তা শুনিয়া তুমি নিজেই অবাক্ হইয়া যাইবে।

*

শঙ্করাচার্য্যের জ্ঞানকে আশ্রয় করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গের প্রেমকে বরণ করিয়া লও। সহজ কথায় শঙ্করের মত ও গৌরাঙ্গের পথ—ইহাই তোমার আদর্শ। জ্ঞানের অনুশীলনে যাহাকে তুমি তত্ত্বের দিক দিয়া অসীম বলিয়া উপলব্ধি করিবে, তিনিই রূপে রসে সৌন্দর্য্যে সসীমের মাঝে ধরা দিয়াছেন—ইহাই তাঁহার লীলা-বিলাস—অরূপের রূপে অবতরণ। তুমিও যখন এই রূপের মাঝে বাঁধা পড়িয়াছ, তখন তোমার এইরূপ যাঁহার পায়ে প্রত্যর্পিত হইলে সার্থক হইয়া উঠিবে, সেই ভগবানের শ্রীচরণেই সব বিলাইয়া দাও—বাঁশীর মত নিজকে ফাঁকা করিয়া ফেল। তবেই দেখিবে, তাঁর ভুবনভুলান সুর তোমার মাঝে বাজিয়া উঠিয়াছে।

বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং

ওঁ তৎ সৎ

শ্রেণী সং
কলিকাতা।

আর্য্য-দর্পণ

(সনাতন ধর্ম্মের মুখপত্র)

১৩শ বর্ষ } আষাঢ় { ৩য় সংখ্যা

ইন্দ্রঃ

[ঋগ্বেদসংহিতা —১।২৩।১]

আ নস্তে গন্তু মৎসরো
বৃষা মদো বরেণ্যঃ।
সহাবাঁ ইন্দ্র সানসিঃ
পৃতনাষাডমর্ত্ত্যঃ॥

ত্বং হি শূরঃ সনিতা
চোদয় মনুষ্যো রথম্।
সহাবা দস্যুমব্রতম্
ওষঃ পাত্রং ন শোচিষা।

শুষ্মিন্তমো হি তে মদো
দ্যুম্নিন্তম উত ক্রতুঃ।
বৃত্রঘ্না বরিবো বিদা
মংসিষ্ঠা অশ্বসাতমঃ॥

যথা পুর্ব্বেভ্যো জরিতৃভ্য ইন্দ্র
ময় ইবাপো ন তৃষ্যতে বভুথ।
তামনুত্বা নিবিদং জোহবীমি
বিদ্যামেষং বৃজনং জীরদানুম্॥

বহুক্ আজি তোমার পানে হর্ষবহা সোমের ধারা,
বরেণ্য যা, তৃপ্তিভরা, মাতায় সবে পাগলপারা—
বর্ণ ধরে সোণার মতন, জোটায় যে তার সহায় কত,
অমর যাহা মরের মাঝে, শত্রুসেনা কর্‌ল হত।

ইন্দ্র, তুমি বীরের সেরা, ভুবন ভরে তোমার গানে,
নরের রথে দেব্-সারথি, ছুটাও তারে স্বরগপানে;
দস্যু যে ওই ভাঙ্গ্‌ল ব্রত—আজকে যত সহায় নিয়ে,
নিঠুর তেজে পোড়াও তারে—পোড়াও তারে আগুন দিয়ে!

হর্ষ তোমার ছড়িয়ে পড়ে, বীর্য্যে কাঁপায় নিখিল ধরা—
কর্ম্ম তোমার উজ্‌লে উঠে করছে গৃহ অন্নভরা—
বজ্রে তোমার বৃত্র মরে, কীর্ত্তিতে ঘর ভরছে বনে,
ভক্তেরে যে কর্‌লে তেজী—জানছ সবি আপন মনে।

যুগ ধরি তোমা স্মরি কবিরা
গান যে গেয়েছে—
পিপাসায় জল হেন তোমাতেই
সুখ তো পেয়েছে।
বারে বার তাই আজি পিয়াসী
কণ্ঠে ফুকারি,
"দাঁড়ায়ে যে দুয়ারে আয়ু-বল-
অন্ন-ভিখারী।"

নামদেব

মহীপতি নামদেবের যে জীবনী লিখিয়াছেন, তাহাতে বিষোবা কেশরের শিষ্যত্ব গ্রহণ ও তীর্থভ্রমণ ছাড়া নামদেবের জীবনের আর কোনও উল্লেখযোগ্য ঘটনার কথা বলেন নাই। তবে নামদেবের অলৌকিক ক্ষমতা, তাঁহার ভক্তি, জীবে দয়া প্রভৃতি বৈষ্ণবোচিত গুণ সম্বন্ধে যে দুই একটী কাহিনীর উল্লেখ আছে, আমরা পাঠকবর্গকে তাহা উপহার দিতেছি।

তীর্থভ্রমণ শেষ করিয়া নামদেব স্বগ্রামে ফিরিয়া আসিয়া প্রচলিত রীতি অনুসারে ব্রাহ্মণ ভোজনের আয়োজন করিলেন। কথিত আছে, এই ব্যাপারে স্বয়ং বিঠোবা আসিয়া নাকি পরিবেষণের ভার লইয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ ভোজন শেষ হইয়া গেলে সারা দিনের পর নামদেব যখন আহারে বসিলেন, তখন এই আশ্চর্য্য পরিবেষণকারীটীও আসিয়া তাঁহার সঙ্গে বসিয়া গেলেন। নামদেব শূদ্র, আর তিনি ব্রাহ্মণ ; কাজেই ব্যাপার দেখিয়া ব্রাহ্মণ-সম্প্রদায় মহা কোলাহল করিয়া উঠিল। কথিত আছে, ভক্তের মান বাড়াইবার জন্য স্বয়ং বিঠোবা তখন আত্মপ্রকাশ করিয়া সকলকে বুঝাইয়া দিলেন, যে তাঁহাকে ঐকান্তিক চিত্তে ভক্তি করে, তাহার কাছে জাতির বিচার থাকে না।

নামদেবের জীবিতকালেই তাঁহার খ্যাতি কত দূর ছড়াইয়া পড়িয়াছিল, নিম্নলিখিত কাহিনীটী তাহার প্রমাণ। বিদরের এক ধনী ব্রাহ্মণ বিঠোবার উদ্দেশ্যে নিজ বাড়ীতে মহোৎসব করিবার সঙ্কল্প করেন। এই উপলক্ষ্যে তিনি নামদেবকে ভজন গাহিবার জন্য নিমন্ত্রণ করেন। নামদেব তাঁহার কীর্ত্তনের দল লইয়া ভজন গাহিতে গাহিতে যখন নগরে প্রবেশ করিলেন, তখন নগরের মুসলমান রাজার কর্ম্মচারীরা আসিয়া তাঁহাদিগকে ঘেরাও করিয়া এমন হল্লা করিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিল। নামদেব শান্তভাবে বলিলেন যে, তাঁহারা ভগবানের দাসমাত্র—ভগবানের গুণ গাহিয়া চলিয়াছেন, কোনও অশান্তি উপদ্রব করিবার উদ্দেশ্য তাঁহাদের নাই। কিন্তু কর্ম্মচারীরা তাঁহার কথা না শুনিয়া সকলকে ধরিয়া রাজার নিকট লইয়া গেল। রাজা সকল কথা শুনিয়া বলিলেন, তোমরা যে ভগবানের সেবক, তা প্রমাণ কর। এই বলিয়া সভায় একটা গোহত্যা করাইয়া নামদেবকে গরুটী পুনর্জীবিত করিতে আদেশ দিলেন। কথিত আছে, নামদেবের আকুল প্রার্থনায় আবার নাকি গরুটী বাঁচিয়া উঠিয়া ভক্তের মান অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিল।

আর একদিন গোণাবাই পীড়িত হওয়ায় পুত্রকে কতকগুলি গাছগাছড়া আনিতে পাঠাইয়া দেন। নামদেব গাছের পাতা ছিঁড়িতে গিয়া তাহার বোঁটা হইতে রস ঝরিতে দেখিয়া প্রাণে বড় ব্যথা পাইলেন। হাতে যে কাটারীখানা ছিল, তাহাই দিয়া তিনি নিজের শরীর হইতে মাংস কাটিয়া তুলিয়া গাছের গায়ে প্রলেপ দিতে লাগিলেন। এই সমস্ত ঘটনা উপলক্ষ্য করিয়া মহামতি রাণাড়ে যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন, "এই মহাত্মারা যে যুগের আবহাওয়ার মধ্যে বাস করিতেন,

তাহার একটু স্পর্শ যে না পাইয়াছে, তাহার কাছে এই তীব্র অধ্যাত্মবোধ বিসদৃশ ঠেকিবেই। কিন্তু ইহার সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার কোনও কারণ নাই এবং একথাও নিশ্চিত যে আমাদের আধ্যাত্মিক উৎকর্ষের আদর্শ চিরদিন ধরিয়া এই ধারাতেই গড়িয়া উঠিয়াছে। হইতে পারে আমরা আজকালকার যুগে এত সহজে নুইয়া পড়ি না, কিন্তু তাই বলিয়া ছই শত বৎসরের পূর্ব্ববর্ত্তী এই সমস্ত মহাপুরুষের জীবনকে আমাদের যুগের অভাব-অভিযোগের মাপকাঠি দিয়া বিচার করা চলিবে না।"

নামদেবের সমসাময়িক আরও অনেক সাধক ছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের সকলের কথা এখানে বলা সম্ভবপর নহে। আমরা শুধু একটী মহীয়সী নারীর কথা বলিব—ইনি নামদেবের আ-যৌবন সঙ্গিনী ছিলেন। ইহার নাম জনীবাই। নামদেবের মত ইনিও কবি ও ভাবুক ছিলেন। নিতান্ত দরিদ্রের ঘরে ইঁহার জন্ম। অতি অল্প বয়সে ইঁহার পিতামাতা ইঁহাকে লইয়া পন্ধরপুরে তীর্থ করিতে আসেন। এখানে আসিয়া ক্ষুদ্র বালিকা জনী বিট্ঠলের বিগ্রহে কি যে দেখিলেন—আর তাঁহার পন্ধরপুর ছাড়িয়া যাইতে মন সরিল না। পিতামাতা কত বুঝাইলেন, কিন্তু কিছুতেই বালিকার মন টলিল না। অগত্যা সেই মহানগরীতে বালিকাকে একাকিনী রাখিয়া বিট্ঠলের পায় তাহাকে সঁপিয়া দিয়া অশ্রুভারাক্রান্ত হৃদয়ে তাঁহারা গৃহে ফিরিয়া গেলেন।

জনী একাকিনী—কিন্তু সেজন্য তাঁহার ভাবনার লেশমাত্র নাই—তিনি প্রাণ ভরিয়া বিট্ঠলের সেবা করিতেছেন, সেবার আনন্দে বিভোর হইয়া আছেন। দৈবাৎ একদিন বালিকার উপর নামদেবের দৃষ্টি পড়িল। তাহার কাহিনী শুনিয়া ও তাহার সুগভীর ভগবৎপ্রীতির পরিচয় পাইয়া নামদেব নিরাশ্রয়া বালিকাকে গৃহে আনিয়া গোণাবাইএর হাতে সঁপিয়া দিলেন। গোণাবাইএর মাতৃহৃদয়ে স্নেহের অভাব ছিল না—তিনি জনীকে আপন মেয়ের মতই পরম যত্নে লালন পালন করিতে লাগিলেন। জনী নামদেবের গৃহে থাকিয়া তাঁহার ধর্ম্মচর্চ্চায় সহায়তা করিতে লাগিলেন।

নামদেবের মত জনীও অনেক কবিতা ও গান রচনা করিয়াছিলেন—সেগুলি যেমন সরল, তেমনি মর্ম্মস্পর্শী। আজও মহারাষ্ট্রের গ্রামে গ্রামে, পাহাড়ে পাহাড়ে স্ত্রীলোকেরা জল তুলিবার সময়, রাখালেরা পশুচারণের সময় জনীবাইএর রচিত ভজনগান করিয়া থাকে। নামদেবের সাহচর্য্যে গৃহের নিত্য কর্ম্মের অনাড়ম্বরতার মাঝেই জনীর ভক্তি-প্রবণ হৃদয় ভগবানের গুণগানে অনুরণিত হইয়া উঠিয়াছিল।

জনীর সম্বন্ধে বিশেষ কোনও কিছু জানিবার উপায় নাই। কেবল তাহার সম্বন্ধে একটী কাহিনী মহারাষ্ট্রে প্রচলিত আছে। একদিন জনী যাঁতায় গম পিষিতেছেন আর আপন মনে গুণ গুণ করিয়া ভজন গাহিতেছেন, এমন সময় একটী প্রিয়দর্শন পুরুষ আসিয়া তাঁহার নিকট হইতে যাঁতাটা কাড়িয়া লইয়া বলিলেন, "আমি যাঁতা ঘুরাই—তুমি আমাকে গান শোনাও।" অপরিচিত একজন পুরুষকে দেখিয়া জনী কোনও সঙ্কোচ অনুভব করিলেন না—বরং কি এক অননুভূতপূর্ব্ব আনন্দে তাঁহার হৃদয় ভরিয়া উঠিল—সে দিন জনীর কণ্ঠ হইতে যেন সুধার নির্ঝর ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। গোণাবাই গৃহান্তর হইতে মুগ্ধ হৃদয়ে এই উচ্ছ্বাসগীতি

শুনিতেছিলেন, হঠাৎ তাঁহার মনে হইল, "জনী যে অমন করিয়া গানে মাতিয়াছে, তবে যাঁতা ঘুরাইতেছে কে? মেয়েটা আর কাহাকেও ডাকিয়া আনিয়া কাজে ফাঁকি দিতেছে না তো?" এই ভাবিয়া জনীকে তিরস্কার করিবার জন্য যেই তিনি সেই গৃহে প্রবেশ করিলেন, অমনি যাঁতাঘুরানো বন্ধ হইয়া গেল, অপরিচিত পুরুষটীও কোথায় অন্তর্হিত হইয়া গেলেন। গোণাবাইএর আহ্বানে জনীর চমক ভাঙ্গিল, তাঁহার কাছে সকল কথা শুনিয়া উভয়ে বুঝিলেন, কে আজ নামদেবের গৃহে যাঁতা ঘুরাইতে আসিয়াছিলেন! গোণা বাই আবেগপূর্ণহৃদয়ে অশ্রুমুখী জনীকে বক্ষে চাপিয়া ধরিলেন।

—*—

ভজন রচনায় ও ভগবৎ-মহিমা প্রচারেই নামদেবের জীবনের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত হইয়াছিল। তাঁহার জীবন সম্বন্ধে খুঁটী নাটী কিছুই জানিবার উপায় নাই। প্রায় ৭০ বৎসর কাল তিনি জীবিত ছিলেন। এই সময়ের মধ্যে তিনি প্রায় তিন চারি সহস্র সঙ্গীত রচনা করেন। অধিকাংশ সঙ্গীতই সম্ভবতঃ ভাবের মুখে সদ্য সদ্য রচিত। নিম্নে আমরা নামদেবের কয়েকটী সঙ্গীতের গদ্যে মর্ম্মানুবাদ করিয়া দিলাম—পাঠক দেখিবেন, সঙ্গীতগুলিতে কি সরলতা, কি আকুলতা, অথচ কি সুগভীর অন্তর্দৃষ্টি।

ভগবানের ঐশ্বর্য্যের বিষয়ে নামদেব গাহিতেছেন—

"হে বিশ্বনাথ, তোমার শক্তিতে বেদবাণী সঞ্জীবিত—তোমার প্রেরণায় গ্রহ-নক্ষত্রমণ্ডলী আবর্ত্তিত—অপার তোমার মহিমা! তোমার এই মহিমাকেই সার সত্য জানিয়া তোমার পায় আপনাকে আমি সঁপিয়া দিলাম।

"মেঘের ধারাবর্ষণ তোমার শক্তিতে, অচলের অচল প্রতিষ্ঠা তোমার বীর্য্যে—তোমার নিঃশ্বাসে প্রভঞ্জনের প্রচণ্ড বেগ। তোমাকে ছাড়িয়া কাহারও তো নড়িবার সামর্থ্য নাই। হে প্রভো পাণ্ডুরঙ্গ, তুমিই তো সকলের মূল। নামদেব তাই সকলকে ডাকিয়া বলিতেছেন, শুধু উপবাসে আর তীর্থবাসে কি হইবে? শ্রদ্ধা আছে কি? প্রেম আছে কি হৃদয়ে? অনুতাপে পাপ-তাপ দূর হইয়া যাইবে—প্রাণ ভরিয়া তাঁহাকে ডাকিতে পারিলে তবে না তাঁহার দেখা পাইবে!"

*

"পাপে ভরা তোমার মন—তীর্থবাসে আর কি হইবে? যদি হৃদয়ে অনুতাপ না জাগে, তবে শুধু আত্মপীড়ন করিলেই বা কি হইবে? পাপ করিয়াছ মন দিয়া—মহাতীর্থে গেলেও কি তার ক্ষালন হইবে? সার কথা, সহজ কথা এই—পাপ যায় অনুতাপে। তাই নামদেব বলেন—ব্রত উপবাসে তপে তোমার প্রয়োজন কি? তীর্থবাসেই বা তোমার কি প্রয়োজন?

"দৃষ্টি রাখ চিত্তে আর কণ্ঠে ফোটাও হরির নাম। পানাহার ত্যাগেই বা কি ফল?—হরির চরণে চিত্ত মজিয়াছে কি?—চাই না যোগ, যাগ আর তপ—চাই শুধু শ্রীহরির চরণে নিবিড় অনুরাগ। নির্গুণকে ধরিবার জন্যই বা এত ব্যস্ততা কেন?—শুধু নামের প্রেমে মজ না একবার! নামে নিষ্ঠা হইলেই তিনি দেখা দিবেন—এই হইল নামের কথা।"

*

"সেই সাধু, যে দেখে সর্ব্বভূতে তার বাসুদেব—যার মাঝে নাই গর্ব্ব, নাই অহঙ্কার। আর সকলি তো মোহের শিকলে বাঁধা। সাধু যে, ধন তো তার কাছে শুধুই মাটী—নয় রতন শুধুই পাথর। বাসনাকে সে ছেড়েছে আর ছেড়েছে ক্রোধ—হৃদয়ে তার শুধু শান্তি, শুধু ক্ষমা। এক নিমেষ ফাঁক যায় না—অবিরাম তার রসনা জপে—গোবিন্দ—গোবিন্দ!"

*

"সত্যকে আশ্রয় কর—সত্যই নারায়ণ। চিত্তকে আর চরিত্রকে কর স্ফটিকের মত নির্ম্মল। লোকের নিন্দার ভয় কি তোমার—তুমি থাক আপন কাজে, তারা থাক নিন্দা নিয়া। বন্ধু তোমার সোহাগের ধন—তাঁর পায়ে আপনা সঁপিয়া দাও—যেন মান থাকে না, ভাণ থাকে না মনে। লোকের নিন্দা—সেই তোমার স্তুতি; আর লোকের স্তুতি—সে যে একেবারেই মিছা। মান চাহে কে পরের কাছে?—চরণে ধ্যান অটুট থাকে, এই তো শুধু চাই। প্রাণের জোরে এই কথাটী আঁকড়ে ধর, আর শ্বাসে শ্বাসে তাঁর নাম কর।

*

"এক তিনি—তবুও বহুকে বেড়িয়া আছেন—বহুর মাঝেও পূর্ণ তিনি। যে দিকেই চাও—সে দিকেই তো তিনি। তাঁহাকে বোঝে, এমন কে আছে?—মায়ার আঁকা ছবির ছায়াতেই পাগল সব। সকলি আমার গোবিন্দ—সকল ঠাঁই আমার গোবিন্দ—গোবিন্দ ছাড়া আর কি আছে জগতে? যেমন একটী সূত্রে গাঁথা থাকে কত শত মুক্তার দানা—তেমনি প্রভুতেই গাঁথা আছে সব। তরঙ্গ আর বুদ্বুদ আর ফেনা, জল হইতে পৃথক্ নয় তো। এই অসীমপ্রসার বিশ্ব তো তাঁরই খেলা—তাঁকে যখন ভাবি, তাঁতে যখন মজি—তখন আর পৃথক আমি রহিলাম কই? মায়ার খেলা—স্বপনের খেলা—তাকেই ভাবি খাঁটী। গুরুর উপদেশে মন জাগিল যখন—তখনই বুঝিলাম সত্য কেমন। ভাবিয়া দেখ, যা কিছু দেখ, সকলই শ্রীহরির। তাই নাম বলেন, ঘটে ঘটে আমার সেই মুরারি—কোনও ছেদ নাই, কোনও ভেদ নাই কোথাও।"

*

"কলসী পূরিয়া জল আনিলাম, দেবতাকে স্নান করাইব বলিয়া। কিন্তু বিয়াল্লিশ লক্ষ প্রাণী আছে সে জলে—আমার বিট্‌ঠল তো তাদের মাঝে;—তবে আর আমি স্নান করাই কাকে? যেখানে যাই, সেখানেই আমার বিট্‌ঠল—আনন্দ লীলায় বিভোর। ফুল তুলিলাম, মালা গাঁথিলাম, তাঁহার পূজা করিব বলিয়া। কিন্তু ভ্রমরে যে সে ফুলের ঘ্রাণ নিয়াছে—আমার বিট্‌ঠল তো ছিল তারও মাঝে;—এখন আমি করি কি? দুধ আনিয়া ক্ষীর করিলাম, বিট্‌ঠলকে ভোগ দিব বলিয়া। কিন্তু গো-বৎস যে তার স্বাদ নিয়াছে সবার আগে। তার মাঝেও তো বিট্‌ঠল—তবে আর ভোগ দিই কার? এই এখানে বিট্‌ঠল, ওই ওখানে বিট্‌ঠল—বিট্‌ঠল ছাড়া জগতে তো নাই কিছুই। সব ঠাঁই জুড়িয়া আছ তুমি—সকল জগতে ছড়াইয়া আছ তুমি—নামদেব রইল তোমার পায়।"

*

"হৃদয় আমার জ্বলে কি জ্বালায়—দেখ না তুমি—রইলে কোথায়? তর সহে না

—এসো আমার দেবতা, আমার রাজা!

তোমা বিনা প্রাণ বাঁচে না—রইলে কোথায়? তর সহে না—এসো আমার দেবতা, আমার রাজা!

"আমায় বাঁচানো ভার কি তোমার? —রইলে কোথায়? তর সহেনা—এসো আমার দেবতা, আমার রাজা!

"এস বঁধু—তোমার নাম যে ডাকে তোমায়—রইলে কোথায়? তর সহে না—এসো আমার দেবতা, আমার রাজা!"

*

"ডাক আমার গেল না তোমার কানে—আমার এই আর্ত্তপ্রাণের করুণ গাথা? এ কি আমার ললাট লেখা?

"পায়ে ঠেলে যাও যে তুমি, ব্যথা বাজে না প্রাণে? তুমি ছাড়া কে আছে আর—কে আছে আমার? কান্না ভরা এই হৃদয় আমার—এরে সঁপি কার পায়?

"তোমার অলখ নূপুর যেমন বাজে—দেশ-বিদেশে তেমনি বাজে তোমার নামের বীণ্; পিসাসায় যার কণ্ঠ জ্বলে, শান্তি-সুধা পিয়াও তারে।—এই তো আমার আশা।

"বিশ্বের ভার বইছ তুমি—আমার ভার কি এতই ভারী? আড়াল ঘুচাও, পাণ্ডুরঙ্গ—মায়ের স্নেহে প্রকাশ তুমি; তোমার নামের আজ তোমার বুকেই বাসা।"

যোগসূত্রবৃত্তি

বিভূতিপাদ

ইতিপূর্ব্বে পাঁচটী বহিরঙ্গ সাধনার কথা বলা হইয়াছে, এক্ষণে পূর্ব্বোদ্দিষ্ট ধারণা প্রভৃতি তিনটী অঙ্গের স্বরূপ নির্ণীত হইবে। ইহার পর সংযমের সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করিয়া বাহ্য ও আভ্যন্তর নানা প্রকার সিদ্ধির কথা বলা হইবে।

নাভিচক্র, হৃদয় পুণ্ডরীক, মূর্দ্ধ জ্যোতিঃ, নাসিকাগ্র, জিহ্বাগ্র প্রভৃতি দেশে চিত্তকে বিষয়ান্তর হইতে নিবৃত্ত করিয়া স্থিরীকরণের নাম **ধারণা**। ধারণার পূর্ব্বে যে সমস্ত অঙ্গের সাধনা করিতে হইবে, তাহা এখানে স্মরণ করা কর্ত্তব্য। অবশ্য এই সমস্ত সাধনের কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। প্রথমতঃ মৈত্রী, করুণা, মুদিতা ও উপেক্ষারূপ চিত্ত-পরিকর্ম্ম দ্বারা অন্তঃকরণকে অনুশীলিত করিতে হইবে। তারপর যম নিয়ম অবলম্বন পূর্ব্বক আসন জয় করিয়া প্রাণায়াম দ্বারা প্রাণের বিক্ষেপ পরিহার করিতে হইবে। তারপর প্রত্যাহার দ্বারা ইন্দ্রিয় সমূহকে বিষয় সম্পর্ক হইতে গুটাইয়া আনিতে হইবে। ইহার পর নির্জ্জন প্রদেশে শরীরকে ঋজু করিয়া শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ্বের অভিঘাত হইতে মুক্ত থাকিয়া যোগী সম্প্রজ্ঞাত সমাধি অভ্যাসের জন্য নাসাগ্র প্রভৃতি দেশে চিত্তকে স্থির

করিবেন। ইহাই হইল ধারণা। (১)

ধারণার পর ধ্যান। সাধারণতঃ আমাদের প্রত্যয় বা জ্ঞানের ধারা একতান থাকে না। ক্ষণে ক্ষণে তাহার বিসদৃশ পরিণাম হইতে থাকে। যে দেশে চিত্তকে ধারণা করা হইয়াছিল এবং যে বিষয়কে ধারণার অবলম্বন স্বরূপ গ্রহণ করা হইয়াছিল, সেই দেশে এবং সেই বিষয়ে যদি প্রত্যয়ের বিসদৃশ পরিণাম না হইয়া একই বিষয়ে নিরন্তর প্রত্যয়ের উৎপত্তি হইতে থাকে, তবে তাহাই **ধ্যান**। (২)

এই ধ্যানই যখন অর্থমাত্রনির্ভাস হইয়া স্বরূপ-শূন্যের মত হয়, তখনই সমাধি। অর্থ ধ্যানের বিষয়। চিত্ত যখন ধ্যায় বিষয়াকারে আবিষ্ট হয়, তখন ধ্যায়ের স্বরূপ আপনিই ফুটিয়া উঠে, অথচ জ্ঞানের স্বরূপ অর্থাৎ আমিই ধ্যান করিতেছি ইত্যাকার অনুভব তখন অভিভূত থাকে, কাজেই ধ্যানের প্রত্যয়াত্মক স্বভাব না থাকায় তাহাকে স্বরূপ শূন্য বলিয়া মনে হয়। এই ধ্যেয় মাত্রের প্রকাশক প্রত্যয়শূন্যের মত অবস্থাকেই বলে **সমাধি**। সমস্ত বিক্ষেপ পরিহার করিয়া মন যখন সম্যকরূপে আহিত বা একাগ্র হয়, তখনই সমাধি। (৩)

এই তিনটী যোগাঙ্গের একটী পারিভাষিক সংজ্ঞা রহিয়াছে। একই বিষয়ে যদি ধ্যান, ধারণা ও সমাধি প্রবর্ত্তিত হয়, তবে তাহাকে যোগশাস্ত্রে বলে **সংযম**। (৪)

সংযম অভ্যাসের ফলে উহা আয়ত্ত হইলে জ্ঞাতব্য বিষয়ের প্রতিবেধরূপ যে সমাধিপ্রজ্ঞা, তাহা বিশারদ বা নির্ম্মল হয় অর্থাৎ সংযমে প্রজ্ঞাজ্ঞেয় সমস্ত বিষয়ই সম্যক প্রকাশিত হয়। (৫)

স্থূল সূক্ষ্ম অবলম্বনভেদে অবস্থিত যে চিত্তবৃত্তি, তাহাই চিত্তের ভূমি। ভূমিতে ভূমিতে সংযমের বিনিয়োগ করা কর্ত্তব্য। নিম্ন ভূমিসমূহ জয় করিয়া ক্রমশঃ তাহার পরবর্ত্তী ভূমিসমূহে সংযম করিতে হয়, কেননা নিম্নভূমিসমূহ জয় না করিয়া মাঝের ভূমি সমূহকে লঙ্ঘন করিয়া একেবারে প্রান্তভূমিতে তো কেহ সংযম লাভ করিতে পারে না। (৬)

সাধনপাদে বলা হইয়াছিল যে যোগাঙ্গ আটটী; কিন্তু সেখানে পাঁচটীর মাত্র লক্ষণ বলা হইয়াছে, শেষের তিনটীর লক্ষণ বলা হয় নাই। কেন?—পূর্ব্বের পাঁচটী অঙ্গ পরম্পরাক্রমে সমাধির উপকারক, অতএব তাহারাও যোগাঙ্গ বটে; কিন্তু পরবর্ত্তী তিনটী অঙ্গ সমাধিস্বরূপের নিষ্পাদক বলিয়া তাহারা সমাধির অন্তরঙ্গ। এইজন্যই তাহাদের কথা পৃথক করিয়া বলা হইয়াছে। (৭)

শূন্যভাবনারূপ আলম্বনশূন্য যে নির্ব্বীজ সমাধি, উক্ত যোগাঙ্গত্রয় কিন্তু পরম্পরাক্রমে তাহার উপকারক মাত্র; অতএব নির্ব্বীজ সমাধির পক্ষে এই তিনটী যোগাঙ্গও বহিরঙ্গ। (৮)

অতঃপর সংযম দ্বারা যোগসিদ্ধিলাভের কথা বলা হইবে। তাই সংযমের বিষয়টীকে ভাল করিয়া বুঝাইবার জন্য সূত্রকার তিনটী পরিণামের কথা বলিতেছেন। প্রথমতঃ নিরোধ পরিণামের কথা। যাহা গুণবৃত্ত, তাহা অবশ্য বিকারী। চিত্তও গুণবৃত্ত অতএব তাহা চঞ্চল। এক্ষণে প্রশ্ন এই, নিরোধক্ষণে এই চলিষ্ণু চিত্তের কিরূপ পরিণাম হইয়া থাকে?

নিরোধক্ষণে চিত্তের একদিকে থাকে ব্যুত্থান সংস্কার, অপর দিকে থাকে নিরোধ সংস্কার। এইক্ষণে একদিকে যেমন ব্যুত্থান-

সংস্কার অভিভূত হয়, তেমনি নিরোধসংস্কারও আবির্ভূত হয়। চিত্ত যে যুগপৎ এই উভয়ে অন্বিত হয়, ইহাকেই বলে **নিরোধ-পরিণাম**।

কথাগুলি আরও স্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন। পূর্ব্বোক্ত ক্ষিপ্ত, মূঢ় ও বিক্ষিপ্ত ভূমি তিনটীকে বলে ব্যুত্থান। নিরোধ চিত্তের পরিণামবিশেষ—সত্ত্বপ্রকর্ষ তাহার অঙ্গ। ব্যুত্থান ও নিরোধ উভয়ই চিত্তের পরিণাম, সুতরাং তাহাদের সংস্কার থাকিবে। ব্যুত্থানসংস্কারসমূহ চিত্তেরই ধর্ম্ম। যদিও প্রত্যয়েরই সংস্কার থাকে, তথাপি প্রত্যয়কে আর সংস্কারের উপাদান্ বলা চলে না। সংস্কার নিমিত্ত মাত্র। অধুনাতন প্রত্যয় সমূহ নিরুদ্ধ হইলেও পূর্ব্বতন প্রত্যয় নিমিত্তক সংস্কার সমূহ নিরুদ্ধ হইবে না। এই জন্যই চিত্তনিরোধ ক্ষণে ব্যুত্থান সংস্কার ও নিরোধ-সংস্কার উভয়ই বর্ত্তমান থাকে। তখন ব্যুত্থান সংস্কারের যেমন অভিভব হইতে থাকে, তেমনি নিরোধ-সংস্কারেরও প্রাদুর্ভাব হইতে থাকে। কোনও বস্তু নির্ব্বীর্য্য হইয়া কোনও কার্য্য করিতে অসমর্থ হইলে, তাহাকে বলে অভিভব। তেমনি প্রবর্ত্তমান অবস্থায় কোনও কিছু অভিব্যক্ত হইয়া অবস্থান করিলে তাহাকে বলে প্রাদুর্ভাব। নিরোধক্ষণে চিত্ত ব্যুত্থান সংস্কারের অভিভব ও নিরোধ-সংস্কারের প্রাদুর্ভাব—এই উভয়ের সহিত যুগপৎ যুক্ত থাকে বলিয়া তাহাকে পরিণামী বলা চলে। এই পরিণামই নিরোধ পরিণাম। নিরোধের সামর্থ্যের তারতম্য দেখিয়াও ইহার অনুমান করা চলে। যদিও গুণবৃত্ত চিত্ত সর্ব্বদা চঞ্চল বলিয়া তাহার নিশ্চল অবস্থা সম্ভবপর নহে, তথাপি ব্যুত্থানদশার তুলনায় আপেক্ষিক দৃষ্টিতে এই অবস্থাকে স্থৈর্য্য বলা চলে। (৯)

নিরোধ-সংস্কারের অভ্যাসে যদি পটুতা জন্মে, তবে চিত্তের প্রশান্তবাহিতা উৎপন্ন হয়, অর্থাৎ কোনও প্রকার বিক্ষেপ বর্ত্তমান না থাকায় চিত্তে তখন কেবল সদৃশ প্রত্যয় প্রবাহ অবলম্বন করিয়াই পরিণাম হইয়া থাকে। আবার নিরোধসংস্কার যদি মন্দা হইয়া যায়, তবে ব্যুত্থান সংস্কার দ্বারা তাহা পুনরায় অভিভূত হইয়া থাকে। (১০)

সর্ব্বার্থতা ও একাগ্রতা উভয়ে চিত্তেরই ধর্ম্ম। চিত্ত চঞ্চল বলিয়া যে নানাবিধ বিষয় গ্রহণে উন্মুখ হয়, ইহাই সর্ব্বার্থতা। আবার একটী মাত্র আলম্বন গ্রহণ করিয়া চিত্তের যে সদৃশ পরিণাম ঘটে, তাহাই একাগ্রতা। যদি যথাক্রমে সর্ব্বার্থতা ধর্ম্মের ক্ষয় বা অভিভব এবং একাগ্রতা ধর্ম্মের উদয় বা প্রাদুর্ভাব হইতে থাকে এবং চিত্তে সত্ত্বোদ্রেক হইয়া তাহা উভয়ের সহিত অন্বিত হইয়া অবস্থান করে, তবে তাহাকে **সমাধিপরিণাম** বলে।

নিরোধপরিণাম ও সমাধিপরিণামের মাঝে পার্থক্য এই—পূর্ব্বেরটা সংস্কারের অভিভব ও প্রাদুর্ভাব মাত্র। কিন্তু পরেরটী প্রত্যয়ের ক্ষয় ও উদয়। অভিভব প্রাদুর্ভাব বলিতে নির্ব্বীর্য্যতা ও বীর্য্যাধিক্য বোঝা যায়; কিন্তু ক্ষয় ও উদয়ে অতীতকক্ষায় প্রবেশ বা চিরশান্তি এবং বর্ত্তমান কক্ষায় প্রকটতা বা চিরপ্রকাশ বুঝায়। (১১)

তারপর একাগ্রতা পরিণাম। সমাহিত চিত্তে যে প্রত্যয় প্রবাহ চলিতে থাকে, তাহার মাঝে একটা যেমন শান্ত বা অতীতকক্ষায় প্রবিষ্ট হয়, তেমনি তাহার পরেই ঠিক পূর্ব্ব প্রত্যয়ের মতই আর একটি প্রত্যয় উদিত বা বর্ত্তমান কক্ষায় স্ফুরিত হইতে থাকে।

চিত্ত একটি মাত্র আলম্বনে সমাহিত থাকে বলিয়া এই দুইটি প্রত্যয়ই তুল্য বা সদৃশ, এবং চিত্ত ইহাদের উভয়ের সহিতই অন্বিত থাকে। সমাধি ভঙ্গ না হওয়া পর্য্যন্ত এই প্রকার শান্তোদিত তুল্যপ্রত্যয়ের যে প্রবাহ চলিতে থাকে, তাহাকেই বলে **একাগ্রতা পরিণাম**। (১২)

যে তিনটী চিত্ত-পরিণামের কথা বলা হইল, তাহা হইতেই স্থূল ও সূক্ষ্ম ভূতসমূহের এবং বুদ্ধি, কর্ম্ম ও অন্তঃকরণ ভেদে অবস্থিত ইন্দ্রিয়সমূহেরও ত্রিবিধ পরিণাম বোঝা যায়। এই পরিণাম তিনটী—ধর্ম্ম-পরিণাম, লক্ষণ পরিণাম ও অবস্থা পরিণাম। যে কোনও ধর্ম্মীর পূর্ব্বধর্ম্ম নিবৃত্ত হইয়া যখন অপর ধর্ম্মের আবির্ভাব হয়, তখন তাহাকে বলে **ধর্ম্ম পরিণাম**; যেমন মৃত্তিকারূপ ধর্ম্মী পিণ্ডরূপ ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া যখন ঘটরূপ ধর্ম্মান্তর স্বীকার করিল, তখন তাহার হইল ধর্ম্ম-পরিণাম। আবার এই ঘটেরই কালভেদে লক্ষণ পরিণাম হইল। ঘট ভবিষ্যৎ গর্ভে নিহিত ছিল, তাহা হইতে উৎপত্তিকালে বর্ত্তমান কক্ষায় প্রবেশ করিল এবং পর মুহূর্ত্তেই অতীত কক্ষায় প্রবিষ্ট হইল। ঘটের এই কালিক পরিণামই **লক্ষণ পরিণাম**। আবার এই ঘটকেই যখন প্রথম দেখিলাম, তখন তাহা নূতন; কিন্তু সেই দৃষ্টির অপেক্ষাতেই পরক্ষণে তাহা আমার নিকট পুরাতন বলিয়া প্রতিভাত হইবে। অথচ পূর্ব্বক্ষণ ও পরক্ষণ উভয়ই সদৃশ। ঘট ইহাদের সহিত অন্বিত থাকায় তাহার **অবস্থা পরিণাম** ঘটিল। গুণবৃত্ত বস্তু মাত্রই চঞ্চল, সুতরাং ক্ষণকালও তাহার পরিণাম না হইয়া থাকিবার উপায় নাই। ১৩

পূর্ব্ব সূত্রে যে ধর্ম্মীর কথা বলা হইল, তাহার লক্ষণ কি? শান্ত, উদিত ও অব্যপদেশ্য ধর্ম্মের যাহা অনুপাতী, তাহাই ধর্ম্মী। নিজ নিজ ব্যাপার সম্পন্ন করিয়া যাহা অতীত কক্ষায় অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছে, তাহা শান্ত। যাহা অনাগত কাল পরিত্যাগ করিয়া বর্ত্তমানে স্বব্যাপারে নিযুক্ত, তাহা উদিত। আর যাহা শক্তিরূপে অবস্থিত, যাহাকে কোনও প্রকারে নির্দ্দেশ করা যায় না, তাহাই অব্যপদেশ্য। যেমন "সর্ব্বং সর্ব্বাত্মকম্।" এ কথার অর্থ এই, সব বস্তুতেই সব রকম ধর্ম্মপ্রকাশের শক্তি রহিয়াছে। তবে সব জিনিষ হইতে সব জিনিষ হয় না কেন? না হওয়ার কারণ এই যে, কার্য্য কারণের একটা নিয়ম বা ধাঁধা রহিয়াছে। সেই নিয়ম দ্বারা বস্তুর শক্তিপ্রকাশের যোগ্যতা নিরূপিত হয়। সর্ব্বত্রপ্রসারিণী শক্তি যখন যোগ্যতা দ্বারা অবচ্ছিন্ন হয়, তখনই তাহাকে বলা হয় **ধর্ম্ম**।

শান্ত, উদিত ও শক্তিরূপ অব্যপদেশ্য ধর্ম্মের সহিত যাহা অন্বিত, তাহাই ধর্ম্মী। স্বর্ণ দ্বারা হার গড়ান হইল, আবার সেই হার ভাঙ্গিয়া বলয় করা হইল। এখানে স্বর্ণ হাররূপ ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া বলয়রূপ ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করা সত্ত্বেও উভয়েই স্বর্ণের অনুবৃত্তি রহিয়াছে। ধর্ম্ম ভিন্ন ভিন্ন হইলেও ধর্ম্মী সামান্যরূপে তাহাদিগকে গাঁথিয়া রাখে; আবার ধর্ম্মী এক হইলেও ধর্ম্ম বিশেষরূপে ছড়াইয়া পড়ে। উভয়ত্র ধর্ম্মীকে আমরা স্থির রূপেই দেখিতে পাই। (১৪)

ধর্ম্মী এক; তবে তাহার অনেকরূপ পরিণাম সিদ্ধ হয় কি করিয়া? ধর্ম্মসমূহের যে ক্রম রহিয়াছে, প্রতিক্ষণে আমরা তাহার অন্যত্ব দেখিতেছি। ক্রমের অন্যত্ব হইতেই পরিণামের নানাত্ব সিদ্ধ হয়। মৃত্তিকার কণা হইতে পিণ্ড, পিণ্ড হইতে মৃৎকপাল, আবার কপাল

হইতে ঘট, এই রূপ নির্দ্দিষ্ট ক্রম রহিয়াছে। ইহা হইতে পরিণামেরও নানাত্ব জ্ঞান হয়। আবার এই একই ধর্ম্মীতে লক্ষণ ও অবস্থার যে ক্রম, তাহা হইতে পরিণামেরও নানাত্ব সম্ভব হয়। সমস্ত বস্তুই প্রতিক্ষণে সুনির্দ্দিষ্ট ক্রম অনুসারে পরিণত হইয়া চলিয়াছে। সুতরাং ক্রমের অন্যত্ব হইতেই পরিণামের অন্যত্ব পাওয়া যাইবে। চিত্তাদির যখন পরিণাম হয়, তখন সুখ, দুঃখ প্রভৃতি কতকগুলি ধর্ম্ম প্রত্যক্ষ উপলব্ধ হয়; আবার সংস্কার শক্তি প্রভৃতি ধর্ম্ম অনুমানবলে জানা যায়। কিন্তু সর্ব্বত্রই ধর্ম্মী ধর্ম্মসমূহে অনুস্যূত থাকে। (১৫)

———*———

প্রচার বনাম প্রকাশ

—*—

অনেক দিন আগে এক সাধু ছিলেন, তাঁর স্বভাবটী এমনি মিষ্টি ছিল যে স্বর্গ হতে দেবতারা পর্য্যন্ত মুগ্ধ হয়ে তাঁকে দেখতে আসতেন আর আশ্চর্য্য হয়ে ভাবতেন, মানুষ কি করে এমনি দেবতার মত হতে পারে। তিনি আপন মনে তাঁর দিনের কাজ করে যেতেন, আর ফুল যেমন তার গন্ধ বিলায়, তারা যেমন করে আলো ছড়ায়, অথচ জানে না তারা কি করছে, তেমনি করে তাঁর পুণ্যপ্রভাব চারদিকে ছড়িয়ে দিতেন।

তাঁর দিনের সকল কাজের মূল হচ্ছে এই দুটী কথা—তিনি দাতা আর তিনি ক্ষমাশীল। কিন্তু এ গুণ যে তাঁর আছে, সে কথা তাঁর মুখ থেকে কখনও বেরোয়নি—তাঁর হাসিতে, তাঁর স্নেহে, তাঁর সহিষ্ণুতায়, তাঁর বদান্যতায় সে ভাব ফুটে উঠত।

দেবতারা ভগবানকে বললেন, প্রভো, এই সাধুকে আপনি কোন অলৌকিক ক্ষমতা দিন।

ভগবান বললেন, আচ্ছা, দিচ্ছি; তাকে জিজ্ঞাসা কর দেখি, সে কি চায়।

দেবতারা গিয়ে সাধুকে জিজ্ঞাসা করলেন, ছুঁলেই রোগ আরাম হবে, এমন শক্তি চান আপনি?

সাধু বললেন, না, তা আমি চাই না; ও ভগবানের কাজ, ভগবানই করবেন।

—পাপী তাপী পথভ্রান্তকে সুপথে ফিরিয়ে আনতে চান কি?

—না, সে হচ্ছে দেবতাদের কাজ। আমি সাধক, প্রচারক নয়।

—আপনি ধৈর্য্যের প্রতিমূর্ত্তি হয়ে পুণ্য-প্রভাবে লোকের চিত্ত আকর্ষণ করে ভগবানের মহিমা জগতে প্রচার করতে চান কি?

—না, তাও চাই না। আমি যদি মানুষের চিত্তকে আকর্ষণ করি, তবে ভগবান হতে যে তাদের চিত্ত ফিরে যাবে। ভগবান তাঁর মহিমা প্রচার করবার আরও পন্থা জানেন।

দেবতারা অবাক্ হয়ে বললেন, তবে আপনি কি চান?

সাধু একটু হেসে বললেন, আমি আর

চাইব কি? ভগবানের দয়া যদি পাই, তাতেই কি আমার সব পাওয়া হবে না?

দেবতারা তখন জেদ করে বললেন, কিন্তু আপনাকে একটা না একটা সিদ্ধান্ত নিতেই হবে, নইলে জোর করে আমরা একটা কিছু দিয়ে যাব।

সাধু বললেন, আচ্ছা বেশ; আমাকে এই বর দিন যে, আমি না জেনে যেন পরের উপকার করতে পারি।

দেবতারা তো ভারী মুস্কিলে পড়লেন। তাঁরা সবাই মিলে পরামর্শ করে অবশেষে এই যুক্তি করলেন, সাধু চলতে ফিরতে যখনি তাঁর ছায়া তাঁর পিছনে বা পাশে পড়বে, তখন সেই ছায়ার স্পর্শে রোগ শোক-দুঃখ দূর হয়ে যাবে—অথচ তিনি তা জানতে পারবেন না।

ঠিক তাই হল। সাধু চলবার সময় তাঁর পিছনে বা আশে পাশে যখনই ছায়া পড়ত, তখনি ঊষর ভূমিতে শ্যামল শোভা ফুটে উঠত, শুষ্ক তরু মুঞ্জরিত হয়ে উঠত, মরা গাঙে জোয়ার বইত, শিশুর মুখে হাসি ফুটত, দুঃখিনী মায়ের বুকে আনন্দ উছলে উঠত।

কিন্তু সাধু আগের মতই তাঁর দিনের কাজ করে যেতেন, আর ফুল যেমন তার গন্ধ বিলায়, তারা যেমন করে আলো ছড়ায়—অথচ জানে না তারা কি করছে, তেমনি করে তাঁর পুণ্য প্রভাব চারদিকে ছড়িয়ে দিতেন।

তাঁর নিরীহ ভাব দেখে লোকে নীরব শ্রদ্ধায় তাঁর অনুগমন করত, তাঁর অলৌকিক শক্তির কথা কখনো কিছু বলত না। ক্রমে লোকে তাঁর নাম পর্য্যন্ত ভুলে গেল—তাঁকে সবাই ডাকত—"পুণ্য ছায়া।"

ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা, জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ।—সত্য তোমার কাছে এত বৃহৎ হয়ে দেখা দিক্ যে তার বিরাট সত্তার কাছে জগতের যত মায়ার খেলা, ধনজনের যত অভিমান, সব যেন শূন্যে মিলিয়ে যায়। সত্যের সঙ্গে তোমার একাত্মতা যখন ঠিক্ ঠিক্ খাঁটী হবে, তখন লোকের ঈর্ষ্যানিন্দা তোমার মর্ম্ম বিদ্ধ করবে না, গণ্ডার তার খড়্গাঘাতের ঠাঁই খুঁজে পাবে না তোমার মাঝে, বাঘ জানবে না কোথায় তার নখ বসাবে, তরবারি তখন তোমায় বিদ্ধ করবে না, কামানের অজস্র বর্ষণ তোমাকে স্পর্শও করবে না।

তোমার মৈত্রী শুধু সত্যের সঙ্গে। তোমাকে যদি একাও থাকতে হয়, তবুও সত্যকে নিয়েই বাঁচবে, সত্যকে নিয়েই মরবে। সত্য-জীবনের উজ্জ্বল শিখরে যদি তোমার অধিষ্ঠান হয়, তবে সেখানে একমাত্র ন্যায়ের সূর্য্য তোমার সাথী হলেই যথেষ্ট হবে। তোমার কাছ থেকে জীবনের যে জ্বলন্ত ইঙ্গিত পাবে, তা পেতেই দেখ্‌বে কত সাথী এসে জুটেছে। এমনি করে যদি সঙ্ঘ গড়, তবে সেটাই হবে স্বাভাবিক। কারু সঙ্গে রফা করে সঙ্ঘ গড়্‌তে যেও না। আমি চাই না, কেউ তার মত বদ্‌লাক্ বা কেউ আমার পথে চলুক—আমি চাই শুধু সত্যের উপর জীবন প্রতিষ্ঠা করতে। সত্যকে বাঁচাবার জন্য রক্ষকের ফৌজ দরকার হয় না। সূর্য্যের কিরণ প্রকাশ হতে কি দূতের বা প্রচারকের প্রয়োজন হয়? আমি তো সত্যের প্রচার করি না—সত্যই আমার মাঝে প্রেরণা জাগায়, আর আপনা হতেই ছড়িয়ে পড়ে।

আপনাকে মিলিয়ে-মিশিয়ে খাপ খাইয়ে নেওয়া সম্বন্ধে ক্রমবিবর্তনবাদী বল্‌ছে, মানুষ যদি এদিক-সেদিক কিছু ছেড়ে-ছুড়ে থাক্‌তে পারে, তবে এ জগতে বাস করাটা তো তেমন কঠিন ব্যাপার বলে মনে হয় না। কত প্রাণী, উদ্ভিদ, মানুষ এই কৌশলটা আয়ত্ত

করেছে বলে, তারা এবং তাদের বংশধরেরা এই জীবন-সংগ্রামের ঠেলাঠেলির মাঝেও আপন আপন হক বাঁচিয়ে চল্‌ছে। কি জান, বাঁচবার সঙ্কেত যিনি জানেন, তিনিই হলেন ঋষি। সমস্ত জগৎ এসে তাঁর সঙ্গে মিলে-মিশে থাক্‌বে, কেননা তিনি যে সমস্ত জগতের সঙ্গে মিলে-মিশে রয়েছেন। কামনাভরা ক্ষুদ্র আমিকে ত্যাগ করে ভূমার সঙ্গে যিনি জীবনের সুর মিলাতে পেরেছেন, তাঁর কাজে বাধা-বিপত্তি আবার কি? "ভূতহিতে রতি যাঁর আছে, পরিণামে তাঁরই জয়," কিন্তু একথাটার অর্থ মানুষে বড় ভুল বোঝে।

ভূতহিত বলব কাকে? মানুষ কি প্রত্যাশা করে, কি চায়, কি সমর্থন করে, সব সময় কেবল তারই খোঁজে থাকাকেই কি বলে ভূতহিত? ন্যায্য দাবী ছেড়ে থাকার মানে কি কেবল মানুষের মতে সায় দিয়ে চলা? না মানব-সেবারূপ মহৎ কর্ম্মের ধুয়া এটা?

না—ব্যক্তিকে সত্যের ভূমিকায় প্রতিষ্ঠিত করাই হচ্ছে যথার্থ ভূতহিত। যিনি আনন্দ ও প্রেমের সঙ্গে জীবনের সুরটী বেঁধে রেখেছেন; আর যে সত্য তাঁর হৃদয়ে প্রকাশ হয়েছে, সামঞ্জস্যের দোহাই দিয়ে তার কাটা-ছাঁটা না করে, যথার্থরূপে সবার মাঝে যিনি বিলিয়ে দিতে পেরেছেন, পরিণামে জয়ী হবেন তিনিই।

যখন তোমার বুকের মাঝে একটা আচম্‌কা ভাব জেগে ওঠে, তখন ঠিক তোমার চারপাশের হাজার লোকের চিত্তে তার সাড়া পড়ে—যদিও হয়ত তার সুস্পষ্ট একটা ধারণা তাদের মাঝে জন্মায়নি। এই যেমন ক্ষেতে যদি একটা তরমুজ পাকবার নমুনা হয়ে উঠ্‌ল, তবে বুঝতে হবে ক্ষেত-ভরা তরমুজই পেকে উঠ্‌বার উপক্রম হয়েছে। গাছে যখন একটী কুঁড়ি বা একটী কচি পাতা নূতন বেরোয়, বা যখন বসন্তে একটী গাছ আর সবাইকে ঠেলে মাথা জাগায়, তখন বুঝতে হবে, তার চারপাশের লক্ষ লক্ষ গাছে নূতন প্রাণের সাড়া পড়েছে। নীতিজগতে বা অধ্যাত্ম-জগতে নূতন সত্যের জন্ম একটা পুণ্য ব্যাপার—মায়ের গর্ভে ভ্রূণের জন্মের মত তা চিরপুণ্য; তাকে আচ্ছন্ন করবার চেষ্টা করা আত্মারই অপমান।

নিজের সম্বন্ধে যদি খাঁটী হতে পার, তবে অবাক্ হবে দেখে যে, সবার সম্বন্ধেই তুমি খাঁটী হয়েছ। ত্যাগ বল, সামঞ্জস্য বল, সবই হবে সত্যের অনুচর—একমাত্র সত্যই হল অপাপবিদ্ধ। লোক, আচার, খেতাব, ধন, বিদ্যা—এ সবকে মান দেখানোই হচ্ছে পৌত্তলিকতা। সংসারজ্ঞান হচ্ছে অজ্ঞান ঢাকবার একটা অছিলা মাত্র।

তারা আলো দেয় আনন্দে, সমুদ্র ঢেউ তোলে আনন্দে, চাঁদ হাসে আনন্দে—কেননা আত্মকেন্দ্রে প্রতিষ্ঠিত তারা—অপরের হৃদয়ের উদ্বেগ-চাঞ্চল্যে তারা মুসড়ে পড়ে না—আপনার অধিকারে বেষ্টিত তারা—ভগবানের সৃষ্টির মাঝে আর কে কোথায় কি ভাবে আছে, তার ভাবনায় দিন কাটায় না তারা। যে কর্ম্মভার ভগবান তাদের দিয়েছেন, তার মাঝেই সমস্ত শক্তি তারা প্রয়োগ করেছে বলে আজ তাদের জীবনে এই মহিমা। তোমাকে তুমি ফিরে পাবে বলে অটুট সঙ্কল্প কর। এই কথা মনে রেখো—আপনাকে যে পেয়েছে, তার সকল দুঃখ দূর হয়েছে।

হোক্ জীবনে, হোক্ মরণে—আমি চাই শুধু সত্য। হোক্ তা পাপ, হোক্ তা দুঃখ—অন্তঃপ্রজ্ঞার উপর হবে আমার প্রতিষ্ঠা।

হে সত্য, তোমার প্রেমী আমি; হে প্রেম, তোমার প্রতি সত্যসন্ধ আমি।

যারা কর্ম্মী, তারা যে একটা কিছু ঘটাতে চায়, নিরেট একটা কিছু ফল চায়, যাতে করে তাদের কাজ কর্ম্ম জাহির হয়ে পড়ে, খাতায় যাতে মাথাগুন্তি হিসাবে দলের লোকের সংখ্যা ফেঁপে ওঠে—এইগুলিই হচ্ছে অবিদ্যা শক্তি। হিসাব নিকাশের জন্য যত মাথা ব্যথা, তাতেই তো সর্ব্বনাশ হয়। একটা মড়ার মাঝে হয়ত এতখানি বিষ আছে, যাতে একটা জাতকে জাত জর্জ্জরিত হতে পারে, কিন্তু তাতেই কি মড়ার মাহাত্ম্য প্রকাশ হল না কি? এইজন্যই তো এক এক সময় একটা দুষ্ট মত মড়কের মত দেশে ছড়িয়ে পড়ে।

গাছ লাগিয়ে তাব ফল ধরিয়ে ফল খাবার জন্য মানুষ বড় ব্যস্ত বেশী। একেই বলে অশ্রদ্ধা ও স্বার্থপরতা। যীশু, নানক প্রভৃতি মহাপুরুষেরা যে গাছ লাগিয়ে গিয়েছিলেন, নিজের দেহটা পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিয়ে তার গোড়ায় সার দিয়ে গিয়েছিলেন, কিন্তু তার ফল ধরেছে, তাঁদের তিরোভাবের বহুপুরুষ পরে।

এমন সব বক্তা আছেন, যাঁরা ধূমকেতুর মত নিজের পেছনে খ্যাতি-প্রতিপত্তির একটা বিশাল বিপুল ল্যাজ জুটিয়ে নিতে চান, যদিও ধূমকেতুর মতই ল্যাজের গোড়ায় যে মাথাটা রয়েছে, তার কোন গুরুত্বই নেই।

বাজী পোড়াবার সময় খুব লোক এসে জড় হয়, কিন্তু বাজী পুড়ে গেলেই আর সেখানে কিছুর চিহ্নমাত্রও থাকে না। কিন্তু বাজীর আলোতে যে তিড়বিড়ে নাচ, তার কোনও সংশোধন কি হয় কোনও দিন? অথচ কাজ দেয় আমাদের প্রদীপের স্থির শিখাতে, হোক্ না সে যতই ছোট।

ভারকেন্দ্রকে বাইরে রেখো না। প্রেম আর আত্মবিসর্জ্জন নইলে চরিত্র গঠিত হয় না। পরহিত তার সহায়ক।

শূন্যপথে পৃথিবী চলেছে সূর্য্যের পানে দৃষ্টি রেখে, কিন্তু আলোতে হোক্, আঁধারে হোক্, ঝড়ে বাদলেই হোক, একটুও সে থামে না, একটুও সে পথ হতে টলে না;—তেমনি ধরিত্রীর সন্তান তুমি, তোমারও তো শক্তি আছে, লক্ষ্য আছে, সময় আছে—এগিয়ে যাও না তুমি!

ভারতবর্ষে দেখা যায়, কারু একদিকে একটু গলদ থাকলে অপর দিকে সে হাজার জন-সেবা করলেও কেউ সেবা নিতে চায় না। যেমন একজন প্রচারকের ব্যক্তিগত চলা-ফেরা মনমত নয় বলে তাঁর উপদেশ নেওয়াটাও অন্যায় হয়ে যায়। এই জন্য এ দেশে সহ-যোগিতা করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ যেন গরুর পিঠে চড়া যায় না বলে তার দুধ খাব না, আবার ঘোড়া দুধ দেয় না বলে তার পিঠেও চড়্‌ব না গোছের ব্যাপার।

বৈজ্ঞানিকেরা স্পষ্ট দেখিয়েছেন, যে ছুট্‌তে পারে বেশী, সেই যে দৌড়ের বাজী জিতে, এমন নয় বা যে জোয়ান বেশী, সেই যে লড়াই ফতে করে, এমনও নয়, জিতে তারা, যারা জুটে-পুটে থাক্‌তে পারে। প্রতি-যোগিতার আগে সহযোগিতা চাই। মানুষের মাঝে সহযোগিতা আস্‌বে কি করে? শুধু সহযোগিতা কর্‌তে হবে বলেই তা কর্‌তে গেলে ফল হবে না কিন্তু। আমাদের দেহের মত প্রাকৃতিক সংহতি মাত্রেই অচেতন। মানু-

যের পরস্পর সহায়তা, সহযোগিতা, সহকর্ম্মিতা হতেই বিজ্ঞানের উৎপত্তি—কিন্তু তা বলে বৈজ্ঞানিকদের যে এক ঘরে বাসা নিতে হবে, এমন নয়। তারা একই সত্যের উপাসক বলে তাদের মাঝে সংহতির সৃষ্টি হয়েছে। ছেলেরা সরল, খেলুড়ে, আদুরে—জগৎভরা সব ছেলেই ওই রকম বলে ওই হল তাদের সাধারণ বাস্তব ধর্ম্ম। এই যে তাদের মাঝে একতা, এ শুধু তারা স্বভাবের মাঝে খাঁটী রয়েছে বলে।

কিন্তু আমার সঙ্গীরা আমাকে ভাল বাসবে—এমনি মনে করতে গিয়ে অনেকে চরিত্রে সত্যভ্রষ্ট হয়ে যায়। অপরের কাছে ভাল হবে বলে সে নিজের ওপর খুব চাপ দিচ্ছে; কিন্তু এই অপর ব্যক্তিটির হয়ত এমন বেয়াড়া রকমের সব বদভ্যাস রয়েছে—যার প্রতি মমতা দেখাতে গিয়ে সে নিজেই এমন সব কাজ করে বসে, যা করা তার পক্ষে কিছুতেই সম্ভব ছিল না। এমনি করে মাতাল বন্ধুর প্রতি সহানুভূতি দেখাতে গিয়ে মানুষ মদ খেতে পর্য্যন্ত সুরু করে। (১)

পথের সঙ্কেত

—*—

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

বাইরে আর ভিতরে এই যে অসামঞ্জস্য—এটা জীবনের একটা মস্ত বড় অভিশাপ। ফুল যেমন অনায়াসে তাহার দলগুলি মেলিয়া দেয়, তেমনি করিয়া তো আমাদের আশেপাশের তরুণ জীবনগুলিকে ফুটিতে দেখি না। এই যে চারিদিকে কত নিরানন্দ অস্বাস্থ্য-ভরা ব্যর্থ জীবনের চিত্র দেখিতে পাই, তার মাঝে সকলই কি অবস্থার নিষ্পেষণের ফল?—তা তো নয়। বোধ হয় শতকরা নিরনব্বইটী জীবনের অস্বস্তি আমাদের আপন হাতের সৃষ্টি। আর এই অস্বস্তির মূলে ওই সামঞ্জস্যের অভাব। জন্মান্তরীণ সংস্কার তোমাকে কোন্ ধর্ম্মের অধিকারী করিয়াছে, তাহা জানিবার সামর্থ্য তোমার নাই। সমাজেও এমন লোক নাই যে তোমার অতীত জীবনের ধারার সঙ্গে এই জীবনের ধারাটী মিলাইয়া দিতে পারে। এমন অবস্থায় যাহা হইবার তাহাই হয়—অর্থাৎ "অন্ধেনৈব নীয়মানা যথান্ধাঃ"র দশা!

মানুষ খাইতে পাইল না, পরিতে পাইল না বা দশ জনের কাছে বাহবা পাইল না—এই কি জীবনের সকল দুঃখের নিদান? অন্তরে যদি আনন্দ উৎসের মুখটী একবার খুলিয়া যায়, তবে কি বাইরের অবস্থার বিপর্য্যয় মানুষকে কখনো পীড়িত করিতে পারে? আনন্দের সূত্রটী যে ধরিতে পারিয়াছে, সে যে অভয়, অমৃত। প্রহ্লাদের মত কোনও হিরণ্যকশিপুই যে তাহাকে আগুনে, জলে, বিষে, অভিচারে—কিছুতেই কিছু করিতে পারে না। সমস্ত দুর্ব্বিপাকের মাঝে, সকল

বিশৃঙ্খলার মাঝেই আপন অন্তরের আনন্দময় সৃজনশক্তির প্রভাব সে একটা নূতন জগৎ গড়িয়া তুলিতে পারে।

কিন্তু মূলে চাই, ভিতরে বাহিরে সামঞ্জস্য। যা তোমার স্বধর্ম্ম, তারই মাঝে তোমার প্রতিষ্ঠা লাভ করা চাই। "শ্রেয়ানপি স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ"—পরের ধর্ম্ম সুন্দর হইলেও, আর নিজের ধর্ম্ম তাহার তুলনায় বিগুণ হইলেও স্বধর্ম্মই শ্রেয়ঃ। আমরা স্বধর্ম্ম বা আমাদের আন্তরিক ধর্ম হইতে ভ্রষ্ট, তাই আমাদের জীবন নিরানন্দ;—দেশের কাজ, দশের কাজ আর নিজের কাজ, কোন টাতেই আমাদের ধৈর্য্য নাই, উৎসাহ নাই, বীর্য্য নাই।

গোলমাল ঘটে বুদ্ধির বিকারে। অন্তর হয়ত সুষুপ্তির ঘোরে অচেতন, আর এ দিকে বুদ্ধি কত ঠাঁইর কত রঙ্গিন স্বপ্ন আনিয়া চোখের সামনে নাচাইতেছে; তখন অপরিণামদর্শী যুবকের তাহা দেখিয়া প্রলুব্ধ হওয়া তো বিচিত্র নয়। তুমি হয়ত এক তিলের অধিকারী, অথচ এক তাল ধরিয়া টানাটানি করিতেছ। এমন অবস্থায় তালটা তোমার ভাগ্যে যদি না পড়ে, নিরাশায় তাড়নায় উৎসাহের মেরুদণ্ড যদি ভাঙ্গিয়া যায়, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? এমন বিপ্লব তো আজ সব দিকেই দেখিতেছি। ধর্মের গোড়াটা না ধরিয়া প্রাংশুলভ্য ফলের দিকে সবাই হাত বাড়াইয়াছি—কিন্তু দুঃখ এই যে, দেশে উপহাস করিবারই লোকের অভাব—কেননা সবারই তো এক দশা।

যতই বলি না কেন, এ কথা স্থির যে অন্তরের দিকে যার দৃষ্টি না ফিরিয়াছে, তাহাকে হাজার উপদেশ দিলেও তাহাতে কোন ফল হইবে না। বুদ্ধির জোরে মানুষ ব্রহ্মতত্ত্ব পর্য্যন্ত বুঝিয়া ফেলিতে পারে, কিন্তু তাই বলিয়া ব্রহ্মভাব কি আর তাহার মাঝে এত সহজেই স্ফুরিত হয়? একটা মুঢ়ের মত অবস্থা বোধ হয় অনেকের মাঝেই আসে, যখন বুদ্ধিতে আর বোধিতে একটা দ্বন্দ্ব লাগিয়া যায়। আন্তরিকতার কথা তখন যতই বলা যাক্ না কেন, বুদ্ধির প্রাচীর ডিঙ্গাইয়া অন্তরের অন্তঃপুরে তাহা আর তখন প্রবেশ করিবার পথ খুঁজিয়া পায় না। অথচ সত্যের আঘাতে বুদ্ধির মিথ্যা অভিমান তখন স্তব্ধ হইয়া যায়। এইটাই বড় সঙ্কটের সময়, বড় যন্ত্রণার সময়—যে চলে তার পক্ষেও, যে চালায় তার পক্ষেও।

অসময়ে যাহারা পথের সন্ধান নিতে আসে, এই বিপত্তি তাহাদের কপালেই ঘটে। জীবনকে সহজ সরস করিতে হইলে, একেবারে গোড়া হইতেই তাহার পরিচর্য্যা প্রয়োজন। কিন্তু সে তো আর সকলের ভাগ্যে ঘটে না, তাই অন্তর ভাল করিয়া ফুটিতে না ফুটিতেই বুদ্ধির সংগৃহীত সংস্কারের বোঝা জগদ্দল পাথরের মত চাপিয়া বসে—বেচারা আর নিঃশ্বাস ফেলিবার অবকাশটুকুও পায় না। আমাদের দেশের ছেলে-মেয়েদের মাঝে এই অন্তরের নিষ্পেষণটাই সব চেয়ে বিসদৃশ বলিয়া চোখে ঠেকে। হিন্দুর দেশে জন্ম, কাজেই অনেক বড় বড় কথা তাহারা ছোট-বেলা হইতেই শুনিয়াছে। কিন্তু সেই বড় কথাগুলির সত্যতা সাধন-সহায়ে যে জীবনে ফুটাইয়া তুলিতে পারিয়াছে, এমন আদর্শ তাহাদের চোখে পড়ে কয়টা? ফলে কথার বোঝা বুদ্ধির বোঝা-ই ভারী হইয়া উঠিতেছে—আর সেই অনুপাতে অন্তরও দিন দিন শুকাইয়া মরুভূমি হইয়া উঠিতেছে। ঠিক এই অবস্থাতেই সঙ্কট।

কাহাকেও বোঝান দায় হইয়া উঠে। সত্যের চেয়ে বুদ্ধির রাজ্য তখন বড় হইয়া যায়—সত্য কথা বলিলেও তাহা আর বিশ্বাস হইতে চায় না, প্রবৃত্তির পথেই মানুষ ঠেলিয়া অগ্রসর হয়।

ব্যাপারটা সহজ হইত, যদি সত্যের সাহচর্য্য শিশুকাল হইতেই মিলিত। কিন্তু তা আর হয় কই? সমস্তটা জাতিই যেখানে অসত্যের বিষে জর্জ্জরিত, সেখানে ব্যক্তিগত সত্য-পিপাসার নিবৃত্তি হইতে হইলে হয়ত জন্ম জন্ম ধরিয়া অপেক্ষা করিতে হইবে—তবে সত্য আসিয়া সহজভাবে অনায়াসে তোমার দুয়ারে দাঁড়াইবে। কিন্তু এত দীর্ঘ প্রতীক্ষায় কাল কাটানো কি প্রাণে মানে? তাই নিজেই সত্যের সন্ধানে বাহির হইয়া পড়িতে হয়—কোথায় যদি মনের মত মানুষ কেউ মিলে।

মানুষের সন্ধান কি করিয়া মিলিবে, তাহা বলিতে পারি না। কেন না সে হইল সুকৃতির কথা, অদৃষ্টের কথা। কিন্তু যদি তেমন মানুষ মিলিয়া যায়, তখন কি করা উচিত, সে সম্বন্ধে দুই চারিটা কথা বলা চলে।

শ্রদ্ধা আর প্রণিপাত এই দুইটী হইল গোড়ার কথা। জানার বড়াই সবার মাঝেই আছে। ছোট বেলা হইতে যদি কোনও গুণীর কাছে জানার একটা পরখ না হইয়া থাকে, তবে এই বড়াইটা অত্যন্ত বাড়িয়া যায়। কিন্তু সত্যলাভ করিতে হইলে এই বড়াইটী প্রথমে বলি দিতে হইবে। সত্য সম্বন্ধে নিঃশেষে জানিয়াছি, এমন কথাটী বলা চলে না। এই জগতে ইন্দ্রিয়ের জানার মাঝে যেমন একটা ইতি আছে, অতীন্দ্রিয় জগতে তা নাই। অথচ এই অতীন্দ্রিয় জ্ঞানের সত্তাটাও এমন সুস্পষ্ট যে, তাহার কাছে ইন্দ্রিয়ের খেলা স্বপ্নের মত মিথ্যা হইয়া যায়। ইন্দ্রিয়ের মোহ যতক্ষণ পর্য্যন্ত না ছুটিয়াছে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত এ রহস্য আমাদের কাছে দুর্ব্বোধই থাকিয়া যাইবে। কাজেই এমন স্থানে বিশ্বাস করা ছাড়া আমাদের আর উপায় কি?

শ্রদ্ধায় বিশ্বাসে অন্তরের সঙ্গে অন্তরের যোগ হয়—সত্যের অবতরণ তখন সহজ হইয়া আসে। এর মাঝে যদি বুদ্ধির কূটতর্ক তুলিলে, তবেই সংযোগসূত্রটী ছিঁড়িয়া যাইবে—তখন আবার তুমি যে তিমিরে, তুমি সে তিমিরে। তোমার বুদ্ধি যে তখন তোমাকে বাঁচাইবে না, এ কথাটা জোর করিয়াই বলিতে পারি। যেখানকার কথা বলিতেছি, সেখানকার আইন এই। পণ্ডিতের সঙ্গে তর্ক করা, আর সত্যদর্শী পুরুষের সঙ্গ করা—এ দুয়ের মাঝে একটা বড় রকমের পার্থক্য আছে। সাধারণ যুক্তিতর্কে বুদ্ধি উজ্জ্বল হয়, প্রখর হয়, তা মানি—কিন্তু সত্যদর্শী পুরুষের কাছে যুক্তির বহর একেবারেই খাটে না। যদি এমন পুরুষের আশ্রয় নিলে, তবে আর একটী নিঃশ্বাসের দ্বারাও বিরোধ ঘটাইতে পারিবে না। বিন্দুমাত্র বিরোধে সেখানে তোমারই ক্ষতি। কেননা সেখানে তো শুধু কতগুলি বীর্য্যহীন বাক্যাবলীর সম্মুখীন হও নাই—সেখানে তুমি একটা বিদ্যুৎভরা শক্তির সম্মুখীন হইয়াছ। তোমার অন্তরের ধর্ম্মের সহিত এই শক্তির সমধর্ম্মী, কাজেই আচারে, বিচারে, বুদ্ধিতে ইহার তিলমাত্র বিরোধিতা করিলে অন্তরের আলো তো নিবিয়া যাইবেই।

এই জন্য শ্রদ্ধাকে সজাগ রাখিতে হইলে প্রণিপাত করিতে শিখা চাই। অমনিই তো আমাদের ঘাড় সহজে নুইতে চাহে না;

বরং অধ্যাত্মজগতে এই বালাই যেন আরও বেশী। এর একটা হেতুও আছে। লৌকিক জগতে কে বড়, কে ছোট, তাহার প্রমাণটা চাক্ষুষই মিলে। সুতরাং যদি কেহও কোন বিষয়ে যথার্থই তোমার চেয়ে বড় হয়, তবে তাহার কাছে নত হইতে তোমার বাধে না। কিন্তু অধ্যাত্মজগৎটা তো তোমার কাছে আঁধার। মানুষের একটা স্বভাব, যেখানে যত আঁধার, যত অজানা, সেখানেই তার কল্পনার দৌরাত্ম্য তত বেশী। এই জন্য অতি বুদ্ধিমান সামাজিক জীবের পক্ষে অধ্যাত্ম-জগতে আপনার ক্ষমতার কথাটা বাড়াইয়া ভাবা কিছুই বিচিত্র নয়। নিজকে যত বড় করিব, অপরে তো আমার কাছে ততই খাটো হইয়া যাইবে। বুদ্ধির বিকারে অধ্যাত্ম জগতের সত্য ও শক্তির কাছে নত হওয়া এই জন্য এত কঠিন হইয়া উঠিতেছে। পাণ্ডিতের পাণ্ডিত্য-বিজৃম্ভণে আমরা মুগ্ধ, অথচ সত্যদর্শী সাধুর কথা হেলায় ঠেলিয়া ফেলিতেছি—এ ব্যাপার তো আজকাল নিত্য প্রত্যক্ষের বিষয়।

তাই বার বার বলি, বুদ্ধিকে খাটো কর, নত হইতে শিখ, নতুবা কল্যাণ নাই। উচ্ছৃঙ্খলতা, ব্যভিচার, অনাচারের স্রোতে দেশ ভাসিয়া যাইতেছে, বুদ্ধিমানের সংখ্যা প্রয়োজনের অতিরিক্ত হইয়া উঠিতেছে—এই আবহাওয়ার মাঝে অন্তর্দৃষ্টি ফুটিবে কোথা হইতে?

মাথা নত করিতে তোমার ভয় হয়, কেননা পরিণাম সম্বন্ধে তুমি সংশয়ান্বিত। অথচ পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সত্যের চরম রূপ যে কি, তাহা তুমি তো বলিতে পারই না, মুখের কথায় কেহই তাহা প্রকাশ করিতে পারে না। কিন্তু অনুকূল চিত্তে তাহার শক্তির প্রভাব যে সুস্পষ্ট অনুভূত হয়, এবং সে অনুভূতি যে ইন্দ্রিয়ানুভূতি হইতেও সুস্পষ্ট, এ কথার সাক্ষ্য দিতে লোকের অভাব এখনও হইবে না। এইখানে আবার সেই শ্রদ্ধার কথাই ওঠে। বাস্তবিক শ্রদ্ধা আর প্রণতি, এ দুটী পাশাপাশি বস্তু। ইহাদের সাহায্যে যে লোকের সন্ধান মিলিবে, তাহা অপরূপ; এখনকার যুক্তি বুদ্ধি সেখানে খাটে না—কিন্তু সত্য, জ্ঞান, আনন্দ সেখানেই।

প্রণতির পক্ষে আর একটী সংশয়ের বাধা আছে। অবশ্য সুকৃতিবশে যাহার মাথা একবার নুইয়াছে, এ সংশয় তাহার মাঝে না আসিতে পারে; কিন্তু দূরে দাঁড়াইয়া যাহারা এই আত্মবিসর্জ্জন দেখে, তাহাদের মনে একটা আশঙ্কা জাগে। আশঙ্কা প্রণতির বাস্তব ফল সম্বন্ধে। প্রাকৃত জগতে দেখিতে পাই, ইন্দ্রিয়ের সামর্থ্যের বাহিরেও বস্তুধর্ম্ম বলিয়া একটা শক্তি আছে। চিনি যে মিষ্ট লাগে, আর নিমপাতা যে তিত লাগে, এ কেবল আমার অনুভব করিবার শক্তির উপরই নির্ভর করে না, চিনিতে ও নিমপাতায়ও যথাক্রমে মিষ্টত্ব ও তিক্তস্বরূপ এক একটা বস্তুধর্ম্মের সত্তা মানিতে হয়। এই জন্য না জানিয়াও চিনি খাইলে তাহা মিষ্টই লাগিবে, নিমের পাতা খাইলে তাহা তিতই লাগিবে।

এখন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুতে যেমন বস্তুধর্ম্মের পরিচয় পাই, মানুষের মাঝেও তেমনি পাইব কিনা, ইহাই সন্দেহ। মানুষের কাছে নত হইলে আমার যে কল্যাণ, সে কি কেবল আমার প্রণতির উপরই নির্ভর করে, না যাহার কাছে নত হইলাম, তাহার দিক

হইতেও কোনও শক্তি সঞ্চারিত হইবার সম্ভাবনা আছে? মহাপুরুষের সঙ্গ যাঁহারা করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই এই শক্তিসঞ্চার ব্যাপারটাকে স্বীকার করিয়া বলেন, মানুষের সঙ্গে মানুষের অধ্যাত্ম যোগের ইহাই একমাত্র ভিত্তি। কিন্তু সদ্‌গুরুসঙ্গ যাহাদের ভাগ্যে ঘটে নাই, তাহাদের কাছে ইহার সত্যতা প্রমাণ করা বড় কঠিন।

আরও কঠিন এই বলিয়া যে, লোক চিনিয়া গুরু করা চলে না। পুরুষকার অন্যত্র খাটে, কিন্তু এখানে খাটে না। যে যাহার আপন জন, সাত সমুদ্র তের নদী পার হইয়া সে তাহার কাছে আপনি জুটিয়া যায়, পরম নির্ভরে আপনি তাহাকে জড়াইয়া ধরে—লাভালাভের কোন সংশয়ই তাহার মনে জাগে না। সমর্পণের যে ফল, তাহা সে পায় বটে, কিন্তু হিসাবী মানুষ তো তাহার রহস্য বুঝিতে পারে না।

সাধন-ভজন মানসিক ব্যাপার। পুরুষকার লইয়া তাহা করিতে গেলে, তাহার ফলাফলের একটা সুস্পষ্ট হিসাব রাখা চলে—তবে পুরুষকারের উপর নির্ভর করিয়া কতটুকু অগ্রসর হওয়া যায়, সে অবশ্য পরের কথা। কিন্তু সাধনভজন নাই, অথচ আত্মসমর্পণে কেহ তাহার সবটুকু ফলের অধিকারী হইতেছে—এ কথা তো সহজে বিশ্বাস করা কঠিন। বুদ্ধিমান লোকেরা এইটুকু বিশ্বাস করিতে পারে না বলিয়াই তাহাদের ধর্ম্ম-সাধনাও নীতির কোঠা পার হইয়া অধ্যাত্ম-শক্তির রাজ্য পর্য্যন্ত পৌঁছায় না। আমাদের দেশের শিক্ষিত সমাজের ধর্ম্মসাধনাও আজকাল অনেকটা এই ধরণের হইয়া উঠিয়াছে—ধর্ম্মসাধনার ফলে তাহাদের বড় জোর সহিবার শক্তি মিলে, কিন্তু সৃষ্টি করিবার শক্তি কাহারও জাগে না।

বিনা সাধনে শুধু প্রণতির ফলেই যাহারা কৃতার্থতা লাভ করে, তাহাদিগের বেলায় মানিতেই হয়, যে বস্তুর কাছে তাহারা নত হইয়াছে, তাহার মাঝে শক্তি পুঞ্জীভূত হইয়া আছে, এবং আত্মসমর্পণে সে শক্তি প্রণতের মাঝে সঞ্চারিত হয়।

যাহাদের সামর্থ্যে কুলায়, তাহাদিগকে এই কথাটী স্মরণ রাখিতে বলি, এবং মনের মানুষ উপস্থিত সময়ে না মিলিলেও চিত্তটাকে তাহারই অনুকূলে উন্মুখ ও উন্মুক্ত করিয়া রাখিতে বলি। (ক্রমশঃ)

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং
কলিকাতা।

বেদান্ত-সার

—*—

[চতুর্থ খণ্ড—বিবৃতি—সাধনবিচার]

—*—

সাধন-চতুষ্টয়

বেদান্তাধিকারীর সহিত কর্ম্মের একটা সম্পর্ক আছে। সেই সম্পর্ক বুঝাইবার জন্যই কর্ম্মবিচারের অবতারণা। এতদূরে আসিয়া সে দীর্ঘ বিচার সমাপ্ত হইল। এক্ষণে অধিকারীর অপর লক্ষণগুলি প্রণিধান করিয়া দেখা যাউক।

বেদান্তাধিকারীকে বলা হইতেছে—"সাধন-চতুষ্টয়-সম্পন্ন প্রমাতা।" অবাধিত জ্ঞানকে বলে প্রমা। ব্রহ্মজ্ঞানে ব্যবহারিক প্রমাণলব্ধ সমস্ত জ্ঞানই বাধিত হইয়া থাকে। অতএব ব্রহ্মজ্ঞানই যথার্থরূপে প্রমাশব্দবাচ্য। এই জন্য বেদান্তাধিকারীকে বলা হইল প্রমাতা। এক্ষণে সাধনচতুষ্টয়সম্পন্ন কি, তাহা বুঝিতে হইবে।

বিবেক, বৈরাগ্য, ষট্‌কসম্পত্তি ও মুমুক্ষুত্ব—এই চারিটী সাধন। এই চারিটী সাধনের পৌর্ব্বাপর্য্য যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। বিবেক ভিন্ন বৈরাগ্যের উদয় হয় না বলিয়া বিবেকের স্থান সর্ব্বাগ্রে। ইন্দ্রিয়দ্বারা গ্রহণ করি, কি মনবুদ্ধি দ্বারাই গ্রহণ করি, জগতের সমস্ত বস্তুই যে আমার গ্রহণযোগ্য, এমন কথা বলিতে পারি না। উদ্দেশ্য, রুচি, ফলে তারতম্য প্রভৃতি বিচার করিয়া যাহা অনুকূল, তাহাই আমরা গ্রহণ করি এবং যাহা প্রতিকূল, তাহাই বর্জ্জন করি। দার্শনিক পরিভাষায় ইহাদিগকেই বলে উপাদেয় এবং হেয়।

জীবব্রহ্মের ঐক্যজ্ঞান আমার অভিলষিত। কিন্তু এই অভিলষিত বস্তু পাইবার পক্ষে আমার বাধা অনেক। এক কথায় এই বাধার স্বরূপ এইরূপে নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে—দ্বৈতজ্ঞান অদ্বৈতজ্ঞানের পরিপন্থী। এই দ্বৈতজ্ঞানের উপরই সংসারের ভিত্তি। সংসারকে আমি ছাড়িয়া আসিতে পারিতেছি না বলিয়া আমার দ্বৈতজ্ঞানের নিবৃত্তি হইতেছে না। সংসারকে ছাড়িতে পারিতেছি না—আসক্তির দরুণ, বাসনার দরুণ। মোহে মুগ্ধ হইয়া জাগতিক বাসনাতৃপ্তির উপকরণকেই আমি ভাবিতেছি উপাদেয়। কিন্তু কর্ম্মদ্বারা গুণক্ষয় হইয়া গেলে অন্তঃকরণ যখন নির্ম্মল হয়, তখন সহজেই যে ব্রহ্মজিজ্ঞাসার উন্মুখতা জন্মে, তাহাই আমাকে বলিয়া দেয়, সংসার যাহাকে উপাদেয় বলিতেছে, তোমার পক্ষে তাহাই বাস্তবিক হেয়, এবং সে যাহার দিক্ হইতে মুখ ফিরাইয়া রহিয়াছে, সেই অদ্বৈতজ্ঞান ও তদনুকূল সাধন-সমূহই তোমার পক্ষে উপাদেয়। এই হেয় এবং উপাদেয়ের বিচারই হইল বিবেক।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বাসনা সংসারের মূল। বৈরাগ্য বাসনার উচ্ছেদক। কিন্তু কি

হেয়, কি উপাদেয়, তাহার বিচার না জন্মিলে বাসনার বন্ধন শিথিল করা তো সম্ভব নয়। এই জন্যই বৈরাগ্যের পূর্ব্বে বিবেকের স্থান।

শম, দম, তিতিক্ষা, উপরতি, প্রভৃতি সাধন-সম্পত্তি আয়ত্ত করিতে হইলে তাহার পূর্ব্বে চিত্তকে আসক্তিশূন্য করিতে হইবে। এই জন্য ষট্‌সম্পত্তির পূর্ব্বে বৈরাগ্যের নির্দ্দেশ। আবার তেমনি ষট্‌সম্পত্তি আয়ত্ত না হইলে—শান্ত, দান্ত, তিতিক্ষাদিসম্পন্ন হৃদয়ে গুরু-বেদান্ত-বাক্যে বিশ্বাসরূপ শ্রদ্ধার সঞ্চার না হইলে, মুমুক্ষুত্ব জাগিবে না। মুক্তিলাভের জন্য সাময়িক সামান্য ইচ্ছাকেই মুমুক্ষুত্ব বলা চলে না; ভক্তির ন্যায় মুমুক্ষুত্ব হৃদয়ের তীব্র আবেগ হইতেই জাগে। কিন্তু মুক্তির স্বরূপ যে না বুঝিয়াছে, বন্ধনের হেয়ত্ব যে প্রাণে প্রাণে না অনুভব করিয়াছে, সে কি করিয়া যথার্থতঃ মুমুক্ষু হইতে পারে? শ্রীগুরুর উপদেশ বা শাস্ত্রের উপদেশ ভিন্ন মুক্তির স্বরূপই বা সে বুঝিবে কি করিয়া? ইন্দ্রিয়াদি শমিতদমিত হইয়া চিত্ত বিক্ষেপশূন্য না হইলে গুরুবাক্যের ও শাস্ত্রশাসনের মনন বা উপলব্ধি হইবে কি করিয়া? আবার বিচারদ্বারা চিত্ত সংসার হইতে নিরাসক্ত না হইলে ইন্দ্রিয়দমন, সহিষ্ণুতা, সদগুরুসঙ্গ প্রভৃতিতে রুচিই বা হইবে কি করিয়া? এই ভাবে বিচার করিলে দেখিতে পাই, বিবেক, বৈরাগ্য ও ষট্‌সম্পত্তিরূপ তিনটী সাধন পরম্পরাক্রমে মুমুক্ষুত্বেরই দ্বারস্বরূপ।

মুমুক্ষুত্ব জন্মিলে যে তাহা হইতে ব্রহ্মজিজ্ঞাসার উদয় হইবে, ইহা নিশ্চিত। যে মুমুক্ষু, সে চাহে বন্ধনকে অতিক্রম করিতে। বন্ধন অর্থেই যাহার বিস্তার রহিয়াছে, তাহার সঙ্কোচ। আমি বদ্ধ মানে আমার যতটুকু পরিব্যাপ্তি বা স্বাতন্ত্র্য থাকা সম্ভব, ততটুকু অধিকার হইতে আমি বঞ্চিত, অর্থাৎ আমার পরিবেষ সঙ্কীর্ণ, আমি শক্তিতে পঙ্গু ইত্যাদি। এই অবস্থা আমার মনঃকল্পিত, অজ্ঞানতাপ্রসূত। নহিলে লৌকিক ভাষায় বন্ধনের যে অর্থ, বাস্তবিক তেমন কোনও বন্ধন আমার নাই। এমন কি শক্তির অভাবে আমি পঙ্গু বলিয়া আমার যে বন্ধন রহিয়াছে বলিয়া মনে করিতেছি, তাহাও মিথ্যা। শক্তির স্ফুরণকে আমি উপাধির আশ্রয়ে সত্তা লাভ করিতে দেখি; অথ তাহার ফলে অন্তঃকরণধর্ম্মের যে পরিণাম ঘটে, তাহা মূলতঃ আমার লক্ষ্য হইলেও ব্যবহারিক দশায় সে কথা আমি ভুলিয়া যাই। কিন্তু উপাধির আশ্রয় পরিত্যাগ করিয়া পরিণামফলের সহিত যদি আমি আত্মসংমিশ্রণ করিতে শিখি, তবে শক্তির স্ফূর্ত্তি অনুভব করিবার পক্ষে আমার কোনও বাধাই থাকে না। ইহাতে এই প্রমাণিত হয় যে, আমাদের সমস্ত বন্ধনই কল্পিত।

যাহা কল্পনা, তাহা অবশ্য চিত্তের ধর্ম্ম। সুতরাং তাহার অন্যথা করিতে হইলে চিত্ত-পরিণামেরই আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে। এই পরিণামের একপ্রান্তে অপরিপুষ্ট কল্পনা—অপর প্রান্তে পরিপুষ্ট জ্ঞান। অবশ্য জ্ঞানের নির্ব্বিশেষ অবস্থা লক্ষ্য করিয়া এ কথা বলা হইতেছে না। জ্ঞান লাভ করিতে হইলে আমাদিগকে চিত্তধর্ম্মেরই অনুসরণ করিতে হইবে।

বন্ধন চিত্তে, সুতরাং চিকিৎসার আরম্ভ সেখান হইতেই। ব্যবহারিক কল্পনা বলিতেছে, তুমি সঙ্কীর্ণ, তুমি পঙ্গু। এখন এই কল্পনার স্থলে এমন একটী বস্তুর ভাবনা করিতে হইবে, যাহার মাঝে সঙ্কোচ নাই, পঙ্গুতা নাই। ব্রহ্মই সেই বস্তু।

এই বস্তুতে আত্মসংমিশ্রণ করিতে পারিলে কাল্পনিক বন্ধন টুটিয়া যায়—শক্তির চরম পরিণতিতে যে অনন্ত জ্ঞান ও অনন্ত আনন্দ বিলসিত, তাহা অধিগত হয়। ইহা হইতেই দেখিতে পাইতেছি, বন্ধন ঘুচাইতে হইলে আমাকে ব্যবহারিক কোনও কর্মের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে না—শুধু ভাবনাকে পরিশীলিত করিয়া চরম ও পরমভাব্য ব্রহ্মসত্তাতে নিজকে নিমজ্জিত করিতে হইবে। অতএব মুক্তির পথ অন্তরের মাঝে। মুক্তি ও বন্ধনের স্বরূপ বুঝিতে পারিলে সাধক অন্তরের আহ্বানেই সাড়া দেয়। তাই বেদান্তী বলিতেছেন—মুমুক্ষুত্ব জন্মিলে ব্রহ্মজিজ্ঞাসা জন্মিবে, ইহা নিশ্চিত। কেননা সর্ব্বপ্রকার সঙ্কীর্ণতা হইতে মুক্তিই যথার্থ মুক্তি এবং তাহার জন্য ভূমাকে আশ্রয় করিতে হয়। ব্রহ্মই সেই ভূমা, সুতরাং ব্রহ্মজিজ্ঞাসাই মুক্তির প্রথম সোপান।

বিবেক

এখন একটী একটী করিয়া এই সমস্ত সাধনের লক্ষণ বলা হইবে। প্রথমতঃ পাইলাম বিবেক। বিবেক—নিত্য ও অনিত্য বস্তুর বিবেক। নিত্য কাহাকে বলিব? যাহা কাল দ্বারা অবচ্ছিন্ন নহে, তাহাই নিত্য, অনিত্য তাহার বিপরীত। অর্থাৎ লৌকিক কিম্বা বৈদিক প্রয়োগে "থাকিবে না" এই কথাটী যাহার প্রতি প্রযুক্ত হইতে পারে না, তাহাই নিত্য; অনিত্য তাহার বিপরীত। বেদান্তী কার্য্য ও কারণের একত্ব স্বীকার করেন বলিয়া উপরি-উক্ত লক্ষণে অতীত কালের কোনও উল্লেখ করিলেন না।

"নিত্যানিত্যবস্তুবিবেক" কথাটীকে দুই ভাবে ভাঙ্গা যায়—এক অর্থে নিত্য ও অনিত্য বস্তুর যে বিবেক, তাহাই নিত্যানিত্যবস্তুবিবেক, এইরূপ দাঁড়ায়। আবার কাহারও মতে, নিত্য ও অনিত্য (পদার্থে) বাস করা যাহার স্বভাব, তাহা হইল নিত্যানিত্য বস্তু অর্থাৎ নিত্যত্ব ও অনিত্যত্ব; তত্তদাশ্রয় সহিত নিত্যত্ব ও অনিত্যত্বের যে বিবেক, তাহাই নিত্যানিত্যবস্তুবিবেক—এইরূপ বিগ্রহবাক্য হইবে। ফলিতার্থ এই, পূর্ব্বকথিত ব্যাখ্যায় আমরা পাই 'আশ্রয়ের' বিবেক এবং অপরটীতে পাই তদপেক্ষা সূক্ষ্মবিচারগম্য আশ্রয়ীর বিবেক।

মোটামুটী যাঁহার বেদের অর্থজ্ঞান হইয়াছে এবং অনুমানপ্রমাণে বস্তু সিদ্ধি করার নৈপুণ্য জন্মিয়াছে, তিনি বেদার্থ পর্য্যালোচনা করিয়া ইহাই জানিতে পারেন যে, একমাত্র ব্রহ্মই নিত্য এবং ব্রহ্ম হইতে ব্যতিরিক্ত নিখিল অচেতন পদার্থ অনিত্য।

শ্রুতির প্রমাণ

এই সিদ্ধান্তের অনুকূল বহু শ্রুতিবাক্য উদ্ধৃত করা যাইতে পারে, যথা—

(ক) "যস্মাদর্ব্বাক্ সংবৎসরোঽহোভিঃ
পরিবর্ত্ততে।
তদেব জ্যোতিষাং জ্যোতিরায়ুর্হোপাসতে-
মৃতম্॥"

—সম্বৎসর কালাত্মা সমস্ত জন্তুরই পরিচ্ছেদক; অহোরাত্ররূপ অবয়ব দ্বারা উহা বিশিষ্ট। কিন্তু সেই কালও তাঁহাকে পরিচ্ছিন্ন করিতে পারে না বলিয়া তাঁহা হইতে নিম্নভূমিতেই বিচরণ করে। আদিত্য প্রভৃতি জ্যোতিষ্ককে অবভাসিত করেন বলিয়া তিনি জ্যোতিরও জ্যোতিঃ। তাঁহাকেই দেবতারা আয়ু রূপে উপাসনা করিয়া থাকেন, কেন না সেই

জ্যোতিঃ অমৃত; আর সকলই মরে, কিন্তু জ্যোতিঃর মরণ নাই। এই জ্যোতিঃই সকলের আয়ু। দেবতারা আয়ুগুণযুক্ত রূপে তাঁহার উপাসনা করেন বলিয়া তাঁহারাও আয়ুষ্মান। ইহজগতে যে আয়ু কামনা করে (মৃত্যুঞ্জয় হইতে চায়) সে আয়ুগুণযুক্ত ব্রহ্মেরই উপাসনা করিবে (বৃহদারণ্যক, শাঙ্করভাষ্য, ৪, ৪, ১৬)

(খ) "নিত্যং বিভুং সর্ব্বগতং সুসূক্ষ্মম্" —তিনি ইন্দ্রিয়প্রবৃত্তি দ্বারা আমাদের অগ্রাহ্য এবং স্বয়ং অগ্রাহক। অতএব তিনি নিত্য অর্থাৎ অবিনাশী। তিনি ব্রহ্মাদি স্থাবর পর্য্যন্ত বিবিধ প্রাণিভেদে বিবর্ত্তিত হন বলিয়া বিভু (বি=বিবিধ রূপে+ভু হওয়া)। তিনি আকাশের মত ব্যাপক বা সর্ব্বগত। শব্দাদি-রূপ স্থূলত্বপ্রাপ্তির কারণরহিত বলিয়া তিনি সুসূক্ষ্ম। (মুণ্ডক, ১, ১, ৬)

(গ) "অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণঃ" —এই আত্মা অন্য কোনও কারণ হইতে প্রসূত হন নাই, আত্মা হইতেও অন্য কোনও বিষয় উৎপন্ন হয় নাই। অতএব এই আত্মা অজ, নিত্য ও শাশ্বত অর্থাৎ অপক্ষয়বর্জ্জিত। যাহা অশাশ্বত, তাহারই অপক্ষয় হয়, কিন্তু ইনি শাশ্বত। এই জন্যই ইনি পুরাণ অর্থাৎ পুরাকালেও ইনি নবই ছিলেন। অবয়বের উপচয় দ্বারা যাহা নিষ্পন্ন, তাহা এখনই নব, যেমন ঘট প্রভৃতি। কিন্তু আত্মা তাহার বিপরীত অর্থাৎ তিনি বৃদ্ধিবর্জ্জিত; অতএব পুরাকালেও তিনি নূতন। (কঠ, ২, ১৮)

(ঘ) "সত্যং জ্ঞানম্ অনন্তং ব্রহ্ম"— ব্রহ্ম সর্ব্বগত অতএব নির্ব্বিকার; তাই তিনি সত্যস্বরূপ। ভূত, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি সমস্তই পরিণামী, অতএব বিকারী। কিন্তু ভেদাবভাসক জ্ঞানের পরিণাম নাই, অতএব তাহা নির্ব্বিকার। এইরূপে ব্রহ্ম সত্য—তাহা হইতেই পাই, তিনি জ্ঞান। জ্ঞান অপরিচ্ছিন্ন, অতএব তাহা অনন্ত। তাই ব্রহ্ম সত্য, জ্ঞান ও অনন্ত। (তৈত্তিরীয় ২, ১)

(ঙ) "বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম রাতের্দাতুঃ পরায়ণং তিষ্ঠমানস্য তদ্বিদঃ"—শ্রুতি আমাদিগকে ব্রহ্মস্বরূপ বলিতেছেন—ব্রহ্ম বিজ্ঞান, আবার তিনি আনন্দও। এই বিজ্ঞান বিষয়বিজ্ঞানের মত দুঃখদ্বারা অনুবিদ্ধ নহে। তবে তাহা কেমন?—উহা প্রসন্ন, শিব, অতুলন, অনায়াস, নিত্যতৃপ্ত ও একরস। যাহারা ধনদাতা অর্থাৎ কর্ম্মানুষ্ঠাতা, সে যজমানদিগেরও পরমাশ্রয় তিনি, কেননা তিনি কর্ম্মফলের প্রদাতা। আবার যাঁহারা সর্ব্বপ্রকার এষণা ত্যাগ করিয়া সেই ব্রহ্মেই অবস্থান করেন, তাঁহাকেই জানেন,—তাঁহাদেরও পরমাশ্রয় তিনি। (বৃহদারণ্যক ৩, ৯, ২৮, ৭)

(চ) "যত্র নান্যৎ পশ্যতি নান্যৎ শৃণোতি, নান্যৎ বিজানাতি, স ভূমা"—ভূমার লক্ষণ কি? এই তত্ত্বে দ্রষ্টব্য কিছুই নাই। দৃশ্য হইতে পৃথক্ দ্রষ্টা কেহ নাই এবং দর্শনের কোনও করণও নাই—তেমনি পৃথক শ্রোতা, শ্রবণ ও শ্রোতব্যও কিছু নাই। ভিন্ন ভিন্ন ব্যবহারিক বিষয়সমূহ নাম ও রূপেরই অন্তর্ভুক্ত; এই জন্য নাম ও রূপের গ্রাহক শ্রবণ ও দর্শনেরই উল্লেখ করা হইল। ইহা হইতে অন্যান্য গ্রাহকও বুঝিয়া লইতে হইবে। বিশেষজ্ঞানের পূর্ব্বে প্রায়ই মননের প্রয়োজন। অতএব এখানে মননেরও উল্লেখ আছে মনে করিতে হইবে। যাহাতে মন্তা, মনন বা মন্তব্য কিছু থাকে না, তেমনি বিজ্ঞাতা, বিজ্ঞান বা বিজ্ঞাতব্য কিছু থাকে না—তাহাই ভূমা। এই লক্ষণ হইতে বোঝা যায়, ভূমা কোনও উপাধিদ্বারা বিশেষিত ও খণ্ডিত নহেন। ইহা হই

তেই তাঁহার নির্ব্বিকারত্ব, সর্ব্বগতত্ব ও নিত্যত্ব সিদ্ধ হয়। (ছান্দোগ্য ৭, ২৪, ১)

(ছ) "যো বৈ ভূমা তদমৃতম্"—স্বপ্নে আমরা যাহা দেখি, তাহার অস্তিত্ব স্বপ্নকাল পর্য্যন্তই; জাগ্রদবস্থায় আর স্বপ্নবস্তুর নিদর্শন থাকে না। তেমনি ভূমা ব্যতিরিক্ত সমস্ত বস্তুই মর্ত্ত্য বা বিনাশী, কিন্তু ভূমা তাহার বিপরীত, তিনি অমৃতস্বরূপ; কেননা তিনি ব্যবহারিক সমস্ত বস্তু হইতেই বিলক্ষণ। (ছান্দোগ্য, ৭, ২৪, ১)

উপরিলিখিত শ্রুতিপ্রমাণ হইতে শুদ্ধসত্ত্ব সাধকের সামান্যতঃ এই বোধ উৎপন্ন হয় যে, ব্রহ্ম নিত্য।

আবার—

(ক) "নৈবেহ কিঞ্চনাগ্র আসীৎ, মৃত্যু-নৈবেদমাবৃতমাসীৎ"—মন প্রভৃতির উৎপত্তির পূর্ব্বে এই সংসারমণ্ডলে নামরূপে প্রবিভক্ত কোনও বিশিষ্ট পদার্থের অস্তিত্ব ছিল না।

তাহা হইলে শূন্যই ছিল? হাঁ, শূন্যই ছিল বই কি? শ্রুতিও তো অন্যত্র বলিয়াছেন, "এখানে কিছুই ছিল না"—কার্য্যও ছিল না, কারণও ছিল না। শ্রুতিপ্রমাণ ছাড়া অনুমানবলেও ইহা সিদ্ধ হয়। অতঃপর যখন সমস্ত বস্তুর উৎপত্তি হইল, কাজেই পূর্ব্বেও কিছু ছিল না। যেমন ঘট উৎপন্ন হইল; কিন্তু উৎপত্তির পূর্ব্বে তো ঘটের অস্তিত্ব ছিল না। আশঙ্কা হইতে পারে, কারণের নাস্তিত্ব তো সম্ভব নয়, কেননা ঘট না থাকিলেও তাহার কারণ যে মৃৎপিণ্ড, তাহা তো দেখিতে পাই। যাহার উপলব্ধি হয় না, তাহারই নাস্তিত্ব; কার্য্যের নাস্তিত্ব মানিতে পারি, কিন্তু কারণের তো উপলব্ধি হয়, সুতরাং তাহার নাস্তিত্ব মানিব কি করিয়া? ইহার উত্তরে বলা যায়, অনুপলব্ধিকেই যদি অভাবের হেতু বলিয়া মান, তবে আমাদের সিদ্ধান্তই তো বজায় থাকিল; কেননা উৎপত্তির পূর্ব্বে জগতের কার্য্য বা কারণ কিছুই তো উপলব্ধ হয় না—সুতরাং সকলেরই তো অভাব সিদ্ধ হইল। অতএব সমস্তই শূন্য ছিল, এই সিদ্ধান্তের কোনও ব্যত্যয় হইতেছে না।—এই গেল পূর্ব্বপক্ষ।

সিদ্ধান্তী ইহার উত্তরে বলিতেছেন, না, শ্রুতিপ্রমাণ হইতে শূন্যবাদ সিদ্ধ হয় না। শ্রুতি বলিতেছেন, "মৃত্যু দ্বারা এই সমস্ত আবৃত ছিল।" যাহা ঢাকা যায়, কিংবা যাহা দ্বারা ঢাকা যায়, এমন কিছু যদি না থাকিত, তবে মৃত্যুতে সব ঢাকা ছিল, এমন কথা শ্রুতি কিছুতেই বলিতেন না। "বন্ধ্যার পুত্রকে আকাশকুসুম দ্বারা আবৃত করা হইল"—এমনটা তো কোথাও ঘটে না। অথচ শ্রুতি বলিতেছেন, মৃত্যুদ্বারা সমস্তই আবৃত ছিল। অতএব শ্রুতিপ্রমাণ হইতেই জানা যাইতেছে যে, যে কারণ আবরক ছিল, এবং যে কার্য্য আবৃত ছিল, উৎপত্তির পূর্ব্বে উভয়েরই বিদ্যমানতা ছিল।

উৎপত্তির পূর্ব্বে কার্য্যকারণের অস্তিত্ব অনুমান দ্বারাও সিদ্ধ হইতে পারে। কারণের সত্তা থাকিলেই জায়মান কার্য্যসত্তার উৎপত্তি দেখা যায়, না থাকিলে দেখা যায় না—যেমন ঘট প্রভৃতির কারণেরও অস্তিত্ব থাকিলেই ঘটের উৎপত্তি দেখা যায়, না থাকিলে দেখা যায় না, তেমনি উৎপত্তির পূর্ব্বে জগতের কারণেরও অস্তিত্ব অনুমিত হইতে পারে।

* * *

মৃত্যুদ্বারা সমস্ত আবৃত; সেই মৃত্যুর লক্ষণ কি? অশনায়াই মৃত্যুর লক্ষণ। বুদ্ধিতে

প্রতিবিম্বিত চৈতন্যের ধর্ম্মই অশনায়া বা ভোজনেচ্ছা (স্থূল); ইহারই সমষ্টি অবস্থা হিরণ্যগর্ভ। হিরণ্যগর্ভই মৃত্যু—তাঁহা দ্বারাই উৎপত্তির পূর্ব্বে জগৎ আবৃত ছিল।

ইহা হইতেই দেখা যাইতেছে—মৃত্যুর বা অনিত্যতার বীজ পূর্ব্ব হইতেই সৃষ্টিতে নিহিত।

(খ) "আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীৎ, নান্যৎ কিঞ্চন মিষৎ"—আত্মা কিরূপ? তিনি শ্রেষ্ঠ, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তি, অশনায়া প্রভৃতি সমস্ত সংসারধর্ম্মবর্জ্জিত, নিত্য শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-স্বভাব, অজ, অজর, অমর, অমৃত, অভয় ও অদ্বয়। ইদং কিরূপ? উহা নাম, রূপ ও কর্ম্মভেদে ভিন্ন এই জগৎ। জগৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে একমাত্র আত্মাই ছিলেন। কিন্তু এখনও তো একমাত্র তিনিই আছেন, নয় কি? তবে আবার "ছিলেন" বলা হইতেছে কেন?

যদিও এখনও সেই একই আছেন, তথাপি এখন আর তখনে একটু পার্থক্য আছে। উৎপত্তির পূর্ব্বে এই জগতের নামরূপ ব্যাকৃত হয় নাই সুতরাং তাহা আত্মা রূপেই বর্ত্তমান ছিল এবং একমাত্র আত্মশব্দ ও আত্মপ্রত্যয়েরই বিষয়ীভূত ছিল। কিন্তু এখন নাম ও রূপের ব্যাকৃতি ঘটাতে লৌকিক জগৎ যেমন বহু শব্দ ও বহু প্রত্যয়ের বিষয়ীভূত, তেমনি উহা একমাত্র আত্মশব্দ ও আত্মপ্রত্যয়েরও বিষয়ীভূত। জল হইতে ফেন পৃথক নামরূপে প্রকাশ হওয়ার পূর্ব্বে ফেনও একমাত্র জলশব্দ ও জল-জ্ঞানেরই বিষয়ীভূত থাকে, কিন্তু জল হইতে পৃথক নামরূপে ব্যাকৃত হইবার পর, জল ও ফেন এই বহু শব্দ ও বহু প্রত্যয়ের বিষয়ও হয়, আবার একমাত্র জলশব্দ ও জলপ্রত্যয়েরও বিষয়ীভূত থাকে। আত্মা ও জগৎসম্বন্ধেও এইরূপ বুঝিতে হইবে। ইহাই পূর্ব্বাবস্থা ও পরাবস্থার বিশেষত্ব।

আত্মা ভিন্ন ব্যাপারবিশিষ্ট আর কিছুই ছিল না। ইহাই হইতে আত্মাই নিত্য এবং তদিতর বস্তু বিকারী, ইহাই প্রমাণিত হয়।

বিরহী

কত যুগযুগান্তের বিরহ-বেদন
আমার বুকের মাঝে ছিল সঙ্গোপন—
আমি তারে নাহি জানি। নিখিল ধরায়
খুঁজিয়া ফিরেছি শুধু, বহিছে কোথায়
প্রমোদ-মদিরা ধারা; করিয়াছি পান
কামনার তীক্ষ্ণ সুরা, গাহিয়াছি গান,
বসন্তের পুষ্পরাশি করিয়া চয়ন
মোহ-ভরা স্বপ্নালস রচেছি শয়ন।
ভোগ বলি দূরে ঠেলি' রাখে সবে যারে,
আজি জানি—তারি মাঝে খুঁজিয়াছি তাঁরে
এতকাল; ছড়ায়েছি হাসির পসরা—
জেনেছি কি মর্ম্ম তার কত কান্নাভরা?
অধর-সুধার তরে তৃষিত পরাণ
কি গভীর ব্যথায় যে করিয়াছে পান
তীব্র হলাহল—বোঝে নাই কেহ—
জানে নাই এ পাগল যাচে কার স্নেহ।

আজি চিত্তে ফুটিয়াছে মিলন আভাস—
কামনা বিরহরূপে হয়েছে প্রকাশ।

ঋত ও সত্য

বেদে দুটী কথা আছে—একটী ঋত, আর একটী সত্য। ঋত লক্ষ্য করছে গতিকে, আর সত্য লক্ষ্য করছে স্থিতিকে। ঋত শুধু একটা এলোমেলো গতি নয়—সে গতির মাঝে ছন্দ আছে। জীব যা করছে, তা হতেই সংসারের সৃষ্টি। যদি ব্যক্তিগত ভাবে দেখতে যাই, তবে কারু কর্ম্মের সঙ্গে কারু কর্ম্মের একটা সামঞ্জস্য দেখতে পাব না—মনে হবে সমস্তটা সংসার জুড়েই একটা হট্টগোল—বিশৃঙ্খলার চূড়ান্ত। এই বিশৃঙ্খল অবস্থাটাকে ঋত বলা চলে না।

কিন্তু যদি আরও একটু গভীর ভাবে দেখি, তবে বুঝি, কর্ম্মের রূপ বাহ্যতঃ বিশৃঙ্খল হলেও, একটা কর্ম্মের সঙ্গে যেখানে আর একটা কর্ম্মের যোগ হয়েছে, সেখানে উভয়েই একটা গূঢ় নিয়মকে স্বীকার করছে। রাবণ সীতা হরণ করল; কিন্তু তার এই কর্ম্ম যেখানে যেখানে অপরকে স্পর্শ করেছে, সেখানেই তো একরকম ফল প্রসব করেনি। কিন্তু তবুও একথা ঠিক যে, এই সব ভিন্ন ভিন্ন ফলের মূলে একটা নিয়মের বন্ধন আছে, যাতে অপরের সংস্পর্শে তার কর্ম্ম যে সমস্ত বিভিন্ন ফল উৎপন্ন করেছে, তার অন্যথা হওয়া কখনো সম্ভবপর ছিল না। এক সীতা হরণই বিভীষণের মাঝে জাগাল ধর্ম্মবোধ, ইন্দ্রজিতের মাঝে জাগাল স্পর্দ্ধা, মন্দোদরীতে জাগাল ধর্ম্মভয় ইত্যাদি। কিন্তু এই বিভিন্ন ফলের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করতে হলে এমন কতগুলি মনোজগতের নিয়ম আমাদের স্বীকার করতে হবে, যার দরুণ এই ব্যাপারের যেমন পরিণতি হয়েছে, তার বিপরীত হওয়া সম্ভব নয়।

যেমন মনোজগতে, তেমনি স্থূলজগতে, সকলই আইনের জালে বাঁধা। বিশ্বজোড়া এমন একটা গূঢ় অথচ পরিপূর্ণ শৃঙ্খলা রয়েছে, যার এক প্রান্ত আহত হলে অলঙ্ঘ্য নিয়তির বশে সমস্ত বিশ্ব জুড়েই তার কম্পন সঞ্চারিত হয়। এই যে নিয়তির বিধান—একেই বেদ বলেছেন ঋত। এই ঋতে প্রতিষ্ঠালাভ করতে পারলে, কর্ম্মফলের যোগাযোগ সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান হয়, সংসারচক্রে আর মূঢ়ের মত আবর্ত্তিত হতে হয় না।

যা কিছু ঘটছে, তাকেই যদি আকস্মিক বলে মনে করি, তবে আমাদের আর অশান্তির সীমা থাকে না। আজকে এখানে একটা ব্যাপার দেখলাম, যা আমার কাছে ভাল ঠেকল না, ওখানে একটা কথা শুনলাম যা আমার অন্তরে বিঁধে রইল, কিম্বা আজকে এমন একটা কিছু লাভ হল, যার উল্লাসে কালকের ক্ষতিটা দুঃসহ বলে মনে হল—এমনিতর ব্যাপার তো আমাদের মাঝে অহঃরহঃ ঘটছে। এইগুলিকে যে ঠিক আমার মনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে পারছি না,—তাতেই তো আমার সংসারে এত জ্বালা।

কিন্তু এ জ্বালা পেতে হয়, আমরা কর্ম্মপ্রবাহের মূলে ঋতকে দর্শন করতে পারি না বলে। ওই যে ঘটনাগুলি আমায় বিচলিত করল, তার কার্য্যটাকে শুধু না দেখে, অন্ততঃ অব্যবহিত কারণটার প্রতিও যদি আমার দৃষ্টি পড়ত, তবে আর এত জ্বালা সইতে

হত না। এমন ঘটনা কেন দেখ্‌তে হল, অমন কথা কেন শুন্‌তে হল, আজকার ক্ষতির পীড়াই বা কেন এত তীব্র মনে হল— এ যদি একটু আমার জানা থাক্‌ত, তবে আর এগুলি আমায় এত পীড়া দিত না।

বহির্জ্জগতে ঋতকে প্রত্যক্ষ করি না বলে যেমন আমরা দুঃখ পাই, তেমনি অন্তর্জগতেও ঋতের শাসন উল্লঙ্ঘন করতে গিয়ে দুঃখ পাই। জগতের সঙ্গে আমাদের শুধু নেওয়ার সম্পর্ক নয়—আমাদের কিছু না কিছু দিতেও হয়। কিন্তু আমরা আইন জানি না বলে আমাদের দেওয়ার ভঙ্গিটী মনমত হয়ে ওঠে না। যেমন বাইরের আঘাতকে আমরা বিনা বিচারে অতর্কিতে গ্রহণ করি, তেমনি আমরাও অজ্ঞাতসারে মূঢ়ের মত সংসারকে আঘাত করতে কসুর করি না। আমাদের চিত্তে যা কিছু জাগে, সকলেরই একটা পূর্ব্বাপর আছে। তার পূর্ব্বাংশ নিহিত রয়েছে আমাদের সংস্কারে—তাই অনেক সময়ে আমরা নিজেও বুঝ্‌তে পারি না, কেন এমনধারা ভাব আমাদের মাঝে জাগল। আবার তার অপরাংশ নির্ভর করছে, আমরা কি আকারে তা জগতের সাম্‌নে প্রকাশ করব। মনোভাবের নিমিত্তও যেমন নিয়মে বাঁধা, তেমনি তার অভিব্যক্তির ফলও নিয়ম দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত। কাজেই মানসিক প্রকাশের উভয় প্রান্তেই আমরা ঋতকেই প্রত্যক্ষ করছি। আমাদের সামলে যেতে হবে দু'জায়গাতেই।

এখানেই সংযমের কথা, বিচারের কথা আসে। মনের মাঝে যা' তা' যেমন আমরা আসতে দিতে পারি না, তেমনি মনের ভাবকে যেমন তেমন করে প্রকাশ করবার অধিকারও আমাদের নাই। কেন নাই? না—আমাদের দুঃখ পেতে হবে বলে। অস্বস্তি আমরা কেউ চাই না—অথচ নিজের দোষেই আমাদের অস্বস্তি পেতে হয়। এর প্রতীকার—নিজের সেই দোষটাকে খুঁজে বের করা। খুঁজতে গেলেই বিচার চাই, আইন-কানুনের জ্ঞান চাই। আবার দোষটা খুঁজে পেলে তাকে দূর করবার জন্য চেষ্টা চাই, সংযম চাই। সংযমও আসে পরিণামের ভাবনা হতে। কিন্তু নিয়মের জ্ঞান না থাকলে পরিণামের জ্ঞান আসবে কোথা থেকে? কাজেই দেখতে পাচ্ছি, অন্তর্জ্জগতেও সর্ব্বত্র আমাদের ঋতের শাসন স্বীকার করে চলতে হয়।

এতেই তো চিত্ত প্রশান্ত হয়, মুক্তির পথ পরিষ্কার হয়ে আসে। বাইরের জগতে দেখছি, বিজ্ঞান যতই দিন দিন নূতন নূতন নিয়ম আবিষ্কার করছে, ততই প্রাকৃতিক ব্যাপারগুলিকে শৃঙ্খলামত সাজিয়ে তার উপর কর্ত্তৃত্ব করবার অধিকার অর্জ্জন করছে। নিয়ম যতই ব্যাপক হচ্ছে, ততই তার সংখ্যা কমছে, অথচ শক্তি বাড়ছে। অন্তরের সম্বন্ধেও ঠিক তাই। আমাদের সম্পর্কে যা কিছু ঘটছে, তার নিয়মগুলি আবিষ্কার করে কার্য্যকারণ-শৃঙ্খলায় যদি তাদের সাজিয়ে নিতে পারি, তবে দিন দিন চিত্তের শক্তি বাড়বে, তার বাহুল্য আবর্জ্জনা সব দূর হয়ে গিয়ে দিন দিন সে পরিশুদ্ধ হয়ে উঠবে।

অন্তরে-বাহিরে সর্ব্বত্র ঋতকে প্রত্যক্ষ করতে পারাই হল চিত্তশুদ্ধি। শুদ্ধচিত্তেই সত্যের আবির্ভাব। কাজেই ঋত আমাদের আকর্ষণ করছে সত্যের দিকে। সত্যের ভিত্তির উপর ঋতের প্রতিষ্ঠা। ঋতই ধর্ম্ম। ঋতের শাসন আমরা মানি সত্যের নির্দ্দেশে। যা চলছে তাই ঋত, আর যা আছে তাই সত্য। সে হিসাবে ঋতও সত্য। কিন্তু সত্য ঋতের চেয়েও ব্যাপক। বিচ্ছিন্ন করে জগতে

যা কিছু দেখছি, তাও অসত্য নয়। কেননা যা অসত্য, তার সত্তা থাকতে পারে না। কিন্তু বিচ্ছেদে একদেশ মাত্র আমাদের কাছে প্রকাশিত হচ্ছে বলে আমাদের অন্তরাত্মা তৃপ্ত হচ্ছে না—সত্যের যে ব্যাপকতা-ধর্ম্ম, তাই বিচ্ছেদকে ছেড়ে আসতে বারবার আমাদের প্রণোদিত করছে।

সংযম অবলম্বন করছি, বিচার করতে শিখ্‌ছি—খণ্ড প্রত্যয়গুলিকে এক অখণ্ড ঋতের শাসনে নিয়ন্ত্রিত করব বলে। কিন্তু এই নিয়ন্ত্রণার প্রেরণা এলো কোথা থেকে? নিয়ন্ত্রণ না করলেও কি জগতে আমাদের ঠাঁই হত না? "উচ্ছৃঙ্খলতাকে নিয়ন্ত্রিত করতে হবে"—এ হচ্ছে আদর্শ বা এ হচ্ছে আদেশ। কাজেই ধরে নিতে হবে, আদর্শের ব্যতিক্রম রয়েছে বলেই আদর্শ অনুসরণ করবার আদেশ দেওয়া সম্ভবপর হয়েছে। তাই যদি হয়, তবে জগতের এক অংশ তো চিরদিন অনিয়ন্ত্রিত অবস্থায় থেকেই যাচ্ছে। সুতরাং নিয়ন্ত্রণ যে অবশ্যকরণীয়, এ বোধ তো আমরা আমাদের প্রাকৃতিক অবস্থা থেকে পেতে পারি না। তবে এ বোধ জাগে কোথা থেকে?

সত্যই আমাদের মাঝে এ বোধ জাগিয়ে দেন। সত্যকে আমরা কেবল একটা নিরবচ্ছিন্ন, নির্ব্বিকার অবস্থারূপেই ভেবে থাকি। অসত্যকে আমরা সর্ব্বতোভাবে সত্যের প্রতিদ্বন্দ্বী বলেই মনে করি—এমন কথা ভাবি না যে, কেবল অসত্যের বিরোধে সত্যের প্রতিষ্ঠা নয়—অসত্যকে গ্রাস করে, কুক্ষিগত করেই সত্যের প্রতিষ্ঠা। এমন কথাও বলা চলে যে অসত্যের সত্তাও আমাদের অনুভবে আসত না, যদি সত্যে তার ভিত্তি না থাকত। এই কথাটা বুঝতে পারলেই কি করে যে এক অদ্বিতীয় তত্ত্বে সকলের পর্য্যবসান হতে পারে, তা আমরা ধরতে পারি। সত্যকে এই ভাবে না দেখলে সত্য আর তার বিরোধী অসত্য—এই দুটী তত্ত্বকে স্বতন্ত্রভাবে স্বীকার না করলে চলে না।

অসত্যকে কুক্ষিগত করেও যখন সত্যের প্রতিষ্ঠা, তখন সত্যকে শুধু নিরবচ্ছিন্ন অবস্থা বলা চলে না—তার মাঝে যে শক্তি আছে, এ কথাও স্বীকার করতে হয়। শক্তি ছাড়া পরিণাম কখনো সম্ভব নয়। যে জগতে আমরা আছি, সেখানে দেখছি, মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে পরিণাম। পরিণাম তো বস্তুরই হয়—সুতরাং তার একটা ভূমিকা আছে নিশ্চয়ই। এই ভূমিকাকেই বলি সত্য—পরিণামকে বলি শক্তির বিলাস। ভূমিকা না থাকলে শক্তির বিলাস হওয়া সম্ভব ছিল না—কাজেই শক্তি সর্ব্বদাই সত্যসঙ্গত অর্থাৎ শক্তি সতী। সত্যের অচঞ্চল স্থিতি হতে ঋতের অনুশাসিত গতি পর্য্যন্ত নিখিল বিশ্বব্যাপারের মাঝে যোগ রেখে চলেছে এই শক্তি। সত্য শক্তিসমন্বিত, তাই সত্য আমাদের মাঝে প্রেরণা দিচ্ছেন—বিচ্ছিন্ন প্রত্যয়কে ঋতে, আবার ঋতকে সত্যে প্রতিষ্ঠিত করতে। দ্বৈতান্বিত জীবনের চরম প্রতিষ্ঠা ঋতে। ঋত হতেই অদ্বৈতের পথে যাত্রা।

আরণ্যক

—*—

"যজ্ঞেন বাচঃ পদবীয়মায়ন্ তামন্ববিন্দন্ ঋষিষু প্রবিষ্টাম্ ॥"

—ঋগ্বেদ সংহিতা ১০।৭১।৩

অন্তর্বিজ্ঞানের নিয়ম বাহ্য বিজ্ঞানের সম্পূর্ণ বিপরীত। তাই যাহারা ইহলোকের ধনসমৃদ্ধি লইয়া মহাধনী, প্রকৃত জ্ঞানীর চক্ষে তাঁহারা দীন হীন কাঙ্গাল। আর নিঃসম্বল কৌপীনবন্ত সন্ন্যাসী মহাসম্পদের অধিকারী। রূপরসাদি বিষয়-ভোগের আড়ম্বর, যার যত বেশী, সে ততই নির্ব্বীর্য্য, ততই দুর্ব্বল, ততই রুগ্ন। আর এ সকলকে যিনি যত ত্যাগ করিতে পারেন তিনি তত বীর, সবল ও সুস্থ।

*

জ্ঞানার্জ্জন করিতে যদি ইচ্ছা হয়, জগতের রহস্য ও আত্মার তত্ত্ব যদি জানিতে অভিলাষ থাকে, তাহা হইলে রাশি রাশি পুঁথি ঘাঁটিয়া বা দেশে দেশে ভাসিয়া বেড়াইলে কোনও ফল হইবে না। স্থির হইয়া এক জায়গায় বসিয়া আপ্তবাক্যে বিশ্বাস করিয়া সাধন আরম্ভ কর। আত্মধ্যানে মজিয়া গেলে আর প্রকৃতি-গ্রন্থ অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করিলে, হৃদয়ের অমিয়-উৎস আপনি উচ্ছসিত হইয়া উঠিবে—মন প্রাণ ভরিয়া যাইবে। তখন মনে হইবে—"পূর্ণমিদং পূর্ণমদঃ পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে, পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে

*

আত্মসম্মান ক্ষুণ্ণ হলে আহত অভিমান কেন ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে, তার কারণ খুঁজতে হবে নিজের মাঝে। যে রাজাধিরাজ বিশ্বময় ছড়িয়ে আছেন, তোমার হৃদয় সিংহাসন জুড়েও তো তিনিই। তাঁরই মহিমার প্রতিবিম্বদ্বারা অবভাসিত তোমার এই ক্ষুদ্র "আমিত্ব।" এই আমিত্বই তোমাকে ভাল মন্দ কাজের সঙ্গে জড়িত করেছে। এই আমিত্বের আবরণেই তাঁর বিরাট জ্যোতির্ম্ময় সত্তা আড়াল হয়ে পড়েছে। তাঁর বিরাট সত্তার প্রেরণাই তোমার অস্থি মজ্জায় মিশে রয়েছে। অপমান, অমর্য্যাদা অন্তর্য্যামীকে স্পর্শ করে বলেই তা তোমার পক্ষে এমনি দুঃসহ হয়ে ওঠে। কিন্তু এতে তো তার পূর্ণ পরিচয় তুমি পাও না। তাঁর বিরাট মহিমা সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করতে পারবে তখনই, যখন নাকি এই সুখ দুঃখ, মান অপমান বিন্দুমাত্র চিত্তকে তরঙ্গায়িত করবে না।

*

তুমি আমি অতি ক্ষুদ্র জীব বটে, অনন্ত সৃষ্টির কণিকা মাত্র পূরণ করি সত্য, কিন্তু তবুও আমরা বিশ্বকে পাইতে চাই, কেন? কই, ক্ষুদ্রের মাঝে ত আমরা তৃপ্ত হইতে পারি না। এর কারণ এই, বাস্তবিক তুমি আমি ক্ষুদ্র বা তুচ্ছ নই, সৃষ্টিধারার সহিত নামিয়া আসিয়াছি বলিয়া আমরা নিজকে সমস্ত জগৎ হইতে পৃথক্ ও ক্ষুদ্র ভাবিতে অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছি। বড় হইতে হইলে আবার আত্মবিস্তার করিতে হইবে—জীবে জীবে—দেশে দেশে—কালে কালে আমি-

ত্বকে প্রসারিত করিয়া দিতে হইবে। ইহাই জ্ঞানীর যোগ-সাধনা।

*

ধ্যেয় বস্তুতে চিত্ত একটু তন্ময় হইলেই স্বপ্নের মাঝে সেই মূর্ত্তি ফুটিয়া উঠিয়া চিত্তকে অভিনব আনন্দে মত্ত করিয়া তুলিবে। কিন্তু এই টুকুতেই উৎফুল্ল হইয়া নিজকে অসামান্য কিছু বলিয়া মনে করিও না—তোমার মনই এই ধ্যেয় বস্তুতে পরিণত হইয়াছে। চিত্ত একাগ্র হইয়া সংযত হইতেছে, ইহা তাহারই লক্ষণ। "ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি"—পৌরুষের অভিমান এ পথে ব্যর্থ হইয়া যায়। গুরুই এখানে একমাত্র কর্ণধার। সদ্‌গুরু অন্বেষণ করিয়া তাঁহারই চরণপ্রান্তে আত্মবিসর্জ্জন করিয়া আত্মরক্ষা করিও। ভগবান বন্ধন-মোচনের উপায় স্থির করিয়া তবেই মহামায়ার বাঁধনে নিজে আবদ্ধ হইয়াছেন। গুরুই সেই ভববন্ধন মোচনকারী। তাঁহার কৃপা ব্যতীত ভগবদ্দর্শনই বল বা মোক্ষই বল, কিছুই সম্ভব নয়। মুক্তির বিধান ভগবানও করিতে অক্ষম, আপন নিয়মে তিনি আপনিই বাঁধা। তাই যুগে যুগে তিনি অবতরণ করিয়া গুরুরূপে জীবোদ্ধার করেন। তাহা না হইলে তাঁর ইচ্ছাতেই তো সকলেই মুক্তি পাইত—এত ক্লেশ স্বীকার করিয়া ধরায় তাহাকে অবতীর্ণ হইতে হইত না।

*

নিজের ভিতরে একটা কিছু ভাল ভাব বা চিন্তা পাইলেই তাহা লোকসমাজে ছড়াইয়া দিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিও না। ফুল যদি ফুটিয়া ওঠে, তবে ভ্রমরকে খুঁজিয়া খুঁজিয়া মধুপান করাইতে হইবে না—আপন গরজেই সে আসিয়া জুটিবে। দান করিবারও একটা সময় আছে। নিজকে তুমি যেদিন তাঁর বিরাটত্বের সঙ্গে যুক্ত বলিয়া উপলব্ধি করিবে, সেই দিনই যথার্থভাবে নিজকে দান করিবার—অপরের হিত করিবার শক্তি জন্মিবে। কিন্তু এ অবস্থা লাভের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত কৃপণ যেমন অতি সযত্নে আপনার ধনভাণ্ডার পূর্ণ করিতে থাকে, তুমিও তেমনি নিজের ভাবকে পরিপুষ্ট করিও। নিজকে অনর্থক অসময়ে ফাঁপাইয়া তুলিয়া আড়ম্বর করিতে গিয়া সব পণ্ড করিও না।

*

দিনরাত স্মরণই কর আর মননই কর, চিত্তের বল্গাটী খুব শক্ত করিয়া ধরিয়া থাকিও। তোতাপাখী দিনরাত হরিনাম করিলেও মৃত্যু-সময় যেমন তার স্বভাবরুক্ষ স্বরটী বাহির হইয়া পড়ে, তেমনি তোমার চিত্তও যদি এই স্মরণ-মননে গভীর ভাবে তন্ময় না হইয়া ভাসা ভাসা অবস্থায় থাকিয়া যায়, তবে তাহা তোমার উন্নতির পরিপন্থীই হইবে। এই উড়ু উড়ু অবস্থা অসংযত চিত্তেরই লক্ষণ। সাধনাও তোমার তখন একটা অনুষ্ঠানের ভান মাত্র। তোমার ভিতরে যে স্বতঃস্ফূর্ত্ত জ্ঞান রহিয়াছে, ইন্দ্রিয়সমূহ তাহার বহিঃপ্রকাশের দ্বার স্বরূপ। ইহাদের বিক্ষেপের জন্যই তোমার শক্তি অপব্যয়িত হইতেছে, তাই অন্তঃশক্তির পরিমাণ বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছ না। চৌবাচ্চার ছিদ্র বন্ধ করিয়া দিলে চৌবাচ্চাটী যেমন সর্ব্বদাই পূর্ণ থাকে, তেমনি এই ইন্দ্রিয়-দ্বার রুদ্ধ করিলে, জ্ঞানের ফোয়ারা উথলিয়া উঠিয়া অন্তরকে পূর্ণ করিবে। "বশে হি যস্যেন্দ্রিয়াণি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা"—ইন্দ্রিয়সমূহ স্ববশে আসিলেই অন্তরে প্রজ্ঞা বা জ্ঞান প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

*

উৎসব যতই আসন্ন হয়, মনের মাঝে ততই একটা আনন্দবেগ সঞ্চারিত হইতে থাকে। দেখিতে দেখিতে কর্ম্মের ভেরী দিগন্ত কম্পিত করিয়া তুলে—চারিদিকে জীবনের দ্রুত স্পন্দন অনুভূত হয়—মন তখন এই বিশিষ্ট দিনের সাফল্যের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠে। দৈনিক জীবনের চিরাচরিত কাজের বন্ধন আর তখন আমাদের পীড়ন করে না। বছর মাঝে আত্মবিসর্জ্জনের সুযোগ ঘটিলে অন্তরের আনন্দ নবীনরূপে মুঞ্জরিত হইয়া উঠে। এই আত্মবিসর্জ্জনের দিনটাই উৎসবের দিন। এই উৎসবের মাঝে—যিনি ভূমা, যিনি বৃহৎ, যিনি সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালে পরিব্যাপ্ত, তাঁহারই উদার মহিমা আমাদের প্রাণকে স্পর্শ করে। ব্যক্তিগত স্বার্থের সঙ্কীর্ণতা তখন ত্যাগের মাঝে মুক্তি লাভ করিয়া ধন্য হয়।

*

বিষয়পরায়ণ, অবিদ্যাচ্ছন্ন মানবই মৃত্যুর নামে আতঙ্কে শিহরিয়া উঠে, কিন্তু জ্ঞানী ব্যক্তির অন্তর মৃত্যুকে বন্ধুরূপে বরণ করিয়া লইতে চায়—মৃত্যুর ভিতর দিয়া অমৃতলাভের আশায় উৎফুল্ল হইয়া উঠে। জীবন দুদিনের, আর মরণ চিরদিনের—ইহাই তো নিয়তি। তাই জ্ঞানী বলেন, জীবন যদি লাভ করিতে চাও, তবে অনন্ত জীবনের পথ-স্বরূপ মরণকেই এই জীবনে বরণ করিয়া লও—এই চঞ্চল বিদ্যুতালোকের মোহ ত্যাগ করিয়া, অনন্ত আলোকের দিকে প্রধাবিত হও।

*

যৌবনের প্রারম্ভেই কোন অজানা দেশ হইতে একটা অতৃপ্ত আনন্দ-বুভুক্ষা বক্ষ জুড়িয়া তাণ্ডব নৃত্য জুড়িয়া দেয়—চায় সে পূর্ণ পরিতৃপ্তি। কিন্তু মরীচিকাভ্রান্ত পিপাসিত মৃগের মত সে নিজেই প্রতারিত হয়, যখন সে কি ক্ষণিক সুখের আশায় প্রলুব্ধ হইয়া আত্মসঙ্কোচকারী কামকে বরণ করিয়া লয়। আত্মেন্দ্রিয়প্রীতি-ইচ্ছাই কাম। ক্ষুদ্র আমির কামনা লইয়া তার গৃহস্থালী। কামনার দাসত্বে একদিনের জন্যও তো যথার্থ তৃপ্তি যথার্থ আনন্দ পাওয়া যায় না; বরং অন্তরের স্বভাবদত্ত সঞ্চয়টুকু ক্রমশঃ নিঃশেষ হইয়া যায়। স্রোতের নির্ম্মল জল হইতে কিছু জল তুলিয়া কোন পাত্রে রাখিলে শীঘ্রই যেমন তাহা দূষিত হইয়া উঠে, তেমনি তোমার কামনাগুলিও যদি শুধু তোমাকেই বেষ্টন করিয়া থাকে, তবে তাহা তোমার চরিত্রকে অচিরে স্বার্থপরতায় কলুষতায় নষ্ট করিয়া দিবে। কিন্তু রুদ্ধ জলকে আবার যদি বৃহৎ স্রোতের সঙ্গে মিশাইয়া দাও—ক্ষুদ্র আত্মেন্দ্রিয়প্রীতিকে বিশ্বপ্রসার ঔদার্য্যের মাঝে বিলাইয়া দাও, তবেই দেখিবে চিত্ত আনন্দরসে ভরপুর হইয়া উঠিতেছে। এই আত্মপ্রসারণই প্রেম—এই প্রেমের পথই তোমার বরেণ্য। ইহাতেই যৌবন সার্থক হইবে—যথার্থ তৃপ্তির সন্ধান পাইবে।

*

সবার মধ্যে যিনি আছেন—সকল স্থানে যিনি আছেন তাঁকে যদি জানিতে পারা যায়—তাঁর সহিত যদি যোগরক্ষা করা যায়, তাহা হইলে সব জীবের ও সব স্থানের খবর জানিতে আর কষ্ট কিসের? তাই শাস্ত্র বলেন—ভগবানকে জানিলেই সব জানা যায়—সব পাওয়া যায়।

সংবাদ ও মন্তব্য

আশ্রম-সংবাদ

মঠাধিষ্ঠাতা শ্রীমৎ পরমহংসদেব বিগত আষাঢ় মাসে ভ্রমণে বাহির হইয়াছেন। শ্রীহট্ট, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, ময়মনসিংহ প্রভৃতি স্থান পরিভ্রমণ করিয়া তিনি সম্প্রতি ঢাকা জয়দেবপুর সারস্বত আশ্রমে অবস্থিতি করিতেছেন। শীঘ্রই সেখান হইতে ঢাকা, মাদারীপুর প্রভৃতি স্থানে তাঁহার যাওয়ার কথা আছে।

জন্মমহোৎসব

আগামী ৯ই ভাদ্র রবিবার ঝুলন পূর্ণিমা তিথিতে আসাম বঙ্গীয় সারস্বত মঠাধিষ্ঠাতা পূজ্যপাদ শ্রীশ্রীমৎ নিগমানন্দ পরমহংসদেবের শুভ জন্মতিথি মহোৎসব অনুষ্ঠিত হইবে। আমরা সাধু, ভক্ত ও আর্য্যদর্পণের গ্রাহক অনুগ্রাহক ও পাঠকগণকে উক্ত মহোৎসবে যোগদান করিয়া আনন্দবর্দ্ধন করিতে সাদরে আহ্বান করিতেছি। উক্ত দিবসে সারস্বত মঠান্তর্গত শ্রীগৌরাঙ্গ সেবাশ্রমের বগুড়াস্থিত শাখাশ্রমেও জন্মতিথি মহোৎসব ও পঞ্চম বার্ষিক উৎসব অনুষ্ঠিত হইবে।

গ্রন্থ-পরিচয়

"স্বাস্থ্যধর্ম্ম গৃহপঞ্জিকা"—কলিকাতা ৪৫ আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, স্বাস্থ্যধর্ম্ম সংঘ হইতে প্রকাশিত ও বিনামূল্যে বিতরিত। এই পঞ্জিকাখানিতে নূতনত্ব আছে। ইহার প্রারম্ভে ৪৪ পৃষ্ঠা ব্যাপী একটী পদ্যরচিত হরপার্ব্বতী-সংবাদ সন্নিবেশিত হইয়াছে এবং উহাতে স্বাস্থ্য, শরীর পালন, পল্লীমঙ্গল, চিকিৎসা প্রভৃতি নানা বিষয় আলোচিত হইয়াছে হরপার্ব্বতী সংবাদের এই অভিনব রূপ মৌলিক কল্পনা-প্রসূত বটে। ইহার কোন কোন সিদ্ধান্ত প্রচলিত হিন্দু সিদ্ধান্তের বিরোধী হইলেও, ইহাতে বহু আবশ্যকীয় ও জন-হিতকারী তথ্য ও উপদেশ লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

"পুরাণতত্ত্ব" (৩য় খণ্ড)—শ্রীমৎ ব্রহ্মানন্দ ভারতী কর্ত্তৃক ব্যাখ্যাত ও শ্রীযুক্ত রাজা শশিশেখরেশ্বর রায়বাহাদুরের উপসংহার-সমালোচনা সম্বলিত। কাশীধাম ব্রাহ্মণরক্ষাসভার আনুকূল্যে প্রকাশিত; ১৬৪ পৃষ্ঠা, মূল্য ॥০ আনা। এই খণ্ডে ব্রহ্মবৈবর্ত্ত, লিঙ্গ, বরাহ, স্কন্দ, বামন, কূর্ম্ম, মৎস্য, গরুড় ও ব্রহ্মাণ্ড—এই কয়খানি পুরাণ আলোচিত হইয়াছে। আলোচনা পূর্ব্ব পূর্ব্ব খণ্ডের মতই উপাদেয় ও গবেষণাপূর্ণ হইয়াছে। গ্রন্থের উপসংহার-সমালোচনাটী অতি সুন্দর—পুরাণসম্বন্ধীয় সকলপ্রকার আলোচনার আভাসই ইহাতে আছে—কাহারও কথা বাদ পড়ে নাই। পুরাণতত্ত্বে শুধু কাটাছাঁটাই করা হয় নাই—পরিশেষে সংরক্ষণের উপায়ও নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। মোটের উপর এই কয় খণ্ড পুস্তক পুরাণসমূহের অত্যুৎকৃষ্ট প্রবেশক বলিয়া বিবেচিত হইবে।

গ্রাহকগণের প্রতি

সম্পাদকের অসুস্থতার দরুণ আষাঢ় মাসের পত্রিকা প্রকাশে এত বিলম্ব ঘটিল। আমরা বহু গ্রাহকের নিকট হইতে পত্রিকার অপ্রাপ্তিজ্ঞাপক পত্র পাইয়াছি—পত্রের সংখ্যাধিক্য বশতঃ ব্যক্তিগত ভাবে কাহাকেও উত্তর দেওয়া সম্ভবপর হয় নাই। পত্রিকাপ্রকাশে মাঝে যে ফাঁক পড়িয়া গেল, আমরা ক্রমশঃ তাহা পূরণ করিবার চেষ্টা করিব। শ্রাবণের পত্রিকা ভাদ্রের ১৫ই তারিখের মধ্যে প্রকাশিত হইবে আশা করি। শ্রাবণের পত্রিকার অপ্রাপ্তিসংবাদ ভাদ্রের শেষ সপ্তাহে পাইলেও আমরা তাহার প্রতীকারে সচেষ্ট হইব।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং ....
গ্রন্থ সং ....

ওঁ তৎ সৎ

আর্য্য-দর্পণ

(সনাতন ধর্ম্মের মুখপত্র)

১৬শ বর্ষ } শ্রাবণ { ৪র্থ সংখ্যা

দ্যাবা-পৃথিব্যো

[ঋগ্বেদসংহিতা—১।২৪।৬]

কতরা পূর্ব্বা কতরা পরায়োঃ
কথা জাতে কবয়ঃ কো বিবেদ।
বিশ্বং ত্মনা বিভৃতো যদ্ধ নাম
বিবর্ত্তেতে অহনী চক্রিয়েব॥

ভূরিং দ্বে অচরন্তী চরন্তং
পদ্বন্তং গর্ভমপদী দধাতে।
নিত্যং ন সূনুং পিত্রোরুপস্থে
দ্যাবা রক্ষতং পৃথিবী নো অভ্বাৎ॥

অনেহোদত্রমদিতেরনর্ব্বং
হুবে স্বর্ব্বদবধং নমস্বৎ।
তদ্রোদসী জনয়তং জরিত্রে
দ্যাবা রক্ষতং পৃথিবী নো অভ্বাৎ॥

অন্তপ্যমানে অবসাবন্তী
অনুষ্যাম রোদসী দেবপুত্রে।
উভে দেবানামুভয়েভিরহ্নাং
দ্যাবা রক্ষতং পৃথিবী নো অভ্বাৎ॥

—দ্যাবা আর পৃথিবীর

কেবা কার পূর্ব্বে, কেবা পরে জেগেছে,
কেন কার জন্ম কবিরা কি জেনেছে?
এ নিখিল বিশ্ব আছে তায় বিতত—
দিবা-রাত্রি-চক্রে ফিরে যারা সতত।

রহি চির-স্তব্ধ করে গতি বিতরণ
অ-চরণ-গর্ভে জনমিছে স-চরণ—
শিশু হেন বিশ্বে আছ কোলে ধরিয়া,
দ্যাবা আর পৃথিবী! নাও পাপ হরিয়া!

ক্ষয়হীন, অকলুষ, অদিতির বিত্ত—
স্বরগের অমিয়া—যাচি তারে নিত্য;
স্তাবকের ঘরখানি দাও তাহে ভরিয়া
দ্যাবা আর পৃথিবী! নাও পাপ হরিয়া!

নাহি জান দুঃখ, বিতরিছ অন্ন,
ওগো দেবপুত্র, হব আজি ধন্য
আলো-ভরা দিবসে তোমাদের বরিয়া—
দ্যাবা আর পৃথিবী! নাও পাপ হরিয়া!

প্রকাশ বনাম প্রচার

সত্যই শিবস্বরূপ। সত্যের অনুসরণ করাই একমাত্র ভূতহিত। সত্য তোমায় বীর্য্যশালী করবে, সত্য তোমায় মুক্ত করবে। নিজেই নিজের বিধাতা হতে পারলে বহির্জগতের বিধি-নিষেধের উৎপীড়ন হতে তুমি মুক্তি পাবে। তোমার মান তো এর মাঝেই। কেবল জবরদস্তিতেই অধিকার মিলে না—যা তোমার সত্যকার অধিকার, তা আপন জোরেই টিকে যাবে। এমনি করে টিকে যাওয়াতেই তো বীর্য্যের পরিচয়। বীর্য্যহীন যা, তার মৃত্যু নিশ্চিত। ভগবান যা ঘটতে দিচ্ছেন তা হতেই আমরা তাঁর ইচ্ছা বুঝতে পারছি। প্রকৃতিগ্রন্থে ভগবান নিজের হাতে সুস্পষ্টরূপে অসংদিগ্ধ ভাবে লিখে রেখেছেন—নির্ব্বীর্য্যতা ছাড়া আর কোন পাপ নাই জগতে—আর নির্ব্বীর্য্যতার উৎপত্তি অবিদ্যা হতে।

যা কিছুতেই মরতে চায় না, যা কেবল বেড়েই চলে, তা নিশ্চয়ই ভগবানের অভিপ্রায়ের অনুকূল। যা আছে তাকেই প্রকাশ করে যে সার্ব্বভৌম সত্যে তোমরা উপনীত হচ্ছ, তাকেই বলছ বিধান। প্রকৃতি গ্রন্থে এই বিধান লেখা আছে দেখছি, "আজ হোক, কাল হোক, যা সত্য, তা শক্তিরূপে নিজের আসনে প্রতিষ্ঠিত হবেই হবে।" সত্য কঠিন বটে—বুদ্বুদের মত ছুঁলেই তা ভেঙ্গে পড়বে না। ফুটবলের মত সারাদিন তাকে লাথিয়ে বেড়াও না কেন, সন্ধ্যাবেলায় দেখবে, তার কোনও দিকেই সে একটু টোল খায়নি। ভগবান্ এই জগতের শাস্তা, কিন্তু তাঁর শাসন সর্ব্বশক্তিমান্ সত্যেরই শাসন। সত্যের প্রকাশে ভীত বা বিস্মিত হয়ো না—তোমার অন্তরের অন্তর হতে বল "অহং ব্রহ্মাস্মি!"

যে সম্প্রদায় সত্যকে প্রকাশ করবে, অনন্ত শক্তির অনুকূলে কাজ করবে, অনন্ত শক্তিমানের মহিমা প্রকাশ করবে, তারই জয়—তারই সিদ্ধি। সত্যের অভিমান তোমায় দেবে বীর্য্য, বিজয়—কিন্তু দেহের অভিমান (হোক না সে ব্রাহ্মণের অভিমান বা সন্ন্যাসীর অভিমান) তোমায় করবে চামার! তোমার কেবল চামড়ার কারবার বলেই তো তুমি চণ্ডাল। তাই না শ্রুতি বার বার তোমার ছায়া মাড়াতে নিষেধ করছেন।

কিন্তু যিনি সত্যসন্ধ অহংবর্জ্জিত পুরুষ, তিনি এই জগৎ-জোড়া চামড়ার কারবারেও সন্ন্যাসীর মহাভাব ঢুকিয়ে দিতে পারেন। তা ছাড়া সত্য সত্যই যদি তুমি চামড়ার কারবারই কর, তাতেই তো তুমি শূদ্র হয়ে যাবে না। জাতিরূপ মহাবৃক্ষের মূলই হচ্ছে—স্ত্রীলোক বালক আর শূদ্র। ভারতবর্ষে এদেরই যথার্থ কোনও শিক্ষা হয় না। এদের দিকেই কেউ ফিরে তাকায় না। যাদের বলি উচ্চবর্ণ, তারা তো গাছের ফল মাত্র। ফলটাকে গাছের সঙ্গে বেঁধে রাখবার চেষ্টায় আমাদের সময়ের অপব্যয় করা উচিত হয় না। মূলের দিকে নজর দাও—মূলে আগে জল ঢাল।

ভাই সংস্কারক, বড় মানুষের ফরমাস মত জিনিষের জোগান দিয়ে দুদিনের জন্য তুমিও হয়ত বাহবা পেতে পার—কিন্তু সত্য অগ্রসর হবে স্ত্রীলোক, বালক আর দরিদ্রের ভিতর

দিয়ে—তাদের মাঝেই তার আশ্রয়। ইতিহাস তাই বলে। সরকারী লোক সভায় বক্তৃতা শুনতে আসলে প্রচারকেরা যেন নিজেদের কৃতার্থ বলে মনে করেন। হতে পারে, আজ কাল যারা সরকারের লোক, তারাই দেশের সেরা বুদ্ধিমান, দেশের হিত তারাই করছে;—কিন্তু জাতির উন্নতি যে তাদের দিয়েই হবে, এমন ভরসা করা যায় না। বেতন যত মোটাই হোক না কেন, তবুও তো অন্নের দায়ে তারা আত্মবিক্রয় করছে। রুটীন-বাঁধা কাজের চাপে তাদের জীবনের সকল রস শুকিয়ে গেল—অথচ এ নালাই ছেড়ে আসাও অসম্ভব। খেতাবই পাক আর বিলাতই থাক—অতিরিক্ত পরিশ্রমে বেচারীদের মাঝে আর সার পদার্থ নাই কিছুই—রাজ সম্মানের উঁচু গদীতে ঠুঁটো হয়ে বসে আছে তারা—তোষামোদে মুগ্ধ হয়ে পারিষদের স্তুতি-নতিতে আয়েসে এলিয়ে পড়ুক তারা—তাদের ভরসা আমরা করি না। যদি দেশ সত্য সত্যই জাগে, তবে গোড়া ধরেই জাগ্‌বে।

ভারতবর্ষের যত সব আন্দোলন-আলোচনা যে ব্যর্থ হয়ে যায়, তার মূল কারণ হচ্ছে এই যে, সকল কর্ম্মীই গাছের ফলে আর পাতায় জল ঢালতে ব্যস্ত। কিন্তু প্রাণ জাগাতে হবে, আলো দিতে হবে যে বেচারী শূদ্রদেরই। ছোট জাতদের যদি সেবা করতে যাও, তবে লোকে তুমি অকর্ম্ম করছ বলে গাল দেবেই, কেননা তারা জানে ছোট জাতেরা সমাজের কিছুই না। শূন্যও তো কিছু না। কিন্তু সেই শূন্যকেও যদি একের পিঠে বসাও, তবে একের মূল্য দশগুণ বেড়ে যায়। তেমনি তোমার মাঝে যে "একটী" রয়েছে, এই সব শূন্যের সঙ্গে তাকে ঠিক ঠিক জুড়ে দাও না!—তত্ত্বমসি—তুমি তাই!

কেউ বলেন, স্ত্রী শূদ্র ব্রহ্মবিদ্যার অধিকারী নয়। এতেই তো বেদান্ত একটা বৃহৎ বাক্যে মাত্র পর্য্যবসিত হয়েছে—বেদান্ত আমাদের কাছে শুধু সন্দেহসঙ্কুল একটা মতবাদমাত্র, তার সত্যতা কিছুই নাই। স্ত্রী-শূদ্র যদি ভৌতিক আলো বাতাসের অধিকারী হতে পারে, তবে আধ্যাত্মিক আলো বাতাসের অধিকারী হবে না কেন? ভেঙ্গে ফেল অবিদ্যার আর নির্বীর্য্যতার যত সব চোরকুঠরী আর অন্ধকারা। দিব্যধামের আলো-হাওয়ার পরশ সবার গায়ে লাগুক।

মানুষকে নীতি উপদেশ দিতে গিয়েই আধ্যাত্মিক দৈন্যের সৃষ্টি হয়। মাথাপাতলা যত নীতিবাগীশ সত্যের সম্বন্ধে নিজেও কিছু জানে না, অপরকেও কিছু জানায় না—শুধু ধর্ম্মের বাইরের খোসাটা সমাজকে দিয়ে সকল উদ্দেশ্যই পণ্ড করে ফেলে। আলো থাকলে পথ ভুল করে না কেউ; সামনে একটা কূয়া দেখতে পেলে ইচ্ছা করে, কেউ তার মাঝে পড়ে না। "এটা করো" আর "ওটা করো না"—এ সমস্ত বিধি-নিষেধ খাটে, মানুষের মাঝে যে পশুত্ব রয়েছে, তার উপর। একটা ছোট ছেলেকেও যদি বলি, "তোকে এটা করতে হবে" কি "এটা তুই কিছুতেই করতে পারি না"—তখন তার মাঝে যে যুক্তি-বুদ্ধিটুকু আছে, তাও আহত হয়ে বিদ্রোহী হয়ে ওঠে—অপমান বা তাচ্ছীল্য সে সইতে পারে না।

আমরা জোর গলায় হুকুম জারী করে কেবল সওয়ারের (যুক্তি) কাছ থেকে ঘোড়াকে (পশুভাব) তাড়িয়ে দিই। যুক্তির শাসন না মানিয়ে কেবল প্রভুত্ব করতে গিয়েই তো আমরা ছেলে-পিলেকে বিদ্রোহী করে তুলি। জবরদস্তীর আইন যেখানে বিদ্রোহ

হের সৃষ্টি করে না—সেখানে তা কেবল পচিয়ে গলিয়ে মারে। মনস্তত্ত্ব বলছে, মানুষ যখন সহজ অবস্থায় থাকে, তখন তাকে অতর্কিতে একটা ইঙ্গিত দিলেও তার ফল হয়, বেশী। আর আমরা যেখানে জবরদস্তি করে নীতি শিখাতে যাই, সেখানে সাধারণ লোকে স্বভাবতঃই উল্টা বুঝে বসে। বাধা দিলে বা অবজ্ঞা করলে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষাটা আরও প্রবল হয়ে ওঠে।

হরদম দেখতে পাচ্ছি, মানুষ ভগবানকেও তো রেহাই দেয় না। তিনি এসে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস তার ক্ষুদ্র আমিটার পরিচর্য্যা করবেন, তার ভাত-কাপড় জোটাবেন—এই তো সে চায়। একবার এক দৈবশক্তির ব্যবসাদার গিয়েছিল এক সাধুর কাছে। সাধুকে প্রণাম করে সে বলল, প্রভু আমায় এমন একটা মন্ত্র শিখিয়ে দিন, যা জপ করলে আমি যা চাই তাই পাই। সাধু একটা মন্ত্র বলে দিলেন বটে কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে মন্ত্র সিদ্ধির একটা অদ্ভুত নিয়মও বলে দিলেন। সাধু বল্‌লেন যতক্ষণ মন্ত্র জপ করবে, ততক্ষণ কিন্তু বানরের কথা ভাবতে পারবে না। বেচারী পরদিনই গুরুর কাছে এসে বল্‌ল, প্রভু আপনি যদি বারণ করে না দিতেন, তবে হয়ত বানরের কথা আমার মনেই আসিত না। কিন্তু এখন যে বানরের চিন্তা বানরের মত আমায় আঁকড়ে ধরেছে—এর হাত তো আমি ছাড়াতে পারছি না। নীতিবিদরা যদি অহরহ পাপ-তাপের নিন্দা করে তাদের জাগিয়ে না রাখত, তবে এতদিনে জগৎ হতে ওসব বালাই দূর হয়ে যেত। বাইবেলের ঈশ্বর যদি নিষিদ্ধ বৃক্ষটার উপর অমন করে মার্কা না মেরে রাখতেন, তবে বেচারী আদমের হয়ত কোন আনাচ কানাচের একটা অজানা গাছের ফল খাবার কথা মনেও আসত না।

সংস্কারের নামে আমরা একেবারে হুকুম চালানোর চূড়ান্ত করে বসি। একবার একটা ছেলেকে জিজ্ঞাসা করা হল, "তোমার নাম কি?" সে বলল, "আমার নাম 'ধেৎ' —মা যে আমায় সব সময় ওই কথাই বলেন।" আদেশ আর নিয়মের চাপে মানুষের আত্মজ্ঞান একেবারে চাপা পড়ে গিয়েছে—এখন নিজকে নাম-রূপ ছাড়া আর কিছু সে ভাবতে পারে না।

ভারতবর্ষে বাস্তব বেদান্তের চর্চ্চা আরম্ভ করতে হবে, বইয়ের ভিতর দিয়ে নয় —স্বাস্থ্যনীতির ভিতর দিয়ে। বেদান্তই হচ্ছে স্বাস্থ্য বা স্বস্থ-ভাব—শারীরিক মানসিক, আধ্যাত্মিক সুস্থতার নিদান। পাকস্থলীর স্বাস্থ্য যদি ফিরিয়ে আনতে পার, তবে তাতে যে কেবল সর্দ্দী, কাশি, জ্বর প্রভৃতিই আরাম হবে তা নয়—তাতে ঈর্ষা, ক্রোধ, কুচিন্তা, আলস্য প্রভৃতি মানসিক নানারকম অশুচিতাও দূর হয়ে যাবে।

অতি-প্রয়োজনের তত্ত্ব যে সূক্ষ্মরূপে বুঝতে পেরেছে, সেই সুস্থ। সমস্ত অতি-প্রয়োজনের মূলে আমি, অতএব আমি মুক্ত। নিজকে জানাই হচ্ছে প্রকৃত স্বাস্থ্য। আমাকে যদি না জানতে পারলে, তবে তোমার স্বাস্থ্যের বড়াই কেবল কুৎসিত রোগের আবরণ মাত্র। একের ভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়াই হচ্ছে স্বাস্থ্য। সেই একের মাঝেই প্রতিষ্ঠিত হও—জগতের আর কিছুকেই বড় ভেবে বিমূঢ় হয়ে থেকো না। তোমার যা বলবার আছে,—তাই বল—যা বলা উচিত, তা বলতে যেও না। জীবন-সমস্যা

কখনও অমীমাংসিত থাকবে না। কেননা সমস্ত সমস্যার মীমাংসাই হচ্ছে জীবন। স্বাস্থ্য তোমার নির্মুক্ত হয়ে ফুটে উঠুক, তার মাঝে মতলববাজী থাকে না যেন। যে জিনিষ হকের নয় বলে এখনি তোমায় ছেড়ে দিতে হবে,—সে হচ্ছে বিষয়। সোজা চাইতে শেখ; অর্থাৎ যে নির্ভীক দৃষ্টি দিয়ে গাছপালার দিকে তাকাচ্ছ, সেই দৃষ্টিতে যাই তার দিকে তাকাতে শেখ। ভয় করো না কিছু—ঠিক শিশুর মত অসঙ্কোচ দৃষ্টিতে তাকাও, মানুষের মাঝে ব্যক্তিত্বের কল্পনা করতে যেও না। সবার মাঝে দেখ শুধু নিজকে—অচেনা পরকে নয়।

ছেলেদের কাছে জীবনটা যেন খেলার মত সহজ, তাই আইন-কানুন সম্বন্ধে তাদের জ্ঞানটাই খাঁটী। অন্ততঃ যারা অভিজ্ঞতার ফলে জ্ঞানী হয়েছে বলে ব্যর্থ অভিমান করে, তাদের চেয়ে ছেলেরা বোঝে ভাল। "বিছু" ঘাসও যদি তুমি ইতস্ততঃ না করে মুঠী চেপে ধর, তবে তা হাতে লাগবে না—অথচ আলগোছভাবে তাকে একটু ছুঁতে গেলে জ্বালানী পোড়ানীর আর অন্ত থাকবে না। এমন সব বড় বড় কর্ম্মী আছেন, যাঁরা সাধারণভাবে দুটা চারটা কথা বলতে গেলেও গুপ্তচর আর ডিটেক্টিভের ভয়ে বুদ্ধিমানের মত সামলে যান। কিন্তু আমি বড় গলা করেই বলছি—এঁরা তো সংস্কারক নয়, এঁরা হচ্ছেন চোর। ভাই ডিটেকটিভ আর গুপ্তচরের দল, তোমাদের আমি সাদরে আমন্ত্রণ করছি। তোমাদের যদি কোনও বেতনের বরাদ্দ থাকে, তবে তার চেয়েও বেশী করে তোমাদের দেব—তোমরা এসে আমার উপর কড়া নজর রাখ। এসো না ভাই, আমার মাঝে যে রহস্য লুকানো রয়েছে, তাকে খুঁজে বের করবার চেষ্টা করে দেখ না একবার। আমার যা কিছু আছে, সব তোমাদের দেব, আশ্চর্য্যভাবে তোমাদের সকল কামনা পূরণ করব, তোমাদের সকল অভাব দূর হয়ে যাবে—আর দুঃখ থাকবে না, রাজমুকুট এসে তোমাদের পায়ে লুটাবে। আহা, রহস্যের সন্ধানে পাঁতি পাঁতি করে ফিরছ—এসো না আমার কাছে।

স্বাস্থ্যনীতির হুকুম মত কাজ সবাকেই করতে হচ্ছে। শিশুর মাঝে কোনও মতলব নেই, কিন্তু তার মত কর্ম্মী জগতে দুর্লভ। বেদান্ত বলছেন, মরদের মত চলতে শেখ, নিখুঁতভাবে কাজ কর, কিন্তু কাজের উপর যেন তোমার আনন্দ নির্ভর না করে। আনন্দের প্রেরণাতেই প্রত্যেকটী কাজ কর—কেবল আনন্দের দিকে হাত বাড়িয়ে থেকো না।

সত্যের উপর তোমার প্রতিষ্ঠা—জগতের বেশীর ভাগ মানুষ তোমার বিপক্ষ বলে ভয় পেয়ো না। দৃঢ়মূলা অবিদ্যার এই প্রাচুর্য্য যেন শষ্প-লগ্ন প্রভাতের শিশিরবিন্দুর মত। হে সবিতা, এই বাষ্পায়মান শিশির বিন্দুর চাকচিক্য তোমারই স্বাগতের প্রতীক্ষায় রয়েছে।

সত্যের সঙ্গে এক হয়ে যাও। তখন দু' লাখ দশ লাখ তোমার বিরুদ্ধ হলেও বা কি? —তখনো যে জগতের বেশীর ভাগই তোমার পক্ষে। নদী, পর্ব্বত, পবন, চন্দ্র, সূর্য্য, তারকা—সবই তোমার অনুকূল। অনন্ত কাল তোমার সহায়—দিন তোমার, যুগ তোমার! অখিল চরাচর তোমার সাথী। বিপক্ষকে তুমিই যে বেষ্টন করে রয়েছ, তুমি তো তাদের দ্বারা বেষ্টিত নও। দৈবকে বেষ্টন করে রয়েছ তুমি—সে যে তোমার বন্দী!

* * *

কর্ম্মখালি

—*—

সংস্কারক চাই—

পরের নয়—নিজের।

এমন লোক চাই—

যারা বিশ্ববিদ্যালয়ের জয়মাল্য পায়নি—

কিন্তু নিজকে জয় করেছে।

বয়স—ব্রহ্মানন্দবিলসিত অনন্ত যৌবন

বেতন—ব্রহ্মপদ

শীঘ্র আবেদন কর

ভিক্ষুকের কাতর প্রার্থনা নিয়ে নয়—

ধাতার অমোঘ সঙ্কল্প নিয়ে!

আবেদন করবার ঠিকানা—

বিশ্ববিধাতা

"স্বয়ং তুমি"

ওঁ ওঁ ওঁ*

---

* স্বামী রামতীর্থ

য়োগসূত্রবৃত্তি

—— * ——

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

সংযমের লক্ষণ বলা হইয়াছে। এক্ষণে সংযমের বিষয় প্রদর্শন করিয়া বিশেষ বিশেষ সিদ্ধিলাভের উপায়সমূহ বর্ণন করা হইবে।

ধর্ম্ম, লক্ষণ ও অবস্থাভেদে যে তিনটী পরিণামের কথা বলা হইল, তাহাতে সংযম করিলে সমাধিবশতঃ যোগীর অতীত ও অনাগত বিষয়ের জ্ঞান হইয়া থাকে। এ কথার তাৎপর্য্য এই—"এই ধর্ম্মীতে এই ধর্ম্ম, এই লক্ষণ এবং এই অবস্থা অনাগত কক্ষা হইতে বর্ত্তমান কক্ষায় প্রবিষ্ট হইয়া নিজ নিজ কর্ম্ম সম্পাদন করিয়া অতীত কক্ষায় প্রবেশ করিল"—বিক্ষেপের কারণসমূহ পরিহার করিয়া এইরূপ ভাবনাসংস্কারে যদি যোগী সংযম প্রয়োগ করেন, তবে যাহা হয় নাই, কিম্বা হইয়া গিয়াছে, তিনি তাহার সমস্তই জানিতে পারেন। কেননা চিত্ত যদি শুদ্ধসত্ত্বের অভিব্যক্তিস্বরূপ হয়, তবে তাহার যে কোনও বিষয় গ্রহণ করিবার সামর্থ্য থাকিবে। কিন্তু অবিদ্যা প্রভৃতি বিক্ষেপহেতু সেই সামর্থ্য অভিভূত থাকে। যোগশাস্ত্র-প্রসিদ্ধ উপায়-সমূহদ্বারা যদি বিক্ষেপ দূরীভূত হইয়া যায়, তবে দর্পণে কলঙ্ক না থাকিলে তাহা যেমন সমস্ত বস্তুরই প্রতিবিম্ব গ্রহণে সমর্থ হয়, চিত্তেরও তেমনি একাগ্রতাবলে সমস্ত বিষয় গ্রহণ করিবার সামর্থ্য জন্মে। (১৬)

সমস্ত প্রাণীর ভাষা-জ্ঞান একটী সিদ্ধি। তাহা এইভাবে অর্জ্জিত হইতে পারে।—শব্দ, অর্থ ও প্রত্যয়ের পরস্পরের অধ্যাসবশতঃ যে সঙ্কর বা অভিন্ন জ্ঞান, তাহার প্রবিভাগে সংযম করিলে সমস্ত প্রাণীর উচ্চারিত শব্দের জ্ঞান হয়। শব্দ আমরা শ্রবণেন্দ্রিয় দ্বারা গ্রহণ করি ; উহা নির্দ্দিষ্ট ক্রমানুযায়ী বিন্যস্ত বর্ণসমূহ দ্বারা গঠিত এবং সর্ব্বদাই একটী নির্দ্দিষ্ট অর্থজ্ঞানের কারণ স্বরূপ। যদি শব্দে বর্ণাদির নির্দ্দিষ্ট কোন ক্রম নাও লক্ষিত হয়, তথাপি তাহা স্ফোটাত্মক এবং যাঁহার বুদ্ধি শাস্ত্রানুশীলনে মার্জ্জিত হইয়াছে, তিনি তাহা বুঝিতে পারেন। বর্ণসমষ্টিই হউক, আর স্ফোটই হউক, শব্দ পদরূপে এবং বাক্যরূপে অভিব্যক্ত হইয়া থাকে এবং উভয়েরই একটী নিয়ত বিষয় প্রতিপন্ন করিবার সামর্থ্য আছে।

জাতি গুণ, ক্রিয়া প্রভৃতি হইল অর্থ, জ্ঞান বা বিষয়াকারে পরিণত বুদ্ধি-বৃত্তি হইল প্রত্যয়। ব্যবহারে শব্দ, অর্থ ও জ্ঞানকে আমরা পরস্পরের সহিত অধ্যাসিত করিয়া গ্রহণ করি এবং তাহাতে ইহারা পরস্পর ভিন্ন হইলেও বুদ্ধিতে একই রূপে প্রতিভাত হয় —ইহাই সঙ্কর। যেমন, কেহ যদি বলে, "গরুটা আন", তখন আমরা গোত্ব-জাতি দ্বারা অবচ্ছিন্ন গলকম্বলাদি বিশেষলক্ষণযুক্ত গোরূপ যে অর্থ বা বিষয়, সেই অর্থের বাচক যে গোশব্দ এবং তাহার গ্রাহক যে গো-জ্ঞান— এই তিনটিকেই অভিন্নভাবে বুঝিয়া থাকি। "এই হইল অর্থের বাচক গোশব্দ, এই হইল গোশব্দের বাচ্য বিষয়, আর এই হইল গ্রাহক প্রত্যয় বা জ্ঞান"—এইরূপ বিশ্লেষণ করিয়া আমরা বুঝি না। যদি কেহ জিজ্ঞাসা

করে, এখানে শব্দই বা কি, অর্থই বা কি, জ্ঞানই বা কি, তবে তাহার একই উত্তর হইবে—"গো।" যদি সকলই মিলিয়া-মিশিয়া একাকার না হইয়া যাইবে, তবে উত্তরটী একরূপ হয় কি করিয়া? কিন্তু এই একাকার সত্তাকে যদি বিভক্ত করিয়া এইরূপ নির্দ্দেশ করা যায়—অর্থের যে বাচকত্ব, তাহাই হইল শব্দের তত্ত্ব; শব্দের যে বাচ্যত্ব, তাহাই অর্থের তত্ত্ব; আর ইহাদের প্রকাশকত্বই হইল জ্ঞানের তত্ত্ব—এবং এই তত্ত্ববিভাগের উপর যদি সংযম প্রয়োগ করা যায়, তবে পশু, পক্ষী, সরীসৃপ, সকলেরই শব্দের জ্ঞান হয়। যোগী তখন বুঝিতে পারেন, কোন্ প্রাণী কি অভিপ্রায়ে কোন্ শব্দ উচ্চারণ করিয়াছে। (১৭)

পূর্ব্বজন্মের জ্ঞান আর একটী সিদ্ধি। সংস্কারের সাক্ষাৎকার হইলে পূর্ব্বজন্মের জ্ঞান হয়। বাসনারূপ চিত্তের সংস্কার দুই প্রকার। কতকগুলি সংস্কার কেবল মাত্র স্মৃতি উৎপন্ন করে, এবং কতকগুলি সংস্কার জাতি, আয়ু ও ভোগ রূপ বিপাকের হেতু। ধর্ম্ম ও অধর্ম্মই এই শেষোক্ত সংস্কার। "এই বিষয় আমি এইরূপ অনুভব করিয়াছি, এই ক্রিয়া এইরূপে নিষ্পন্ন করিয়াছি"—এইরূপ ভাবনা দ্বারা পূর্ব্বঘটিত ব্যাপারের আলোচনা করিয়া সংস্কারসমূহে যিনি সংযম করেন, তিনি সমস্ত অতীত বিষয় জানিতে পারেন। এই জ্ঞানের পক্ষে সংস্কারের উদ্বোধক কোনও কিছুর প্রয়োজন হয় না। সংযমের ফলে যখন পর পর সংস্কার সমূহ উদ্বুদ্ধ হইতে থাকে, তখন পূর্ব্বজন্মের জাতি, আয়ু ও ভোগও যোগী প্রত্যক্ষভাবে দর্শন করিয়া থাকেন। (১৮)

পরচিত্ত জ্ঞান আর একটী বিভূতি। প্রত্যয়ের উপর সংযম করিলে পরচিত্তের জ্ঞান হয়। প্রত্যয় শব্দের অর্থই পরের চিত্ত। কেহ বা প্রত্যয় শব্দে স্বচিত্তকে বুঝিয়া থাকেন। মুখভাব প্রভৃতি চিহ্ন হইতে পরচিত্তের যে সামান্য জ্ঞান হয়, তাহার উপর সংযম করিলে পরের চিত্তধর্ম্ম জানা যায়, অর্থাৎ সে চিত্ত রাগযুক্ত কিম্বা বিরাগযুক্ত তাহা জানা যায়। (১৯)

কিন্তু এই পরচিত্তজ্ঞানের বিশেষত্ব এই যে ইহাতে চিত্ত সম্বন্ধেই জ্ঞান হয়, কিন্তু তাহার আলম্বনের জ্ঞান হয় না অর্থাৎ চিত্ত কোন্ বিষয়ে ব্যাপৃত, তাহার জ্ঞান হয় না—কেনন: বিষয় সম্বন্ধে কোনও চিহ্ন তো পূর্ব্বে জানা যায় নাই। মুখভাব প্রভৃতি হইতে পরের চিত্তমাত্রই জানা গিয়াছে, কিন্তু সে চিত্ত নীল বস্তুর ভাবনা করিতেছে, কি পীত বস্তুর ভাবনা করিতেছে, তাহা তো বোঝা যায় নাই। যাহা পূর্ব্বে বোঝা নাই, তাহার উপর সংযম করা চলে না, সুতরাং পরচিত্তের যাহা বিষয়, তাহার জ্ঞান হয় না। এই জন্য সূত্রকার বলিতেছেন, আলম্বন সংযমের বিষয়ীভূত না হওয়াতে সালম্বন পরচিত্তের জ্ঞান হয় না। কিন্তু চিত্ত কি বিষয় নিয়া ব্যাপৃত, যোগীর যদি তাহার প্রণিধান হয়, তবে তদ্বিষয়ে সংযম করিলে আলম্বনেরও জ্ঞান হইতে পারে। (২০)

রূপ শরীরের চক্ষুর্গ্রাহ্য গুণ। সুতরাং রূপে চক্ষুর্গ্রাহ্যত্বরূপ শক্তি বিদ্যমান। আবার চক্ষুতেও প্রকাশরূপ সত্ত্বধর্ম্ম আছে। "শরীরে রূপ আছে"—এইরূপ ভাবনাবশতঃ রূপে সংযম করিলে তাহার চক্ষুর্গ্রাহ্যত্ব শক্তিকে স্তম্ভিত করায় রূপের সহিত চক্ষুর প্রকাশধর্ম্মের সংযোগ বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। তখন চক্ষুর গ্রহণ ব্যাপারের অভাবে যোগী অন্তর্হিত হইয়া যান। যেমন কায়িক রূপের অন্তর্দ্ধান ঘটান

যায়, তেমনি শব্দ প্রভৃতি শ্রবণেন্দ্রিয়াদি-গ্রাহ্য বিষয়সমূহেরও অন্তর্দ্ধান হইতে পারে। (২১)

মনুষ্যের আয়ু কর্ম্মেরই ফল। সেই কর্ম্ম দুই প্রকার—সোপক্রম ও নিরুপক্রম। কার্য্যকরী হইবার অভিমুখে বর্ত্তমান থাকাই উপক্রম। যে কর্ম্ম ফল উৎপাদনের জন্য উন্মুখ হইয়া রহিয়াছে, তাহাই সোপক্রম। যেমন উষ্ণস্থানে সিক্ত বস্ত্র প্রসারিত করিয়া রাখিলে তাহা শীঘ্র শুষ্ক হইয়া থাকে। নিরুপক্রম তাহার বিপরীত; যেমন সেই সিক্ত বস্ত্রখানিই অনুষ্ণ স্থানে রাখিলে তাহা বহু বিলম্বে শুষ্ক হইয়া থাকে। কর্ম্মও তেমনি অচিরে ফল-ব্যাপারে উন্মুখ কিম্বা বিমুখ হইতে পারে। কোন্ কর্ম্ম শীঘ্র ফলিবে, কোন্ কর্ম্মই বা বিলম্বে ফলিবে—এ বিষয়ে সংযম করিলে ধ্যানের দৃঢ়তাহেতু যোগীর অপরান্ত জ্ঞান হইয়া থাকে। অমুক সময়ে অমুক স্থানে আমার শরীর বিয়োগ হইবে, এইরূপ নিঃসংশয় জ্ঞানের নাম অপরান্ত জ্ঞান। অরিষ্ট সমূহ হইতেও অপরান্তজ্ঞান হইয়া থাকে। আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক ভেদে অরিষ্ট তিন প্রকার। আধ্যাত্মিক যথা—কান বন্ধ করিলে যদি স্বদেহস্থ বায়ুর শব্দ শুনিতে না পাওয়া যায়। আধিভৌতিক যথা—সহসা কোনও বিকৃত পুরুষ দর্শন। আধিদৈবিক যথা—লৌকিক দৃষ্টির অবিষয় স্বর্গাদির দর্শন। এই সমস্ত অরিষ্ট দর্শন হইতেও মৃত্যুকাল জানা যায়। যদিও যাহারা যোগী নহে, তাহারাও অরিষ্ট হইতে মৃত্যুকাল জানিতে পারে, তথাপি তাহাদের অরিষ্টজ্ঞান সামান্যাকারে হইয়া থাকে, সুতরাং তাহা নিঃসংশয় হয় না। কিন্তু যোগীদের এই জ্ঞান নিয়ত দেশে নিয়ত কালে হইয়া থাকে বলিয়া তাহা প্রত্যক্ষ-জ্ঞানের মতই অব্যভিচারী হয়। (২২)

মৈত্রী, করুণা, মুদিতা ও উপেক্ষারূপ চিত্ত-পরিকর্ম্মে যিনি সংযম করেন, তাঁহার মৈত্রী প্রভৃতি এত উৎকর্ষ লাভ করে যে তিনি সর্ব্বভূতের প্রতিই মিত্রত্বাদি সম্পন্ন হইতে পারেন। (২৩)

হস্তী প্রভৃতি বলশালী জন্তুর বলে সংযম করিলে যোগিদেহে তৎসদৃশ বলের আবির্ভাব হয়। এইরূপে বায়ুবেগ বা সিংহবীর্য্য প্রভৃতিতে সংযম করিয়াও তত্তৎ সামর্থ্য লাভ করা যায়। (২৪)

বিষয়বতী ও জ্যোতিষ্মতী প্রবৃত্তির কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে (১।৩৫, ৩৬)। সেই প্রবৃত্তির সাত্ত্বিক-প্রকাশরূপ যে আলোক, বিষয়-সমূহে তাহাকে ন্যস্ত করিলে অর্থাৎ সেই আলোকদ্বারা বিভাসিত করিয়া বিষয়-সমূহের ভাবনা করিলে অন্তঃকরণ ও ইন্দ্রিয় সমূহ প্রকৃষ্ট শক্তিসম্পন্ন হইয়া থাকে। তখন যোগী পরমাণুর মত সূক্ষ্ম বিষয়, কিম্বা ভূমিতলে নিহিত ধনাদিরূপ ব্যবহিত বিষয়, অথবা মেরুর অপরপার্শ্ববর্ত্তী রসায়নাদিরূপ বিপ্রকৃষ্ট বিষয়ও জানিতে পারেন। (২৫)

শ্রীশ্রীরূপসনাতন

—*—

(শ্রীমন্মহাপ্রভুসূত্রিত অভিধেয়সাধনভক্তিতত্ত্ব)

—*—

জ্ঞান-ভক্তির বিরোধভঞ্জন

ভক্তির মহাজন বলিতেছেন—"জ্ঞান-বৈরাগ্য ভক্তির কভু নহে অঙ্গ।" শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলিতেছেন (১১, ২০, ৩১)—

তস্মান্মদ্‌ভক্তিযুক্তস্য যোগিনো বৈ মদাত্মনঃ।
ন জ্ঞানং ন চ বৈরাগ্যং প্রায়ঃ শ্রেয়ো ভবেদিহ॥

—অতএব যে যোগী আমাতে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন, আমার প্রতি যাঁহার ভক্তি আছে, তাঁহার পক্ষে প্রায়শঃই জ্ঞান ও বৈরাগ্য এই পথে শ্রেয়স্কর হয় না।

ভগবানের এই উক্তি হইতে সাধারণের মনে সংশয় উৎপন্ন হইতে পারে। সাম্প্রদায়িক ভাব পুষ্ট করিতে যাহারা উৎসুক, তাহারা ভগবানের এই উক্তি অবলম্বন করিয়া জ্ঞানীর প্রতি অযথা বিদ্বেষ প্রদর্শন করিয়া থাকে। আবার দেশে এমন জ্ঞানাভিমানীরও অভাব নাই, যাহারা ভক্তিধর্ম্মকে দুর্ব্বলচিত্ত স্ত্রীলোকের ধর্ম্ম বলিয়া উপহাস করিতে ছাড়ে না। এ দুটাই দোষের। ভগবানকে পাইবার বহু পথ আছে। তাঁহাকে পাওয়া নিয়া আমাদের কথা। সদ্‌গুরু আশ্রয় করিয়া, কোন পথে চলিলে আমরা তাঁহাকে পাইব, তাহা জিজ্ঞাসা করিয়া তাঁহার নির্দ্দিষ্ট পথে চলাই শ্রেয়ঃ। সকল পথই একজনের জন্য সৃষ্ট নয়, কিম্বা সকল পথের খবরও আমরা জানি না। জন্মান্তরীণ সাধন-সংস্কারবশতঃ যাহার চিত্ত যে দিকে প্রবণ, শ্রীগুরু দিব্যদৃষ্টিতে তাহা দর্শন করিয়া শিষ্যকে সেই দিকেই পরিচালিত করিয়া থাকেন। সুতরাং প্রত্যেকের গুরু-নির্দ্দিষ্ট পথে শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠা থাকা প্রয়োজন—অপরের পথ ভাল কি মন্দ, তাহার বিচারের প্রয়োজন কি?

আবার যথার্থভাবে ভগবানকেই যিনি চাহিয়াছেন, কেবল মত আর পথের খোসা লইয়া মারামারি করিয়া নিজ নিজ সম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিতে যিনি ব্যস্ত নহেন, তিনি বুদ্ধির স্বাভাবিক নির্ম্মলতাবশতঃ কোনও পথের সহিতই কোনও পথের বিরোধ দেখিতে পান না। বিভিন্ন পথের সৃষ্টি বিভিন্ন চিত্তবৃত্তি লইয়া। বিচারশীল চিত্ত স্বাভাবিকই জ্ঞানের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িবে, আবার ভাবপ্রবণ চিত্ত ভক্তিকেই নিঃশ্রেয়সকর বলিয়া গ্রহণ করিবে। কিন্তু চরম ফল সম্বন্ধে কি কাহারও আত্যন্তিক তারতম্য ঘটিবে? অবশ্য সূক্ষ্মবিচারে ফলের একটু তারতম্য থাকিবেই, কিন্তু তাহার দরুণ যে দুঃখনিবৃত্তি, যে আনন্দ ও তৃপ্তি নিখিল জীবের কাম্য, তাহার সম্বন্ধে কোনও ব্যত্যয় ঘটিবে কি? তাহা ছাড়া চরমে যাঁহারা পৌঁছিয়াছেন, কোনও পথের সারাসারতা সম্বন্ধে কিম্বা

ফলের তারতম্য সম্বন্ধে তাঁহাদের দৃষ্টি অবরুদ্ধ থাকিবে কি? লক্ষ্যে পৌঁছাইয়া যিনি কৃতার্থ হইয়াছেন, তিনি কি বলিবেন না, "তং সদ্‌বিপ্রা বহুধা বদন্তি"—মহাজনেরা একমাত্র তাঁহাকেই নানাভাবে দেখেন ও বলেন; "গতিস্ত্বমেকো পয়সামিবার্ণবঃ।"—সমস্ত জলের যেমন একমাত্র সাগরে গতি, তেমনি সকলের একমাত্র গতি তুমিই।

কায়মনোবাক্যে যিনি স্বামীকে ভালবাসিয়াছেন, যিনি যথার্থ সতী, তিনি অপর সতীরও মর্ম্ম জানেন, অপর সতীকেও শ্রদ্ধা করিতে জানেন। হইতে পারে, তাঁহার স্বামিসেবার পদ্ধতি এক রকম, অপরের আর এক রকম; কিম্বা তিনি ঠিক যে ভাবে স্বামীকে পাইতেছেন, অপরে তেমন ভাবে আস্বাদন করিতেছেন না—কিন্তু তথাপি সতী কি অপর সতীর প্রেমের মর্ম্ম বুঝেন না? আর যিনি কেবল আপন স্বামীটি আগলাইয়া কুঞ্চিত নাসায় অপরের প্রতি বক্রদৃষ্টি করিতেছেন, তাঁহার পাতিব্রত্যে সংশয় আছে।

জ্ঞান ও ভক্তিতে যথার্থ কোনও বিরোধ নাই—হইতেও পারে না। যে ভক্ত জ্ঞানীকে শুষ্ক নীরস ভাবিয়া মুখ বাঁকান, তাঁহার কেবল ভক্তির অভিমানই আছে; জ্ঞানী যে কি রসে বিভোর, তাহা তিনি বুঝেন না, বা বুঝিতেও চাহেন না। আবার যে জ্ঞানাভিমানী ভক্তের গদ্‌গদভাব দেখিয়া হাসিয়া মরেন, তিনিও জানেন না ভক্তের হৃদয় কোন দিব্যজ্যোতিঃতে আলোকিত। শুধু ফল সম্বন্ধেই বা বলি কেন, গোড়ায় সাধনগুলির সম্বন্ধেই ভক্তি পথে আর জ্ঞানপথে যে কি আশ্চর্য্য ঐক্য আছে, তাহা আমরা তলাইয়া দেখি কি? আর ঐক্য তো থাকিবেই—কেননা আমরা সাধারণ জীব তো কেহই সর্ব্বকলুষবিবর্জ্জিত জ্ঞানী বা ভক্ত হইয়া জন্মাই নাই। কাজেই ভিতরে জ্ঞানের সংস্কারই প্রবল থাক্ কিম্বা ভক্তির সংস্কারই প্রবল থাক্, দুই পথিকেরই কিন্তু গোড়ায় একই গলদ্। সুতরাং সে গলদ সারিবার জন্য বহুদূর পর্য্যন্ত একই পথে উভয়কে চলিতে হয়। কিন্তু উভয়ের আচার বিচার বেশভূষা বিভিন্ন, কাজেই এক পথে চলিয়াও কেহ কাহাকে চিনি না। জ্ঞানী বিচারই করুন, আর ভক্ত শ্রবণকীর্ত্তনাদি পঞ্চাঙ্গ সাধনই করুন, এই যে মহামায়ার মোহ জালে আমরা বেড়া রহিয়াছি, ইহার বন্ধন হইতে মুক্ত হইবার চেষ্টা দুইজনেই করিতেছেন। প্রকৃত প্রস্তাবে দুইজনেই বিবেকী ও বৈরাগী—দুইজনেই মুমুক্ষু। সংসারের পাঁকে পড়িয়া গড়াগড়ি খাই—এ কেহও চাহে না। তবে এ উহার পথের নিন্দা করিয়া মরে কেন?

ভক্ত বলিবেন আমি রসিকের সেবা করি, জ্ঞানীর কঠোর বৈরাগ্য সাধনার স্থান আমার মাঝে কোথায়? কিন্তু বিষয়রসে বৈরাগ্য না জন্মিলে সেই চিন্ময় রসে মন গলিত কি? জ্ঞানীও তো তাহাই বলিতেছেন। আবার জ্ঞানী ভাবিবেন, অনুরাগ তো হৃদয়ধর্ম্ম, হৃদয়ধর্ম্ম বলি দিয়া আমি রিক্ত সন্ন্যাসীর কঠোর পথ অবলম্বন করিয়াছি—আমার চিত্তে কোমলতা কোথায়? কিন্তু সদ্বস্তুর প্রতি ঐকান্তিক অনুরাগ না থাকিলে কি মুমুক্ষুত্ব জন্মে? তাই তো জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ শঙ্করাচার্য্য বলিতেছেন "ভক্তি আর মুমুক্ষুত্ব এক।" আর জ্ঞানীই কি নরাকার পরব্রহ্ম শ্রীগুরুর ভজনা করেন না,—তাঁহাতে আত্মসমর্পণ, তাঁহার প্রণিপাত, তাঁহার সেবা করেন না? "অদ্বৈতং ত্রিষু লোকেষু নাদ্বৈতং গুরুণা সহ"—এ তো জ্ঞানী

রই সিদ্ধান্ত। তবে জ্ঞানীর মাঝে অনুরাগ নাই, কি করিয়া বলি ?

শাস্ত্র কিন্তু জ্ঞান ও ভক্তির মাঝে বাস্তবিক কোনও বিরোধ দেখিতে পান নাই—কারণ শাস্ত্রের দৃষ্টি সত্যপূত, সাম্প্রদায়িক ভাব দ্বারা কলুষিত নহে। আমরাই আমাদের ব্যক্তিগত ভাবের অনুকূল বচনগুলি প্রকরণ হইতে বিচ্ছিন্নভাবে উদ্ধার করিয়া প্রমাণ করিয়া বসি —শাস্ত্র অমুককে সমর্থন করিতেছেন আর অমুককে খেদাইয়া দিতেছেন !

প্রস্তাবের শিরোভাগে শ্রীমদ্ভাগবত হইতে যে শ্লোকটী উদ্ধৃত হইয়াছে, প্রকরণস্থ অন্যান্য শ্লোক হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখিলে মনে হয়, ভগবান বুঝি ভক্তকে জ্ঞান-বৈরাগ্যের ছায়া মাড়াইতেও নিষেধ করিতেছেন। সাম্প্রদায়িক ব্যাখ্যাকারেরা এই বিরোধের ভাবটিই সযত্নে ফলাইয়া তুলিবেন। কিন্তু এটী যে অধ্যায়ের শ্লোক, সে অধ্যায়ের সমস্তটুকু মনোযোগ দিয়া পড়িলে বোঝা যায়, শাস্ত্র কেমন নিরপেক্ষ ও সত্যাশ্রিত। প্রসঙ্গ একটু দীর্ঘ হওয়ার আশঙ্কা থাকা সত্ত্বেও আমরা সমগ্র অধ্যায়ের মর্ম্মটুকু নিম্নে উদ্ধার করিয়া দিলাম।—

পূর্ব্ব অধ্যায়ের, "পণ্ডিত কে, মূর্খ কে, স্বর্গ কি, নরক কি"—প্রভৃতি উদ্ধবের গুটীকতক প্রশ্নের উত্তরে উপসংহারকালে ভগবান বলিয়াছিলেন, "গুণ আর দোষের লক্ষণ তোমাকে বাড়াইয়া আর কি বলিব, সার কথা এইটুকু জানিয়া রাখ, গুণ আর দোষকে ভেদদৃষ্টিতে দেখাই বাস্তবিক দোষ ; এবং গুণ-দোষের কোনও ভেদ না দেখিয়া স্বভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকাই গুণ।"

ইহার উত্তরে উদ্ধব বলিয়াছিলেন, "ভগবন্, বেদ আপনারই বাক্য, তাহাতে কর্ম্মসম্বন্ধে বিধিও আছে, নিষেধও আছে ; সুতরাং কর্ম্মের গুণও বলা আছে, দোষও বলা আছে। গুণদোষাদির বিচার না করিলে বর্ণাশ্রমাদির প্রতিষ্ঠাই বা হয় কি করিয়া ? বেদ আমাদের নিঃশ্রেয়সের পথ বলিয়া দিতেছেন। তিনি যেখানে গুণদোষের উল্লেখ করিতেছেন, সেখানে গুণদোষ-বিচারকে নিঃশ্রেয়সের নিদান বলিয়া গ্রহণ করিব না কেন ?"

উদ্ধবের কথাগুলি ঠিক ব্যবহারিক দৃষ্টির অনুকূল। মনে রাখিতে হইবে, ইহারও উর্দ্ধে দৃষ্টি প্রেরণ করিতে পারিলে তবে অধ্যাত্মরাজ্যের সন্ধান মিলে। ভগবান এই তত্ত্বের প্রতি ইঙ্গিত করিয়াই প্রত্যুত্তরে বলিলেন, "মানুষের কল্যাণবিধান কামনায় আমি তিনটি যোগের কথা বেদের তিনটি কাণ্ডে উপদেশ করিয়াছি। কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তিই সেই তিনটী যোগ—এই তিনটী পথ ছাড়া মোক্ষ সাধনের আর অন্য কোনও পথ নাই। ইহাদের মাঝে বিষয়ের ভেদ না থাকিলেও অধিকারীর ভেদ আছে। কর্ম্মকে দুঃখকর জানিয়া যাঁহারা তাহার ফলের প্রতি বিরক্ত হইয়া কর্ম্মত্যাগ করিয়া থাকেন, তাঁহাদের পক্ষে জ্ঞানযোগ সিদ্ধিপ্রদ। আর যাঁহারা কর্ম্মকে দুঃখকর বলিয়া বুঝিতে পারেন না, সুতরাং তাহার ফলের প্রতিও বিরক্ত হন না, তাঁহাদের জন্যই কর্ম্মযোগ। ভাগ্যবশতঃ আমার প্রসঙ্গ শ্রবণ-কীর্ত্তনে যাঁহার শ্রদ্ধা জন্মিয়াছে, কর্ম্মের প্রতি যিনি বিরক্তও নহেন, অতিমাত্রায় অনুরক্তও নহেন, তাঁহার পক্ষে ভক্তিযোগ সিদ্ধিপ্রদ।"

দেখা যাইতেছে, গুণদোষ-বিচারের নিদান

কর্ম্মের সহিত এই তিনটী পথের অল্পাধিক যোগ রহিয়াছে। কাম্যকর্ম্মে যাহাদের প্রবৃত্তি আছে, তাহারা সর্ব্বতোভাবে বিধি-নিষেধের বা গুণদোষের অধীন। যাঁহারা নিষ্কাম কর্ম্মের অধিকারী, তাঁহারাও যথাশক্তি বিধিনিষেধ মানিয়া চলিবেন। কিন্তু জ্ঞান ভক্তির অধিকার লাভ করিবার পূর্ব্বে এই দুইটীর অধিকার বুঝিতে হইবে। জ্ঞান-ভক্তির অধিকারীর পক্ষে বিধিনিষেধের বশ্যতা সামান্য মাত্র। আর জ্ঞানভক্তিতে যাঁহারা সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের বিধিনিষেধের কোনও বন্ধনই নাই।

অতঃপর কর্ম্মযোগের অধিকার বিবৃত করিয়া ভগবান বলিতে লাগিলেন, "প্রথমতঃ কর্ম্ম সকলকেই করিতে হয়। যতদিন পর্য্যন্ত নির্ব্বেদ উপস্থিত না হইবে, কিম্বা আমার প্রসঙ্গে শ্রদ্ধা উৎপন্ন না হইবে, ততদিন পর্য্যন্ত নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবে। কর্ম্মযোগীও জ্ঞান ও ভক্তির ভূমিকায় আরোহণ করিতে পারেন—কিন্তু তাহা হইলে তাঁহাকে স্বধর্ম্মনিষ্ঠ ও ফলকামনাশূন্য হইয়া কর্ম্ম করিতে হইবে। মানুষ যদি স্বধর্ম্মে অবস্থিত থাকে, তবে তাহার নিষিদ্ধ কর্ম্মের অনুষ্ঠানের কোনও সম্ভাবনা থাকেনা—সুতরাং নরকেরও কোনও ভয় থাকে না। আর ফলকামনা না থাকিলে, তাহার স্বর্গগতিও হয় না। সুতরাং কাম্য ও নিষিদ্ধ কর্ম্ম বর্জ্জন করিয়া কর্মযোগী স্বর্গ-নরকরূপ গুণ-দোষের কবল হইতে উদ্ধার পান। এইরূপ যোগী স্বধর্মানুষ্ঠানের ফলে নির্মল ও শুদ্ধ হইয়া এই জগতে এই দেহেই বিশুদ্ধ জ্ঞান, কিম্বা ভাগ্যবশতঃ আমার প্রতি ভক্তির অধিকারী হইয়া থাকেন।

"এই নরদেহই জ্ঞান ও ভক্তি সাধনের উপায়। এই জন্য স্বর্গবাসী ও নরকবাসী জীবেরাও এই দেহের কামনা করিয়া থাকে, কেননা স্বদেহে তাহাদের এই অধিকার লাভ করিবার উপায় নাই। এই জন্যই বলি, বিচক্ষণ ব্যক্তি স্বর্গ বা নরক কিছুরই আকাঙ্ক্ষা করিবেন না, এমন কি নরদেহ শ্রেষ্ঠ বলিয়া পুনরায় মানুষ হইবারও আকাঙ্ক্ষা পোষণ করিবেন না—তাহা হইলে দেহের প্রতি আসক্তিবশতঃ লক্ষ্যে তাঁহার অবধান থাকিবে না। এই দেহ জ্ঞান ও ভক্তি সাধনের একমাত্র উপায় হইলেও, ইহা যে মরণশীল—ইহা জানিয়া বিদ্বান ব্যক্তি অপ্রমত্ত চিত্তে মৃত্যুর পূর্ব্বেই মোক্ষলাভের জন্য যত্ন করিবেন। মনুষ্য পক্ষী দেহবৃক্ষে নীড় রচনা করিয়াছে বটে, কিন্তু নির্দ্দয় কাল সেই বৃক্ষকে ছেদন করিতে উদ্যত হইলে অনাসক্ত পক্ষী অনায়াসেই তাহাকে ত্যাগ করিয়া পরমা গতি লাভ করে।

"দিবারাত্র আয়ুক্ষয় হইতেছে জানিয়া বিচক্ষণ ব্যক্তি পরিণাম ভাবিয়া সচকিত থাকেন। ফলে তিনি আসক্তি ও কর্মচেষ্টা ত্যাগ করিয়া সেই পরমতত্ত্বকে জানিয়া পরমা শান্তি লাভ করেন। একেই তো নরদেহ লাভ করা কঠিন। ভব-পারাবার পার হইবার পক্ষে এই নরদেহই একমাত্র তরণীস্বরূপ। যে ব্যক্তি এমন দেহ-তরণীতে গুরু-কর্ণধারকে পাইয়া আমার কৃপারূপ অনুকূল পবন দ্বারা চালিত হইয়া ভবসমুদ্র পার হইবার চেষ্টা করে না, তাহাকে আত্মঘাতী ভিন্ন আর কি বলিব?"

এইরূপে কর্মে যাহার বিরক্তি উৎপন্ন হয় নাই, তেমন অধিকারীও নিষ্কাম কর্মানুষ্ঠান ও বৈরাগ্য-সহায়ে কি প্রকারে জ্ঞান-ভক্তির অধিকার অর্জ্জন করিতে পারে, ভগবান্ তাহা বিবৃত করিলেন। ইহাই পূর্ব্বকথিত কর্ম-যোগ। অতঃপর আমরা ভগবানের শ্রীমুখ-নিঃসৃত জ্ঞান ও ভক্তিযোগের আলোচনা করিব।"

সাক্ষী

—*—

হে আনন্দময়,
দুঃখ-শোক-মরণের মরুস্থলে জেনেছ নিশ্চয়
অমৃতের ফল্গুধারা—চির-স্নিগ্ধ, চির-সঙ্গোপন!

কামনার মরীচিকা, মায়ার স্বপন
ভেদি আজি লভিয়াছে বজ্রভেদী অগ্নিদৃষ্টি তব
অনির্ব্বাণ জ্যোতির্ম্ময় সত্তা অভিনব।

তোমার শাসন
বিশ্বমাঝে অকুন্ঠিত নিয়াছে আসন—
লঙ্ঘিয়াছে কামনার সীমা,—
লোক হতে লোকান্তরে—ব্যাপিয়াছে অসীম নীলিমা—
অনায়াসে!

মৃত্যু হেসে দাঁড়ায়েছে অমৃতের পাশে—
ছায়ালোকে কম্পমান ধরণীর সুখ-দুঃখ-ছবি—
তোমার আনন্দ মাঝে রহিয়াছে সবি
অচঞ্চল, নিমেষ-নিহত!—

ধ্রুবতারা সম জ্বলিছে সতত—
অতি ঊর্দ্ধে ওই তব স্থির দৃষ্টিখানি;—
স্ফুরিত অধরতটে নির্ঘোষিত মেঘমন্দ্র বাণী
বিশ্বমর্ম্ম মাঝে পশি জাগে অনুক্ষণ—
সত্যের বিজলী-ঘেরা আনন্দের মন্ত্রসঞ্জীবন!

শিক্ষার গলদ

—— * ——

শিক্ষার কেন্দ্র বলতে আমরা বুঝি ইস্কুল আর কলেজ বা তেমনিতর একটা প্রতিষ্ঠান। কিন্তু ছেলে জন্মালে পরেই তো তাকে ইস্কুলে পাঠানো চলে না—অথচ ইস্কুলে যাওয়ার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সময়টা যে বিনা শিক্ষায় কাটবে, এমন কথাই বা কে সাহস করে বলতে পারে? তা ছাড়া, ইস্কুলে সব রকম শিক্ষাও হয় না, হওয়া সম্ভবও নয়। বিশেষতঃ আমাদের দেশে যে ইস্কুল-শিক্ষার রীতি প্রচলিত আছে, তাতে সকল শিক্ষার মূল মনুষ্যত্ব শিক্ষাকেই সযত্নে বর্জ্জন করে ছেলের ঘাড়ে কেবল কতকগুলি অবান্তর বিদ্যার বোঝা চাপিয়ে দেওয়া হয়। আর সে দেওয়ার কায়দাটাও এমন বিশ্রী যে, তাতে ছেলের জীবনে না ফোটে ধর্ম, না ফোটে কর্ম, না ফোটে শিল্প। এমন অবস্থায় অধিকাংশ ছেলের মা-বাপ ছেলেকে ইস্কুলে পাঠিয়েই যখন নিশ্চিন্ত হন, তার পূর্ব্বেও ছেলের সম্বন্ধে কোন ব্যবস্থা করেন না, পরেও করেন না— তখন এই ভেবে আমাদের দুঃখ হয় যে, পরনির্ভরতায় আমরা এতদূর অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি যে আপন ছেলের ভালটুকুও আমরা পরের হাতে পয়সা দিয়ে করিয়ে নিতে পারলেই নিশ্চিন্ত থাকি।

অবশ্য সাধ্যাসাধ্যের একটা কথা এখানে ওঠে। ছেলের শিক্ষার ভার শেষ পর্য্যন্ত আপন হাতে রাখা সাধ্যে কুলিয়ে ওঠে না বলেই আমরা পরের হাতে তাকে সঁপে দিই। সমাজ গড়তে গেলে এমনি পরস্পরের সহায়তা নিয়ে চলতে হয়, তাও মানি। কিন্তু কথা হচ্ছে, শিক্ষার জন্য ছেলেকে ঘরের বার করতে বাধ্য হলেও, যতক্ষণ সে ঘরে আছে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত তার শিক্ষা সম্বন্ধে আমরা উদাসীন থাকি কেন? শিক্ষা-সম্বন্ধে যে সমস্ত আজগুবি ধারণা আমাদের মাঝে আছে, সেগুলিই হচ্ছে আমাদের ঔদাসীন্যের মূল। সাহিত্য, বিজ্ঞান, শিল্প প্রভৃতির মোহে আমরা এমনি আচ্ছন্ন যে, এগুলি ছাড়া অন্যত্রও যে জীবনের কোনও একটা সার্থকতা থাকতে পারে, তা আমাদের মনেই আসে না। মনুষ্যত্ব না জন্মালে কেবল বিদ্যা হলেই কি সব হয়? ইতিহাসের দু'পাতা আর বিজ্ঞানের চার পাতা কি আমার জীবনের সমস্ত সুখদুঃখের সমাধান করবে, আমার ইহকাল পরকালের উপায় করবে?

বাস্তবিক আমরা অতিমাত্রায় ইহকাল-সর্ব্বস্ব হয়ে পড়েছি বলেই ইহকালের শিক্ষার চটকটাই কেবল নজরে আসে। অথচ সমাজ হিসাবে, ধর্ম হিসাবে, নীতি হিসাবে সে শিক্ষাও যে সম্পূর্ণ হয়, তাও তো দেখি না। বছর বছর এক বাংলা হতেই হাজার গ্র্যাজুয়েট বিদ্যার ভারে কুব্জ হয়ে বিশ্ববিদ্যালয় হতে বেরিয়ে আসে, কিন্তু তার মাঝে ধার্ম্মিক, চরিত্রবান, সত্যাশ্রয়ী, মেরুদণ্ডবিশিষ্ট মানুষ থাকে কয়টা? আপনার উদর পোষণের করুণ প্রয়াস ছাড়া সমাজের হিতের দিকে দৃষ্টি দেবার শক্তি থাকে কয়জনার? যে দেশে বিদ্যার ছাপওয়ালা মানুষের সংখ্যা এত বেশী, সে দেশের মানুষ শৌর্য্যে, বীর্য্যে, ধর্ম্মে, নীতিতে এমন হীন হয় কেন? হাজারকরা

কয়টা লোক লেখাপড়ার কসরত শিখে নিয়েছে তাই দিয়ে কি শিক্ষার উন্নতির পরিমাণ হবে? আর এই যে ইহসুখপরায়ণ দুশ্চরিত্র নাস্তিকের সংখ্যা দেশে বেড়ে চল্ছে, একেই কি শিক্ষার সুফল বল্‌ব?

আমরা স্ত্রীজাতিকে লেখাপড়া শিখাইনি, ছোট জাতকে দেবনাগরী অক্ষর পরিচয় করাইনি—এই কথা নিয়ে আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থার দৈন্যসম্বন্ধে কত কথাই শুনলাম। কিন্তু মেয়েরা লেখাপড়ায় উভয়ভারতী না হয়েও যে একমাত্র সতীত্বের, সংযমের গৌরবে জাতটাকে ধ্বংসমুখ হতে রক্ষা করে এসেছে—এখনও আস্‌ছে—তাকে কি কুসংস্কার আর কুশিক্ষার ফল বল্‌ব? যে দেশের ছোট জাতের মাঝেও কত শত সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তক মহাপুরুষের জন্ম হয়েছে, সে দেশের শিক্ষা-দীক্ষার ব্যবস্থাকে কি হীন বল্‌ব? আমরা এমন কথা বল্‌ছি না যে, মেয়েদের বা অনুন্নত (?) জাতদের লেখা পড়া শিখে না। লেখাপড়া যত পার শিখ, কিন্তু তাদের মাঝে যাতে প্রকৃত মনুষ্যত্বের বিকাশ হয়, ইহকাল পরকালের উপায় হয়, এমন শিক্ষার ব্যবস্থাই আগে কর। আগে মানুষ হয়ে তার পর যে যত বিদ্বান হতে পারে। আর এ কথা মেয়ে পুরুষ, ছোট-বড় সকলের পক্ষেই খাটে।

এখনকার সঙ্গে আগেকার এই পার্থক্য যে আগে সমাজ-সংগঠনের গুণেই প্রকৃত মনুষ্যত্বের শিক্ষা সমাজের সর্ব্বত্র অবাধে সঞ্চারিত হতে পারত। স্ত্রী শূদ্রকে বেদাধিকার দেওয়া হয়নি মানে বেদের আক্ষরিক অধিকার তারা পায়নি, কিন্তু সেই বেদের তত্ত্ব তাদের শিক্ষা দেবার জন্য হিন্দু পুরাণ-সংহিতায় যে বিপুল আয়োজন করেছিল, এত বড় লোকহিতকর অনুষ্ঠান কে কোথায় করছে? এই শিক্ষা-ব্যবস্থার ফলেই ধর্ম্মের নিগূঢ় তত্ত্ব সমাজের হীনতম ব্যক্তির মাঝেও আত্মপ্রকাশ করতে পেরেছে। নিজ নিজ অধিকারের মাঝে সংযত থেকে এত দিন ধরে এত বিপ্লবের মাঝেও যে এই বৃহৎ সমাজকে সকলে স্বচ্ছন্দে ও সুশৃঙ্খলায় বহন করে আনতে পেরেছে—জাতি হিসাবে, সমাজ হিসাবে এত বড় লাভটাকে কি আমরা বলব কুশিক্ষা আর কুসংস্কারের ফল? সুশিক্ষা আর সুসংস্কারের ফলে আজ তো দেখতে পাচ্ছি, ঘরে ঘরে হাহাকার উঠছে—কেবল গুটীকতক লোকের সুবিধা হয়ে বাকী সমস্তটা দেশই অরাজকতা আর উচ্ছৃঙ্খলতায় দুঃখময় হয়ে উঠেছে।

আজ আমাদের সমাজ ভেঙ্গেছে, ঘর ভেঙ্গেছে। যেমন একদিক দিয়ে দেখতে গেলে শিক্ষার বিপ্লবেই আমাদের এ সর্ব্বনাশ ঘটেছে, তেমনি আজ সামাজিক ও পারিবারিক দুর্ব্বলতার দরুণ শিক্ষা-বিপ্লবেরও কোনও সমাধান হতে পারছে না। পূর্ব্বে সমাজদেহে ও পরিবারে ভাবের ঐক্য-বন্ধন ছিল; কিন্তু আজ সেখানে কত রকমের যে মতভেদের সৃষ্টি হচ্ছে, তার ইয়ত্তা নাই। মতের পার্থক্যে উচ্ছৃঙ্খলতা যত বাড়ছে, ততই মানুষ জীবনের চরম লক্ষ্য সম্বন্ধে বিচারহীন ও উদাসীন হয়ে পড়ছে। জীবনের গতিই যেখানে অনিয়ন্ত্রিত, শিক্ষার সেখানে আর কি গতি হবে? কাজেই দেখতে পাই, ব্রাহ্মণসন্তান যদি পূর্ব্বপুরুষের সমস্ত আচার-বর্জিত হয়েও রাক্ষসী বিদ্যার অর্জ্জনে বেশী রকম অনুরাগ দেখায়, তবে আমরা সময় সময় মৌখিক একটু আধটু দুঃখপ্রকাশ করলেও কার্য্যতঃ বড় কিছু করতে চাই না।

যে ঢেউ আজ কাল দেশে এসেছে, তার সঙ্গেই সব ভাসিয়ে দেব, না প্রাচীনকালের কথা স্মরণ করে আত্মরক্ষা করে চলব—এই হচ্ছে সমস্যা। সমাজ দুর্ব্বল বলেই এ সমস্যার কোন মীমাংসা হচ্ছে না। আর এই দোটানা ভাব পারিবারিক জীবনে ঢুকে গৃহের ভিত্তিকে পর্য্যন্ত দুর্ব্বল করে ফেলছে। এই জন্য দেখি, আমরা ঘরসংসার চালাই কতকটা মনু-পরাশরের শাসনে, আবার কতকটা বিলাতী কায়দায়। কাজেই সংশয় রেখে চলতে গিয়ে জীবনের গুরুত্ব সম্বন্ধে দায়িত্ববোধ আমাদের চলে যাচ্ছে। ফলে শিক্ষা দীক্ষা সম্বন্ধে একটা নিরেট ব্যবস্থা আমাদের দ্বারা হয়ে উঠছে না। রাজসরকার থেকে যে রকম দোআঁসলা ব্যবস্থা হচ্ছে, আমরা নিশ্চেষ্ট হয়ে তা মেনেও নিচ্ছি, আবার তাকে গালও দিচ্ছি।

এই দুর্ব্বলতার জন্য সমাজকে দায়ী করতে হলে আজকে তো আর তাকে খুঁজে পাওয়া যাবে না! কাজেই এর জন্য পরিবারকেই আমরা দায়ী করছি। সন্তানকে যারা সংসারে এনেছে, তার কল্যাণ চিন্তা, তার শিক্ষাব্যবস্থা তো তারাই করতে বাধ্য। ছেলেকে সরকারী প্রতিষ্ঠানে ঢুকিয়ে দেবার সময় যে যুক্তিই দেখাও না কেন, তার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তার শিক্ষা দীক্ষার জন্য তো তুমিই দায়ী। ছেলে যে বংশে, যে সমাজে, যে দেশে জন্মেছে, তার একটা মর্য্যাদা নিশ্চয়ই আছে, এবং সেই মর্য্যাদা সে যাতে কিছুতেই ক্ষুণ্ণ না করে, এমন শিক্ষাও তার প্রয়োজন। কিন্তু সে শিক্ষা কি বাহিরে হবে? বিদেশীয় রাজা আমাদের ব্যক্তিগত আচার বা ধর্ম্মের উপর হস্তক্ষেপ করতে চান না, সে ভালই মানলাম। কিন্তু আচার আর ধর্ম্মকে বাদ দিয়ে যে শিক্ষার ব্যবস্থাটা হল, তাতে আমাদের মনুষ্যত্ব অক্ষুণ্ণ থাকবে কতটুকু? শিক্ষার এই ক্রটী রাজাও পূরণ করবেন না, বিশৃঙ্খল সমাজও তা করতে অসমর্থ, তবে এ দায়িত্ব বহন করবে কে? এর জন্য যদি পরিবারকে দায়ী না করি, তবে করব কাকে?

অনেক সময় আবার পরিবার বলেও একটা সংহতি খুঁজে পাওয়া যায় না। শিক্ষার প্রভাবে একান্নবর্ত্তী পরিবারগুলি দিন দিন ধ্বংসের পথে যাচ্ছে—বংশমর্য্যাদা বা পূর্ব্বপুরুষের গৌরববোধও তার সঙ্গে ম্লান হয়ে আসছে। আজকাল বহু পরিবার বিলাতী প্রথানুযায়ী শুধু একটী নর আর একটী নারী নিয়ে। এমন অবস্থায় আত্মসুখচিন্তাটা যদি বড় হয়ে উঠে, তা তো আশ্চর্য্য কিছুই নয়। আত্মসুখচিন্তাই তো মানুষকে ইহসর্ব্বস্ব করে তোলে। পারিবারিক জীবনের এমন দুর্দ্দশা হলে শুধু পরিবারের উপরই সন্তানের শিক্ষার দায়িত্ব ফেলে তো নিশ্চন্ত হওয়া যায় না। কাজেই অবশেষে পিতামাতাকেই সব রকমে দায়ী করা ছাড়া আর উপায় থাকে না।

আগে যেখানে সমস্ত সমাজের বা বহুকুটুম্ব পরিবারের শিক্ষার দায়িত্ব ছিল, সেখানে দায়িত্বভার এসে পড়েছে শুধু পিতা আর মাতার উপর। এতে তাদের পক্ষে সমস্যা যেমন জটিল হয়েছে, তার মীমাংসার জন্য তেমনি অধিকমাত্রায় চেষ্টা ও যত্নেরও প্রয়োজন হয়েছে। অথচ শিক্ষা, সমাজ, অর্থনীতি সবদিক দিয়ে বাপ মাও এমন বিড়ম্বিত যে যতটুকু চেষ্টা হওয়া উচিত, তাও তাদের দিয়ে হয় না। কিন্তু চেষ্টার অভাবের জন্য কেবল বর্ত্তমান অবস্থাকেই দোষী করা চলে না। আসল দোষ পিতামাতার আলস্য আর পর-

নির্ভরতা। সন্তান সম্বন্ধে পিতামাতাকে আরও সচেতন হতে হবে। অবস্থা সঙ্কটময় বলেই তো চেষ্টার আরও জোর হওয়া উচিত।

পিতামাতা এই কথাটি স্মরণ রাখবেন যে একটু ইংরেজী শিখবার জন্য বা একটা কেরাণীগিরি জোটাবার জন্য যদি ছেলেকে ইস্কুলে পাঠানো নিতান্তই প্রয়োজন হয়, তাতে আপত্তি নাই। কিন্তু এই ইস্কুল-কলেজের বহির্মুখী শিক্ষাটাকেই চরম ভেবে তাঁরা যেন নিশ্চিন্ত না থাকেন। তাঁদের এইটুকু মনে রাখতে হবে যে, আজ অবস্থা-বৈগুণ্যে তাঁদের সন্তান সমাজ হতে বিচ্ছিন্ন, বংশধারার গৌরব হতে বিমুক্ত, দেশাত্মবোধ-হীন। তাঁরাও ঠিক এমনি দুর্দ্দশাপন্ন। এমন অবস্থায় দেশের, সমাজের, বংশধারার অনুকূল জাতীয় শিক্ষার ভার তাঁদেরই বিশেষ করে নিতে হবে। সকলের চেয়ে বড় কথা, চার্ব্বাক্-সভ্যতার বিষময় ফলে আমাদের আধ্যাত্মিক দৈন্যেরও সীমা নাই; এই দৈন্য ঘুচাবার জন্য ধর্ম শিক্ষার ভারও তাঁদেরই নিতে হবে। অন্ততঃ যতদিন পর্য্যন্ত ছেলেকে কোনও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে না পাঠাচ্ছেন, ততদিন পর্য্যন্ত—ছেলে ভূমিষ্ঠ হবার পর থেকে—সব রকম শিক্ষার ভার তাঁরা নিতে বাধ্য। সর্ব্বাঙ্গীন শিক্ষার প্রতি ঘরে হবে পিতা-মাতার ঔদাসীন্য আর বাইরে থাকবে ইস্কুল-কলেজের ঔদাসীন্য—তবে ছেলে মানুষ হবে কোথায়? গুরুগৃহবাস পদ্ধতির প্রবর্ত্তন করলেও সমস্যার মীমাংসা হবে না—যদি পিতামাতা শৈশবেই সব রকম শিক্ষার বীজ সন্তানের হৃদয়ে বপন না করেন।

ভোক্তা ও দ্রষ্টা

কর্ম্ম লইয়াই সংসার। কর্ম্ম করে সকলেই—সচেতন কর্ত্তাতেও করে, অচেতন কর্ত্তাতেও করে। কর্ম্মের অধিকারও বহুদূর পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত। পরের ইচ্ছাতে বা নিজের ইচ্ছাতে হাত-পা নাড়িয়াই যে মানুষ কর্ম্ম করে, তা নয়; দেহকে ইচ্ছার কর্ম্ম করিতে না দিলেও মন তো চুপ করিয়া বসিয়া থাকে না। আবার ইচ্ছার কর্ম্ম ছাড়া দেহের অনিচ্ছার কর্ম্মও আছে; শ্বাস বয়, নাড়ী চলে—কেমন করিয়া তাহার কোনও খবরই জানি না, কিন্তু আমার কোনও স্পষ্ট ইচ্ছা না থাকিলেও কোন্ এক অজ্ঞাত ইচ্ছার প্রেরণায় কাজ তো হইতেছেই। দেহ ছাড়িয়া একটু ভিতরে ঢুকিলে দেখিব, মনেও সেই ব্যাপার—দিন রাত সে সঙ্কল্প-বিকল্পের জাল বুনিতেছে, এখন সে খবর আমি জানি, আর নাই জানি। মনের পরের খবর বড় বেশী রাখি না, কিন্তু হৃদয় বলে বুদ্ধি বলিয়া যে

একটী বস্তু আছে, সে ও তো বসিয়া নাই—মনের গোলমাল ঘুচাইয়া একটা নিশ্চিত মীমাংসা করিয়া দেওয়া তাহার কাজ। জ্ঞান, ইচ্ছা আর কৃতির অহরহ নিশ্চয়াত্মক প্রকাশের সমষ্টিই তো জীবন।

বিচার করিয়া দেখিলে স্বপ্ন, জাগ্রৎ, সুষুপ্তির যে অবস্থাতেই থাকি না কেন, আমাদের সমস্ত জীবনই কর্ম্মময়। শুধু মানুষ বলিয়া নয়—প্রাণি-জগৎ, উদ্ভিদ্-জগৎ জড়-জগৎ কোথাও কর্মের বিরতি নাই—পলে পলে একটা না একটা বিকার সমস্ত আধারেই ঘটিতেছে। সমস্ত বিকারের মাঝেই মানুষের মত একটা সুস্পষ্ট ইচ্ছার শাসন আমরা না দেখিতে পারি। কিন্তু নিয়মের শাসন একটা আছেই—নিয়ম ছাড়া অনিয়মে কিছু হইবার যো নাই। সুতরাং অন্যত্রও একটা অজ্ঞাত ইচ্ছার সত্তা স্বীকার করিতে হয়। ইচ্ছা তো খামখেয়ালী কিছু নয়। যত অদ্ভুত ইচ্ছাই আমাদের মাঝে দেখা দিক না কেন, তাহার উৎপত্তি হয় যেমন আইন মানিয়া, তেমনি তাহার পরিণতিও ঘটে আইন মানিয়া। সকল জায়গাতেই যখন একটা নিয়মের শৃঙ্খলা দেখিতে পাইতেছি, তখন স্থাবর-জঙ্গমময় নিরন্তর কর্মশীল এই জগৎকে এক মহতী ইচ্ছার প্রকাশ ভিন্ন আর কি বলিব?

কর্ম্মের প্রকাশ জ্ঞান, ইচ্ছা আর প্রযত্ন লইয়া—সকল কর্ম্মের মূলেই এই তিনটী রহিয়াছে। তার মাঝে প্রযত্নের রূপটী আমরা স্পষ্ট দেখিতে পাই। কি চেতন, কি অচেতন আধারে, সর্ব্বত্রই প্রযত্নের অধিষ্ঠাতার দর্শন না মিলিলেও তাহার ব্যাপার আমাদের প্রত্যক্ষের বিষয়। সর্ব্বত্র বিকার দেখি বলিয়া প্রযত্নও দেখি—এমন কথা আমরা বলিতে পারি। সুতরাং জগৎজোড়া কর্ম্মের একাংশের জ্ঞান আমাদের হওয়া সম্ভব। আবার যখন সর্ব্বত্রই নিয়মের শৃঙ্খলা বা কার্য্যকারণের শাসন দেখিতে পাই, তখন চেতন অচেতন সমস্ত আধারের কর্ম্মেই সমষ্টিরূপে এক ইচ্ছার সত্তাও স্বীকার করিতে পারি। সুতরাং এইরূপে কর্ম্মের আর এক অংশের জ্ঞানও আমাদের হয়। এক্ষণে প্রশ্ন এই, সমস্ত কর্মের মূলেই আমরা জ্ঞানকে দর্শন করিব কি করিয়া?

যখন বলি, কর্ম্মের মূলে জ্ঞান, তখন জ্ঞানকে কর্মের প্রেরক ও ধারক বলিয়াই গ্রহণ করি। কর্ম হইতেছে আর আমি উদাসীনভাবে তাহা দেখিতেছি, কর্মের সঙ্গে জ্ঞানের শুধু এইটুকু সম্বন্ধই নয়। শুধু দেখা নয়, হইয়া দেখিতে হইবে। দেখা আর হওয়া—এই দুইটীতে সামঞ্জস্য হইলে তবে কর্মমূল জ্ঞানের স্বরূপ মিলে। আমি যে কর্ম করি, তাহা শুধু আমি জানিই না—কর্মের পরিণামের সঙ্গে সঙ্গে আমি কিছু হই-ও। তবে আমার হওয়াটা শুধু আমারই অনুভূতির সামিল, অপরে তাহা প্রত্যক্ষ করিতে পারে না, নিজের সঙ্গে তুলনা করিয়া অনুমান করিতে পারে মাত্র। ছোট ছিলাম—বড় হইলাম, এ শুধু অপরে দেখিয়া বলিতে পারে; কিন্তু এই হওয়ার মাঝে আমার যে স্বারসিকী অনুভূতি রহিয়াছে, তাহার অনুমান মাত্র করা চলে। অথচ ছোট হইতে বড় হওয়া—এই যে কর্মের প্রবাহ, ইহার মাঝে শুধু দেখা তো নয়, হওয়ার অনুভূতিও যে আছে। কর্মের তত্ত্ব নিঃশেষ জানিতে হইলে তদাশ্রয়ী জ্ঞানের এই দুইটী কোটীই জানিতে হইবে।

অপরের সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা, তাহা আমি জানি না। কিন্তু আমার সম্বন্ধে একটু সমাহিত ভাবে চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারি—এই যে অবিরাম কর্ম্মদ্বারা আমার জীবন গড়িয়া উঠিতেছে, তাহাকে জ্ঞানের দুইটী ধারা ধরিয়া আছে। কর্মের পরিণতির সঙ্গে সঙ্গে আত্মসংমিশ্রণ করিয়া আমিও যেন পরিণত হইতেছি—এই এক প্রকার জ্ঞান; আবার নির্ব্বিকার থাকিয়া এই পরিণামকেও দর্শন করিতেছি, এই এক প্রকার জ্ঞান। কর্ম্মপরিণামের সঙ্গে যে আত্মসংমিশ্রণ, তাহাকে বলি ভোগ—আমি সেখানে ভোক্তা। আর নিরপেক্ষ থাকিয়া ভোগকে দেখা—এই হইল আমার সাক্ষীভাব। অপরের ভোগ সম্বন্ধে আমার জ্ঞান প্রত্যক্ষলব্ধ নয়, সুতরাং যে আমিকে ভোক্তা বলিতেছি, তাহার অধিকার সঙ্কীর্ণ—উপনিষদের ভাষায় আত্মা এখানে সংসারী। অথচ ভোগের মাঝেও যে নিরপেক্ষ দ্রষ্টার ভাব অনুস্যূত রহিয়াছে, কোনও কিছুদ্বারা সংস্পৃষ্ট নহে বলিয়াই তাহা অপরিচ্ছিন্ন, বিভু, শাশ্বত ও অব্যয়। ইহাকেই বলি পরমাত্মা। বেদে এই দুটিকে বর্ণনা করিয়া বলা হইতেছে—"দুইটী পাখী;—তাহারা এক সঙ্গে থাকে, পরস্পরের সখা, একই বৃক্ষে তাহারা উপবিষ্ট। তাহাদের মধ্যে একজন সেই বৃক্ষের স্বাদু পিপ্পল ফল ভক্ষণ করে, অপরে খায় না, চাহিয়া দেখে মাত্র।"

আমার মাঝে সামান্যতঃ যে এই দুটী ভাব দেখিতে পাইতেছি—ইহাদিগকে বিশ্বময় ব্যাপ্ত করিতে পারিলেই—আমার মুক্তি, জ্ঞান, আনন্দ। কর্মের রহস্য, শক্তির তত্ত্ব তখন আমার আয়ত্ত। এই ব্যাপ্তির পক্ষে আমার বাধাই বা কি, কি করিয়াই বা সে বাধা অতিক্রম করা যায়, এখন তাহাই বিবেচ্য।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমি প্রত্যক্ষভাবে যাহা কিছু জানি, তাহা আমার সম্বন্ধেই—অপরের সম্বন্ধে আমার জ্ঞান অনুমানলব্ধ। অবশ্য চেতন কর্ত্তা সম্বন্ধেই একথা বলা হইতেছে। কর্ত্তার কর্ম্ম আমার জ্ঞানগম্য হয় বটে, কিন্তু কর্ম্মের মূলে যে চেতয়িতা রহিয়াছে, তাহার বৃত্তি সম্বন্ধে আমার অপরোক্ষ জ্ঞান হওয়ার কোনও সম্ভব নাই। ইহা হইতে এই বুঝি, আমার ভাব, আমার বৃত্তি লইয়াই আমার একটা জগৎ গড়িয়া উঠিয়াছে। তাহার এক প্রান্তে আমি, অপর প্রান্তে আমি ছাড়া আর যত কিছু সব। এইটুকু হইল সহজ বুদ্ধি—এই বুদ্ধি লইয়াই আমাদের সংসার চলিতেছে। আমি যখন সংসারী, তখন আমার মাঝে যে পরিণতি, তাহাই আমি অনুভব করিতেছি; কিন্তু আমার যাহা বিষয়, তাহার ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বাহ্য পরিণাম ভিন্ন আন্তর অনুভূতির সহিত আমার যোগ থাকিতেছে না। এই রূপেই বিশ্বজগৎ হইতে আমি বিচ্ছিন্ন। বিচ্ছিন্ন বলিয়াই এখানে আমাকে কেন্দ্র করিয়া বিষয়-বিষয়ী, কর্ম্মকর্ত্তা প্রভৃতি অগণিত ভেদের উৎপত্তি হইয়াছে; দেশ-কাল অবচ্ছেদে আমার ব্যাপ্তির ন্যূনতা ঘটিয়াছে বলিয়া আমার সংসারগতিও সম্ভব হইয়াছে। সংসারীরূপে যে আমার খণ্ডিত অনুভূতি, তাহাকে পূর্ণ জ্ঞান বলে না। অহংরূপ যে চেতয়িতা আর ইদংরূপ যে বিষয়, ইহাদের মাঝে কোনও পার্থক্য না থাকিয়া উভয়েই একই অখণ্ড সত্তাতে পর্য্যবসিত জ্ঞান হওয়ার নাম তত্ত্বজ্ঞান। আমার ব্যবহারিক জ্ঞান,

তত্ত্বজ্ঞান নয়—উহা বিকারের জ্ঞান। এই জ্ঞান দ্বৈত সত্তাকে মানিয়া চলে, সুতরাং উহা হইতে আমার সত্তার পূর্ণ ব্যাপ্তি উপলব্ধ হইতে পারে না।

বিষয় ও বিষয়ীর ভেদ ঘুচাইয়া যদি এক তত্ত্বে উভয়কে পর্য্যবসিত করা যায় তবেই অহং-এর ব্যাপ্তি জ্ঞান ঘটে বটে, কিন্তু এই ব্যাপ্তি ঘটাইতে হইবে কোন প্রান্তকে আশ্রয় করিয়া? বিষয়মাত্রেই পরিচ্ছিন্ন, যতক্ষণ দেশ ও কালের জ্ঞান অব্যাহত থাকিবে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত তাহাদের পরিচ্ছেদ দূর করিবার উপায় নাই। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য স্থূল বিষয়সমূহ দেশরূপ সংস্কার দ্বারা পরিচ্ছিন্ন—তাহাদের পরিণাম কালিক সংস্কার দ্বারা পরিচ্ছিন্ন। আর ইন্দ্রিয়, অন্তঃকরণ প্রভৃতি সূক্ষ্ম বিষয়-সমূহ কালিক সংস্কারের আশ্রিত। সুতরাং ইহাদের ব্যাপ্তি ঘটাইতে হইলে দেশে এবং কালেই ব্যাপ্তি ঘটিবে। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত দেশ-কালের সংস্কার অটুট থাকাতে পরিচ্ছেদ-বুদ্ধি দূর হইবে না। সুতরাং বিষয়ের ব্যাপ্তি ঘটাইয়া তাহাকে বিষয়ীর সমযোগ্য করিয়া তোলা সম্ভবপর হইবে না।

এই জন্য ব্যাপ্তি বোধ পাইতে হইলে বিষয় ছাড়িয়া আমাদিগকে বিষয়ীর আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। বিষয়ীর ধর্ম্ম জ্ঞান—জ্ঞানের ব্যাপ্তি স্বাভাবিক। জ্ঞানদ্বারা বিষয়কে ব্যাপ্ত করিতে হইবে—ইহাই আমাদের সাধনা। জ্ঞানের দুইটী প্রকার দেখিয়াছি—একটি হওয়া, আর একটি দেখা (জ্ঞানসামান্য)। দেখিয়াছি হওয়ার জ্ঞান আমার নিতান্তই সামান্য—এই গণ্ডীটী আমাকে এখন ভাঙ্গিতে হইবে। দেখার জ্ঞানও আমার সঙ্কীর্ণ—কেননা আমি ইন্দ্রিয়সহায়ে দেখি, এবং ইন্দ্রিয় সমূহও অসম্পূর্ণ, অশক্ত ও চঞ্চল। তথাপি দেখার-জ্ঞানের অধিকার হওয়ার-জ্ঞানের অধিকারের চেয়ে বিস্তৃত। কিন্তু ইন্দ্রিয়রূপী মাধ্যমিক সহায়ে জ্ঞান হয় বলিয়া দেখার জ্ঞান কখনও বিশুদ্ধ হইতে পারে না—উহাতে ইন্দ্রিয়ের দোষসমূহ সংক্রামিত হইয়া থাকে। আবার ইন্দ্রিয় জ্ঞানের আবরকও বটে; ইন্দ্রিয় দ্বারা দর্শন বিশিষ্ট দর্শন—বিশিষ্ট দর্শনকে তত্ত্বজ্ঞান বলা চলে না।

এই অবস্থায় আমার মুক্তি কোন পথে? দেখিলাম, জ্ঞানের দুইটী প্রকারেই দোষ রহিয়াছে। হওয়ার জ্ঞান আন্তরিক হইলেও তাহার অধিকার সঙ্কীর্ণ—আত্মা সেখানে ভোক্তা সংসারী। আবার দেখার জ্ঞান ব্যাপ্তিধর্ম্মী হইলেও তাহা ইন্দ্রিয়দোষ দ্বারা দুষ্ট এবং মাধ্যমিক সহায়ে তাহার প্রকাশ বলিয়া তাহার নিরুপাধিক স্বরূপও আমরা জানিতে পারিতেছি না। সুতরাং সাক্ষী, চেতা, কেবল যে আত্মস্বরূপ, তাঁহাকেও আমরা জানিতে পারিতেছি না। এই দুইটী সমস্যার যদি আমরা মীমাংসা করিতে পারি, ভোক্তা আত্মার সঙ্কীর্ণ ভোগরূপ উপাধি দূর করিয়া এবং দর্শক আত্মার দৃষ্টি ব্যবধানকারী উপাধি-সমূহের বিনাশ করিয়া উভয়কে যদি একই তত্ত্বরূপে উপলব্ধি করিতে পারি, তবেই আমার তত্ত্বজ্ঞান জন্মিবে, বন্ধন ঘুচিয়া যাইবে।

তত্ত্বে এই কথা বুঝিলেও বাস্তবে বুঝিব কি করিয়া, কি ধরিয়া সাধন আরম্ভ করিব, তাহাই জিজ্ঞাস্য। ভোক্তার মাঝেও দ্রষ্টা প্রচ্ছন্ন রহিয়াছেন, ইহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এক্ষণে এই দ্রষ্টার স্বরূপই মেঘমুক্ত সূর্য্যের মত নির্ম্মল করিয়া তুলিতে হইবে। সে পথে প্রথম কাঁটা আমাদের বিষয়বুদ্ধি। আমরা স্বভাবতঃই বহির্ম্মুখী। তাই অন্তরের প্রেরণায় ব্যাপ্তি ঘটাইতে গেলেও বিষয়ীর দিকে না চাহিয়া বিষয়েরই ব্যাপ্তি ঘটাইতে

যাই। এমনি করিয়া বিষয় বাড়ে, ভোগ বাড়ে—সঙ্গে সঙ্গে জ্বালাও বাড়ে। অতএব সর্ব্বাগ্রে বিষয়াকাঙ্ক্ষা বর্জ্জন করিতে হইবে। দেহ সর্ব্বাপেক্ষা সন্নিকৃষ্ট বিষয়; সুতরাং দেহের আকাঙ্ক্ষাকে সর্ব্বাগ্রে সংযত করিতে হইবে। ইহার জন্যই সদাচার ও তপস্যা।

তারপর বাধা ইন্দ্রিয়। ইন্দ্রিয় বিশিষ্ট, অশক্ত ও চঞ্চল বলিয়া জ্ঞানের অব্যাহত প্রকাশের পরিপন্থী হইয়াছে—সুতরাং ইন্দ্রিয়কে বর্জ্জন করিতে হইবে। একেবারেই বর্জ্জন করা সম্ভব নহে—তাই সংযমবশে আগে তাহাদের চাঞ্চল্য দূর করিতে হইবে। ইন্দ্রিয় অচঞ্চল হইলে সত্ত্বস্ফুরণ হইবে, চিত্ত শুদ্ধ হইবে।

চিত্তশুদ্ধি অধ্যাত্মসাধনার প্রথম সোপান। ইহার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সাধনা বাহিরকে লইয়া, কিন্তু চিত্তশুদ্ধি হইলে অন্তঃসাধনার আরম্ভ হইল। তখন হইতে সাধনার মাঝে আর কৃচ্ছ্রতা থাকিবে না; অন্তর্নিহিত গতিবেগেই উহা অগ্রসর হইবে। বৌদ্ধশাস্ত্র এই স্তবকে স্রোতাপত্তি নাম দিয়াছেন—এই সংজ্ঞা সার্থক নাম বটে।

• •

যেমন সংসারের প্রবাহে পড়িলে, পরবশ হইয়া জন্ম হইতে জন্মান্তরে আবর্ত্তন করিতে হয়, তেমনি একবার অধ্যাত্মস্রোতে পতিত হইলেও কোন্ অজানা শক্তির আকর্ষণে মানুষ প্রকৃতির এক একটী অধিকার অতিক্রম করিয়া চরমে সাধ্যবস্তুকে লাভ করে। দেহ, ইন্দ্রিয়, মন—বুদ্ধি, অহং, মহৎ, অব্যক্ত—এই হইল প্রকৃতির স্তর-বিভাগ। ইহাদিগকে অতিক্রম করিলেই পুরুষকে পাওয়া যায়। "পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ—সা কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ।"

জ্ঞানেশ্বর

মহারাষ্ট্র দেশ বহু মহাপুরুষের জন্মভূমি। আজ তাঁহাদেরই একজনের জীবনকাহিনী বলিব। ইঁহার নাম জ্ঞানেশ্বর। ১২৭৫ খৃষ্টাব্দে ব্রাহ্মণবংশে ইঁহার জন্ম হয়। ইঁহার পিতার নাম বিট্‌ঠলপন্থ, মাতার নাম রুক্মিণী। ইঁহাদের জীবনকথাও আশ্চর্য্য—আমরা পূর্ব্বে সেই কথাই বলিব।

শিশুকাল হইতেই বিট্‌ঠলপন্থ পন্ধরপুরের বিট্‌ঠলদেবের একজন অনুরাগী ভক্ত ছিলেন। গৃহস্থ হইয়া সংসারধর্ম্ম করা তাঁহার অভিপ্রায় ছিল না। যৌবনে উদাসীন হইয়া তিনি মহারাষ্ট্র ও গুর্জ্জরের তীর্থে তীর্থে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেন। পুত্রের সংসারের প্রতি এই বীতস্পৃহা পিতামাতার সহ্য হইত না—তাঁহারা পুত্রকে সংসারী করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেন।

সংসারের প্রতি অনুরাগ না থাকিলেও বিট্‌ঠলপন্থ অবশেষে পিতামাতার নির্ব্বন্ধাতিশয়ে বিবাহ করিলেন বটে, কিন্তু বিবাহের অনতিকাল পরেই পিতামাতার মৃত্যু হওয়াতে আর তাঁহার সংসারী করিবার সুযোগ হইল না, অথচ বিবাহ করিয়াও এখন দায়ে ঠেকিলেন। পত্নীকে পিতৃগৃহে পাঠাইয়া দিয়া সংসারের দায়িত্ব একরকম এড়াইলেন বটে, কিন্তু তাঁহার জীবনে সন্ন্যাসী হওয়ার যে সাধ ছিল, সে সাধ পূর্ণ হইবার পক্ষে তাঁহার স্ত্রীই অন্তরায় হইলেন। বিবাহের পর পুত্রোৎপাদন না করিয়া সন্ন্যাসী হইতে নাই, ইহা স্মৃতির বিধান। তার পর বিবাহিত ব্যক্তির পক্ষে স্ত্রীর অনুমোদন ব্যতীত সন্ন্যাস গ্রহণ করিবার উপায় নাই—এই ছিল তখনকার লোকাচার। যদিও একান্ত বিরক্তের পক্ষে শ্রুতি বলিয়াছেন, "যদহরেব বিরজেৎ, তদহরের প্রব্রজেৎ—যেদিনই বৈরাগ্য উপস্থিত হইবে, সেই দিনই প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিবে", তথাপি শাস্ত্রশাসিত সমাজের সহিত বিরোধাচরণ করিয়া স্মৃতি ও লোকাচার লঙ্ঘনপূর্ব্বক সন্ন্যাসগ্রহণ করিতে বিট্‌ঠলপন্থ ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। বলা বাহুল্য বিট্‌ঠলপন্থের নিজের ঘর-বাড়ী বলিতে কিছুই ছিল না—তিনি উদাসীনের মত ঘুরিয়া বেড়াইতেন, এবং প্রয়োজন হইলে পুনার নিকটবর্ত্তী আলন্দীগ্রামে তাঁহার শ্বশুরালয়ে আসিয়া বাস করিতেন।

কিন্তু ঘরছাড়ার মন্ত্র একবার যাহার কানে ঢুকিয়াছে, তাহাকে ঠেকাইয়া রাখা বড় শক্ত। বিট্‌ঠলপন্থকেও ঠেকাইয়া রাখা গেল না। একদিন তিনি কাহাকেও কিছু না বলিয়া একবারে কাশীতে রামানন্দ স্বামীর কাছে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রামানন্দ তাঁহার অভিপ্রায় জানিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি যে সন্ন্যাস গ্রহণ করিবে, তোমার স্ত্রীর তাহাতে সম্মতি আছে কি?" বিট্‌ঠলপন্থ অবলীলাক্রমে উত্তর করিলেন, সংসারে আমার স্ত্রী পুত্র কেহই নাই। রামানন্দ স্বামী আর দ্বিরুক্তি না করিয়া তাঁহাকে সন্ন্যাসধর্ম্মে দীক্ষিত করিলেন। কিন্তু এই মিথ্যাভাষণের পরিণাম ফল বড় শোচনীয় হইল।

বিট্‌ঠলপন্থ রামানন্দ স্বামীর তত্ত্বাবধানে শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। বিনয়ের গুণে ক্রমে তিনি গুরুর এমনি প্রিয়পাত্র হইলেন যে, রামানন্দ তাঁহার আশ্রমের সমস্ত ভারই শিষ্যের উপর দিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতেন।

বহুদিন পরে একবার রামানন্দ স্বামী দাক্ষিণাত্যের তীর্থসমূহ পরিভ্রমণ করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। শিষ্যেরা সকলেই সঙ্গে যাইতে চাহিল, কিন্তু কি ভাবিয়া বিট্‌ঠলপন্থ যাওয়ার জন্য কোনও রকম আগ্রহ প্রকাশ করিলেন না। রামানন্দ স্বামী তাঁহার উপরেই আশ্রমের ভার সমর্পণ করিয়া সশিষ্য তীর্থযাত্রায় বাহির হইলেন।

বিট্‌ঠলপন্থের শ্বশুরালয় আলন্দী তখন শাস্ত্রচর্চ্চার জন্য বিখ্যাত ছিল। দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ করিতে আসিয়া কেহ যে আলন্দীগ্রামে দুই একদিনের জন্যও আতিথ্য হইবে না, এমন কথা হইতেই পারে না। রামানন্দ স্বামীও আলন্দীতে আসিয়া স্থানীয় দেবালয়ে আসন স্থাপনা করিলেন। সাধু দর্শন করিবার জন্য গ্রামবাসীরা দলে দলে আসিতে লাগিল—ইহাদের মধ্যে বিট্‌ঠলপন্থের পত্নী রুক্মিণী দেবীও একদিন আসিলেন। দৈবাৎ

রুক্মিণী দেবীর উপর রামানন্দ স্বামীর দৃষ্টি পড়িল—তাঁহার চিন্তাক্লিষ্ট শীর্ণ মুখখানিতে তাঁহাকে যেন বয়সের চেয়ে বড় বলিয়া মনে হইত। রুক্মিণী দেবী রামানন্দ স্বামীকে প্রণাম করিলে, তিনি আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন, "সুপুত্রের জননী হও।" স্বামী তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন, আর সন্ন্যাসী তাঁহাকে এই আশীর্ব্বাদ করিলেন! মুহূর্ত্তের জন্য রুক্মিণীর মুখের উপর দিয়া একটা চাপা বিদ্রূপের হাস খেলিয়া গেল। রামানন্দ স্বামী তাহা লক্ষ্য করিলেন, এবং এই অত্যাশ্চর্য্য রমণীটীকে তাঁহার বিসদৃশ ব্যবহারের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন।

রুক্মিণী দেবীর নিকট তাঁহার দুঃখের কাহিনী আদ্যোপান্ত শুনিয়া রামানন্দ বুঝিতে পারিলেন, এই রমণীর গৃহত্যাগী স্বামী তাঁহার প্রিয় শিষ্য বিট্‌ঠলপন্থ ছাড়া আর কেহই নহে। পুত্রোৎপাদন না করিয়া এবং পত্নীর সম্মতি না লইয়া শিষ্য সন্ন্যাসগ্রহণ করিয়াছে, এবং সেজন্য মিথ্যা কথা বলিয়া গুরুকে প্রতারণা করিতেও সঙ্কুচিত হয় নাই, ইহা ভাবিয়া রামানন্দের হৃদয় ক্ষুব্ধ হইল। সত্যের উপরই ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা, সত্যকে লঙ্ঘন করিয়া শিষ্য কোন্ কল্যাণের অধিকারী হইবে—ভাবিতে ভাবিতে তাঁহার আর তীর্থভ্রমণ করা হইল না। রুক্মিণী দেবীকে লইয়া তিনি আবার কাশীতে ফিরিয়া আসিলেন।

গুরুকে অকস্মাৎ এত শীঘ্র ফিরিয়া আসিতে দেখিয়া বিট্‌ঠলপন্থ প্রথমে বিস্মিত হইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার সঙ্গে রুক্মিণী দেবীকেও আসিতে দেখিয়া তিনি মনে মনে প্রমাদ গণিলেন। রামানন্দ স্বামী ক্রুদ্ধস্বরে শিষ্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বুঝিতেই পারিতেছ, আমি আলন্দী গিয়াছিলাম। তোমার সকল কথাই জানিতে পারিয়াছি—তোমার কিছু বলিবার আছে কি?" বিট্‌ঠলপন্থ আর কি বলিবেন? সন্ন্যাসগ্রহণ মহৎ কর্ম্ম হইলেও তিনি অসত্যের দ্বারা সে অধিকার লাভ করিয়াছেন, সাময়িক উত্তেজনা ও অবিবেকের ফলে ধর্ম্মজীবনের প্রারম্ভেই অসত্যের বীজ বপন করিয়াছেন। এতদিন নীরবে ইহার অনুশোচনায় দগ্ধ হইয়াছেন, কিন্তু আজ তাঁহার কৃতকর্ম্মের ফল ভোগ করিবার দিন আসিয়াছে। বিট্‌ঠলপন্থ সাশ্রুনয়নে গুরুদেবের চরণ ধরিয়া বলিলেন, "আমি আর কি বলিব? আপনি তো সমস্তই জানেন—আমি অপরাধ করিয়াছি, দণ্ড দিন, কিন্তু চরণছাড়া করিবেন না।"

রামানন্দ গম্ভীর কণ্ঠে বলিলেন, "তুমি স্মৃতি ও লোকাচারের শাসন লঙ্ঘন করিয়াছ, তাহার জন্য মার্জ্জনা আছে, কেননা তীব্র বৈরাগ্যযুক্তের প্রব্রজ্যার অধিকার আছে, ইহা বেদেরই শাসন। কিন্তু তুমি যে সত্য লাভ করিতে আসিয়া অসত্যের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছ, ইহা কিছুতেই ক্ষমা করা যাইতে পারে না। তুমি সরল ভাবে তোমার অবস্থা জানাইলে তোমার বৈরাগ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া আমি উচিতমত ব্যবস্থা করিতে পারিতাম। কিন্তু তুমি মিথ্যাচার দ্বারা সন্ন্যাস আশ্রমকে কলুষিত করিয়াছ। গৃহস্থকে সংসারধর্ম্ম পালন করিতে হইলেও সত্য আশ্রয় করিয়াই চলিতে হয়। কিন্তু তোমাতে তো গৃহস্থেরও যোগ্যতা নাই, অথচ তুমি সন্ন্যাসী হইতে আসিয়াছ! তাই আমার আদেশ, তুমি আবার গৃহাশ্রমে ফিরিয়া যাও—সন্ন্যাসাশ্রম তোমার মত অসত্যাচারীর জন্য নহে।"

বিট্‌ঠলপন্থের মাথায় যেন আকাশ

ভাঙ্গিয়া পড়িল। অবশ্য তাঁহার অপরাধ গুরুতর, কিন্তু এই দ্বাদশবর্ষব্যাপী তপশ্চর্য্যাতেও কি তাহার প্রায়শ্চিত্ত হইল না? কিন্তু মঙ্গলময় গুরুদেব যাহা আদেশ করিয়াছেন, তাহার অন্যথাচরণ করা কখনই সম্ভবপর নহে। একটী মাত্র মিথ্যা কথা—তুমি বলিবে, এ তো সামান্য অপরাধ। কিন্তু পাপপুণ্যের গুরুত্ব তো উহার আকার দ্বারা বিচারিত হয় না। হলাহল কণিকামাত্র হইলেও প্রাণ নাশ করিতে সমর্থ।

গুরুর আদেশ মাথা পাতিয়া লইয়া শুধু কঠোর কর্ত্তব্যকে সম্মুখে রাখিয়া এই দুঃস্থ দম্পতী আবার আলন্দী গ্রামে ফিরিয়া আসিলেন। সেখানে আবার এক অভিনব বিপদ্ তাঁহাদের প্রতীক্ষায় ছিল। রামানন্দ স্বামী বিট্‌ঠলপন্থকে গৃহস্থাশ্রমে ফিরিয়া যাইতে আদেশ করিলেন বটে, কিন্তু গৃহস্থাশ্রম ছাড়িয়া যাওয়া যত সহজ ছিল, আবার তাহাতে প্রবেশ করা তত সহজ হইল না। তখনকার হিন্দুসমাজ সজীব ছিল। সমাজে যাহা খুসি তাহাই করিয়া কেহ নিষ্কৃতি পাইত না। সন্ন্যাসীও তো সমাজের অঙ্গ—সামাজিক কর্ত্তব্য হইতে নিষ্কৃতি পাইলেও সমাজের সহিত তাঁহার যোগ তো বিচ্ছিন্ন হইবার নয়। প্রকৃত সন্ন্যাসীর যেমন সমাজকে শাসিত ও পরিচালিত করিবার অধিকার ছিল, তেমনি সন্ন্যাসী পথভ্রষ্ট হইলে সমাজও তাহাকে শাসন করিতে কুণ্ঠিত হইত না। সন্ন্যাসগ্রহণের অধিকার সমাজ সহজে দিতে চাহিত না, কিন্তু একবার সে চরম অধিকার লাভ করিয়া যে তাহার অমর্য্যাদা করিয়া আবার সমাজে ফিরিয়া আসিতে চাহিত সমাজও তাহাকে ক্ষমা করিত না। হিন্দুর সমাজ ধর্ম্মের উপর প্রতিষ্ঠিত। ধর্ম্মভ্রষ্টকে সমাজে স্থান দিলে ধর্ম্মের সমাজ দু'দিনেই ধ্বংস হইয়া যাইবে যে!

রুক্মিণী দেবীও প্রাণের আকুলতায় স্বামীকে দেখিতে ছুটিয়া আসিয়াছিলেন। স্বামীর প্রাণ যে কোন বস্তু পাইবার জন্য ব্যাকুল, তাহা তিনি জানিতেন। সহধর্ম্মিণী হইয়া যে স্বামীর ধর্ম্মের প্রতিকূলতাচরণ, ইহা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব। স্বামীর জন্য প্রাণ আকুল হইলেও, তিনি গৃহে ফিরিয়া আসুন, এমন আকাঙ্ক্ষা তিনি কোনও দিনও পোষণ করেন নাই। সমস্ত দুঃখই কৃতকর্ম্মের ফল মনে করিয়া নীরবে তিনি সহিয়া যাইতেছিলেন। কিন্তু যখন তাঁহার স্বামীরই ইষ্টদেব স্বামী সন্দর্শনের জন্য তাহাকে আহ্বান করিলেন, তখন শ্রীগুরুর আদেশ মনে করিয়া তাঁহার চিত্ত বিন্দুমাত্রও দ্বিধাগ্রস্ত হয় নাই। তা ছাড়া, তিনি আসিয়াছিলেন স্বামীকে শুধু দেখিতে—ফিরাইয়া লইতে তো আসেন নাই। স্বামীকে ফিরিয়া পাওয়া নারীর পরম সৌভাগ্য—কিন্তু সে কি এমন ভাবেই ফিরিয়া পাওয়া? স্বামীর ভাগ্যবিপর্য্যয়ের কথা ভাবিয়া রুক্মিণী দেবীর হৃদয় অবশ হইয়া পড়িল।

বিট্‌ঠলপন্থের মনে যাহাই থাকুক, কিম্বা তাঁহার গুরুদেব সত্যাসত্যের সূক্ষ্ম বিচার করিয়া যাহাই নির্দ্দেশ করিয়া থাকুন, সমাজ কিন্তু তাহা দেখিল না। সমাজের চক্ষে, বিট্‌ঠলপন্থ সন্ন্যাসাশ্রম ত্যাগ করিয়া আবার গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করিতে চলিয়াছেন, সুতরাং তিনি সন্ন্যাসধর্ম্মে পতিত। অতএব সমাজে তিনি স্থান পাইতে পারেন না। ব্যক্তিগতভাবে বিট্‌ঠলপন্থের অবস্থা বিচার করিলে তাঁহার স্বপক্ষেও দুইটা কথা বলা চলিত বটে, কিন্তু সমাজ একটা সমষ্টিগত বৃহৎ প্রতিষ্ঠান—

অত করিয়া ব্যক্তির হিসাব নিলে তাহার চলে না। একটা আদর্শের দিকে চাহিয়া তাহাকে শাসনদণ্ড পরিচালনা করিতে হয়। সুতরাং প্রত্যেকের ব্যক্তিগত ভাবে খুঁটী-নাটী বিচার করিতে গেলে তাহার পরিচালনায় কোনও শৃঙ্খলা থাকে না। ব্যক্তিকেও এইজন্য সমষ্টি সমাজের দিকে চাহিয়া নিজ নিজ ব্যক্তিত্বের অধিকার খর্ব্ব করিতে হয়—অধিকারের দাবী না করিয়া কর্ত্তব্যের দায়িত্ব মাথায় তুলিয়া লইতে হয়।

বিট্‌ঠলপন্থ ও রুক্মিণী দেবী সমাজ হইতে বিতাড়িত হইলেন। বন্ধুবান্ধবেরা তাঁহাদের দিকে ফিরিয়াও চাহিল না—দুষ্ট লোকেও নির্য্যাতন করিতে ছাড়িল না। সুখের আশায় এই দম্পতী ঘর বাঁধিতে আসেন নাই, কাজেই সমাজের এই উপেক্ষা ও উৎপীড়নে তাঁহারা বিচলিত হইলেন না। বিট্‌ঠলপন্থ তো এক রকম বাল্যকাল হইতেই সন্ন্যাসী—এতদিনের অর্জ্জিত সংস্কার তো সহজে যাইবার নয়, কাজেই সুখ-দুঃখে মান অপমানে তাঁহার সমান ভাব। রুক্মিণীদেবীও তো তাঁহারই সহ-ধর্ম্মিণী। স্বামীকে হারাইয়া এতদিন যে জ্বালা তিনি সহ্য করিয়াছেন, আজ স্বামীকে পাইয়া লোকের দুটা গাল মন্দ বা অন্নবস্ত্রের কষ্ট কি তিনি সহিতে পারিবেন না? বিশেষতঃ এ ত তাঁহাদের সুখের সংসার নয়—অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ গুরুদেব যে ভার বহন করিতে দিয়াছেন, অম্লানচিত্তে তাঁহারা তাহা বহন করিয়া চলিবেন।

বিট্‌ঠলপন্থের এই নিঃস্পৃহ ও নিরুদ্বিগ্ন ভাব পুত্র জ্ঞানেশ্বরের অঙ্কিত একটী চিত্রে বড় সুন্দর ফুটিয়াছে। জ্ঞানেশ্বর বলিতেছেন—

"তিনি অতি সন্তর্পণে মাটীতে পা ফেলেন, কি জানি একটী পিপীলিকাও যদি তাঁহার পদদলনে প্রাণত্যাগ করে। বক এত সন্তর্পণে মাছ ধরে যে তাহার ঠোঁটের ঘায় জল একটুও নড়ে না; তেমনি তিনিও এত সাবধানে চলেন, যেন তাঁহার ব্যবহারে কাহারও শান্তি-সুখ বিন্দুমাত্রও ক্ষুণ্ণ না হয়। বিড়াল তার ছানাগুলিকে মুখে করিয়া এখান হইতে সেখানে লইয়া যায়, কিন্তু ছানাগুলি একটুও দুঃখ পায় না। তাঁর ব্যবহারেও কেহ কোন দিন তত্টুকু আঘাতও পায় না। প্রেমে ঢল ঢল তাঁহার মুখখানি—কাহাকেও কিছু বলিবার পূর্ব্বেই চোখের ভাষায় তাঁহার মনের ভাব ধরা পড়িয়া যায়। তাঁর তপঃশীর্ণ তনু, আকৃতি দেখিয়া বিশেষ কিছু মনে হয় না। কিন্তু গাছের বল্কল দেখিয়া কি তাহার ফলের মধুরতার অনুমান করা চলে? সর্ব্বদাই তিনি ভাবে বিভোর, তাই তাঁহার মুখে একটীও কথা নাই। কোনও প্রাণীর উপরে তিনি কখনও হাত তোলেন না—কিন্তু আর্ত্তকে রক্ষা করা তাঁহার ব্রত। এমন লোক যে কখনও কাহাকেও উৎপীড়ন করিবে এ কি কাহারও বিশ্বাস হয়?"

আরণ্যক

—*—

"যজ্ঞেন বাচঃ পদবীয়মায়ন্ তামন্ববিন্দন্ ঋষিষু প্রবিষ্টাম্॥"

—ঋগ্বেদ সংহিতা ১০।৭১।৩

আমরা আমাদের এই ক্ষুদ্র দেহমনের অভিমানে স্ফীত হয়ে অপরের কাছে মাথা নোয়াতে অপমান বোধ করি, কিন্তু তাতে আমাদের আত্মার মহিমা খর্ব্বই হয়ে থাকে। অনন্তপ্রসার আত্মার মহিমা যিনি জেনেছেন, এ জগতের তুচ্ছ মান অভিমান তাঁকে স্পর্শই করতে পারে না—দেহমনের নিন্দা-গ্লানি তাঁর কাছে অতি তুচ্ছ। জগতের সবার কাছে মান-যশ বিসর্জ্জন দিয়ে লুটিয়ে পড়তে তিনি কাতর হন না, আবার সমস্ত যশ ও শ্রী লাভ করলেও তিনি তাতে চঞ্চল হন না। নদীর স্রোত চঞ্চলধারায় বইতে থাকে, কিন্তু মহাসাগরে পড়লে তা প্রশান্ত গম্ভীর ভাব ধারণ করে—এ-ও তেমনি।

*

আত্মবিচারের অভাবেই আমরা নিজকে পাপী তাপী দুঃখী ও অভাবগ্রস্ত মনে করি। কিন্তু সর্ব্বদা আত্মানাত্মবিচার করিলে দেখিতে পাই, আমরা প্রত্যেকেই নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত ও অপাপবিদ্ধ। পাপ-তাপ দুঃখ-জ্বালা আমাদিগকে স্পর্শই করিতে পারে না; আত্মজ্ঞানের অভাবই যত দুঃখ, যত জ্বালা, যত পাপের কারণ। তাই গীতায় শ্রীভগবান বলিয়াছেন—জ্ঞানী ব্যক্তি অপরকে হত্যা করিয়াও পাপ ভাগী হন না এবং নিজে আহত হইলেও দুঃখ করেন না।

*

এ জগতে যে আমাদের এত দুঃখকষ্ট, শোকতাপ আছে, তাতে মানুষের ভালই হইতেছে—এ সকলকে ভগবানের দান বলিতে হইবে। কারণ এ জগতের সুখে আবদ্ধ হইয়া গেলে অনন্ত সুখ হইতে আমরা চিরবঞ্চিত থাকিয়া যাইতাম। দুঃখ-জ্বালা, বিপদ-আপদই পরম লোক ও অনন্ত আনন্দ লাভের জন্য আমাদিগকে প্রবুদ্ধ করে। এই জন্য বৈরাগী বা সন্ন্যাসী দীনহীন ভাবে সর্ব্বদা অবস্থান করেন। এই দৈন্যই তাঁহাদিগকে অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকার দেয়।

*

চিত্তকে যদি একজায়গায় স্থির করিতে পারা যায়, তবে তাহা সমস্ত বিষয়ে সকল অবস্থাতেই ক্রমশঃ স্থির হইয়া আসে। একটি গুণ যদি আয়ত্ত করা যায়, তবে তার সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য গুণগুলি আপনি আসিয়া জোটে। —একটি একটি করিয়া অর্জ্জন করিতে গেলে হয়ত কিছুই হইয়া উঠিত না। তেমনি আবার একটী দোষ বা ছিদ্র থাকিলে তার ভিতর দিয়া সমস্ত জীবন পণ্ড হইবারও আশঙ্কা আছে। এ অবস্থায় যাহা কাম্য, তার দিকে সমস্ত জীবন নিয়োগ করাই কর্ত্তব্য। একান্ত চেষ্টা যেখানে, পথ সেখানে মিলিবেই, ভগবান লাভের জন্য যদি উৎকণ্ঠা জাগে, তবে দয়াল তিনি—পন্থা নির্দ্দেশ করিয়া দিবেনই—

আঁধারেতে জাগে তোমার আঁখিতারা,
তোমার ভক্ত কভু হয় না পথহারা।

ভগবানের নির্দ্দেশ যিনি হৃদয়ে বুঝিতে পারিয়াছেন, শত দুর্ব্বিপাকেও তাঁর কখন বেচালে পা পড়ে না।

*

তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিয়া যতই মনের ভিতর তলাইয়া যাইতে পারিবে, ততই নিত্য নূতন গলদ তোমার কাছে ধরা পড়িবে। কিন্তু তা দেখিয়া হতাশ হইও না, বরং সেগুলি শুধরাইতে চেষ্টা করিয়াই দিন দিন তুমি শুদ্ধসত্ত্ব হইবে। আর মনের কোনে যদি কোনও লুকানো ময়লা চোখে না পড়ে, তবে জানিবে, এখনও তোমার মন জড়বৎ, নিজের খুঁত খুঁজিয়া বাহির করবার শক্তি তোমার এখনও জন্মে নাই। জন্ম জন্মান্তরের কত সংস্কারের আবর্জ্জনা যে জমিয়া আছে তার ইয়ত্তা নাই, তার ভিতর অতি সামান্য পুঁজি নিয়া তোমার এবারকার জীবন সুরু হইয়াছে, বাকী সমস্তই মজুত রহিয়াছে। এখন এবারকার যতটা দোষ তোমার চোখে পড়ে, ততটার জন্য তুমি ভগবানের কাছে আকুল প্রার্থনা করিয়া শুধরাইতে চেষ্টা কর। প্রার্থনা করিতে করিতে তাঁর কৃপা হইলে আর কথা নাই, তিনিই তখন তোমায় কোলে টানিয়া লইবেন।

*

তুমি আমি যে ভাষায় কথা কই, সেই ভাষাই কবির নিকট ছন্দের বাঁধনে বাঁধা পড়ে প্রাণবন্ত নূতন জিনিষ হয়ে ওঠে। তেমনি তোমার আমার এই যে তুচ্ছ জীবন, জ্ঞানীর নিকট তাই এক আশ্চর্য্য অভিনব আনন্দের উৎস বলে প্রতীয়মান হয়। এই তুচ্ছ জীবনকেই তিনি মহানের সহিত যুক্ত দেখে একে গরিমময় ও মহিমান্বিত মনে করেন।

*

তোমার আদর্শের অনুকূল যদি পারিপার্শ্বিক অবস্থা না-ই পাও, তবে তার জন্য দুঃখ করিয়া তো লাভ নাই, কেননা তাতে চিত্ত শুধু হতাশ ও দুর্ব্বল হইয়াই পড়িবে। তোমার আদর্শ যদি সত্যের অনুকূল হয়, আর তোমার যদি আদর্শের অনুরূপ হইয়া চলিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা থাকে, তবে একদিন ভগবান্ সেই পারিপর্শ্বিক আনিয়া দিবেনই। এইটুকু বিশ্বাস স্থির রাখিয়া তাঁর উপর ভার দিয়া, যাহা আছে তাহা নিয়া তাঁর দিকে অগ্রসর হও, সিদ্ধি তোমার অনাসক্ত একান্ত চেষ্টায় একদিন আপনি আসিয়া মিলিবে।

*

দুঃখ, রোগ প্রভৃতি যখন প্রথমে আসে, তখন হইতেই আমরা উহাদের ভাবনার অভ্যস্ত হইতে থাকি ও ক্রমশঃ সংস্কারাবদ্ধ হইয়া পড়ি। তখন ঔষধে বিশ্বাস করিয়া রোগের প্রতিবিধান করিতে সচেষ্ট হই, নইলে অনেক সময়ে ভাল ঔষধও অবিশ্বাসের দরুণ উপযুক্ত ফল দর্শায় না। তেমনি আমরা বদ্ধ, পাপী অধম কাঙ্গাল ভাবিয়া নিজকে সেইভাবে সম্মোহিত করি। বেদান্ত বলেন, সদ্গুরুর শরণ লইয়া তাঁর বাক্যে বিশ্বাস করিয়া তুমি যে মুক্ত, ইহাই ধারণা করিতে চেষ্টা কর। সংস্কার ভুলিয়া যাও—গুরুবাক্য ফলিবেই।

*

নির্ভর ভিন্ন মানুষ দাঁড়াইতে পারে না, কেননা ক্ষুদ্র বৃহতের দিকে—পূর্ণের দিকে আত্মবিসর্জ্জনের জন্য ছুটিয়া যাইবেই। ইহাই

ধর্ম্ম। তাই ছোট শিশু মাকে ভালবাসে। সে জানে না কেন ভালবাসে, কিন্তু প্রকৃতির এমন আইন যে তাহাকে ওইরূপ ছোট হইয়াই তবে বাঁচিতে হইবে। মানুষের যখন যৌবন আসে, তখন তার অভিমানও অত্যন্ত বাড়িয়া উঠে। আপনাকেই তখন সে সমস্ত জগতের মধ্যে বিশ্বাস করে বেশী, তাই তার মাথা কারও কাছে সহজে নুইতে চায় না। আর সেই ভাব মূলে থাকিয়া অপর কত শত অনুকূল যুক্তি যোটাইতে থাকে। তার মধ্যে সব চেয়ে বড় যুক্তি এই যে, নির্ভরের বা মাথা নোয়াইবার উপযুক্ত পাত্র তাহারা খুঁজিয়া পায় না। কিন্তু যার মাথা যথার্থ নত হইয়াছে, প্রাণমন দিয়া যে নির্ভর করিতে পারিয়াছে, সে জানিয়াছে যে, তার এই *নির্ভরতায়* নত মস্তক একদিন ভগবান আপনি আসিয়া স্বমহিমায় সমুন্নত করিয়া দিবেন। এ যদি না হইত, তবে পাথর পূজা করিয়া ভারতে ভগবান লাভ করা এতদিনে মিথ্যা বলিয়া প্রতিপন্ন হইত—পতিই পরম গুরু বলিয়া সতী নারী মূর্খ স্বামীকে পূজা করিতে পারিতেন না। শিষ্যের বা অনুগতের নির্ভরতার গুণে ভগবান আপনি আসিয়া গুরুরূপে দেখা দেন। তখন যদি তিনি লৌকিকদৃষ্টিতে অন্যায়ও কিছু বলেন, তবুও তাঁর মহান প্রাণের ঐকান্তিক স্নেহাশীর্ব্বাদের জোরে তাহা শিষ্যের বা অনুগতের অমঙ্গলের পরিবর্ত্তে মঙ্গলই সাধন করিয়া থাকে।

*

মন যখন যে রকম ভাবনা নিয়া ব্যস্ত থাকে, চারিদিকের আবহাওয়াও তখন তেমনি মনে হয়। মন যখন আনন্দে থাকে, তখন পৃথিবী আনন্দময় বলিয়া বোধ হয়; আবার যখন নিজের প্রাণ দুঃখে ভরা থাকে, তখন বাহিরের সকলই তিক্ত বলিয়া মনে হয়। বাহির হইতেও ঠিক মনের অবস্থার অনুরূপ হইয়াই যেন পর পর নানা রকমের আঘাত আসিতে থাকে। আমরা তখন বলি, সুখ সুখকে টানিয়া আনে—দুঃখ দুঃখকে টানিয়া আনে. চিত্ত উদ্বিগ্ন বা বিরক্ত থাকিলে তার পদে পদে ঠেকিতেই হয়। তাই সর্ব্বদা যদি মনকে শান্ত রাখিয়া উদার দৃষ্টিতে নিজকে দ্রষ্টার আসনে রাখিয়া সৌম্যভাবে জগৎকে দেখা যায়, তবে আর সুখ দুঃখের ক্রীড়নক হইয়া এই বেদনা পাইতে হয় না।

*

যাহা ক্ষুদ্র, তাহাই হেয়, তাহাই পাপ। আত্মসুখের জন্য কাজ করা স্বার্থপরতা= মহাপাপ। কিন্তু বিশ্বের হিতের জন্য কাজ করা পরার্থপরতা—মহাপুণ্য।

*

যিনি—সর্ব্বস্য ধাতারং অচিন্ত্যরূপং আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ—তাঁহাকে কি আর ইচ্ছামাত্রেই এই মন দিয়া ধারণা করিতে পারিবে? মন এই স্থূল জগতের ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য বস্তুই ধারণা করিতে পারে; অতীন্দ্রিয়ের অস্তিত্ব তাহার কাছে প্রহেলিকা। কিন্তু সাধনবলে অসম্ভবও সম্ভব হয়। এই সাধনার প্রথম অবস্থা স্থূল দৃশ্য বিষয়ই অবলম্বন করিয়া। প্রথমে কোনও দেবতার ছবি বা কোনও মহাপুরুষ বা তোমার গুরুর স্থূল দেহকেই চিন্তা করিও। এই স্থূল মূর্ত্তিতে মন স্থির হইলে সময় সময় দেখিবে, সে মূর্ত্তি যেন জীবন্ত জ্যোতির্ম্ময় হইয়া উঠিয়াছে। তখন এই জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তিরই ভাবনা করিতে থাকিও। এই ভাবনা গাঢ় হইলে দেখিবে,

যে জ্যোতিঃকণা গুলি জমাট বাঁধিয়া মূর্ত্তি আকারে ছিল, তাহাদের পরস্পরের যোগ যেন বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। যাহা রূপে আবদ্ধ ছিল, তাহা যেন অরূপে মিলাইয়া যাইতেছে। এই সাধন-পথ ধরিয়া চলিয়াই ক্রমে সেই অরূপ অবাঙ্মানসগোচর পুরুষকেও ধ্যানগম্য আনিতে পারিবে

*

যোগ্যং যোগ্যেন যোজয়েৎ—এই হইল ভগবানের বিধান, সুতরাং তাঁর কাজ যদি করিতে চাও, তবে তার যোগ্যতা অর্জ্জন কর। এজন্য চাই আকুল আকাঙ্ক্ষা—তার ভিতর যেন আত্মপ্রতিষ্ঠা, অহঙ্কার, স্বার্থবুদ্ধি প্রভৃতি লুকাইয়া না থাকে। সে দিকে মনকে কড়া পাহারায় রাখিলে আন্তরিক চেষ্টার ফলে অজ্ঞাতসারে তোমারই মাঝে যোগ্যতা জন্মিবে। আর তখন কাজের ভারও আপনি তোমার উপর পড়িবে। নিজকে তখন ইচ্ছাময়ের যন্ত্র-স্বরূপ জানিয়া তাঁর প্রত্যেকটী কাজ সুসম্পন্ন করিয়া দেহ মন-প্রাণ ধন্য করিয়া লইবে'।

*

লক্ষ্য বা উদ্দেশ্যের তারতম্যানুসারে একই কাজ কাহারও বন্ধনের, কাহারও বা মোক্ষের কারণ হইয়া থাকে। আমরা নিত্য যে সমস্ত কর্ম্ম করিয়া নিজকে এ জগতে বদ্ধ মনে করি, সেই সমস্ত কর্ম্মই আবার যখন ভগবৎপ্রাপ্তির জন্য কর্ম্মযোগরূপে অনুষ্ঠিত হয়, তখন উহাই আমাদের মোক্ষের সহায়ক হয়। ঋষিযুগে ঋষিরাও আজকালকার মানুষের মত স্ত্রী-পুত্র লইয়া সংসার করিতেন, আবার তাহার মধ্য দিয়া নিজেও মুক্ত হইতেন ও পরিবার বর্গেরও মুক্তিপথ প্রশস্ত করিয়া দিতেন।

*

বাহিরে আড়ম্বর যেখানে যত জমকাল অন্তর সেখানে তত দুর্ব্বল ও অভাবগ্রস্ত বুঝতে হবে। আর বাহির যতই সাদাসিধে, অন্তর ততই গৌরবে ভরা। এই জন্য এ দেশে নিঃসম্বল জটাচীরধারী সন্ন্যাসীর পায়ে রাজার মুকুট লুটিয়ে পড়ত। এর জন্যই ব্রাহ্মণই এ দেশের রাজাদেরও শাসন করত। অন্তরের ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হয়েই সন্ন্যাসী বাহ্য জগতের সমস্ত ধনসম্পদ অক্লেশে ত্যাগ করতে সমর্থ হন। এই যে তুচ্ছ তুমি আমি—এর মধ্যেই অত্যাশ্চর্য্য গুপ্তনিধি লুকিয়ে রয়েছে; তাকে পেলে রাজপদ বল, পাণ্ডিত্য বল আর যাই বল না কেন, সব তোমার কাছে তুচ্ছ হয়ে যাবে। তাই সন্ন্যাসীর উপদেশ—যাকে পেতে চাও, তাকে ত্যাগ কর অর্থাৎ সব বাহ্য সম্পদ ছেড়ে সব সম্পদের মূল যে তুমি স্বয়ং—তাকেই লাভ করতে চেষ্টা কর—তাহলে সবই মিলবে।

*

বিশ্বের হিতকামনা যিনি করেন, জগতের অভাবমোচন যিনি করিতে চান, তাঁর কার্য্য সর্ব্বাগ্রে আত্মকেন্দ্রিক হওয়া আবশ্যক। নিজকে মুক্ত শুদ্ধ বলিয়া জানিয়া তবে অপরকে মুক্ত করিতে অগ্রসর হইতে হইবে। নিজের অভাব পূর্ণ না হইলে অপরের অভাব পূর্ণ করিতে যাওয়া বিড়ম্বনামাত্র। তাই শাস্ত্রের উপদেশ—"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।"

*

বেদান্তী ঘরে লুকিয়ে বসে যোগ করতে চান না—তিনি চান সবার মাঝে নিজকে পেতে—জীবে জীবে নিজের শিবস্বরূপকে উপলব্ধি করতে। স্থাবর জঙ্গম বিশ্বচরাচর

সবকে ব্যাপ্ত করে রয়েছেন যিনি, তাঁকে উপলব্ধি করবার জন্য সবাইকে ছেড়ে তাঁর সঙ্গে যুক্ত হতে হবে কেন? সবার মাঝেই ত তিনি—সবার মাঝেই তাঁকে পাওয়া চাই, এ নইলে জ্ঞানীর যোগসাধনা বৃথা।

*

শুধু দুইটী অন্নসংগ্রহ করিয়া কষ্টেসৃষ্টে নিজকে বাঁচাইয়া রাখিয়া শেষকালে চিরবিদায় গ্রহণ করিবার জন্য সংসারে আস নাই। এই সংসার তোমার সাধনক্ষেত্র; এখানকার প্রত্যেকটী কার্য্য, প্রত্যেকটী চিন্তা তোমার আত্মোন্নতিকল্পে অনুষ্ঠিত হইতেছে কিনা, কর্ম্মকোলাহলময় দিনের অবসানে রাত্রির সুস্নিগ্ধ অবসরে তাহাই ভাবিয়া দেখিবে। দুঃখ কষ্টে মুহ্যমান হইয়া পড়িও না। আধি-ব্যাধি ভগবানই সৃষ্টি করিয়াছেন। ইহারা নির্দ্দয়ভাবে আঘাত করে বলিয়াই মানুষ ইন্দ্রিয়ের পঙ্কিলতায় মজিয়া থাকিতে পারে না। নিজকে জানিতে চেষ্টা না করিয়া যতদিন তুমি মূঢ়ের মত অবস্থান করিবে, ততদিনই এই দুঃখ তাপের অঙ্কুশতাড়ন তোমাকে উৎপীড়িত করিবে। কর্ম্মের মাঝে মনকে ভগবচ্চিন্তায় বা আত্মস্বরূপের মননে ব্যাপৃত রাখিও, তবেই বিশৃঙ্খল চিত্ত স্থির হইয়া আসিবে। তখন সাংসারিক দুঃখ-তাপ তরঙ্গের আকারে উত্থিত হইয়া ক্ষণেকের জন্য হয়ত তোমাকে একটু ক্ষুব্ধ করিবে, কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই তোমার প্রশস্ত চিত্তের প্রশান্তির মাঝে তাহা বিলীন হইয়া যাইবে। মন এইরূপ প্রশান্ত হইলেই আত্মস্বরূপের জ্ঞান লাভ করিয়া জীবন ধন্য হইবে।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং
কলিকাতা

সংবাদ ও মন্তব্য

আশ্রম সংবাদ

মঠাধিষ্ঠাতা শ্রীমৎ পরমহংসদেব এখনও বঙ্গদেশ পরিভ্রমণে আছেন। ভাওয়াল আশ্রম হইতে ঢাকা, বালিয়াটী, মাদারিপুর প্রভৃতি স্থানে ভ্রমণ করিয়া তিনি পুনরায় ঢাকায় ফিরিয়া আসিয়াছেন। জন্মোৎসবের সময় মাণিকগঞ্জবাসী ভক্তগণের প্রার্থনায় তাঁহার মাণিকগঞ্জের অন্তর্গত তরাতে যাওয়ার কথা আছে। তথা হইতে ফিরিয়া আসিয়া জন্মাষ্টমী পর্য্যন্ত ঢাকায় বিশ্রাম করিবেন।

গ্রাহকগণের প্রতি

ভাদ্রের পত্রিকা ভাদ্রমাসের শেষে বাহির হইবে আশা করি। কেহ পত্রিকা না পাইলে অনুগ্রহ পূর্ব্বক আশ্বিনের প্রথম সপ্তাহান্তে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইবেন।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং
কলিকাতা।

ওঁ তৎ সৎ

আর্য্য-দর্পণ

(সনাতন ধর্ম্মের মুখপত্র)

১৩শ বর্ষ } ভাদ্র { পঞ্চম সংখ্যা

জগতঃ পিতরৌ

[ঋগ্বেদসংহিতা—১।২৪।৬]

উর্বী পৃথ্বী বহুলে দূরে অন্তে
উপব্রুবে নমসা যজ্ঞে অস্মিন্।
দধাতে যে সুভগে সুপ্রতূর্ত্তী
দ্যাবা রক্ষতং পৃথিবী নো অভ্বাৎ॥

উভা শংসা নর্য্যা মামবিষ্টাম্
উভে মামূতী অবসা সচেতা।
ভূরি চিদর্য্যঃ সুদাস্তরায়
ইষা মদন্ত ইষয়েম দেবা॥

ঋতং দিবে তদবোচং পৃথিব্যা
অভিশ্রাবায় প্রথমং সুমেধাঃ।
পাতামবদ্যাদ্দুরিতাদভীকে
পিতা মাতা চ রক্ষতামবোভিঃ॥

ইদং দ্যাবা পৃথিবী সত্যমস্তু
পিতর্মাত র্যদিহোপব্রুবে বাম্।
ভূতং দেবানামবমে অবোভিঃ
বিদ্যামেষং বৃজনং জীরদানুম্॥

বিশাল, বিপুল যাঁরা—বহুকায়া, নিকটে ও দূরে,
যজ্ঞে আজি তাহাদের ডেকে আনি মিনতির সুরে;
ভুবনের ধাতা তাঁরা, সুভগ ও নিখিল-আশ্রয়—
হে দ্যাবাপৃথিবী, মোরে পাপ হতে বিতর অভয়।

ভুবনশংসিত দোঁহে আজি মোরে দাও গো আশ্রয়—
দাও গো আশ্রয় মোরে—এস হেথা, মঙ্গল-নিলয়!
জাগাব দেবের হর্ষ, কুণ্ঠিত না হব কভু দানে,
ভূরি অন্ন যাচি, তাই ত্রিভুবন ভরিয়াছি গানে।

নহি মন্দমেধা আমি; সত্যপূত দিব্যবাণী দিয়া,
দ্যাবা আর পৃথিবীর কীর্ত্তিগাথা দিনু বিথারিয়া;
পিতা আর মাতা তাঁরা—ক্ষরে যেন সন্তানের পরে
স্নেহধারা; অকথ্য কলুষ তারে স্পর্শ নাহি করে।

জানি দ্যাবা-পৃথিবীরে নিখিলের জনকজননী—
এই মোর আবাহন যজ্ঞভূমে সত্য বলে গণি;—
দিব্যতনু কবিদের হও আজি অটুট আশ্রয়,
দাও অন্ন, দাও বল, দূর কর মরণের ভয়।

বিচিত্র প্রসঙ্গ

—*—

ভগবান তোমার ভিতর দিয়ে কাজ করুন, তা হলেই আর কর্ত্তব্যের বাঁধন বলে কিছু থাকবে না—কেবল তাঁরই আলো জ্বলে উঠবে। ভগবান তোমার মাঝেই আত্মপ্রকাশ করুন—আহারে বিহারে, জীবনে-মরণে, প্রতি নিশ্বাসে-প্রশ্বাসে শুধু ভগবান। আগে সত্য উপলব্ধি হোক, তাহলে সব জিনিষ আপনা থেকেই সামলে যাবে। দেবলোকে বাস করবে কি? সে তো তোমার মাঝেই—তুমিই যে তাই। আর যা কিছু দেখ্‌ছ, তা কেবল তোমার সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়েছে।

*

লর্ড বায়রণের ভিতর স্বাধীনতার হাওয়া খেলত। তিনি যখন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তেন, তখন একবার তাঁদের ক্লাসে একটা রচনা লিখ্‌তে দেওয়া হয়েছিল। বিষয় ছিল—বিবাহ-ভোজে খৃষ্ট কি করে জলকে মদে পরিণত করলেন, সেই অলৌকিক কাহিনী। পরিক্ষার্থী বেচারীরা তাই নিয়ে কত যে মাথা ঘামাতে লাগল! যে সময়টুকু দেওয়া হয়েছিল, তারি মাঝে কত জন কত লম্বা লম্বা রচনা লিখে ফেল্‌ল—ভোজের অতিথিরা কেমন সেজে এসেছিল, পরিবেশনের ব্যবস্থা কেমন হয়েছিল, খৃষ্টকেই বা কেমন দেখাচ্ছিল—ইত্যাকার ঝুড়ি ঝুড়ি কথায় তো সবাই খাতা বোঝাই করতে লাগল। বায়রণ কিন্তু সব সময় শুধু শুধু বসে থাক্‌লেন—কখনও বা কড়িকাঠ গুণছেন, কখনও বা ছাত্রদের মুখের দিকে তাকাচ্ছেন—আর একটু হলেই শিষ দিতে সুরু করবেন—এমনিতর তাঁর ভাব। নির্দ্দিষ্ট সময় পার হয়ে গেলে পরীক্ষক সবার খাতা নিতে এলেন। বায়রণের কাছে এসে ঠাট্টা করে তিনি বললেন, "খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছ নয় কি? সারাটা ঘণ্টা যে লেখাটাই লিখেছ।" এই বলে একখানা শাদা খাতা তুলে নেবার জন্য হাত বাড়ালেন। বায়রণ বললেন, "এই একটু থামুন"—বলেই তাড়াতাড়ি এক ছত্র কি লিখে দিয়ে খাতাখানা পরীক্ষকের হাতে তুলে দিলেন। প্রায় তিন সপ্তাহ পরে পরীক্ষার ফল বেরুল। পরীক্ষক কোনও কোনও রচনার বেশ প্রশংসা করেছেন বটে, কিন্তু সবাই অবাক হয়ে শুনল যে, বায়রণ নাকি প্রথম পুরস্কার পেয়েছেন। বায়রণের রচনার কদর বুঝাবার জন্য শিক্ষক ক্লাসে সব ছেলের সামনে সেই এক ছত্রের রচনাটী পড়লেন। ছত্রটী এই—"জল তার স্বামীকে দেখে লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠ্‌ল!" তিনি কিছুই বানিয়ে বলেন নি। এই ছোট্ট একটী ছত্র যেন স্বতঃস্ফূর্ত্ত হয়ে ফুটে উঠেছে। স্বভাবে থেকে কাজ করলে সে যেমন পরিপূর্ণ, লীলায়িত, কমনীয় ও কবিত্বময় হয়ে ওঠে, এ-ও তেমনি। এই তো স্বভাবের কাজ।

*

ওয়ার্ড্‌সওয়ার্থ বলছেন, চোখ না দেখে তো পারে না, কানকেও তো বন্ধ করে রাখতে পারি না। দেহটা যেখানেই থাক্‌ না কেন, আমাদের ইচ্ছায় অনিচ্ছায় স্পর্শের অনুভূতি তার হবেই। * * * এই যে চরাচর জুড়ে সবাই এমন করে সাড়া দিচ্ছে এত কথা বল্‌ছে,

এর মাঝে কি আপনা হতে কিছুই আমাদের কাছে আসবে না? চিরদিনই কি আমাদের খুঁজে খুঁজে বেড়াতে হবে?

*

এক গির্জ্জায় খুব ভাল একটা অর্গান ছিল। যন্ত্রটা এতই ভাল ছিল, যে তার জিম্মাদার আনাড়ীকে তা ছুঁতেই দিত না। একদিন গির্জ্জায় গান হচ্ছে, এমন সময় কাঙ্গাল বেশে একটি লোক এসে গির্জ্জায় ঢুকে অর্গানটা বাজাতে চাইল। কিন্তু তাকে অর্গানের কাছেই যেতে দেওয়া হল না। তাকে তো কেউ চেনে না, কাজেই অমন আদরের বাজনাটা কে আর তার হাতে তুলে দেবে বল? গান হয়ে গেলে পর গির্জ্জার বাজনাদার যখন সরে গিয়েছে, তখন লোকটা কি করে যেন চুপি চুপি অর্গানের কাছে গেল। যন্ত্রটা ছুঁতেই সে যেন তার ওস্তাদকে চিনতে পেল, আর তা থেকে এমন আশ্চর্য্য বাজনা হতে লাগল যে, যারা গির্জ্জা থেকে ফিরে যাচ্ছিল, সুর শুনে তারা আর যেতে পারল না, কে যেন যাদুবলে তাদের সেখানে আটকে রাখল। এমন আশ্চর্য্য সুরের বাজনাদার যে, সে হচ্ছে একজন নামজাদা ওস্তাদ—ওই অর্গানটা ছিল তারই নিজ হাতের তৈরী।

আমাদেরও ঠিক সেই দশা। আমরা ভগবানকে প্রেমকে জীবনে স্ফূর্ত্ত হতে দিই না—আমাদের নজর থাকে এই দেহটার উপর, মনটার উপর। তাই আমাদের জীবনবীণায় শুধু সাদাসিদে সুরই বেরোয়। এসে একবার যদি বাজাতে আরম্ভ করত, প্রেম এসে যদি হৃদয়ের তন্ত্রী স্পর্শ করত, তা হলে এই বীণা হতেই এমন সুর বেরুত—যা তোমার স্বপ্নেরও অগোচর। তখন চারিদিকে কেবল সুর, কেবল আলো—দিব্যধামের সুধা-সঙ্গীতের অপরূপ মূর্চ্ছনা।

*

এক কুমোর ছিল, সে মূর্ত্তি গড়তে এমনি ওস্তাদ ছিল যে, তার নিজের মূর্ত্তি গড়ে দিলেও তুমি আসল-নকলে কোনও তফাৎ করতে পারবে না। সে যখন বুঝতে পারল, তার মরণকাল ঘনিয়ে এসেছে, এইবার যমদূত আসবে তাকে নিতে—তখন সে অনেক ভেবে-চিন্তে একটা ফন্দীর মত ফন্দী আঁটল। সে নিজের গোটা বারো মূর্ত্তি গড়ে রাখল। যমদূত যখন তাকে নিতে এল, তখন সে তো বুঝতেই পারল না, কোনটা আসল মানুষ, আর কোনটা নকল। কুমোরকে ঠিক ঠিক ধরতে না পেরে সে আবার যমরাজার কাছে ফিরে গিয়ে সব কথা তাঁকে বলল। যম সব কথা শুনে দূতকে একটা কৌশল বলে দিলেন। যমদূত আবার পৃথিবীতে ফিরে এল। কুমোরের বাড়ীতে এসেই মূর্ত্তিগুলির সামনে দাঁড়িয়ে সে বলল, "বাঃ, তুমি তো তুখোড় লোক হে! কি চমৎকার মূর্ত্তিই গড়েছ! কিন্তু একটা জায়গায় তোমার ভুল হয়েছে—ওই এক খুঁতেই সব মাটী।" কুমোর মূর্ত্তিগুলির মাঝে দাঁড়িয়েছিল। যমদূতের কথা শুনেই সে তড়াক্ করে লাফিয়ে বলল, "কি, কি—ভুল করেছি না কি?—কোথায়?" "এইখানেই তো ভুল"—বলেই যমদূত তাকে ধরে বেঁধে নিয়ে চলে গেল। "ভুল করেছি কি?"—জিজ্ঞাসা করাটাই তো ভুল। তুমি যে সত্যস্বরূপ, তোমার ভুল হবে কোথায়? যে বজ্জাত কর্ত্তা-আমি মনে করে যে, সে কিছু করেছে, সেই মৃত্যুর বাঁধনে বাঁধা পড়ে।

দুর্ভিক্ষের দিনে এক বুড়ী মারা গেল। মরার পর যমলোকে চিত্রগুপ্তের খাতা খুলে যখন তার পাপ পুণ্যের হিসাব করা হল, তখন দেখা গেল যে, জীবনে সে কখনও দান ধর্ম্ম কিছুই করেনি—কেবল একবার এক ভিখারীকে একটুকরা শাক-আলু খেতে দিয়েছিল। যমরাজার হুকুমে শাক-আলুর টুকরাটা আদালতে দাখিল করা হল। তা দেখে যমরাজা তাকে আলুর টুকরাটা নিয়ে স্বর্গে যেতে হুকুম দিলেন। বুড়ী সেটাকে চেপে ধরতেই সেটা বুড়ীকে নিয়ে উপরমুখী উঠ্‌তে লাগল।

এমন সময় এক বুড়া ভিখারী এসে সেখানে উপস্থিত। বুড়ীকে উপরমুখী উঠ্‌তে দেখে সে তার ছেঁড়া আঁচলখানা চেপে ধরে তার সঙ্গে সঙ্গে উঠে যেতে লাগ্‌ল। আবার দেখাদেখি ভিখারীর ঠ্যাং চেপে ধরে আর এক জন উঠতে লাগ্‌ল। এমনি করে বুড়ীর সেই এক আলুর জোরে বিশ-পঁচিশ গণ্ডা মানুষ ঝুল্‌তে ঝুল্‌তে স্বর্গপানে চল্‌ল। কিন্তু মজা এই, এতগুলি লোক যে বুড়ীর পিছনে চলছে, তা কিন্তু বুড়ীর একটুও ভারী ঠেকছে না।

এমনি করে বুড়ী তো তার দলবল নিয়ে ক্রমে উঠতে উঠতে অবশেষে একেবারে স্বর্গের দুয়ারে এসে পৌছাল। সেখানে এসেই বুড়ী নীচু পানে তাকিয়ে কি জানি কি ভেবে বলে উঠল, "এই সব, দূর হ এখান থেকে !—এ আমার আলু।" এই বলেই অজান্তেই তাদের দিকে হাতের ইসারা করল। আর আলুর টুকরাটা ছেড়ে দিতেই বুঁড়ী দলবল নিয়ে একেবারে নরকে গিয়ে পড়্‌ল।

সব কথাই স্পষ্ট করে বলেছি—এর অর্থ কি, বুঝতেই পার।

*

একবার কাঠবিড়ালী আর পর্ব্বতের মাঝে ঝগড়া হয়েছিল। তাতে পর্ব্বত রেগে কাঠবিড়ালীকে বলেছিল, "ক্ষুদে।" তা শুনে কাঠবিড়ালী জবাব দিল, "তুমি একজন মস্ত লোক বটে, কিন্তু জানই তো, ঝড়-জল, শীত-রোদ সব নিয়েই তবে বছর যায়; জগৎটাতেও ভাল-মন্দ, ছোট-বড় সবই আছে। কাজেই আমার ঠাঁইটুকু যে আমি জুড়ে আছি, তাতে তো আমার লজ্জা হচ্ছে না। আমি যেমন তোমার মত মস্ত নই, তেমনি তুমিও তো আমার মত ক্ষুদে হতে পারবে না—আমার মত অমন চট্‌পটেও হতে পারবে না। এক একজন এক এক কাজের ওস্তাদ—জগতে সবই ভাল, সবই ঠিক। আমি বনের বোঝা পিঠে বইতে পারি না বটে, কিন্তু তুমিও তো আমার মত দাঁতে বাদাম ভাঙ্গতে পার না।"

*

প্রশ্ন—স্বামিজী, আপনি তো বলেছেন, জ্ঞানই আমাদের স্বরূপ। আমি আইন পরীক্ষা দেব। পুঁথি-পুস্তক না পড়ে কি করে আমি আইন পরীক্ষায় প্রথম হতে পারি, এমন কোনও বৈদান্তিক দিব্যদর্শনের যদি উপায় থাকে, তা আমায় দয়া করে বলে দেবেন কি?

উত্তর—এক রাজকুমার ছেলেবেলায় পাত্রের ছেলেদের সঙ্গে লুকোচুরী খেলছিল। পাত্রের ছেলেরা আগে লুকাল, রাজপুত্র আর তাদের খুঁজে পায় না! পাশে একজন দাঁড়িয়েছিল, সে বলল, "তুমি রাজার ছেলে,

তুমি হুকুম করলেই তো ওরা এখনি হ হতে বাধ্য, তবে তুমি তাদের খুঁজে বের করতে হয়রাণ হচ্ছ কেন?" রাজপুত্র উত্তর করল, "তা হলে খেলায় আর কোনও মজা থাকবে না—খেলাটাই যে মাটী হয়ে যাবে।" আমিও বলি, তুমি বাস্তবিকই জগতের শাস্তা, বিধাতা, তুমি বিশ্বতশ্চক্ষুঃ। কিন্তু এখন যে খেলার ছলে তোমার হাতে গড়া জিনিষকেই তুমি খুঁজতে চলেছ—এই জগৎজোড়া লুকো-চুরীর মাঝে কত অর্থ-অনর্থ খুঁজে বেড়াচ্ছ—এখন তোমার সর্ব্বদর্শীর ক্ষমতা প্রয়োগ করতে গেলে যে খেলাটাই মাটী হয়ে যায়,—" তোমার কি তাই করা উচিত? যে ভূমিতে উঠলে ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান একাকার হয়ে যায়, অনন্তকোটী গ্রহনক্ষত্র তোমারই আত্ম-স্বরূপ বলে প্রতিভাত হয়,—জগতের সমস্ত বিদ্যা যখন তোমার অসীম জ্ঞানসমুদ্রে তরঙ্গের মত, বুদ্বুদের মত মাত্র—তখন আইন পরীক্ষা বা সাংসারিক সম্পদের জন্য তোমার ভাবনা হবে কেন? যে ইন্দ্রিয়-ভূমিতে থেকে ইন্দ্রিয়তৃপ্তির জন্য দিব্যদৃষ্টি চাচ্ছ, যদি বাস্তবিক দিব্যদর্শন চাও, তবে ওর লোভ তোমাকে ছাড়তে হবে আজ।

মাছ ধরবার জন্য জাল পাতা হল, কিন্তু তাতে এত বড় মাছই পড়ল, যে জাল-টাল শুদ্ধ সে কোথায় উধাও হয়ে গেল। বৈদান্তিকের দিব্যদর্শন হচ্ছে এই রকম একটা বড় মাছ, ও তোমার বাসনার জাল শুদ্ধ পালিয়ে যাবে। আবার অপরা বিদ্যা অর্জ্জন করবার যে সাধারণ রীতি আছে, তা-ও তো বৈদান্তিক দিব্য-দর্শনেরই অঙ্গ, কেননা তার মাঝেও মানুষ অজান্তে অহংবোধ ও দ্বৈতজ্ঞানকে ছাড়িয়ে যায়।

ইমাম গিজালী নামে এক মুসলমান সাধু ছিলেন। ছাত্রাবস্থায় একদিন সারারাত পড়াশুনা করে কখন তিনি পড়ার জায়গায় ঘুমিয়ে পড়েছেন। খাজা খিজির হলেন জ্ঞানের দেবতা; তিনি স্বপ্নে তাঁকে দর্শন দিয়ে বললেন "আমি তোমার মুখে আর কাণে একবার ফুঁ দিয়ে জগতের সব বিদ্যা তোমার ভিতর ঢুকিয়ে দেব।" কিন্তু ইমাম তাঁর আত্ম-সম্মান ক্ষুণ্ণ হতে দিলেন না—খিজিরের কাছে তিনি দুপুর রাত পর্য্যন্ত পড়বার জন্য একটু প্রদীপের তেল মাত্র চাইলেন। খিড়কী-দুয়ার দিয়ে স্বর্গে ঢুকতেও তিনি নারাজ, তাই সোজা পথের চেয়ে বাঁকা পথটাই তাঁর কাছে শ্রেয়ঃ বলে মনে হল।

ভগবানের কি করা উচিত, সে পরামর্শ তাঁকে দিও না। তোমার কি খুসী, তা তাঁকে বলতে যাও কেন? তাঁর কাছে আত্ম-সমর্পণ কর—এই ক্ষুদ্র অহং আর নিত্য-নূতন বাসনার চাঞ্চল্য তাঁর পায়ে সঁপে দাও—তাতেই তোমার দেহমন তাঁর জ্যোতিতে জ্যোতির্ম্ময় হয়ে উঠবে। প্রকৃত জ্ঞান আর শিক্ষা বই পড়ে হয় না বা বাইরে থেকে কেউ তা ঢুকিয়ে দিতে পারে না—সে জাগে ভিতর থেকে। যাঁরা প্রতিভাশালী, গবেষণার ফলে নূতন তথ্যের আবিষ্কার করেছেন—তাঁরা প্রেরণা পান কখন? না যখন তাঁদের মনের গতি মোটেই স্বার্থপরতার দিকে ঝুঁকে পড়ে না, কোনও বাসনার তাগিদ বা তাড়া-হুড়া থাকে না—অসীমের ভাবে মনটী যখন তলিয়ে যায়। তাঁরা নিজে স্বচ্ছ হয়ে গেলেন, তাই জ্ঞানের আলো তাঁদের মাঝে স্বচ্ছন্দে ফুটে উঠল, আর সেই আলো এসে পড়ল কেতাবের উপর, গ্রন্থশালার উপর। এই

তো খাঁটী কাজ। দিন মজুরের হাড়ভাঙ্গা মেহনৎকে রাম কাজ বলেন না। আত্ম-স্বরূপের সঙ্গে এক ছন্দে স্পন্দিত হওয়া, বিশ্বের সঙ্গে একসুর হয়ে যাওয়া—বৈদান্ত একেই বলেন কর্ম্ম। অদ্বিতীয় সত্তার সঙ্গে এই যে নিঃস্বার্থ মিলন—এই তো হল বাস্তবিক কাজ; কিন্তু তাকেই অনেক সময় লোকে বলে কুঁড়েমি।

ওঁ ওঁ ওঁ*

---

* স্বামী রামতীর্থ

রথযাত্রা

সংসারের রোগ শোক দুঃখে যে জর্জ্জরিত, তাহার কাছে যদি অরোগ অশোক আনন্দময় কোনও বস্তুর প্রসঙ্গ উত্থাপন করা যায়, তবে সেই বস্তুটি পাইবার জন্য তাহার চিত্ত স্বতঃই ব্যগ্র হইয়া উঠে। যদি বলা যায়,'তুমি ত্রিবিধ দেহের আবরণে আবৃত, তাই রোগ শোক-দুঃখরূপ বিকারের, অধীন হইয়া রহিয়াছে, কিন্তু স্বরূপতঃ তোমার আত্মা অকায়, অব্রণ অশোক আনন্দময়—তবে মানুষ বড় একটা ভরসার কথা পায় বটে। কিন্তু অপ্রবুদ্ধ চিত্ত এত বড় কথাটা শুনিয়াও তাহার যথার্থ মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারে না। রোগ, দুঃখ, শোক তাহার নিত্য অনুভূত বস্তু। ইহাদিগকে ছাড়াইয়াও যে কোনও বস্তু আছে,' তাহা সে শুনিয়া মানিয়া লইতে পারে, কিন্তু সে বস্তু কত দূরে বা কত নিকটে তাহার কোনও ধারণাই তাহার হয় না। ফলতঃ, 'তোমার আত্মা অশোক আনন্দময়' বলা সত্ত্বেও সে আত্মাকে অননুভূত অপ্রাপ্ত কোনও অপরূপ বস্তু বলিয়াই মনে করে

কিন্তু যে বক্তা তোমার কাছে আত্মার কথা বলিলেন, তিনি কি তোমাকে কোনও সুদূর বস্তুর বার্ত্তা বলিলেন, না তোমার অতি নিকটের—তোমার তুমির কথাই বলিলেন? আমরা যে ভাষায় কথা বলি, যাহাতে সব জিনিসই দূরে পড়িয়া যায়—বাক্যদ্বারা যাহাকে প্রকাশ করি, তাহাকেই আমরা নিজ হইতে পৃথক না দেখিয়া পারি না। বাক্যে এই দোষ আছে বলিয়াই আত্মতত্ত্ব বা ব্রহ্মতত্ত্ব চিরদিন অনির্ব্বাচ্য থাকিয়া গেল। মূল তত্ত্বের প্রতি ইঙ্গিত করিয়া আমরা যতই দার্শনিক বিচারের পত্তন করি, আসল জিনিষ ততই আড়াল হইয়া পড়ে—যতই বুঝাইতে যাই, বোদ্ধব্য বিষয় ততই আরও জটিল হইয়া পড়ে। সেই জন্যই উপনিষদ একস্থানে বলিয়াছেন, যে এই আত্মার কথায় বলে, আমি তাঁহাকে বুঝিয়াছি. সে তাঁহার কিছুই বুঝে নাই; এবং যে বলে আমি তাঁহাকে বুঝি নাই, সেই ঠিক বুঝিয়াছে।

তবে কি আত্মার প্রসঙ্গে কিছুই বলিবার নাই? বলিবার আছে বই কি। শ্রুতিই বলিতেছেন "স শ্রোতব্যঃ।" যিনি শ্রোতব্য, তিনি বক্তব্য নিশ্চয়ই। কিন্তু তাঁহার কথা বলিবার ভঙ্গী ও ভাষা ঠিক এই লোকের মত নয়। "পোথী পঢ় পঢ় জগমুবা পণ্ডিত ভয়া ন কোয়,

ঢাই অক্ষর প্রেমসে পঢ়ে সো পণ্ডিত হোয়।” —প্রেমের সহিত আড়াইটী অক্ষর পড়িয়া পণ্ডিত হইতে হইবে। সে কোন ভাষার অক্ষর, তাহা অন্তর্যামী গুরুই জানেন, আর উদ্বুদ্ধ শিষ্যই বুঝিতে পারে। দিব্যচক্ষু ছাড়া অর্জ্জুনের বিশ্বরূপ দর্শন ঘটে নাই, দিব্য কর্ণ ছাড়াও এই পরম রহস্য শুনিবার অধিকার মিলে না। শাস্ত্রের ব্যখ্যান আমরা শুনি বটে, কিন্তু বিশ্বাস করি না—মুখে বলি মানি, কিন্তু মনে মানি না। ঠিক বুঝিয়া দেখ, গরু ঘোড়া ছাগলের খবরে আমরা যতটা বিশ্বাস করি এবং সেই বিশ্বাস অনুসারে কাজ করি, আত্মার কথা, ভগবানের কথা শুনিয়া ততটা বিশ্বাস করি কি না?

তবেই দেখ, সত্য কথার চিন্ তো হৃদয়ে লাগে না। তা হইলে আর শুধু শাস্ত্রের কথা শুনিয়া কি হইবে? শাস্ত্রকে বলে অজ্ঞাত-জ্ঞাপক; অজ্ঞাত মানে লৌকিক মন-বুদ্ধিরও এলাকার বাহির—সে কেবল বিলাতের খবর বা আমেরিকার খবর বলিয়াই অজ্ঞাত নয়। সেই তত্ত্বের জ্ঞাপন হইবে কি এই চোখ-কানের কাছে? ঠিক ইহাই শাস্ত্রের অভিপ্রেত নয় বলিয়াই, শাস্ত্র-প্রতিপাদ্য বস্তুকে লৌকিক প্রত্যয়ের বিষয়ীভূত করিলেও আমরা তাহার মর্ম্মগ্রহণ করিতে পারি না—আত্মার কথা, নিজের কথাও কোন সুদূরের বাণী বলিয়া মনে হয়।

এই জন্য শুনিবার যোগ্যতা আগে অর্জ্জন করিয়া তার পর শুনিতে যাওয়া। তবুও কথাটা ঠিক করিয়া বলা হইল না। শুনিতে যাইব আবার কি?—এ কি রাজনীতির বক্তৃতা যে ঘড়ি ধরিয়া সভায় উপস্থিত হইতে হইবে? শোনা অহরহঃই চলিতেছে—নিত্য সদাচারে নিজকে যতই পরিশুদ্ধ করিয়া তুলিতেছি, ততই সংসার-কোলাহলের মাঝে কোন্ অপরূপ সুরের আলাপ শুনিতে পাইতেছি—চিত্ত যতই শুদ্ধ হইতেছে, ততই সে সুর স্পষ্ট হইতেছে। তার পর চরম ক্ষণে মনঃকর্ণরসায়ন হইয়া সে বাণী বাজিয়া উঠিল —বক্তা আর বাণী, বাণী আর আমি—সব একাকার হইয়া গেল। এই শেষ শোনা—এই শেষের গানের সুরের রেশটুকুই শাস্ত্র এখানে-সেখানে একটু-আধটু ফুটাইয়া তুলিতে চাহিয়াছে।

তাও সে স্পষ্ট করিয়া একটা কথা বলিতে পারিল কই? শাস্ত্র যাহা বলিল, লৌকিক বুদ্ধির কাছে তাহার সার-সংক্ষেপ এই যে—আমি যাহার কথা বলিতে আসিয়াছিলাম, তাহা বলিতে পারিলাম না—তুমিও সে কথা বুঝিতে পারিবে না—তোমার এ চোখে সে দৃশ্য দেখা যায় না, এ কানে সে কথা শোনা যায় না—কেবল নেতি, নেতি! তবে শাস্ত্রের প্রামাণ্য কোথায়? প্রামাণ্য তাহার আস্তিক্যে। শাস্ত্র বলিতেছে, তুমি যাহা লইয়া মজিয়া আছ, তাহাতেও তো পুরা সুখ পাইতেছ না—এর চেয়েও মজিবার ঠাঁই আছে। যদি জিজ্ঞাসা করিলে, সে কেমন? উত্তর হইল, তোমার এটার মত নয়। হাজার করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেও ওর চেয়ে স্পষ্ট কথা আর শাস্ত্র হইতে বাহির হইবে না। বিচারের কথা বলিতেছি না —সে কথা ঝুড়ি ঝুড়ি আছে—কিন্তু অনুভূতির কথা ওই একটি। তবে এমন কথা বলিয়া লাভ? লাভ এই যে, একটা মজা আছে একথা শুনিয়া কোনও কোনও নির্ব্বোধ তাহা বিশ্বাস করিয়া বসে এবং মজাটা দেখিবার জন্য আবদার জুড়িয়া দেয়। শাস্ত্র ইহাদের কাছেই

সার্থক আর এই নির্ব্বোধের বুদ্ধিকেই শাস্ত্র নাম দিয়াছে শ্রদ্ধা বা আস্তিক্য-বুদ্ধি।

তত্ত্বের কথা শাস্ত্রে স্পষ্ট নয় কিন্তু পথের কথাটা খুবই স্পষ্ট। যদি ভাগ্যবশতঃ একবার শাস্ত্র-প্রতিপাদ্য সেই অলখ্ বস্তুটীর প্রতি তোমার লোভ জন্মে, তবে তাহাকে পাইবার পথটা শাস্ত্রের মাঝে খুব স্পষ্ট করিয়াই লেখা দেখিবে। চরম তত্ত্বের সম্পর্কে তোমার করণীয় কিছুই নাই, যাহা কিছু কর্ত্তব্য তাহা এই পথ-চলা লইয়া। সংসারধর্ম্মও তো আমরা এই ভাবেই পালন করি। কি লক্ষ্য লইয়া সংসার করিতেছি, তাহার কিছুই জানি না, কিন্তু তবুও কতকগুলি বাধার সঙ্গে নিত্য লড়াই করিয়া আপনার ঠাঁইটুকু বজায় রাখিতে হইতেছে। এই ক্ষেত্রেও তাই। চরমের কথা গোপনই থাক, আগে দেখি, পথ-চলার সঙ্গতি কতটুকু হইয়াছে। সঙ্গতি অর্জ্জন করিতে গেলেই সংসারের সঙ্গে একটা ঠোকাঠুক লাগিয়া যায়। এই দ্বন্দ্ব যুদ্ধটাই হইল সাধনার প্রাণ, কেননা এর মাঝে অনির্ব্বচনীয় তত্ত্ব কিছুই নাই—যাহা আছে তাহা অতি নিরেট, অতি কঠিন। প্রত্যহ যে সমস্ত বস্তু লইয়া নাড়াচাড়া করি, তাহাদের সঙ্গেই যুদ্ধ; সুতরাং শত্রুপক্ষ আমার অজ্ঞাত নয় বলিয়াই শাস্ত্রের কথা এখানে খুব স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। তবে কিনা অজ্ঞাতের প্রতি শ্রদ্ধা বা আস্তিক্যবুদ্ধি থাকা চাই, নতুবা শাস্ত্রের কথা বুঝিয়াও তাহার হুকুম তামিল করিতে মন সরিবে না।

অজ্ঞাত ও জ্ঞাত দুইটী তত্ত্বকেই উপনিষদ্ একটী রূপকে সাজাইয়া দেখাইয়াছেন। উপনিষদ বলিতেছেন—এই সংসার পথে তোমার যে চলা—এ যেন রথযাত্রার মত। তোমার এই দেহই রথ, ইন্দ্রিয়গুলি হইল রথের ঘোড়া, বিষয় হইল তাহাদের চরিবার ঠাঁই, রথের সারথি হইল বুদ্ধি, আর মন হইল তাহার লাগাম। ঘোড়াগুলি চঞ্চল, তাহারা যেখানে খুসি সেখানে চরিয়া বেড়াইতে চায়, কিন্তু সারথি যদি হুঁসিয়ার হয়, তবে লাগাম কসিয়া তাহাদের সায়েস্তা রাখিতে পারে। মনের লাগাম ডাইনেও আছে, বাঁয়েও আছে—মনে প্রবৃত্তিও আছে, নিবৃত্তিও আছে, সঙ্কল্পও আছে, বিকল্পও আছে। কখন যে কোন দিকের লাগাম টানিতে হইবে, তাহা তো আর লাগামে বলিয়া দিবে না, রথেও বলিয়া দিবে না, ঘোড়াতেও বলিবে না। বলিবে যার একটু পথের জ্ঞান আছে, সেই সারথি। সারথি এক পথেই রথ চালায়, সে বানচাল হইলে রথ অচল হইয়া যায়। রূপকের এই পর্য্যন্ত আমরা বেশ বুঝিতে পারি, কেননা এগুলি আমাদের জ্ঞাত-তত্ত্বের সামিল।

কিন্তু প্রশ্ন এই, রথ তো চলিয়াছে, তাহা দেখিতেই পাইতেছি। কিন্তু এই রথের রথী কে?—উপনিষদ বলিতেছেন, "আত্মানং রথিনং বিদ্ধি"—আত্মাকেই রথী বলিয়া জানিবে, তুমি নিজেই রথী। এই তো মুস্কিলের কথা। সারথি রথ চালাইবে বটে কিন্তু সে তো রথীর হুকুমে। যে আমি সংসারদুঃখে জর্জ্জরিত, সে আমিকেই যদি রথী মানিয়া লই, তবে আর নূতন ব্যবস্থা কি হইল, দুঃখেরও বা অবসান হইল কোথায়? যদি বল, তোমার আমিরও একটা স্বরূপ আছে, তাহাই আত্মা—এ তোমার বিরূপ;—তাহা হইলে আবার সেই অজ্ঞাত তত্ত্বের সম্মুখে আসিয়া পড়িলাম। সেখানে ধরিবার ছুঁইবার কাহাকেও পাইব না—তবে কার হুকুম লইয়া রথ চলিবে?

উপনিষদ্ এই খানেই মোড় ফিরিয়া দাঁড়াইলেন। রথীকে শুধু নির্দ্দেশ করিয়া দেওয়া

হইয়াছে—তুমি কেবল জানিলে, এই রথের রথী একজন আছেন, এবং তিনি আত্মা বলিয়া যেমন এখন তোমার অজ্ঞাত, তেমনি আত্মা বলিয়াই তিনি তোমার অভিন্ন স্বরূপ। এইটুকু শুধু জানিয়া রাখ। তার পর তোমাকে এখন কি করিতে হইবে, তাহাই শোন। গীতাতে ভগবান বলিয়াছেন, "বুদ্ধৌ শরণম্ অন্বিচ্ছ"—বুদ্ধির শরণ লও। বুদ্ধি তোমার নিতান্ত অজ্ঞাত নহে—চিত্তের নিশ্চয়াত্মিকা বৃত্তিই বুদ্ধি। মন তো কেবলই ডাইনে-বাঁয়ে দোল খাইতেছে—করি কি না করি, এই তাহার ভাবনা। বুদ্ধি আসিয়া তাহার তাল ঠিক করিয়া দিতেছে। এই ব্যাপার হইতে এইটুকু শিক্ষা গ্রহণ করিতে হইবে যে, সাধনার মাঝে দোটানা থাকিলে চলিবে না, একটা নিশ্চয়াত্মক ভাব আশ্রয় করিতে হইবে। আজ এটা, কাল ওটা করিয়া বেড়াইলে কিছুই হইবে না। যদি মনন পথে অগ্রসর হইতে চাও, তবে একটী ভাবেরই মনন কর, নানা সংশয় বিপত্তি বাধার মাঝে একটী ভাবেরই পরখ করিয়া যাও, সমস্ত বিকারের মাঝে একটী ভাবকে ধরিয়াই নির্ব্বিকার থাকিতে চেষ্টা কর। তোমার ভাবের সঙ্গে সংসার বৈচিত্র্যের সংঘর্ষ যতই কমিয়া আসিবে, ততই তোমার ভাব ব্যাপকতা লাভ করিবে এবং ততই তুমি চরম তত্ত্বের দিকে অগ্রসর হইতেছ বুঝিতে হইবে। উপনিষদও বলিতেছেন, বিষ্ণুর পরম পদ পায় কে ?—"বিজ্ঞানসারথি র্যস্ত"—যে নাকি বিজ্ঞানকে (= বিশিষ্ট জ্ঞান, এলোমেলো ভাব নয়) সারথি করিয়া রথ চালাইয়াছে।

বুদ্ধির সারথ্য ভাল করিয়া বুঝিতে হইলে আরও এক ধাপ নীচে নামিয়া আস। বুদ্ধির নীচে মন। বুদ্ধির সারথ্য ঠিক হইবে, যদি তুমি "মনঃপ্রগ্রহবান্" হইতে পার, অর্থাৎ মনের লাগামটী ধরিয়া থাকিতে পার। ইন্দ্রিয় বিষয়ে ছুটিয়া যায় বলিয়া তাহার অপবাদ আছে বটে, কিন্তু মন যদি ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে যুক্ত না হয়, তবে কি ভোগ হয় ? ইন্দ্রিয় তো অহরহঃ কত বিষয়ই গ্রহণ করিতেছে, কিন্তু তাহাদের মাঝে মন যাহার উপর অধিষ্ঠান করিতেছে, তাহারই মাত্র ভোগ হইতেছে। আবার এই মনটীও এমনি বেয়াড়া যে একদণ্ড স্থির হইয়া বসিবার পাত্র সে নয়। ইন্দ্রিয়ের আহরিত বিষয়েরও অভাব নাই—মনেরও ছুটাছুটীর অন্ত নাই। মনের চাঞ্চল্যই ইন্দ্রিয়ের উপর চাপাইয়া বলি, ইন্দ্রিয় চঞ্চল। আসলে মনঃস্থৈর্য্য না হইলে ইন্দ্রিয়-সংযম কিছুতেই হইবার নয়।—বুদ্ধির সারথ্য, মনঃস্থৈর্য্য, আর ইন্দ্রিয়-সংযম, তিনটী ওত-প্রোতভাবে গাঁথা।

ইন্দ্রিয়রূপ অশ্বকে কোন্ সারথি স্ববশে রাখিতে পারে ? উপনিষদ্ বলেন, যে না কি "সমনস্কঃ সদাশুচিঃ"—যার মন একটী সুরে বাঁধা এবং যে সর্ব্বদা শুচি। মন যদি বুদ্ধির সারথ্য মানিয়া নেয়, তবে তাহাকে এক সুরে বাঁধা চলে। সে কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। কিন্তু ইন্দ্রিয়কে বশে রাখিবার এখন এই এক নূতন সঙ্কেত পাইতেছি—সর্ব্বদা শুচি থাকা। মনুও বলিয়া গিয়াছেন, শিক্ষার জন্য ব্রহ্মচারীকে যখন আচার্য্যের কাছে উপনীত করা হইবে, তখন আচার্য্য তাহাকে "শিক্ষয়েৎ শৌচম্ আদিতঃ"—প্রথমেই শৌচ শিক্ষা দিবেন। এখন শৌচ কথার না হয় খুব স্থূল অর্থই গ্রহণ করিলাম—অর্থাৎ দেহের শৌচ হইতেই কাজ আরম্ভ করিলাম ; তাহাতেই আমাদের ধাতু প্রসন্ন হইবে এবং ধাতুর প্রস-

ম্রতা হইতে চিত্তশুদ্ধি জন্মিবে। ইহার পরের অবস্থাগুলি তো পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

এতক্ষণ কথা কহিয়াছি, উল্টা ধারা ধরিয়া। এবার সবটুকু গুছাইয়া বলি। এই দেহই রথ—ইহার মাঝেই জগন্নাথ আছেন। তাঁহাকে না দেখিতে পাইলেও যেন শ্রদ্ধাদ্বারা আস্তিক্যবুদ্ধি দ্বারা সর্ব্বদা তাঁহার ধারণা করিতে চেষ্টা করি। আমিই কর্ত্তা নই—আমার আত্মরূপে আমার পরম প্রিয়তম, আমার অভেদস্বরূপ যে জগন্নাথ, তিনিই দেহরথের রথী—এই ভাবনায় ভরপূর হইয়া থাকিতে হইবে। এই জীবনই জগন্নাথের রথযাত্রা। সে রথযাত্রার উপকরণ—আদিতে শৌচ, তারপর ইন্দ্রিয় সংযম, তারপর মনঃস্থৈর্য্য, ক্রমে ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি। আর কিছুর নাগাল না পাই, অন্ততঃ দেহটীকেও যেন শুচি রাখিতে পারি। আবার উপনিষদের ভাষায় বলি—"আমরা যেন কর্ণ দ্বারা ভদ্র কথাই শ্রবণ করি, চক্ষু দ্বারা ভদ্র বস্তুই দর্শন করি, প্রতি অঙ্গে এবং সমগ্র তনুতে অচঞ্চল থাকিয়া যেন প্রাণের দেবতার স্তুতি গাহিতে পারি"—তবেই আমাদের সাধনা আমাদিগকে সিদ্ধির পথে লইয়া যাইবে।

জ্ঞানেশ্বর

—*—

১২৭৩ খৃষ্টাব্দে রুক্মিণী একটি পুত্র সন্তান প্রসব করিলেন। বিট্‌ঠলপন্থ তাহার নাম রাখিলেন নিবৃত্তিদেব। দুই বৎসর পরে আর একটী পুত্র হইলে তাহার নাম দিলেন জ্ঞানেশ্বর—আমরা ইহারই জীবন কথা আলোচনা করিব। ইহার পর রুক্মিণী দেবীর আরও দুইটী সন্তান হয়—একটী পুত্র, তাহার নাম সোপানদেব ও একটী কন্যা তাহার নাম মুক্তাবাই। বিট্‌ঠলপন্থ যে ভাবে তাঁহার পুত্রকন্যার নামকরণ করিলেন, তাহা হইতেই এই দম্পতীর মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়।

বিট্‌ঠলপন্থের এই চারিটী পুত্রকন্যা হইতে কালে মহারাষ্ট্রের মুখ উজ্জ্বল হইয়াছিল। ইহাদিগের জন্যই ভগবান আবার তাঁহাকে সংসারে ফিরাইয়া আনিয়াছিলেন। কিন্তু সে কথা তখন কেহ ভাবিতে পারে নাই। সমাজের যে অবজ্ঞা অত্যাচার, দারিদ্র্যের যে কঠোর নিষ্পেষণ সহ্য করিয়া এই দুঃস্থ দম্পতীর দিন চলিতেছিল, তাহার মাঝে নয়নানন্দকর এই চারিটী সন্তান পাইয়া তাঁহারা হাসিবেন কি কাঁদিবেন, স্থির করিতে পারিলেন না। দরিদ্রের ঘরে কেন ভগবানের এই অযাচিত দান, ইহা ভাবিয়া এক একবার যেমন তাঁহাদের চিত্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিত, তেমনি আবার গুরুর কঠিন আদেশ স্মরণ করিয়া, এই বিধানের মাঝে হয়ত ভবিষ্যতের কোন মহামঙ্গল নিহিত আছে ভাবিয়া নিস্তব্ধ হইতেন।

সমাজচ্যুতের গৃহে এই চারিটী শিশুর

দিন একটু নূতনতর ভাবে যাইতে লাগিল। ভবিষ্যতে যে মহাকার্য্যের ভার ইহাদের উপর পড়িবে, তাহার যোগ্য করিয়া গড়িবার জন্যই যেন সমস্ত সংসার-সম্পর্ক হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া এমন নিবৃত্তিমার্গী মাতাপিতার ঘরে ভগবান ইহাদিগকে পাঠাইয়াছিলেন। ইহারা সমাজচ্যুত, ইহাদের ছায়া মাড়াইলেও পাপ—কাজেই গ্রামের কোনও ছেলে মেয়ে ইহাদিগের সহিত মিশিতে আসিত না। চারিটী ভাই বোন আপনা আপনি খেলা করিত; বৈরাগ্যের জীবন্ত বিগ্রহ পিতা ও স্নেহ-সহিষ্ণুতার প্রতিমূর্ত্তি মাতা ছাড়া আর কাহারও মুখ দেখিতে পাইত না—আর কাহারও কথা শুনিতে পাইত না। ছেলে-মেয়ে সুখে থাকুক, এ ইচ্ছা সকল মা-বাপেরই হয়। কিন্তু সংসার সুখ বলিতে যা বোঝে, সে তো বিধাতা বিট্‌ঠলপন্থের ভাগ্যে লিখেন নাই। তিনি জানেন, তাঁহার এই বৈরাগ্যের ঝুলি আর নিবৃত্তির কন্থা ছাড়া অন্য কোনও পিতৃধন তিনি সন্তানদিগের জন্য রাখিয়া যাইবেন না। তাই শিশুকাল হইতেই ইহারা যাহাতে নিবৃত্তি-সুখের অধিকারী হইতে পারে, সেইরূপ শিক্ষাই তিনি দিতেন। পুত্রকন্যার দৈহিক দুঃখকষ্টের কল্পনা করিয়া রুক্মিণী দেবীর মাতৃহৃদয় এক একবার উচ্ছসিত হইয়া উঠিত বটে, কিন্তু তাঁহার পরম বৈরাগী শিবতুল্য স্বামীর প্রশান্তি-প্রসন্ন মুখের দিকে চাহিয়া সে উচ্ছাস তিনি সম্বরণ করিয়া লইতেন—কেননা তিনিও তো স্বামীর উপযুক্ত সহধর্ম্মিণী।

দুঃখ কষ্টের ভিতর দিয়া আরও কয়েক বৎসর কাটিয়া গেল। ক্রমে নিবৃত্তিনাথ দশবৎসরে ও জ্ঞানেশ্বর আট বৎসরে পড়িলেন। এখন পর্য্যন্ত ইহাদের উপনয়ন সংস্কার হয় নাই—কিন্তু আর তো অপেক্ষা করা চলে না। বিট্‌ঠলপন্থ একটু বিব্রত হইয়া পড়িলেন। সমাজ তাঁহার বিরোধী—কিন্তু সমাজের অনুমতি ও অনুমোদন ছাড়া তো এই ব্যাপার হওয়ার সম্ভাবনা নাই। পুত্রদিগকে আর সমস্ত সম্পদ হইতে বঞ্চিত দেখিয়া তাঁহার দুঃখ হয় নাই—কিন্তু ব্রাহ্মণ-সন্তান হইয়া ব্রাহ্মণ্যসংস্কার হইতে বঞ্চিত থাকিবে—এই চিন্তাই তাঁহার আজন্মসঞ্চিত সংস্কারকে পীড়িত করিতে লাগিল। অবশ্য পুত্রকন্যাকে ধর্ম্ম-শিক্ষা দিতে তিনি ত্রুটী করেন নাই—বয়সে এত ছোট হইলেও ইহারই মাঝে সাধনজীবনেও তাহারা উন্নতি লাভ করিয়াছে। নিবৃত্তিনাথ যখন সাত বৎসরের বালক, তখনই তিনি নাসিকের নিকটবর্ত্তী ত্র্যম্বকেশ্বরের শ্রীমৎ জ্ঞাননাথের কৃপা লাভ করিয়া তাঁহার নিকট হইতে যোগ ও জ্ঞানের দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছেন। ছোটভাই জ্ঞানেশ্বরও সেই পাঁচ বৎসর বয়সেই দাদাকে আচার্য্যপদে বরণ করিয়া তাঁহার নিকট দীক্ষিত হইয়াছেন। যে জ্ঞান লাভের জন্য সংস্কারের প্রয়োজন, সেই জ্ঞানের সাধনায় যাঁহারা প্রতিষ্ঠিত, তাঁহাদিগের পক্ষে সংস্কার বাহুল্য বলিয়া মনে হইতে পারে—কিন্তু তথাপি বিট্‌ঠলপন্থের মন এ কথায় প্রবোধ মানিল না। যেমন করিয়াই হউক পুত্রদিগের উপনয়ন সংস্কার করাইতে তিনি কৃতসংকল্প হইলেন।

সমাজপতিদিগের অনুমতি পাইবার জন্য বিট্‌ঠলপন্থ বহু সাধ্যসাধনা করিলেন—কিন্তু কিছুতেই তাঁহাদের মন গলিল না। বিট্‌ঠলপন্থ ও তাঁহার স্ত্রী-পুত্র-কন্যা জাতিচ্যুত, সমাজবহির্ভূত, সুতরাং সমাজ তাহাদিগকে কোনও অধিকারই দিবে না। বিট্‌ঠলপন্থের

ও তাহার পুত্রগণের প্রকৃত অবস্থা আমরা জানি বলিয়া তাঁহাদিগের প্রতি সহানুভূতি-সম্পন্ন হইয়া সমাজের এই জেদকে আমরা অন্যায় বলিয়া মনে করিতে পারি, কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সমাজের মত একটা বৃহৎ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে ব্যক্তিগত অধিকারের প্রতি ঔদাসীন্য ও সামাজিক আদর্শকে বিশুদ্ধ রাখিবার জন্য অতিসতর্কতা নিতান্ত অযৌক্তিক ও অস্বাভাবিক নহে। সে যাহা হউক, বিট্‌ঠলপন্থের উপর কৃপাপরবশ হইয়া অবশেষে সমাজ এইটুকু ব্যবস্থা করিল যে, তিনি তাঁহার অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করিলে পর সমাজ তাঁহার পুত্রদিগের সম্বন্ধে বিবেচনা করিবে এবং সে প্রায়শ্চিত্ত আর কিছু নয়—মৃত্যু! আমরা বলিব—এ সমাজের করুণাই বটে!

কিন্তু বিট্‌ঠলপন্থ সমাজের এই নির্ম্মম বিধানই মাথা পাতিয়া লইলেন। এই পুত্রের জন্যই তাঁহাকে সন্ন্যাসব্রত ভঙ্গ করিয়া গৃহে ফিরিতে হইয়াছে—ইহাদের জন্যই সমাজের নির্য্যাতন সহ্য করিতে হইয়াছে—কিন্তু সমস্তের মাঝেই তিনি দেখিয়াছেন, শ্রীগুরুর অলঙ্ঘ্য আদেশ—কোন্ মহাকল্যাণ ইহার অন্তরালে প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে, তাহা নিশ্চিত না জানিলেও সন্তানদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তাঁহার আশা যে অপরিমিত!—প্রাণ দিলেও যদি সে আশা ফলবতী হয়, তাহাতে তিনি ত হইবেন কেন? শ্রীগুরুর ইচ্ছা জয়যুক্ত হোক্—এই সন্তান তাঁহারই দান—তাঁহার চরণাশ্রয়েই তিনি ইহাদিগকে রাখিয়া গেলেন—তাঁহার জীবনই যদি ইহাদের উন্নতির পরিপন্থী হইয়া থাকে, তবে গুরুর আদেশ মনে করিয়া তাহাও তিনি বিসর্জ্জন দিবেন।—রুক্মিণীদেবী তাঁহারই সহধর্ম্মিণী—স্বামীর যে গতি, তাঁহারও সেই গতি। একদিন গুরুর আদেশে এই দম্পতী বারাণসীর পুণ্যক্ষেত্র হইতে নিরুদ্দিষ্ট জীবনপথে যাত্রা করিয়াছিলেন, আজ আবার দুইজনে পরস্পরের হাত ধরিয়া গুরুর ইচ্ছায় নিরুদ্দিষ্ট মরণের পথে যাত্রা করিলেন, এবং অবশেষে ত্রিবেণীসঙ্গমে আত্মবিবর্জ্জন দিয়া ইহলোকের সকল কর্ত্তব্য সমাপন করিলেন।

আলন্দীর সমাজপতিরা কোন্ প্রমাণবলে যে বিট্‌ঠলপন্থের মৃত্যু-প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, তাহা জানা যায় না। কিন্তু পিতা-মাতার এই শোচনীয় পরিণামের কথা কন্যা মুক্তাবাই লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। এই কাহিনীর অধিকাংশই মুক্তাবাইর বর্ণন হইতে গৃহীত।

বিট্‌ঠলপন্থ তো চলিয়া গেলেন; কিন্তু যে জন্য তাঁহার এই অপূর্ব্ব ত্যাগ স্বীকার, তাহার ভার পুত্রকন্যাদের উপরেই রাখিয়া গেলেন। সমাজপতিরা পিতার মৃত্যুর ব্যবস্থা দিয়াছেন; কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহারা তো আর স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া পুত্রদের সম্বন্ধে কোনও ব্যবস্থা করিতে যাইবেন না। নিজের অধিকার ফিরিয়া পাইতে হইলে পুত্রদিগকেও আবার সমাজের নিকট নতজানু হইয়া ভিক্ষা মাগিতে হইবে।

নিবৃত্তিনাথ দশ বৎসরের বালক; পিতা-মাতার অবর্ত্তমানে তিনটী ভাইবোনের এখন তিনিই অভিভাবক। কোনও একটা ব্যবস্থা যদি করিতে হয়, তবে তাঁহাকেই অগ্রগামী হইয়া করিতে হইবে। কিন্তু এ তো দশ বছরের ছেলে নয়—এ যেন আগুনের ফুলকী! পিতার প্রতি সমাজের কঠোর দণ্ডাদেশ—তাহা তিনি নিঃশব্দে শুনিয়াছেন; পিতা ও মাতার গৃহত্যাগের করুণ দৃশ্য—তাহাও নিঃশব্দে দেখিয়াছেন। ইহার পর পুত্রের

মনে যে কি ভাব উদিত হইতে পারে, তাহা সহজেই অনুমেয়। অমন মহাদেবতুল্য পিতা—অমন ভগবতীতুল্য মাতা—তাঁহাদের আজন্ম তপস্যা, অতুল স্নেহের কি এই পরিণাম? কিন্তু সে কথাও তিনি ভুলিয়া থাকিতে পারেন, কেননা গুরুভক্ত ত্যাগীর ছেলে তিনি—মায়িক সম্বন্ধের জন্য বেদনা অনুভব করাকে তিনি পৌরুষ বলিয়া মনে করিতে পারেন না। কিন্তু তাঁহার মনে অন্যপ্রকার ভাব জাগিয়াছে। বালক হইলেও তিনি জ্ঞানবৃদ্ধ। তিন বৎসর পূর্ব্বে তিনি গুরুর নিকট দীক্ষাগ্রহণ করিয়াছেন। জন্মান্তরীয় সাধনসিদ্ধ বিশুদ্ধ আধারে, পিতামাতার সযত্ন অনুকূল শিক্ষায় গুরুর কৃপা তাঁহার মাঝে সম্যক্ স্ফুরিত হইয়াছে—ব্রহ্মবীর্য্য তাঁহার মাঝে সন্দীপিত হইয়া উঠিয়াছে, নিজকে সমস্ত সংস্কার, সংশয় ও বন্ধনের অতীত বলিয়া তিনি অনুভব করিয়াছেন—সামাজিক সংস্কারে তাঁহার কি প্রয়োজন?

জ্ঞানেশ্বর যখন দাদার কাছে উপনয়ন সংস্কারের কথা উত্থাপন করিলেন, তখন নিবৃত্তিনাথ গম্ভীরকণ্ঠে বলিলেন, "আমি নিত্য শুদ্ধ মুক্ত স্বভাব, আমার আবার সংস্কারের প্রয়োজন কি?" আচার্য্য যে কোন ভূমি হইতে কথা বলিতেছেন, জ্ঞানেশ্বর তাহা বুঝিলেন—কেননা তিনিও তো তাঁহারই পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া চলিয়াছেন। কিন্তু এই অষ্টমবর্ষীয় বালকের মনে ভগবান আর এক প্রেরণা জাগাইয়া দিয়াছেন। দাদার মত কেবল জ্ঞানের ঊর্দ্ধশিখরে উদাসীনভাবে বিচরণ করিতে তিনি পারেন না—অজ্ঞানের অন্ধকারে যাহারা আচ্ছন্ন রহিয়াছে, তাহাদের জন্যও যে তাঁহার প্রাণ কাঁদিয়া উঠে। পিতার নির্ম্মম বৈরাগ্য ও মাতার স্নেহ-ব্যাকুলতা, দুয়েরই অধিকার তিনি পাইয়াছেন, তাই জ্ঞানেশ্বর হইয়াও অজ্ঞ জনসাধারণের জন্য তাঁহার চিত্ত আকুল হইয়া উঠে যে! তিনি বুঝিতে পারেন, এই অবোধ অজ্ঞানদের মাঝেই ভগবান তাঁহাদের কর্ম্মক্ষেত্র নিরূপিত করিয়া দিয়াছেন, দেশকে জাগাইবার ভার তাঁহাদের উপর দিয়াছেন—আজ কি দেশের সঙ্গে প্রথম পরিচয়েই তাহার সহিত বিরোধ করিয়া বসিবেন?

জ্ঞানেশ্বর নিবৃত্তিনাথকে বলিলেন, "তুমি যাহা বলিলে, তাহা তোমারই যোগ্য কথা। কিন্তু একবার দেশের দিকে চাহিয়া দেখ, আর দেশের প্রতি আমাদের কি কর্ত্তব্য, তাহাও স্মরণ কর। আজ সমাজের অবস্থা সেনানী-হীন সেনার মত—দিন দিন সমাজ ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। সম্মুখে তার না জানি কি নিদারুণ পরীক্ষা। আমরাও এ সময়ে তাহার বিদ্রোহী হইব? পিতামাতার শিক্ষা, তাঁহাদের অপূর্ব্ব আত্মত্যাগ কি মিথ্যা হইবে?"

নিবৃত্তিনাথ ভ্রাতার যুক্তির সারবত্তা বুঝিতে পারিলেন। সকলে গিয়া সমাজপতিদিগের নিকট সামাজিক অধিকার পাইবার প্রার্থনা জানাইলেন। কিন্তু সমাজপতিরা অটল; তাঁহারা উত্তর করিলেন, "আমরা শাস্ত্র লঙ্ঘন করিতে পারি না। তোমাদিগকে ব্রাহ্মণের অধিকার দেওয়া অসম্ভব।" তারপর অনেক কথা-কাটাকাটীর পর শাস্ত্রীরা বলিলেন, "তোমরা যদি পৈঠানের পণ্ডিতদের পাঁতি সংগ্রহ করিতে পার, তবে তোমাদের সম্বন্ধে বিবেচনা করিতে পারি।" তাহাই স্বীকার করিয়া ভাই-বোনদের লইয়া জ্ঞানেশ্বর পৈঠান যাত্রা করিলেন।

পৈঠান গোদাবরীর তীরে তখনকার এক প্রধান বিদ্যাকেন্দ্র ছিল। জ্ঞানেশ্বর পৈঠানে উপস্থিত হইয়া সেখানকার শাস্ত্রীদের নিকট তাঁহাদের আবেদন জানাইলেন। মনে রাখিতে হইবে, এই প্রসঙ্গে যাহা কিছু কথাবার্ত্তা, কাজকর্ম্ম, জ্ঞানেশ্বরকেই তাহা করিতে হইয়াছে। নিবৃত্তিনাথ সঙ্গে থাকিলেও উদাসীনভাবে দেখিয়া গিয়াছেন মাত্র, আর তাঁহার অনুমতিক্রমে জ্ঞানেশ্বর কাজ করিয়া গিয়াছেন। দুইটী ভাইয়ের মাঝে আজীবন এই ভাব বর্ত্তমান ছিল—একজন গুরুরূপে কর্ম্মে উদাসীন থাকিয়া প্রেরণা দিয়াছেন, অপরে শিষ্যরূপে সেই প্রেরণার অনুবর্ত্তী হইয়া কাজ করিয়া গিয়াছেন।

জ্ঞানেশ্বর সকল কথা খুলিয়া বলিলে, পৈঠানের শাস্ত্রীরাও প্রথমতঃ তাঁহাদিগকে সমাজে লইতে অস্বীকার করিলেন। জ্ঞানেশ্বর দেখিলেন, শুধু বাদ বিতণ্ডায় সময় বহিয়া যাইতেছে,—কেবল কথায় কিছু হইবে না, একটু অলৌকিক শক্তির পরিচয়ও দিতে হইবে। কথিত আছে, শাস্ত্রীদের মনে প্রতীতি জন্মাইবার জন্য জ্ঞানেশ্বর একটা মহিষকে দিয়া ঋগ্বেদের সূক্ত উচ্চারণ করাইয়াছিলেন। এই ঘটনার পর পণ্ডিতেরা ইঁহাদিগকে বেদাধিকার দিতে আর আপত্তি করিলেন না। তাঁহাদের উপনয়ন সংস্কার নির্ব্বিঘ্নে সম্পূর্ণ হইয়া গেল—চারিটী ভাইবোনের কর্ম্মজীবনেরও সূত্রপাত হইল।

বিস্মৃত

ওরে ও—ও বিবাগী,
মরণ পথের পথিক যে তুই—তবে কাহার লাগি
আজকে অমন উদাস প্রাণে ফিরে ফিরে চাওয়া?
বন্ধ হল বাওয়া—
অচিন্ কূলের রসিক নাবিক—তোর সে তরীখান?
বিদ্যুতেরি ঝিলিক সাথে বজ্রসুরে বাঁধা যে তোর প্রাণ—
কণ্ঠে যে তোর ফুটত নিতি সৃষ্টি-মথন প্রলয়বহন গান—
তারে কি আজ রইলি রে তুই ভুলে?
অথৈ সায়র নৃত্য করে নিত্য যে তোর হৃদয়-উপকূলে—
ব্যর্থ হবে আজকে বুঝি তাহার আবাহন?
ব্যর্থ হবে প্রলয়-বিষাণ-চমকে-ওঠা মরণ-জাগরণ?
হায়রে হায়—পথিক-প্রাণের আয়েস-লোভী,
অমনি করে বিকিয়ে দিলি সবি'—
কূলের নেশায় রইলি ভুলে অসীম পারের ডাক—
রিক্তবসন মরণরে তোর করল আড়াল জীবন-পথের জাঁক!

কর্ম্মী

যতক্ষণ ভাবের ঘোরে কেবল কল্পনা জল্পনাই করি, ততক্ষণ সময় কাটে বেশ। কিন্তু কাজে নামলেই দেখি, একটা না একটা দুর্য্যোগ লেগেই থাকে। তখন শেষ ফলটা কি দাঁড়াবে, তাই ভেবে আমরা ব্যস্ত হয়ে পড়ি। গলদ আমাদের এইখানেই।

প্রতিকূলের সঙ্গে যুঝে যুঝে ক্লান্ত হয়ে আমরা এইটুকু বুঝতে পারি যে, একটা কিছু গড়ে তুলব বলে কোনও রকম কামনা রাখাই বিপদের। এতদিন হয়ত—এইটে হবে আর এইটে হবে না—এই বলেই সবার সঙ্গে ধস্তাধস্তি করে এসেছি। কিন্তু তাতে কি নিজের আর পরের অস্বস্তি জমানো ছাড়া বিশেষ কিছু লাভ হয়েছে?—কিছুই না। তাই ঠকে ঠকে শেষকালে শিখি—সব সয়ে যাওয়াই ভাল। কেননা যা আমাদের দৃষ্টির আড়ালে, তার উপর কোনও দিক থেকেই জোর খাটে না। নিজের প্রত্যক্ষ দেখাটার উপরই যখন খাটে না, তখন পরের উপর আন্দাজে ঢিল ছুঁড়লে তাকে আর কি করে ন্যায়সঙ্গত বলতে পারি?

মোট কথা, নিরুদ্বেগ হতে হবে। আমাদের হাতে কিছু এসে পড়েছে বলেই ব্যস্ত হলে চলবে না। মালমসলা এসেছে বটে, কিন্তু শিল্পপ্রতিভা জেগেছে কিনা, তা তপস্যা ভিন্ন কি করে বলব? তাই কায়মনোবাক্যে আগে তপস্যা করে যেতে হবে, নিজের ভিতরেই শিল্পপ্রতিভা জাগাবার জন্য।

যদি রীতিমত আধ্যাত্মিক শক্তি পরিচালনার ক্ষমতা না থাকে, (এ শুধু ভাবুকতা নয় বা শুভাকাঙ্ক্ষা-পরায়ণতা নয়) তবে শিল্পীর আসন নেওয়া চলে না। আমরা গৃহের কর্ত্তা হতে পারি, বিদ্যামন্দিরের আচার্য্য হতে পারি, দেশের নেতাও হতে পারি—কিন্তু অদৃষ্টের উপরও কলম চালাবার ঔদ্ধত্য রাখতে পারি কি?

শিক্ষা দেওয়াও তো নিজকে শিক্ষা দেবার জন্যই। আমরা গড়ে তুলবার কেউ নই। একটা প্রতিষ্ঠানকে লক্ষ্য করে, নিজেদের চরিত্রকে উন্নত করবার—নিজেদের পক্ষে যে সমস্ত বাধা পরকে পীড়িত করতে পারে, তা থেকে বিমুক্ত থাকবার যে একটা উপায় হয়েছে, এতেই নিজকে ভাগ্যবান্ বলে মনে করা উচিত। মহৎ কাজমাত্রেই বিনয় থাকা উচিত। কাদার তাল নরম না হলে তা দিয়ে কিছু গড়া চলে না।

ঔৎসুক্য কিছু মাত্র নাই, অথচ ঔদাসীন্যও নাই—সাধনার জ্বলন্ত উৎসাহে প্রাণ পরিপূর্ণ—এই হচ্ছে অপরের প্রাণ প্রদীপ জ্বালিয়ে তুলবার যথার্থ যোগ্যতা। কেবল নিজের দিকে লক্ষ্য রেখে নিজকে অপরের কাছে সুসহ করা, ধীর চিত্তে প্রত্যেকটী অনুগত চিত্তের বৈচিত্র্য লক্ষ্য করে তার উপযুক্ত নির্দ্দেশ আবিষ্কার করা; শিল্পশক্তি না জন্মাতেই শিল্পীর স্পর্দ্ধা প্রকাশ না করা—এইগুলি হচ্ছে প্রাথমিক শিক্ষার অঙ্গ।

তা ছাড়া বেশী আকাঙ্ক্ষা করতে নাই। ঠিক যতটুকু সাধ্য, ততটুকু সুষ্ঠুরূপে করতে পারলেই যথেষ্ট। ভগবান্ তো আর সবার জন্যই সব কিছুর যোগ্যতা মেপে রাখেন নি—এই কথা স্মরণ রেখে নিজের অস্বস্তিকেও পরাভূত রাখতে হবে।

শিক্ষিত সমাজ

গণ-তান্ত্রিকদের স্বপ্ন সফল হইলে সুদূর ভবিষ্যতে কি হইবে তাহা বলিতে পারি না, কিন্তু এখন পর্য্যন্ত প্রায় সকল দেশেই মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়কেই সামাজিক উন্নতির মাপকাঠি ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। বর্ত্তমান যুগে আমাদের দেশের সামাজিক বিবর্ত্তনের ইতিহাস এই মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়কে ধরিয়া বুঝিতে হইবে। শিক্ষা-হিসাবে এই সম্প্রদায়কে দুই ভাগে ভাগ করিতে পারি। এক ভাগ শিক্ষিত অর্থাৎ পাশ্চাত্য শিক্ষায় দীক্ষিত, কেননা শিক্ষা বলিতে আজকাল আমরা প্রায়শঃ পাশ্চাত্য শিক্ষাই বুঝিয়া থাকি; আর এক ভাগকে অশিক্ষিত না বলিয়া শিক্ষিতেতর সম্প্রদায় বলিব, কেননা এই সম্প্রদায়ের মাঝে যাহারা প্রাচ্য শিক্ষায় অনুপ্রাণিত, তাহাদিগেরও স্থান আছে এবং সে শিক্ষাকে অশিক্ষা বলিতে আমরা কুণ্ঠা বোধ করি।

এখন সর্ব্বাগ্রে আমরা শিক্ষিত সম্প্রদায়ের ইতিহাসই পর্য্যালোচনা করিব। এই সম্প্রদায়ের শিক্ষার মূল উৎস হইল পাশ্চাত্য ভূমি। পাশ্চাত্য সভ্যতাকে আমরা প্রাচ্যবাসীরা ইহসর্ব্বস্ব বলি এবং ইহার মাঝে আমাদের আধ্যাত্মিকতার বড়াই ও প্রতীচ্য সভ্যতার নিষ্ফল নিন্দা প্রচ্ছন্ন আছে ভাবিয়া কেহ কেহ উষ্ণ হইয়া উঠেন। কিন্তু আমরা ভালমন্দের তুলনা করিবার জন্য কথাটা ব্যবহার করিতেছি না; আমরা যাহা দেখিতেছি, তাহাই বলিতেছি। প্রতীচ্যশাস্ত্র ঘাঁটিলে তাহার মাঝে আমরা জড়তত্ত্ব, প্রাণিতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব, রাজনীতি ইত্যাদি সম্বন্ধে যত গবেষণা পাইব, তাহার শতাংশের একাংশও প্রাচ্য-শাস্ত্রের মাঝে পাইব না; পক্ষান্তরে যোগ, জ্ঞান, ভক্তি, আত্মা, পরমাত্মা, পরলোকের কথা যেমন এ দেশী শাস্ত্রের পাতায় পতায় পাইব, তেমনটী প্রতীচ্যশাস্ত্রে পাইব না। কাজেই বলিব, প্রতীচ্য সভ্যতা ইহসর্ব্বস্ব এবং প্রাচ্য সভ্যতা পরত্র-সর্ব্বস্ব। এ শুধু তথ্যকথন মাত্র, ইহার মাঝে গালাগালির কিছুই নাই।

এই ইহসর্ব্বস্ব সভ্যতার ঢেউ যখন আমাদের দেশে আসিয়া পৌঁছিল, তখন এ দেশের অবস্থা কেমন ছিল? সাহেবেরা ধুয়া ধরিয়াছিলেন, এ দেশ অজ্ঞানান্ধকারে ডুবিয়া ছিল এবং তাঁহাদের প্রাচ্য ভক্তেরা এখন পর্য্যন্ত তাহারই প্রতিধ্বনি করিয়া আসিয়াছেন। কিন্তু চারিদিক দেখিয়া শুনিয়া আজকাল আর এ কথায় সায় দেওয়া চলে না। আমাদের মনে হয়, হিন্দু সমাজের মর্ম্মগত সত্য পূর্ব্বেও যাহা ছিল, এখনও তাহাই আছে, কেবল মাঝখানে রাষ্ট্রবিপ্লবের দরুণ একটা আত্মবিস্মৃতির যুগ আসিয়াছে মাত্র। রাজার প্রতি হিন্দুর শ্রদ্ধা অসীম। যে যাহাকে শ্রদ্ধা করে, সে তাহার অনুকরণ করে। হিন্দু মুসলমান রাজারও কম অনুকরণ করে নাই। কিন্তু মুসলমান মূলে প্রাচ্য এবং জ্ঞানগৌরবে হিন্দুর চেয়ে খাট ছিল বলিয়া তাহার সভ্যতা হিন্দুকে ততটা বিচলিত করিতে পারে নাই। তা ছাড়া মুসলমান দেশ জয় করিয়া এ দেশেই ঘরবাড়ী করিল; তার ঐহিক সম্পদের পুঁজিও হিন্দুর চেয়ে বেশী

নয়, কাজেই হিন্দুর আদর্শকে ক্ষুণ্ণ করিবার ক্ষমতা তাহার হইয়া উঠিল না—বরং হিন্দুই আধ্যাত্মিকতার গর্ব্বে নিজের ঘরের বেড়াটা আরও একটু শক্ত করিয়া লইল।

কিন্তু ইংরেজ আসিল ঐহিক-সম্পদের জাঁক লইয়া। একে রাজা, তাহাতে তাহার মাঝে নূতন শক্তির বিলাস, কাজেই হিন্দুর ভুলিতে বেশী দিন লাগিল না। প্রথম আঘাতটাই আসিল শিক্ষা আর সমাজের উপর। রাজা বলিলেন, তোমাদের সমাজটা আমাদের মত নয়, অতএব ওটা খারাপ; অমনি গুণমুগ্ধ প্রজাবর্গ অপকটে তাহা বিশ্বাস করিয়া বসিল, সমাজের গণ্ডী ভাঙ্গিয়া তাহার সংস্কারসাধনে প্রবৃত্ত হইল। শিক্ষার ফলে গণ্ডী ভাঙ্গার কাজটা আরও সহজ হইল। বর্ণবিচার ছিল এদেশের সমাজগঠনের মূল ভিত্তি, সুতরাং শিক্ষার মাঝেও বর্ণভেদানুসারে ব্যবস্থা ছিল। গণতন্ত্রী ইংরাজ আসিয়া ভেদনীতি উঠাইয়া দিয়া শিক্ষার ক্ষেত্রে সাম্যমন্ত্রের প্রচার করিল—আবার সে শিক্ষাও এদেশের শিক্ষা নয়, তাহার আপন দেশের শিক্ষা। প্রাচ্য শিক্ষার প্রতি প্রকাশ্য ভাবে যুদ্ধ ঘোষণা করা হইল না বটে, কিন্তু রাজার কাছে মান পাইয়া প্রতীচ্য শিক্ষারই জয়-জয়কার হইল—প্রাচ্য শিক্ষা দিন দিন কোণঠেসা হইয়া পড়িল। বিশেষতঃ, প্রাচ্য শিক্ষায় এখনও সেই প্রাচীন বর্ণভেদ প্রথা বিদ্যমান, অথচ প্রতীচ্য শিক্ষায় সকলেরই তুল্য অধিকার, জীবিকোপার্জ্জনের সঙ্গেও তাহার সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ; সুতরাং এই প্রতীচ্য শিক্ষার ছিদ্র দিয়া সমাজের বাঁধ ভাঙ্গিয়া সব একাকার হইয়া গেল, গুরু-লঘুভেদ লোপ পাইল। আজ আমরা সেই একার্ণবেই নিমগ্ন হইয়া ভাসিয়া বেড়াইতেছি।

বস্তুতঃ শিক্ষারূপ ব্রহ্মাস্ত্রেই আমাদের সমাজ ভাঙ্গিয়াছে। নূতন শিক্ষার চটক হইতে যে সমাজ আত্মরক্ষা করিতে পারিল না—এইখানেই তাহার দুর্ব্বলতা। মুসলমান সভ্যতার কাছে হিন্দু গণ্ডীর বেড়া শক্ত করিয়া দিয়া প্রাণ বাঁচাইল, কিন্তু প্রতীচ্য সভ্যতার কাছে সে কৌশল পরাভূত হইয়া গেল। দেশে যাঁহারা ইংরেজী শিক্ষার প্রচার ও প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তাঁহারা সংখ্যায় মুষ্টিমেয়—তাঁহাদের তুল্য গুণশালী ব্যক্তির অভাব তো সমাজে ছিল না। কিন্তু সমাজ ইংরেজী শিক্ষার প্রবর্ত্তকাদগকে নিজের গণ্ডী হইতে বাহির করিয়া দিয়াই নিশ্চিন্ত রহিল, প্রতীচ্য শিক্ষাবিস্তারের প্রতিকূলে প্রাচ্য শিক্ষা বিস্তারের জন্য কোনও উদ্যমই করিল না। এই নিশ্চেষ্টতার ফলেই সর্ব্বনাশ হইল। আজ গালাগালি করিয়া, খেদ করিয়াও সমাজ কাহাকেও ফিরাইতে পারিতেছে না—নিরুপায় হইয়া তাহাকে নিজের অপরিণামদর্শিতার ফল ভোগ করিতে হইতেছে। সংঘবদ্ধ হইয়া কালানুযায়ী ব্যবস্থা করিবার ক্ষমতা সমাজ হারাইয়াছে—ইহাই তাহার দুর্ব্বলতা—পাপ; নতুবা প্রাচ্য সমাজের শিক্ষা-দীক্ষাকে হীন বলিতে পারি না।

এই শিক্ষায় শুধু সমাজের শৃঙ্খলাই নষ্ট করে নাই, ইহা আমাদের ধর্ম্মকেও পীড়িত করিয়াছে। প্রতীচ্য শিক্ষা-সভ্যতার বিরুদ্ধে এই অভিযোগই সব চেয়ে নিদারুণ। প্রাচ্য সমাজ যদি উদার-নৈতিক শিক্ষার ব্যবস্থা করিত, তবে তাহাকেও সমাজ সংগঠনের কিছু অদল বদল করিতে হইত—যে সাম্যের লোভ দেখাইয়া পাশ্চাত্য সভ্যতা আমাদিগকে ঘরের বাহির করিয়াছিল, আমাদের অবস্থা ও

যোগ্যতা বিবেচনা করিয়া প্রাচ্য সমাজকেও কিয়ৎ পরিমাণে সেই সাম্যনীতির আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইত। সুতরাং সমাজ ভাঙ্গাটাই আমরা তত বড় দুর্দ্দৈব মনে করি না। কিন্তু এই সমাজ যদি আমাদের ধর্ম্ম অনুযায়ী আমরাই ভাঙ্গিয়া আমরাই নূতন করিয়া গড়িয়া তুলিতাম, তবে সব দিক বজায় থাকিত —কিন্তু আমাদের যে সমাজও গেল, ধর্ম্মও গেল, এই হইল সব চেয়ে বড় বিপদ। ধর্ম্ম থাকিলে তাহার জোরেই আবার আমরা ভাঙ্গা সমাজকে জোড়া দিতে পারিতাম, কিন্তু আজ ধর্ম্মের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের শক্তিও গিয়াছে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, পাশ্চাত্য সভ্যতা ইহ-সর্ব্বস্ব। এই দিকে আমাদের কিছু কমতি ছিল সুতরাং ইহার লোভ আমরা সামলাইতে পারি নাই। অবশ্য "এদিক-ওদিক দুদিক রেখে" দুধের বাটীতে যে চুমুক দিতে পারে, সে বাহাদুর বটে; সুতরাং পারত্রিক শিক্ষার সঙ্গে ঐহিক শিক্ষা হইতেও আমাদের কোনও আপত্তি নাই। কিন্তু আমাদের বেলায় তো তাহা হইল না। রাজা বলিলেন, ধর্ম্মের ভার তোমরা লও, শিক্ষার ভার আমি লই লাম! কিন্তু শিক্ষার সময়টাতেই যদি ধর্ম্মের নাম না লইলাম, তবে ধর্ম্ম শিখাইব কখন? শিক্ষাব্যপদেশে অতি তরুণ বয়সেই শিক্ষার্থীকে বিদেশে বিজাতীয় সংস্কারের মাঝে থাকিতে হয়; তখনই তাহার চিত্তে সংস্কার গড়িয়া উঠিবার সময়। এই সময়েই যদি ধর্ম্ম শিখাই-বার ব্যবস্থা না থাকিল, তবে কি আর বুড়া শালিকে রাধা-কৃষ্ণ নাম শিখিবে?

ফলে শিক্ষিত সমাজের ধর্ম্ম-বোধ দিন দিন ক্ষুণ্ণ হইতে লাগিল। পাশ্চাত্য দেশে কি ধর্ম্ম নাই?—ধর্ম্ম আছে বটে, কিন্তু তাহা পূর্ণাঙ্গ নয়; বিশেষতঃ পাশ্চাত্য দেশ ধর্ম্ম সম্বন্ধে ব্যবসায়ী নয় (কথাটা সংস্কৃত অর্থেই ব্যবহার করিতেছি)। আমাদের দেশে ধর্ম্মের রূপ ও প্রভাব অন্য একরকম। পাশ্চাত্য সভ্যতা যেমন জড় জগতের শক্তি সমূহ আবিষ্কার করিয়া শক্তিশালী হইয়াছে, আমরাও তেমনি অধ্যাত্ম জগতের শক্তি-সমূহ আয়ত্ত করিয়া শক্তিশালী। কিন্তু পাশ্চাত্য দেশ অধ্যাত্মশক্তির প্রতি আস্থাহীন —সে বিষয়ে তাহাদের চর্চ্চাও নাই। এই সেদিন মাত্র তাহাদের মাঝে পরলোকের চর্চ্চা আরম্ভ হইয়াছে। পাশ্চাত্য দর্শনে খুব বড় বড় কথা আছে বটে, কিন্তু তার কোনও কথাই ফলিত নয়—আমাদের দেশের দর্শনের মত প্রত্যক্ষসিদ্ধ নয়—দার্শনিক তত্ত্বগুলি প্রত্যক্ষ করিবার সাধনশাস্ত্রও তাহাদের নাই। এই জন্য পাশ্চাত্যদেশ একেশ্বরবাদী হইলেও বলিব, তাহারা এক ঈশ্বর বলে বলিয়াই একে-শ্বরবাদী—কিন্তু তাহারা একেশ্বরদর্শী নয়।

পাশ্চাত্য শিক্ষার সঙ্গে আমাদের সমাজে এই বাদটা খুব প্রসার লাভ করিয়াছে, কিন্তু দর্শন করিবার যোগ্যতা ও চেষ্টা দিন দিন লোপ পাইতেছে। পাশ্চাত্য-সভ্যতায় যাহারা দীক্ষিত, তাহারাও একরকম ঈশ্বর মানে বটে, কিন্তু সে মানার সঙ্গে হাতে-কলমে কিছু করে না। এই মানাটাও মুখের মানা, কেননা ঐহিক সুখ যেখানে চরম লক্ষ্য, সেখানে ঈশ্বরকে না মানিয়া শুধু নীতি মানিয়া গেলেও চলিতে পারে। এই জন্য শিক্ষিত সমাজের মুখে দ্বৈত, অদ্বৈত, সাংখ্য-পাতঞ্জলের যত বড় কথাই শোনা যায় না কেন, সমস্তই শুধু "বাদ" মাত্র—"দর্শন" নয় —কেননা বাদ ক্রিয়াম্বয়ী না হইলে তাহা দর্শনপদবাচ্য হইতে পারে না। কিন্তু শিক্ষিত

সমাজ আজ ক্রিয়াহীন, গুরুত্যাগী। এই জন্যই বলি, ক্রিয়ার অভাবে আজ সমাজ হইতে ধর্ম্মের শক্তিটুকু লোপ পাইয়াছে, শুধু খোসাটুকু পড়িয়া আছে এবং বিজাতীয় শিক্ষাব্যবস্থাই এর জন্য দায়ী। আজকাল কাগজ খুলিলেই দেখিতে পাই, ধর্ম্মের উপর শিক্ষিত সমাজের ঐতিহাসিক গবেষণা পুরা দমে চলিতেছে এবং তাহাতে দেশের বৈজ্ঞানিক জ্ঞানও বৃদ্ধি পাইতেছে! এখন অদ্বৈতবাদ বেদে ছিল না বাইবেলে ছিল, না কোরাণ হইতেই আসিল, তাহারই মামলা চলে এবং এ বিষয়ে যিনি যত গলাবাজী করিতে পারেন, তিনিই তত জ্ঞানী।

শিক্ষার গুণে সমাজ যখন ধর্ম্মের অনুষ্ঠান ছাড়িয়া দিয়া কেবল বাদের দিকেই ঝুঁকিয়া পড়িল, তখন ব্রাহ্মসমাজের প্রমুখাৎ খৃষ্টীয় ভাব আর উপনিষদের একটা খিঁচুড়ী শিক্ষিত সমাজের মধ্যে আমদানী হইল। বুভুক্ষু সমাজ পরম আগ্রহে তাহাই গলাধঃকরণ করিল। আজ পর্য্যন্ত সমাজে তাহারই উদ্গার উঠিতেছে। শিক্ষিত সমাজ গুরু ছাড়িয়াছে, পুরোহিত ছাড়িয়াছে, কৌলিক দেবতা, কৌলিক অনুষ্ঠান সব ছাড়িয়াছে—অথচ তাহারা যে নাস্তিক, এমন কথা বলিতে পারিবে না। বলিতে গেলেই উপনিষদ্ হইতে আরম্ভ করিয়া বাইবেল কোরাণ হইতে অজস্র "কোটেশানে" তোমাকে অভিভূত হইতে হইবে। আবার কোটেশানগুলিও বিশেষভাবে কাটাছাঁটা—তার মাঝে কেবল বিশুদ্ধ তত্ত্বই দেখিবে, ক্রিয়ার কোনও সন্ধান পাইবে না, কুসংস্কারাচ্ছন্ন তত্ত্বেরও সমাবেশ দেখিতে পাইবে না।

এই তো শিক্ষিত সমাজের শিক্ষা ও ধর্ম্ম বোধ। এখন এই সমস্যার সমাধান কি? এই ভাবের শিক্ষা আর সভ্যতাই কি সমাজে বিস্তার লাভ করিতে থাকিবে?

যোগসূত্রবৃত্তি

—*—

বিভূতিপাদ

সূর্য্যে সংযম করিলে ভুবনজ্ঞান হয়। কাহারও মতে লোক ও ভুবন পৃথক্। ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ, মহঃ, জন, তপঃ, সত্য—এই সাতটী লোক এবং তাহাতে সন্নিবেশিত পুরীসমূহই ভুবন। পূর্ব্বসূত্রে সাত্ত্বিক প্রকাশকে আলম্বন স্বরূপে গ্রহণ করিয়া সূক্ষ্ম, ব্যবহিত ও বিপ্রকৃষ্ট বস্তুর জ্ঞানের কথা বলা হইয়াছিল। এখানেও তাহাই বটে, কিন্তু সূর্য্যরূপ ভৌতিক প্রকাশকে এখনে আলম্বন বলা হইতেছে।

ভাষ্যকার ভুবন শব্দটীকে পৃথক অর্থে গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার মতে সপ্ত লোক লইয়াই ভুবন। ভাষ্যে ভুবনের সবিস্তার বর্ণনা আছে। কৌতূহলী পাঠকের জন্য নিম্নে তাহা লিপিবদ্ধ হইল।

"সাতটী লোক ভুবনের প্রস্তার বা থাক্। অবীচি হইতে মেরুপৃষ্ঠ পর্য্যন্ত ভূর্লোক। মেরুপৃষ্ঠ হইতে ধ্রুব পর্য্যন্ত তাঁরা-নক্ষত্র বিভূষিত অন্তরীক্ষ লোক। তারপর পাঁচটী স্বর্লোক। তন্মধ্যে প্রথমতঃ মাহেন্দ্রলোক (আমাদের পরিচিত স্বর্গ), তৎপর প্রাজাপত্য মহর্লোক এবং পরিশেষে তিনটী ব্রাহ্মলোক্। তাহাদের নাম, যথাক্রমে জনলোক, তপোলোক ও সত্যলোক।

"আবার অবীচির উপর্য্যুপরি ছয়টী মহানরকভূমি রহিয়াছে, তাহারা পৃথিবী, সলিল অনল, অনিল, আকাশ ও তমে প্রতিষ্ঠিত; তাহাদের নাম মহাকাল, অম্বরীষ, রৌরব, মহারৌরব, কালসূত্র ও অন্ধতামিস্র। স্বীয় কর্ম্মফলে যাহারা দুঃখভোগ অর্জ্জন করিয়াছে, সেই সমস্ত প্রাণী কষ্টকর দীর্ঘ আয়ু লইয়া এখানে জন্ম গ্রহণ করে। তারপর মহাতল, রসাতল, অতল, সুতল, বিতল, তলাতল ও পাতাল নামে সাতটী পাতাল। এই সপ্তদ্বীপা বসুমতী পৃথিবী অষ্টম ভূমি। তাহার মধ্যে সুমেরু নামক সুবর্ণগিরি। তাহার শৃঙ্গসকল রজত, বৈদূর্য্য, স্ফটিক, সুবর্ণ ও মণিময়। সেই বৈদূর্য্যময় শৃঙ্গের প্রভায় অনুরঞ্জিত বলিয়া নভোমণ্ডলের দক্ষিণভাগ নীলোৎপলদলের ন্যায় শ্যামবর্ণ। নভোমণ্ডলের পূর্ব্বভাগ শ্বেত, পশ্চিমভাগ স্ফটিকবৎ স্বচ্ছ ও উত্তরভাগ কুরণ্টক পুষ্পের মত স্বর্ণবর্ণ। ইহার দক্ষিণপার্শ্বে জম্বু আছে, তাহা হইতেই জম্বুদ্বীপ নাম। সূর্য্যের গতিহেতু তাহাতে রাত্রি ও দিন পর্য্যায়ক্রমে সংলগ্ন বলিয়া প্রতীয়মান হয়। সুমেরুর উত্তরদিকে দ্বিসহস্র যোজন বিস্তীর্ণ নীল ও শ্বেত শৃঙ্গ বিশিষ্ট তিনটী পর্ব্বত আছে। এই পর্ব্বত সমূহের মাঝে মাঝে নয় সহস্র যোজন বিস্তীর্ণ তিনটী বর্ষ রহিয়াছে—তাহাদের নাম রমণক, হিরণ্ময় ও উত্তরকুরু। দক্ষিণে নিষধ, হেমকূট, হিমশৈল নামে দ্বিসহস্র যোজন বিস্তীর্ণ তিনটি পর্ব্বত। তাহাদের মধ্যে নয় সহস্র যোজন বিস্তীর্ণ হরি, কিম্পুরুষ ও ভারত এই তিনটী বর্ষ। সুমেরুর পূর্ব্বদিকে মাল্যবান পর্য্যন্ত ভদ্রাশ্ব পর্ব্বত এবং পশ্চিমে গন্ধমাদন পর্য্যন্ত কেতুমাল। ইহাদের মধ্যে ইলাবৃত বর্ষ। সমস্ত জম্বুদ্বীপের পরিমাণ লক্ষ যোজন, এবং সুমেরুর চারিদিকে পঞ্চাশৎ সহস্র যোজন করিয়া ভূমির বিস্তার।

"এই লক্ষ যোজন বিস্তার জম্বুদ্বীপ তাহার দ্বিগুণপরিমাণ লবণসমুদ্রে বলয়াকারে বেষ্টিত। ইহার দ্বিগুণ দ্বিগুণ পরিমাণবিশিষ্ট শাক, কুশ, ক্রৌঞ্চ, শাল্মল, প্লক্ষ ও পুষ্কর দ্বীপ জম্বুদ্বীপের পর পর সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে। প্রত্যেক দ্বীপই দ্বিগুণ পরিমিত সমুদ্রদ্বারা বেষ্টিত। সেই সমস্ত সমুদ্রের জল যথাক্রমে ইক্ষুরস, সুরা, ঘৃত, দধি, মণ্ড ও ক্ষীরের মত সুস্বাদু। ইহারা বিচিত্র শৈলমালাদ্বারা ভূষিত এবং সর্ষপরাশির ন্যায় নিতান্ত উচ্চিতও নহে, নিতান্ত ভূমিসমও নহে। পঞ্চাশৎ কোটী যোজন বিস্তীর্ণ বলয়াকৃতি লোকালোক পর্ব্বতদ্বারা সপ্তসমুদ্র পরিবেষ্টিত। লোকালোকবেষ্টিত এই বিশাল ভূমণ্ডল তাহার সুনিরূপিত অবয়ব-সংস্থান লইয়া ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে নিহিত রহিয়াছে। ব্রহ্মাণ্ড আবার প্রকৃতির অণুপরিমাণ অবয়ব মাত্র। যেমন আকাশে খদ্যোত, তেমনি প্রকৃতিতে এই ব্রহ্মাণ্ড।

"এই সমস্ত পাতালে, সমুদ্রে ও পর্ব্বতে অসুর, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, কিম্পুরুষ, যক্ষ, রাক্ষস, ভূত, প্রেত, পিশাচ, অপস্মারক, অপ্সরা, ব্রহ্মরাক্ষস, কুষ্মাণ্ড, বিনায়ক, প্রভৃতি দেবযোনি

সমূহ বাস করে। দ্বীপসমূহে পুণ্যাত্মা দেবতা ও মনুষ্যেরা বাস করে।

"সুমেরু ত্রিদশদিগের উদ্যানভূমি। তথায় মিশ্রবন, নন্দন, চৈত্ররথ ও সুমানস নামে উদ্যান আছে। এতদ্ব্যতীত সুধর্ম্মা নামে দেবসভা, সুদর্শন নামে পুরী ও বৈজয়ন্ত প্রাসাদও রহিয়াছে। এই হইল ভূর্লোক।

"গ্রহ, নক্ষত্র ও তারকাসমূহ ধ্রুবে নিবদ্ধ। তাহারা সুমেরুর উপর্য্যুপরি সন্নিবিষ্ট ও দ্যুলোকে পরিবর্ত্তমান। বায়ুবিক্ষেপের নিয়ম দ্বারা তাহাদের গতি উপলক্ষিত হয়। এই হইল অন্তরীক্ষ লোক।

"মাহেন্দ্রলোকনিবাসী ছয় প্রকার দেবযোনি আছে—ত্রিদশ, অগ্নিষ্বাত, যাম্য, তুষিত, অপরিনির্ম্মিতবশবর্ত্তী ও পরিনির্ম্মিতবশবর্ত্তী। ইহারা সকলেই সঙ্কল্পসিদ্ধ, অণিমাদি ঐশ্বর্য্য-সম্পন্ন, কল্পকালপরিমিত আয়ুবিশিষ্ট, পূজ্য ও কামভোগী। ধর্ম্মবিশেষ দ্বারা অভিসংস্কৃত অণু হইতে পিতৃ মাতৃ সংযোগ ব্যতিরেকে অকস্মাৎ ইহাদের দিব্য শরীর আবির্ভূত হইয়া থাকে, এইজন্য ইহাদিগকে ঔপপাদিক-দেহ বলে। উত্তম ও অনুকূল অপ্সরারা সর্ব্বদা ইহাদের পরিচর্য্যা করিয়া থাকে।

"প্রাজাপত্য মহর্লোকে পাঁচপ্রকার দেব-যোনি—কুমুদ, ঋভু, প্রতর্দ্দন, অঞ্জনাভ ও প্রচিতাভ। মহাভূতসমূহ ইহাদের বশে—ইহারা যাহা চান, মহাভূতেরা তাহাই দেয়, এবং ইহাদের ইচ্ছানুরূপ সংস্থানে অবস্থান করে। ইহারা ধ্যানমাত্রে তৃপ্ত এবং সহস্র কল্প ইহাদের আয়ু।

"ব্রাহ্মলোকের প্রথম জনলোক। সেখানে চারিপ্রকার দেবযোনি—ব্রহ্মপুরোহিত, ব্রহ্ম-কায়িক, ব্রহ্মমহাকায়িক ও অমর। ভূত ও ইন্দ্রিয়গণ ইহাদের বশে এবং পূর্ব্ব পূর্ব্ব অপেক্ষা ইহাদের আয়ু দ্বিগুণ-পরিমাণ।

"ব্রাহ্মলোকের দ্বিতীয় তপোলোক। সেখানে তিন প্রকার দেবযোনি—আভাস্বর, মহাভাস্বর, ও সত্যমহাভাস্বর। ভূত, ইন্দ্রিয় ও পঞ্চতন্মাত্র ইহাদিগের বশে। পূর্ব্ব পূর্ব্ব অপেক্ষা ইহাদের আয়ুর পরিমাণ দ্বিগুণ। সকলেই ধ্যান-তৃপ্ত, ঊর্দ্ধরেতা, ঊর্দ্ধ সত্যলোকের অপ্রতিহত জ্ঞানবিশিষ্ট এবং অবীচী হইতে তপোলোক পর্য্যন্ত সমস্ত বিষয়েরই অনাবৃত-জ্ঞানযুক্ত।

সত্যলোক তৃতীয় ব্রাহ্মলোক। সেখানে চারি প্রকার দেবযোনি—অচ্যুত, শুদ্ধনিবাস, সত্যাভ ও সংজ্ঞা-সংজ্ঞী। ইহাদের বাস-ভবনের প্রয়োজন হয় না, আধার অভাবে ইহারা স্বপ্রতিষ্ঠ, উপর্য্যুপরি ইঁহাদের অবস্থান। ইহারা প্রকৃতিকে বশে আনিয়াছেন—সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণ ইহাদের ইচ্ছাতে প্রবর্ত্তিত হয়। সৃষ্টির স্থিতি পর্য্যন্ত ইঁহাদের আয়ুর পরিমাণ।

ইঁহাদের মধ্যে অচ্যুতেরা সবিতর্ক ধ্যান সুখে তৃপ্ত, শুদ্ধনিবাসেরা সবিচার ধ্যানে, সত্যাভেরা আনন্দমাত্র ধ্যানে এবং সংজ্ঞাসংজ্ঞীরা অস্মিতামাত্র ধ্যানে পরিতৃপ্ত। ইঁহারাও ভুবন মধ্যেই অবস্থিত।

এই সাতটী লোকই ব্রহ্মলোক। বিদেহ-লয় ও প্রকৃতিলয়েরা মোক্ষপদে অবস্থান করেন, অতএব লোকমধ্যে তাঁহাদিগকে বিন্যস্ত করা হইল না।

সূর্য্যদ্বারে অর্থাৎ সুষুম্নানাড়ীতে সংযম করিলে যোগী এই সমস্ত দেখিতে পান।" (২৬)

চন্দ্রে সংযম করিলে তারাব্যূহ অর্থাৎ নক্ষত্র সমূহের বিশিষ্ট সন্নিবেশ জানিতে পারা যায়। নক্ষত্রসমূহের জ্যোতি সূর্য্যতেজদ্বারা

অভিভূত থাকে বলিয়া সূর্য্যে সংযম করিয়া তাহাদিগকে জানা যায় না, এই জন্য তাহাদিগকে জানিতে হইলে চন্দ্রে সংযম করিতে হয়। (২৭)

ধ্রুব নক্ষত্রদিগের মধ্যে প্রধান। তাঁহাতে সংযম করিলে নক্ষত্রসম্বন্ধীয় গতির জ্ঞান হইয়া থাকে। (২৮)

পূর্ব্বোক্ত সমস্তগুলিই বাহ্য সিদ্ধি। এখন সূত্রকার আভ্যন্তর সিদ্ধির কথা বলিবেন। মানুষের শরীরে যে সমস্ত নাড়ী বিসর্পিত রহিয়াছে, নাভিরূপ ষোড়শটী অরবিশিষ্ট চক্রই তাহার মূল। সেই নাভিচক্রে সংযম করিলে যোগী শরীরস্থ বিশেষ বিশেষ রস, ধাতু, নাড়ী প্রভৃতির সন্নিবেশ জানিতে পারেন। (২৯)

জিহ্বার অধোদেশে স্বরোৎপাদক যে তন্তু রহিয়াছে, তাহার অধোদেশে কূপের ন্যায় গর্ত্তাকার একটী প্রদেশ আছে, তাহাকে কণ্ঠকূপ বলে। প্রাণবায়ু এই কণ্ঠকূপ স্পর্শ করিলেই ক্ষুধা ও পিপাসার আবির্ভাব হয়। কণ্ঠকূপে সংযম করিলে যোগীর ক্ষুৎপিপাসার নিবৃত্তি হইয়া থাকে। (৩০)

কণ্ঠকূপের অধোদেশে কূর্ম্ম নামক নাড়ী আছে। তাহাতে সংযম করিলে কায়স্থৈর্য্য লাভ হয় এবং তাহা হইতে চিত্তও স্থির হইয়া থাকে। তখন শরীর কিম্বা চিত্তকে কিছুতেই বিচলিত করিতে পারে না। (৩১)

মাথার খুলির ভিতর ব্রহ্মরন্ধ্র নামে একটী ছিদ্র আছে, উহা সাত্ত্বিক প্রকাশের আধার বলিয়া জ্যোতির্ম্ময়। গৃহে একটী দীপ থাকিলে তাহার প্রভা যেমন চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে, তেমনি আমাদের হৃদয়স্থ সাত্ত্বিক প্রকাশও শরীরের সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়ে। ব্রহ্মরন্ধ্রে সেই জ্যোতিঃ পিণ্ডাকার ধারণ করিয়া থাকে। এই স্থানে সংযম করিলে দ্যুলোক ও ভূলোকের অন্তরালবর্ত্তী যে সমস্ত সিদ্ধ নামক দিব্যপুরুষ রহিয়াছেন, তাঁহাদিগের সহিত সাক্ষাৎ ও আলাপ করা যায়। (৩২)

কোনও নিমিত্তের অপেক্ষা না করিয়া কেবল মন হইতে সহসা যে অবিসংবাদী জ্ঞানের উৎপত্তি হয়, তাহাকে বলে প্রতিভা। তাহাতে সংযম করিলে প্রাতিভ বা তারক নামে জ্ঞান উৎপন্ন হয়। সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে যেমন অনতি উজ্জ্বল অথচ সর্ব্বপ্রকাশক প্রভার আবির্ভাব হয়, তেমনি বিবেকখ্যাতির পূর্ব্বে এই সর্ব্ববিষয়ক তারক জ্ঞানের আবির্ভাব হয়। এই জ্ঞান উৎপন্ন হইলে যোগী নিমিত্তের অপেক্ষা না করিয়াও সব জানিতে পারেন। (৩৩)

হৃদয়ে যে অধোমুখ ক্ষুদ্র পদ্মাকৃতি স্থান রহিয়াছে, তাহাই অন্তঃকরণ সত্ত্বের আধার। এই স্থানে সংযম করিলে নিজের ও পরের চিত্তের সকল বাসনার জ্ঞান হয়। (৩৪)

প্রকাশ ও সুখাত্মক যে প্রকৃতির পরিণামবিশেষ, তাহাই সত্ত্ব; অধিষ্ঠাতৃরূপ পুরুষই ভোক্তা। সত্ত্ব অচেতন, পুরুষ চেতন; সত্ত্ব ভোগ্য এবং পুরুষ ভোক্তা। সুতরাং উভয়ে অসঙ্কীর্ণ অর্থাৎ ভিন্ন। কিন্তু সত্ত্ব ও পুরুষ যখন ভিন্ন প্রতিভাত হয় না, তখন সত্ত্বেই কর্ত্তৃত্বের আরোপ করিয়া সুখ দুঃখের জ্ঞান হইয়া থাকে। ইহাকেই বলে ভোগ। কিন্তু সত্ত্ব সংহত অতএব তাহা পরার্থ। সুতরাং তাহার ভোগপ্রত্যয়ও স্বার্থনিরপেক্ষ বলিয়া পরার্থ অর্থাৎ পুরুষের দৃশ্য। এই ভোগপ্রত্যয় হইতে বিশিষ্ট পুরুষের স্বরূপ মাত্রকে অবলম্বন করিয়া যে প্রত্যয়, তাহাকে সত্ত্বের স্বার্থপ্রত্যয় বলা যাইতে পারে, কেননা

তখন সত্ত্ব হইতে প্রতিভাসিত-অহংজ্ঞান দূর হইয়া চিৎ-ছায়াই তাহাতে সংক্রামিত হইয়া থাকে। সত্ত্বের প্রত্যয়সমূহের মধ্যে ইহাই চরম। অবশ্য স্বনিষ্ঠ পুরুষেরই এই জ্ঞান হইয়া থাকে। পুরুষই নিজকে আলম্বন করিয়া এই রূপে জানিয়া থাকেন। নতুবা জ্ঞাতা পুরুষ আর কি করিয়া জ্ঞানের বিষয় হইবেন? পুরুষ জ্ঞেয় হইলে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের বিরোধ উপস্থিত হয়, সুতরাং উক্ত প্রত্যয় পুরুষেরই হইয়া থাকে, সত্ত্বের উৎকর্ষবশতঃ তাহাতে উহা সংক্রামিত হয় মাত্র। (৩৫)

পূর্ব্বোক্ত পুরুষসংযমের অভ্যাসবশতঃ ব্যুত্থিত অবস্থাতেও প্রাতিভ, শ্রাবণ, বেদন, আদর্শ, আস্বাদ ও বার্ত্তা জ্ঞানের আবির্ভাব হইয়া থাকে। প্রাতিভ জ্ঞানের কথা ৩৩ সূত্রে বলা হইয়াছে। পুরুষসংযমের ফলে সমাধির পূর্ব্বেই এই জ্ঞান আবির্ভূত হইতে পারে। শ্রাবণ জ্ঞান হইতে যোগী দিব্য শব্দ শুনিতে পান। স্পর্শেন্দ্রিয়জ জ্ঞানকে যৌগিক পরিভাষায় বেদনা বলে। আদর্শ দর্শনেন্দ্রিয়জ জ্ঞান। গন্ধজ্ঞানকে যোগশাস্ত্রের পরিভাষাতে বার্ত্তা বলে। পূর্ব্বোক্ত সংযমের ফলে যোগীর দিব্য স্পর্শ, দিব্য দর্শন, দিব্য শ্রবণ, দিব্য স্বাদ ও দিব্য গন্ধের অনুভূতি হইয়া থাকে। (৩৬)

কিন্তু এই সমস্ত জ্ঞান যোগীর চিত্তে হর্ষ, বিস্ময় প্রভৃতি উৎপন্ন করে বলিয়া সমাধি শিথিল হয়। সুতরাং সমাধি প্রকর্ষের পক্ষে ইহারা বিঘ্নস্বরূপ এবং ব্যুত্থানকালে অর্থাৎ ব্যবহার দশায় সিদ্ধি বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। (৩৭)

চতুষ্টয়ী

—*—

কখন যে কোন কাজের ভার কার উপর পড়বে, তা বলা যায় না। তাই সব রকমে নিজকে তৈরী রাখতে হবে—এতটুকু গ্লানি ও দেহ মনে থাকলে চলবে না।

সার্ব্বভৌমভাবে নিজকে তৈরী করতে হলে, প্রথমতঃ চাই **মৌন**। অকারণ কারু কাছে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠাটা ভাল নয়—তাতে নিজের তালমান থাকে না। বাজে কথায় দেহ-মন এত অবসন্ন হয়ে পড়ে যে মানুষকে সারাদিন খাটিয়ে নিলেও তার এতটা অবসাদ আসে না। কাজ করবার শক্তি যদি ভিতরে সঞ্চয় করতে হয়, তবে মুখের ছিদ্রটী বন্ধ করে রাখা উচিত—নইলে ফুটো কলসীতে জল ঢালার মত সবই বৃথা হবে।

চুপ করে থাকার আর একটা মস্ত লাভ এই যে সহ্য করবার শক্তিটা এতে অসীম করে দেয়। চলতি কথাতেও আমরা বলি, "বোবার শত্রু নাই।" জগতে চলতে হলে কবির এই কথাটা মনে রাখতে হবে—"মহাপ্রাণ সহিয়াছে পলে পলে সংসারের ক্ষুদ্র উৎপীড়ন, বিঁধিয়াছে পদতলে প্রত্যহের কুশাঙ্কুর, করিয়াছে তারে অবিশ্বাস মূঢ় বিজ্ঞ জন, প্রিয়জন করিয়াছে পরিহাস অতিপরিচিত অবজ্ঞায়—গেছে সে করিয়া ক্ষমা—নীরবে

করুণনেত্রে—অন্তরে বহিয়া নিরুপমা সৌন্দর্য্য-প্রতিমা।"

এ মন্ত্রের সাধনায় সিদ্ধ না হলে আর সংসারে শান্তি নাই, বীর্য্য নাই।

তারপর **নির্জ্জনসত্তা**। দেহের উপর এতটুকু স্বাতন্ত্র্য থাকা চাই, যাতে যখন-তখন তাকে আয়েস না দিলেও চলে। হয়ত অনেক বাইরের কাজ এসে ঘাড়ে পড়বে, কিন্তু শুধু তাই নিয়ে দিন গুজরাণ করতে গেলে চিত্ত দিন দিন রুক্ষ রসহীন হয়ে উঠবে। তাই নিজের মাঝে সমাহিত হবার জন্যও একটু সময় চাই। কিন্তু অপরের প্রতি যে কর্ত্তব্য রয়েছে, তা থেকে নিজের জন্য সময় কেটে নিলে তো চলে না। সেই জন্য নিজের আরামের অংশ হতে অনেকখানি বাদ দিতে হবে। মোটের উপর কাজে চিন্তায় সমস্তটা দিন নিরেট হওয়া চাই—তার মাঝে একটুকুও যেন ফাঁক না থাকে।

আর একটী জিনিষ চাই—**নির্ভীকতা**। মৌন হতেই সেটা পাওয়া যায়। নিজকে নিজের মাঝে সংহত করতে পারলেই না সবকে জয় করবার অমোঘ বীর্য্য পাওয়া যায়। প্রতি পদে পদে বিবেক থাকা চাই—এই আমার লক্ষ্য, এই তার উপায়, এই সাধ্য, এই সাধন, এইটুকু গ্রহণ করতে হবে, এই-টুকু ছাড়তে হবে—এমনি করে জেনে শুনে প্রত্যেকটি পা ফেলে পথ চল্‌লে আর ভয় করবার কিছু থাকে না। জগতে কোনও কিছুর কাছেই নিজকে বাঁধা রাখব না—এই আমাদের পণ—আমরা কেবল বলি, "ছাই দিয়ে সব ঘরের সুখে, ধন্য হরি, ধন্য হরি!" এই ভাবটি যাতে কোনও বিভিষীকায় আড়াল না হয়ে যায়, তার জন্যই বিবেকের সতর্ক প্রহরা।

কিন্তু সব চেয়ে বড় কথা হচ্ছে **ব্রহ্মচর্য্য**। এ শুধু আলো-চাল আর কাঁচকলার বরাদ্দ নয়—এ হচ্ছে ব্রহ্মবিহার বা ব্রহ্মে বিচরণ। ব্রহ্মচর্য্যের মাঝে আমরা সাধারণতঃ বর্জ্জনের দিকটাই দেখি, অর্জ্জনের দিকে নজর দিই না। ব্যক্তিগত জীবনে বর্জ্জনের প্রয়োজন আছে, কিন্তু সমস্তটা জগৎকে জড়িয়ে দেখ্‌লে তা থেকে তো কিছুই বাদ পড়ে না। আমাদের আত্মীয়তার প্রসার বৃদ্ধি করে এই অখণ্ড জগতের সঙ্গেই পরিচয় ঘটাতে হবে। যাকে আমরা ক্ষুদ্র করে দেখি, সে-ই পাপ হয়ে আমাদের ক্ষুদ্রদৃষ্টির সাজা দিতে আসে। প্রেমকে সঙ্কীর্ণ করে আমরা কামের সৃষ্টি করি, বীর্য্যকে সঙ্কীর্ণ করে ক্রোধের সৃষ্টি করি, জ্ঞানকে সঙ্কীর্ণ করে মোহের সৃষ্টি করি, ভোগকে সঙ্কুচিত করে লোভের সৃষ্টি করি। আমাদের ছাড়তে হবে—এই সঙ্কীর্ণ দৃষ্টি—জগৎকে ছাড়তে হবে না। সে তো যা আছে, তা আছেই—সব জড়িয়ে ভগবান্‌ তো তাকে অসুন্দর করে সৃষ্টি করেন নি। আমাদের ভাবনা করতে হবে, "আমরা স্বাধীন—অমৃতস্য পুত্রাঃ—কোনও ক্ষুদ্রতার কাছেই আমরা মাথা নোয়াই না—আমাদের ভূমৈব সুখং, নাল্পে সুখমস্তি—নাল্পে সুখমস্তি।"—এই হবে আমাদের ব্রহ্মচর্য্য। এ শুধু স্পর্দ্ধা নয়—এ হবে দিব্যানুভূতির অনির্ব্বাণ আনন্দ-শিখা। এর জন্যই সংযম, এর জন্যই বীর্য্যধারণ।

বেদান্ত-সার

[চতুর্থ খণ্ড—বিবৃতি—সাধনবিচার]

বিবেকের শ্রুতিপ্রামাণ্য

(গ) "সদেব সৌম্য ইদমগ্র আসীৎ একমেবাদ্বিতীয়ম্"—হে সৌম্য, পূর্ব্বে ইহা সৎই ছিল, অদ্বিতীয় একই ছিল।

সৎ বলিতে অস্তিতামাত্র বুঝায়। সমস্ত বেদান্তে যে নির্ব্বিশেষ, সর্ব্বগত, এক, নিরঞ্জন, নিরবয়ব, বিজ্ঞানস্বরূপ, সূক্ষ্ম বস্তু প্রতিপাদিত হইয়াছে, তাই সৎশব্দবাচ্য। এব, শব্দদ্বারা অবধারণ করা হইতেছে। কি অবধারণ করা হইতেছে?—এই জগৎ—যাহাকে এখন নাম, রূপ ও ক্রিয়াযুক্ত এবং বিকৃত বলিয়া জানা যাইতেছে, তাহা সৎই ছিল। কখন সৎ ছিল?—না জগদুৎপত্তির পূর্ব্বে। তবে কি এখন উহা আর সৎ নয় যে বিশেষ করিয়া বলা হইল, পূর্ব্বে ইহা সৎই ছিল? বিশেষিত করার সার্থকতা কি?—এখনও এই জগৎ সৎই বটে, কিন্তু এখন উহা নাম-রূপ বিশেষণযুক্ত, "ইদং" শব্দ এবং "ইদং" বুদ্ধির বিষয় অর্থাৎ এখন ইহাকে "এই" বলিয়া জানি, "এই" বলিয়া নির্দ্দেশও করি। কিন্তু উৎপত্তির পূর্ব্বে উহা কেবলমাত্র "সৎ"শব্দ ও "সৎ" জ্ঞানগম্য ছিল। সেই জন্যই অবধারণ করিয়া বলা হইতেছে, "ইহা পূর্ব্বে সৎই ছিল" সুষুপ্তির সময় যেমন কোনও বস্তুর জ্ঞান হয় না, তেমনি উৎপত্তির পূর্ব্বে এই জগৎকে নামযুক্ত বা রূপযুক্ত বলিয়া গ্রহণ করিবার সম্ভাবনা ছিল না। সুষুপ্তি হইতে উঠিয়া মানুষের যেমন কেবল সত্তামাত্রেরই উপলব্ধি হয়, সুষুপ্তিতে বস্তুমাত্র সত্তারূপেই জানা যায়, তেমনি উৎপত্তির পূর্ব্বে জগৎকে সৎরূপেই জানা যায়।

একটা লৌকিক উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। একজন পূর্ব্বাহ্নে গ্রামান্তরে যাইবার সময় দেখিয়া গেল, কলসী গড়িবে বলিয়া কুম্ভকার কাদার তাল পাকাইয়াছে। অপরাহ্নে ফিরিবার সময় দেখিল, সেই কাদা হইতে কত কাজ হইয়াছে—কলসী, সরা প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন বস্তুর সৃষ্টি হইয়াছে। তখন সে ভাবিতে পারে, "এই সমস্ত সরা কলসী তো ওবেলায় কেবল কাদার তালই ছিল।" তেমনি এখানে বেদান্ত বলিতেছেন, "এই জগৎ পূর্ব্বে সৎই ছিল।"

তার পর বলা হইতেছে, "একমেব"—একই ছিল অর্থাৎ নিজেরই কার্য্যরূপে পরিণত অন্য কিছুই ছিল না—স্বগত ও সজাতীয় ভেদশূন্য ছিল। বিজাতীয় ভেদও ছিল না, ইহা বুঝাইবার জন্য বলা হইতেছে—"অদ্বিতীয়ম্।" কলসী প্রভৃতির আকারে পরিণত করিবার জন্য মৃত্তিকার যেমন স্বব্যতিরিক্ত কুম্ভকার প্রভৃতি নিমিত্ত কারণের প্রয়োজন হয়, প্রকৃত স্থলে কিন্তু সৎ-

ব্যতিরিক্ত সত্তের সেরূপ অন্য কোনও সহকারী কারণরূপ দ্বিতীয় বস্তু ছিল না। অন্য দ্বিতীয় বস্তু ছিল না বলিয়াই বলা হইতেছে—অদ্বিতীয়ম্।

সৃষ্টির পূর্ব্বে ও এখনও যদি কেবল মাত্র সৎই থাকে, এই জগৎ যদি সৃষ্টির পূর্ব্বে এক অদ্বিতীয় সৎস্বরূপই ছিল, তবে সৎ হইতে ব্যতিরিক্ত সমস্ত জগৎই মিথ্যা বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে। (ছান্দোগ্য, ৬, ২, ১)

(ঘ) "নেতি নেতি"—বেদান্ত ব্রহ্মের সত্যরূপ বলিতেছেন—সেই অক্ষিপুরুষের রূপটী যেন হরিদ্রারঞ্জিত বস্ত্রের ন্যায়, কিম্বা পাণ্ডুবর্ণ মেষলোমজাত বস্ত্রের ন্যায়, অথবা ইন্দ্রগোপ কীটের ন্যায়, অথবা অগ্নিশিখার ন্যায়, শ্বেতপদ্মের ন্যায় কিম্বা বিদ্যুৎপ্রকাশের ন্যায়। চিত্তের নানা প্রকার বাসনা সেই পুরুষেই উপচরিত হয় বলিয়া এইরূপ বিচিত্র উপমা প্রযুক্ত হইয়াছে।

এই তো হইল রূপের সত্য। কিন্তু বেদান্ত বলিতেছেন—সত্যেরও সত্য আছে। তাহার স্বরূপ কি ? কি বলিয়া তাহার নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে ?—"নেতি নেতি" বলিয়া।

সকল প্রকার বিশিষ্ট উপাধি বর্জ্জন করিয়া বলা হইল—"নেতি নেতি"; ইহাতেই সত্যেরও সত্যস্বরূপের নির্দ্দেশ করা হইল নেতি অর্থাৎ যাহার কোনও বিশেষ নাই—নাম নাই, রূপ নাই, কর্ম্ম, ভেদ, জাতি বা গুণ কিছুই নাই। এইগুলি থাকিলে তবে না শব্দ ব্যবহার করা চলে। ব্রহ্মের মাঝে এমন কোনও বিশেষ নাই; সুতরাং "ইহা তাই"—ব্রহ্মসম্বন্ধে এমন কোনও নির্দ্দেশ করা যায় না। গরু দেখিয়া লোকে নির্দ্দেশ করিয়া বলিতে পারে, এটা গরু—এর শাদা রং, শিং আছে ইত্যাদি। কিন্তু ব্রহ্মকে তেমন ভাবে নির্দ্দেশ করিবার কোনও উপায় নাই। "বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম, বিজ্ঞানঘন এব ব্রহ্মাত্মা" ইত্যাদি শব্দে ব্রহ্মে নাম-রূপ-কর্ম্ম অধ্যারোপিত করিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে বটে; কিন্তু যদি সমস্ত বিশিষ্ট উপাধি দূর করিয়া তাহার স্বরূপ নির্দ্দেশ করিতে হয়, তবে আর কোনও প্রকারেই তাহাকে নির্দ্দেশ করা চলে না। তখন একমাত্র উপায়, যে সমস্ত উপাধি দ্বারা তাহাকে নির্দ্দেশ করা সম্ভব, "নেতি নেতি" দ্বারা তাহাদেরও প্রতিষেধ করা।

দুইটী নকার বীপ্সা দ্বারা ব্যাপ্তি অর্থাৎ সাকল্য-নিষেধ বুঝাইতেছে—যাহার যাহার প্রাপ্তি ছিল, তাহা সমস্তই নিষেধ করা হইল। তাহা না হইলে ব্রহ্ম যে অনির্দ্দিষ্ট থাকিয়া যান, এ আশঙ্কা দূর হইত না। কারণ দুইটী নকার দ্বারা যদি কেবল মাত্র দুইটী বস্তুর নিষেধ করা হইত, তাহা হইলে মনে হইত, ব্রহ্ম ওই নিষিদ্ধ বস্তু দুইটীর ব্যতিরিক্ত মাত্র, কিন্তু তাহা হইলে, তাহা কি ?—এই আশঙ্কা নিবৃত্ত হইত না এবং লোকের জিজ্ঞাসার নিবৃত্তি না হওয়াতে এরূপ ব্রহ্মনির্দ্দেশের কোনও সার্থকতাও থাকিত না। "ব্রহ্ম কি তাহা বলিব" এরূপ কথার অর্থও অসম্পন্ন থাকিয়া যাইত। সমস্ত উপাধির নিরাকরণ হেতু যখন দিক্ কাল প্রভৃতি সমস্ত বস্তুর জিজ্ঞাসা নিবৃত্ত হয়, তখন জ্ঞান হয়, "সৈন্ধবপিণ্ডের মত আমি একরস, প্রজ্ঞাঘন—আমার অন্তর বাহির নাই, আমি সত্যের সত্য, আমিই ব্রহ্ম"—তখন সকল দিক হইতে জিজ্ঞাসার নিবৃত্তি হয়, প্রজ্ঞা আত্মাতেই অবস্থিত

হয়। এই বোধ জন্মাইবার জন্যই বীপ্সার্থে দুইটী নকার দেওয়া হইয়াছে।

ব্রহ্মই যখন সত্যের সত্য, নেতি-বাক্য দ্বারা যখন তাহার স্বরূপ নির্দ্দিষ্ট হইল, তখন ব্রহ্মব্যতিরিক্ত সমস্ত বস্তুই মিথ্যা। (বৃহদারণ্যক, ২, ৩, ৬)।

(ঙ) "নেহ নানাস্তি কিঞ্চন"—বেদান্ত বলিতেছেন, আচার্য্যের উপদেশে পরিশুদ্ধ মন দ্বারা ব্রহ্ম দর্শন করিতে হইবে।—দর্শন বিষয় ব্রহ্মে কোনও নানাত্ব বা ভেদ নাই—ইহাই দর্শন করিতে হইবে। নানাত্ব না থাকিলেও অবিদ্যা দ্বারা উহা অধ্যারোপিত হইয়াছে বুঝিতে হইবে।

ব্রহ্ম একরস সত্য হইলে বহুধা ব্যাকৃত প্রপঞ্চজাল নিশ্চয়ই মিথ্যা। (বৃহদারণ্যক, ৪, ৪, ১৯)

(চ) "যত্র অন্যৎ পশ্যতি, অন্যৎ শৃণোতি, অন্যৎ বিজানাতি, তদল্পম্"—অবিদ্যার অধিকারে আসিয়া লোকে যে একে অপরকে দেখে, একে অপরকে শোনে, একে অপরকে জানে, তাহা অল্প—অর্থাৎ যতক্ষণ অবিদ্যা, ততক্ষণ তাহার অবস্থিতি। যেমন স্বপ্নে যাহা কিছু দেখা যায়, তাহা জাগরণ কালের পূর্ব্ব পর্য্যন্তই থাকে, ইহাও সেইরূপ। অতএব অবিদ্যাদর্শিত বিষয়সমূহ স্বপ্নদৃষ্ট বস্তুর মতই বিনাশী—ভূমা ইহার বিপরীত, উহা অমৃত। (ছান্দোগ্য, ৭, ২৪, ১)

উপরি-উক্ত শ্রুতিবাক্য হইতে আমরা জানিলাম, ব্রহ্ম ব্যতিরিক্ত এই প্রপঞ্চজাল মিথ্যা।

"অচেতন বস্তুমাত্রেই অনিত্য, কেননা তাহারা বিভক্ত, যেমন ঘট, পট, স্তম্ভ প্রভৃতি"—এই প্রকার অনুমানও ব্রহ্মাতিরিক্ত পদার্থের অনিত্যত্ব সম্বন্ধে প্রমাণ।

বিভক্ত পদার্থ সমূহকে আমরা অনিত্য বলিয়া জানিতেছি। কিন্তু এই সমস্ত পদার্থ তো নিশ্চয়ই কাহারও কাছে প্রকাশিত হইতেছে। বিভাগ দ্বারা অচেতন বস্তুর সংহতি ও আনুগত্য নষ্ট হইয়া গেলেও প্রকাশাত্মক চৈতন্য সর্ব্বত্রই অবিভক্ত ও অনুগত থাকে। সুতরাং বিভক্ত প্রপঞ্চ অনিত্য হইলেও তদনুগত অবিভক্ত চৈতন্যস্বরূপ ব্রহ্ম নিশ্চয়ই নিত্য।

এইরূপে শ্রুতি ও অনুমান দ্বারা নিত্য ও অনিত্য বস্তুর বিবেক সাধিত হয়। এখানে কেহ বলিতে পারেন, ইহাতেই তো ব্রহ্মজ্ঞান হইয়া গেল, তবে আর বিচারের প্রয়োজন কি? কিন্তু ব্রহ্ম যে নিত্য, এই সমস্ত প্রমাণবলে জিজ্ঞাসু তাহা আপাততঃ জ্ঞাত হইলেন মাত্র। কিন্তু ব্রহ্মের অদ্বিতীয়ত্ব, প্রত্যগাত্মা হইতে অভিন্নত্ব ইত্যাদি বিষয় তো এখনও নির্দ্ধারিত হয় নাই। সুতরাং এইটুকু মাত্র জানিয়া প্রকৃত জিজ্ঞাসুর কখনও জিজ্ঞাসা নিবৃত্ত হইবে না। কাজেই ইহার পরেও বিচারের আবশ্যক রহিয়াছে। ১৬

বিজনে ও সজনে

আঁধার রাতে বিজন ঘরে একলা যখন বসি,
ঘরখানি মোর উজল করে দাঁড়াও তখন আসি;—
সারাদিনের কোলাহলে যাই যখনি ভুলে—
আপনি এসে কেন তুমি নাও না কোলে তুলে?

আরণ্যক

—*—

"যজ্ঞেন বাচঃ পদবীয়মায়ন্ তামন্ববিন্দন্ ঋষিষু প্রবিষ্টাম্ ॥"

—ঋগ্বেদ সংহিতা ১০।৭১।৩

যা ভাব, তাই রূপে ফুটে ওঠে। যেখানে মোহ, সেখানেই রূপের বিকৃতি। তুমি স্বরূপতঃ অরূপ, তাই তোমার মিলন অরূপ—তোমার ভাব চিরসুন্দর। রূপহীন বলে তুমি অরূপ নও, তুমি রূপাতীত বলেই অরূপ। তোমার যা বিকৃতি, তাকে অতিক্রম করেও তোমার চিরসত্য অরূপ রূপ একটা রয়েছে। এখানেই তোমার সাধনার সঙ্কেত।

তোমার রূপকে তুমি সর্ব্বদাই ছেড়ে যেতে চাও, ভাবের রাজ্যে নিজকে তুমি ধরা দিতে চাও—কেননা রূপের রাজ্যে তুমি বিরূপ। রূপের জগতে তোমার প্রেম ইন্দ্রিয়ানুভূতির বেড়া দিয়ে ঘেরা—সেখানে দুদিক হতেই একটা দেনা-পাওনার হিসাব আছে, যদিও সেটা মায়া। কিন্তু অরূপের জগতে তোমার প্রেম শুধুই চিদ্‌ঘন অনুভব, শুধুই আনন্দের চিরবিলাস। সে প্রেমের দ্বৈত তোমারি মাঝে—প্রেমের ঋণের তুমিই খাতক, তুমিই মহাজন।

অরূপকে যদি রূপের আশ্রয় দিতে চাও, তবে শুধু একটা রূপ সেখানে পেলে তো চলবে না। অরূপের যে রূপযজ্ঞ—তার মাঝে তুমি হোতা, তোমার প্রিয়জন অধ্বরাগ্নি—আর বিশ্ববাসী সকলেই যজমান। কাউকে সেখানে বাদ দিলে চলবে না। একার তোমার ভোগে অধিকার নাই। বিশ্বই অমৃত, বিশেষই মৃত্যু। প্রেম অভয়, অমৃত—সকলকে সে গ্রাস করে রয়েছে—তাই তার রূপ অরূপ—আনন্দঘন চিরজ্যোতির্ম্ময়!

*

"সর্ব্বাভিলাপবিগতঃ সর্ব্বচিন্তাসমুত্থিতঃ।
সুপ্রশান্তঃ সকৃজ্জ্যোতিঃ সমাধিরচলোঽভয়ঃ॥"

—এই তো আমরা চাই। বাইরের জন্য ভাবব কেন? মাতৃগর্ভে যখন ছিলাম, মায়ের সত্তায় যখন আমার সত্তা মিশে গিয়েছিল, তখন কি আর বাইরের দিকে চাইতাম? আমার সকল অভাব পূর্ণ করে কে আমাকে এই আলোকোদ্ভাসিত নব জীবনে জন্ম দিয়েছে? আবার যেন আমরা সেই অবস্থাই ফিরে পাই—আবার যেন নিজকে বিশ্বজননীর ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডোদরে সমাহিত মনে করি। আমাদের সকল অভিলাপ দূর হয়ে যাক, সমস্ত চিন্তা বর্জ্জন করে আবার সেই সুপ্রশান্ত, অচল, অভয়, জ্যোতির্ম্ময় আনন্দধামে সমাহিত হই!—অভাব যা, তার চিন্তা আমার কেন? সন্তানের অভাব তো মা-ই দেখবেন!

*

মহৎ কল্পনাকে বিশ্বাস করতে শেখ। ছোট কাল হতে শুনে আসছ, মানুষ দুটা চোখ দিয়ে যা দেখবে, দুটা কান দিয়ে যা শুনবে, তা, তার যে চিন্ময়ী সত্তা—যা নাকি চোখকে দেখাচ্ছে, কানকে শোনাচ্ছে—

তার চেয়ে বেশী সত্য হয়ে দাঁড়াবে। বেদান্তের মননকেও লোকে কল্পনা বা মনের খেয়াল বলে উড়িয়ে দেবে। কিন্তু ওই কল্পনাই যে তোমার সুপ্ত সৃষ্টিশক্তির স্ফুরণ—"ভূরিতি ব্যাহরন্", এই মহাব্যাহৃতির আভাস যে পাই তোমারই কল্পনার মাঝে। সংসারের সংস্কারের বিপরীত বলে যাকে তুমি আজ অবিশ্বাস করছ, সে যে তোমার মাঝে সবিতার বরেণ্য ভর্গের বিকাশ। নিত্যানিত্যের বিবেক তোমার মাঝে নাই বলেই তোমার বিশ্বাস হচ্ছে না—দুদিনের জিনিষটাকেই তুমি বেশী আপন ভেবে আঁকড়ে ধরতে চাও, তাই তোমার আনন্দ জ্যোতি ম্লান হয়ে যায়, বিশ্বাস শিথিল হয়ে আসে। যদি আনন্দকে ধরতে, তবে দেখতে সবই তার মাঝে—এই নিরেট বস্তু জগৎ তখন ফাঁকা হয়ে যেত, কল্পনার সত্যজ্যোতিঃ তার রন্ধ্রে রন্ধ্রে অনুপ্রবিষ্ট হত।

*

সংযম আর তপস্যা, এই হল জীবনের মূল ভিত্তি। তপঃসিদ্ধ সংযমের ফলে অপরূপ শৌর্য্যে-বীর্য্যে যদি জীবনকে মণ্ডিত না করতে পারলে, তবে তার সার্থকতা কি? জীবনে যে একটা স্থির লক্ষ্য রয়েছে, পরিপূর্ণ নিষ্ঠার সঙ্গে প্রতি মুহূর্ত্তেই সেই কথাটী মনের সমস্ত আন্দোলনের উপরে, কর্ম্মের সমস্ত কোলাহলের উপরে বীরের মত জাগিয়ে রাখতে হবে। কল্পনার সকল সৌন্দর্য্য আহরণ করে তোমার নিষ্ঠাপূত জীবনের সমুজ্জ্বল চিত্রটী যেন সর্ব্বদাই মনশ্চক্ষে ভেসে বেড়ায়। "আমরা মহৎ হব—অপরকে মহৎ করব"—এই গৌরবকে বিধাতার আশীর্ব্বাদের মত জীবনের প্রতি নিমেষে নিমেষে তোমায় বহন করতে হবে। বাধা-বিপত্তিকে কিছুতেই আপন ঠাঁই ছেড়ে দিও না—প্রাণের পরিপূর্ণতায় সমস্ত ক্ষণিক কামনাকে উল্লঙ্ঘন করে অসঙ্কোচে আপনাকে আপ্তকাম বলে ঘোষণা কর। কিন্তু এর মাঝে উচ্ছ্বাস যেন না থাকে—হৃদয়ের অচঞ্চল স্তব্ধতার মাঝেই যেন তোমার আনন্দের পরিসমাপ্তি ঘটে।

*

জগতের শান্তিটুকু অব্যাহত রাখবে, এই মাত্রই তোমার জীবনের লক্ষ্য নয়; সৌন্দর্য্যেও যে জগৎকে সাজিয়ে তুলতে হবে, এটুকুও তোমার দায়িত্ব বটে! কিন্তু এ কথা ভুললে চলবে না যে, সংযমই সৌন্দর্য্যের সুষমা—কায়ে, মনে এবং বাক্যে সংযমে সংহত হলেই সৌন্দর্য্যে অমল শতদলটীর মত তুমি ফুটে উঠবে। বিশ্বের মাঝে দিকে দিকে যা ছড়িয়ে পড়েছে, একটী প্রাণকেন্দ্রে যে বিশ্বরাজ তাকে সংহত করেছেন, তাতেই তাঁর সৌন্দর্য্যের পরিচয়। রূপের মূলে এই প্রাণের জ্যোতির্বিন্দু—তা হতেই আবার অজস্র কিরণধারা অনন্ত দিকে জগতের মাঝে বিচ্ছুরিত হচ্ছে। এই তো জগতের লীলা—এই কেন্দ্র আর পরিধির ক্রীড়া। নিজের জীবনে এইটুকু ফুটিয়ে তোলাই মনুষ্যত্বের সাধনা।

*

সংযমের সাধনায় বর্জ্জনকেও তোমার সহায় করতে হবে। এক একটীর মায়া ছাড়বে, আর তার চেয়ে বিস্তীর্ণ লোকের মহিমা তোমার কাছে প্রকাশিত হবে। স্থূলকে ছাড়লে, কিন্তু তাতেই তোমার সংযমের সাধনা পূর্ণ হলো না—অভিনিবেশ করলে দেখবে, সূক্ষ্মের অন্তরালে বিদেহ রূপের রাজ্যেও গ্রহণ বর্জ্জনের শেষ নাই—সেই কল্প-

লোকেও তো তোমাকে এই দ্বন্দ্ব হতে বাঁচতে হবে। তার পর অনুভূতির পরম কারণে যখন আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করবে, তখনই সকল দ্বন্দ্বের শেষ। সেখানেই তোমার সৌন্দর্য্যের চরম পরিণতি।

*

"আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন।"—তোমার হাতে যার হাত রয়েছে, সে আবার ভয় করবে কাকে প্রভু? যে রূপেই তুমি আস না কেন, তোমায় যে ভালবেসেছে, তার কাছে তোমার সকল রূপই যে হাসিমাখা। প্রেম যেখানে, ভয় তো সেখানে নাই; সেখানে দুঃখ নাই, অসুন্দর কিছু নাই—সেখানে সবি স্নিগ্ধ, ফুল্ল শারদী জ্যোৎস্না মাখা। তুমি যে হাসির দেবতা—চরণ বাড়াতেই তোমার ভক্তহৃদয়ে অজস্রধারে আনন্দ ধারা যে ঝরে পড়ে। তাই ভক্ত তোমার আসা বুঝতে পারে, যখন অকারণ তার অঙ্গে পুলক বহে, যখন শুধু শুধুই তার হিয়া দুরু দুরু করে ওঠে। এই অকারণ অবারণ আনন্দই যে তোমার রূপ। ভক্তহৃদয় হতে বিশ্বজগতে সে রূপের জ্যোতিঃ ছড়িয়ে পড়ে—সে আলোতে "মধু বাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ"—বিশ্বপ্রকৃতি তখন সুন্দর—মানুষের মুখ অপরূপ সুন্দর। দেহের বেষ্টন তখন ভেঙ্গে পড়ে, মনের বাঁধন এলিয়ে যায়—এক আমিই তখন অনন্ত আমির রূপে বিকসিত হয়ে উঠে—তার প্রতি অণুতে অণুতে কেবল তুমি—আর তোমার সেই চিরসুন্দর হাসিটী!

*

মানুষ মানুষকে কি দিতে পারে?—শুধু বাইরের সম্পদ? শুধু শরীর দিয়েই যে আমরা পরস্পরের সাহায্য করতে পারি, তা নয়—প্রাণ দিয়ে, হৃদয় দিয়েও আমরা অপরের সহায়ক হতে পারি। যতটুকু অপরকে দিতে পারি, ততটুকু পর্য্যন্ত উভয়ের মাঝে যে একটা নিবিড় যোগ, একটা ঐক্যের অনুভূতি রয়েছে, তা স্বীকার করতেই হবে—নইলে কাউকে কিছু দেওয়া সম্ভব হত না। কিন্তু এই যোগ যে কতদূর ব্যাপ্ত, তা আমরা জানি না। আত্মায় আত্মায় যে সহজ ঐক্যের বন্ধন রয়েছে, তা বুঝি না। অধ্যাত্ম-যোগের প্রতি দৃষ্টি রাখলে বুঝি, শুধু দেহের দান বা প্রাণের দানেই মানুষের দানের পর্য্যাপ্তি নয়—আত্মার দানই আমাদের চরম দান। তাই ভারত যখন গুরুবাদ মেনেছে, তখন মানুষের এই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মহত্ত্বের কথাই তার অন্তরে জেগেছে যে, শুধু দেহ-মন-প্রাণের নয়, মানুষ এই আত্মার সম্পদের মহাজন পর্য্যন্ত হতে পারে—এতখানি বৃহত্ত্ব তার মাঝে আছে। এই আত্মার দানেরও একটা বিশেষ ধারা আছে। এক আত্মার আর এক আত্মাকে যে দান, তা ভগবানেরই দান—তাই তা অতিমাত্র সহজ—সে যেন ঠিক সূর্য্যরশ্মির মত—আপনি এসে সে চোখে ঠেকছে, তাকে অস্বীকার করবার যো নাই। এইখানেই হচ্ছে গুরুশিষ্যের খাঁটী সম্বন্ধ—এইখানেই গুরুশক্তির সত্য পরিচয়।

*

এলোমেলো কথা সুন্দর নয়, সুন্দর হচ্ছে কবিতা, কেননা তাতে ছন্দ রয়েছে। তেমনি কাজের শৃঙ্খলা হচ্ছে তার সৌন্দর্য্য, তাই তার আনন্দ। কর্ম্মকে যে বৃহতের ভূমি হতে দাঁড়িয়ে দেখতে হবে, সে তো খুবই খাঁটী কথা—তার পর তাকে সংযম আর শৃঙ্খলার

মাঝে দিয়েও দেখ্‌তে হবে। বাস্তবিক শৃঙ্খলা কথাটার মাঝেই একটা ব্যাপকতা রয়েছে—ব্যাপকভাবে দৃষ্টিক্ষেপ করতে না পারলে শৃঙ্খলা কখনো চোখে পড়ে না। এই যে সমস্তটা বছরের মাঝে ষড়-ঋতুর একটা ছন্দ রয়েছে, বসন্তের প্রাচুর্য্যের মাঝে বা শীতের শীর্ণতার মাঝে দৃষ্টি অবরুদ্ধ রেখে আমরা তার পরিমাণ করতে পারি কি? খণ্ড-ভাবে যখন দেখি, তখন একটাতে আমাদের মাঝে যেমন অতিমাত্রায় উত্তেজনার সৃষ্টি করে, আর একটাতে তেমনি অতিমাত্র অব-সাদে আমাদের প্রাণশক্তিকে সঙ্কুচিত করে আনে। কিন্তু কোনও কিছুর আতিশয্যই তো সৌন্দর্য্য নয়; আলো আর ছায়াকে যিনি "যাথাতথ্যতো বিদধাতি"—তিনিই শিল্পী, তিনিই "কবির্মনীষী।" এই কবির মতনই উদার দৃষ্টি নিয়ে কর্ম্মকে ব্যাপকতার মাঝে গ্রহণ করে, সুনিপুণ শৃঙ্খলায় সাজিয়ে তাকে সুন্দর করে তুলতে হবে, ছন্দের বন্ধনে তার উদ্দাম গতিকে নৃত্য-কুশল করতে হবে।

*

আসলে আমরা সকলেই মুক্ত কিন্তু নিজকে মুক্ত বলে না ভাবাই বন্ধনের কারণ। তাই যিনি নিজকে মুক্ত ভাবেন তিনি মুক্ত, আর যিনি বদ্ধ ভাবেন তিনি বদ্ধ। এই জন্যই জগৎ মায়াজালে আবদ্ধ থাকলেও শঙ্করাচার্য্য, গৌরাঙ্গ প্রভৃতি মহাপুরুষগণ মুক্ত, আর তাঁরা মুক্ত হলেও অজ্ঞানীরা বদ্ধ। মুক্তি মানবের স্বরূপাবস্থা, অজ্ঞানাবৃত হয়ে আমরা নিজকে বদ্ধ ভাবি মাত্র। সুতরাং স্বরূপতঃ আমরা এক হলেও আমাদের মুক্তি ও বন্ধন পরস্পর নিরপেক্ষ।

সংবাদ ও মন্তব্য

আশ্রমসংবাদ—মঠাধিষ্ঠাতা শ্রীমৎ পরমহংসদেব সম্প্রতি ঢাকা অবস্থান করিতেছেন। শারদীয়া পূজার পূর্ব্বে তাঁহার মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার কথা আছে।

জন্মোৎসব—বিগত ৯ই ভাদ্র তারিখ অত্র সারস্বত মঠে মঠাধিষ্ঠাতা শ্রীমৎ পরমহংসদেবের শুভ জন্মোৎসব যথারীতি সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। উক্ত তিথিতে বগুড়া, জগৎসী, তরা, সন্দীপ, উচালন, হাওড়া, ভঞ্জ, কুচবিহার প্রভৃতি স্থানে ভক্তগণকর্ত্তৃক জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে, এরূপ সংবাদ আমরা পাইয়াছি। শিষ্য ভক্তগণ শুনিয়া আনন্দিত হইবেন, এবারকার উৎসব সর্ব্বত্রই সুচারুরূপে ও মহানন্দে নিষ্পন্ন হইয়াছে।

উৎসবে সাহায্যপ্রাপ্তি—জন্মোৎসব উপলক্ষে আমরা নিম্নলিখিত সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছি—শ্রীযুক্ত অধরচন্দ্র পাল ২০৲, শ্রীযুক্ত গগনচন্দ্র দে ১০৲, সন্দীপবাসী ভক্তগণ মাঃ শ্রীযুক্ত করুণাকান্ত মুখোপাধ্যায় ১০৲, শ্রীযুক্ত কুমারকৃষ্ণ ৬৲, শ্রীযুক্ত ভূষণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ৫৲, শ্রীযুক্ত অমলকুমার মুখোপাধ্যায় ৫৲, শ্রীযুক্ত পশুপতিনাথ দত্ত ৫৲, শ্রীযুক্তা কৃষ্ণভাবিনী দেবী ২৲, শ্রীযুক্ত সত্যপদ দে ১৲, শ্রীযুক্ত হরিনাথ কর ১৲।

কৃষ্ণ-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার

ওঁ তৎ সৎ

আর্য্য-দর্পণ

(সনাতন ধর্ম্মের মুখপত্র)

১৬শ বর্ষ } আশ্বিন { ৬ষ্ঠ সংখ্যা

...ক্রমিক সং
...সং
...কলিকাতা।

আনন্দ-লহরী

[শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য]

হরিস্ত্বামারাধ্য প্রণতজনসৌভাগ্যজননীং,
পুরা নারী ভূত্বা পুররিপুমপি ক্ষোভমনয়ৎ।
স্মরোঽপি ত্বাং নত্বা রতিনয়নলেহ্যেন বপুষা,
মুনীনামপ্যন্তঃ প্রভবতি হি মোহায় মহতাম্॥

ধনুঃ পৌষ্পং মৌর্ব্বী মধুকরময়ী পঞ্চ বিশিখা,
বসন্তঃ সামন্তো মলয়মরুদায়োধনরথঃ।
তথাপ্যেকঃ সর্ব্বং হিমগিরিসুতে কামপি কৃপা-
মপাঙ্গাত্তে লব্ধ্বা জগদিদমনঙ্গো বিজয়তে॥

ক্বণৎকাঞ্চীদামা করিকলভকুম্ভস্তনভরা,
পরিক্ষীণা মধ্যে পরিণতশরচ্চন্দ্রবদনা।
ধনুর্ব্বাণান্ পাশং সৃণিমপি দধানা করতলৈঃ,
পুরস্তাদাস্তাং নঃ পুরমথিতুরাহোপুরুষিকা॥

সুধাসিন্ধোর্মধ্যে সুরবিটপিবাটিপরিবৃতে,
মণিদ্বীপে নীপোপবনবতি চিন্তামণিগৃহে।
শিবাকারে মঞ্চে পরমশিবপর্য্যঙ্কনিলয়াং,
ভজন্তি ত্বাং ধন্যাঃ কতিচন চিদানন্দলহরীম্॥

বিতর সৌভাগ্য তারে, লোটে দেবী, যে তোমার পায় ;—
তোমারে নমিয়া হরি মোহে হরে নারীর মায়ায়,—
মনসিজ মোহে রূপে—রতি-আঁখি পিয়ে তার সুধা—
মহামুনি-মানসেরও বাড়ায় সে কামনার ক্ষুধা।

পুষ্প-ধনু, গাঁথা গুণ মধুকরে—তাহে পঞ্চ তীর,
বসন্ত সামন্ত তার, যুদ্ধ-রথ মলয়-সমীর ;
কি ইঙ্গিত দিল তারে, গিরিসুতা, অপাঙ্গ করুণ—
অনঙ্গ অসঙ্গ তবু, বিশ্বহিয়া করেছে অরুণ !

রুণুঝুনু কাঞ্চীদামে, স্তনযুগে করিকুম্ভ ছাঁদ,
ক্ষীণ কটি, মুখখানি পরিপূর্ণ শরতের চাঁদ,
ধনুর্ব্বাণ শোভে হাতে, পাশাঙ্কুশ শোভিয়াছে ভালো—
মহেশের অভিমানরূপা তুমি নিখিলের আলো !

সুধাসিন্ধু মাঝে আছে সুরতরু-ঘেরা-চারিপাশ
মণিদ্বীপে নীপবনে চিন্তামণি-রচিত-আবাস ;—
পঞ্চশিব-মঞ্চে সেথা মহাশিব-পর্য্যঙ্ক-শয়ন
চিদানন্দরূপা তোমা ধন্য হেরি সাধক-নয়ন।

মাতৃমূর্ত্তি

—※—

মায়ের মন্দিরে পূজারী তুমি—আজ কি উপচার আনিয়াছ? বসন্তের স্পর্শে প্রকৃতির বুকে প্রাণের শিহরণ দেখিয়াছি, গ্রীষ্মের রুদ্র পিপাসা বর্ষার অমৃতধারায় স্নিগ্ধ হইতে দেখিয়াছি, আর তাহারই সঙ্গে সঙ্গে দেখিয়াছি যৌবনোচ্ছসিতা, প্রকৃতির মাঝে অগণিত ভ্রূণের আবির্ভাব। আজ সে উচ্ছাস শান্ত হইয়া গিয়াছে,—মাতৃত্বের গৌরবে প্রকৃতির যৌবনশ্রী সার্থক—আর আবেগ নাই, উচ্ছাস নাই—দিকে দিকে তাহার গর্ভভারালসা জননীর স্নিগ্ধ মূর্ত্তি। এই তো মাকে আবাহন করিবার উপযুক্ত সময়। কিন্তু এমনি করিয়া বাহিরে ভিতরে তোমার সুর মিলিয়াছে কি? হিমঋতুর অবসাদ ঘুচাইয়া বসন্তের কুঞ্জদুয়ারে জ্ঞানরূপিণী বীণাপাণির আবাহন করিয়াছিলে কি? সেই দিব্যজ্ঞানের জ্যোতিঃতে বসন্তের প্রাণস্পন্দনে মায়ের আবির্ভাব সূচিত হইতে দেখিয়াছিলে কি? বসন্তের মুকুল-কিসলয়ের সঙ্গে তোমার সাধনা মুঞ্জরিত হইতে দেখিয়াছিলে কি? তারপর গ্রীষ্মের সুকঠোর তপস্যা আর বর্ষার উন্মত্ত প্লাবনের মাঝ দিয়া আজ শরতের পরিপূর্ণতায় তোমার সাধনাকে উত্তীর্ণ করিয়াছ কি? সারা বৎসরের তপস্যার ফল আজ মিলিবে; যদি তপস্যা না করিয়া থাক, তবে তোমার এই পূজার আড়ম্বর বৃথা হইয়াছে। ইহাতে তোমার আত্মাভিমান তৃপ্ত হইতে পারে—কিন্তু আত্মার পূর্ণতা ইহাতে ঘটিবে না, সুতরাং যে আত্মসমর্পণ পূজার প্রকৃত স্বরূপ, তাহাও সম্পূর্ণ হইবে না।

মায়ের মূর্ত্তি কেবল মানুষের মূর্ত্তিই নয়—"নিত্যৈব সা জগন্মূর্ত্তিঃ।" আমরা মানুষ, প্রাণে ভাবের সম্যক্ স্ফুরণ না হইলেও কেবল মানুষের মুখ দেখিয়াই অজানা ভাবের আবেশে আকুল হইতে পারি, তাই মাকে মানুষ বলিয়া কল্পনা করিয়াই সুখ পাই। কিন্তু সেই কল্পনার মূলে যে নিবিড় আনন্দ, যে সুগভীর রসময় ভাবসম্পদ আস্বাদন করাইবার জন্য সকল মূর্ত্তি ছানিয়া সকল ভাব গলাইয়া মায়ের ওই ভাবাবেশময়ী মূর্ত্তি কল্পিত হইয়াছে—সেই ভাবের দিকে আনন্দের দিকেই যদি চিত্ত প্রসারিত না হইল, তবে এই কল্পনার ফল কি? মায়ের মূর্ত্তি কি শুধু পূজামন্দিরেই প্রতিষ্ঠিত থাকিবে? যেমন সহজ দৃষ্টিতে তরুলতা, নদী, বন, উপবন দেখি, যেমন সহজে প্রকৃতির মাঝে সৌন্দর্য্য প্রত্যক্ষ করি, তেমনি করিয়া মাকেও কি ইহার সর্ব্বত্রই প্রত্যক্ষ করিব না? অমূর্ত্ত আনন্দের মাঝে কি মূর্ত্তি লীন হইয়া যাইবে না? তা যদি না হয়, তবে মানুষের গণ্ডীর মাঝে আমার মায়ের মূর্ত্তি আবদ্ধ রাখিতে চাহি না!

জানি, পথ দুইটী। এক মূর্ত্তিকে গলাইয়া অমূর্ত্তে লীন করিয়া দেওয়া; আবার অমূর্ত্তকে ঘনীভূত করিয়া ভাব-সার মূর্ত্তি গড়িয়া তোলা। যাই কর না কেন, অমূর্ত্তের মাঝে একবার অবগাহন করিতেই হইবে, নতুবা মূর্ত্তিজগতের সংস্কার কাটিবে না। আমরা একটা প্রত্যক্ষ দেখিয়াছি, আর একটা দেখি নাই। তবে চেতনার, আনন্দের উজ্জ্বল মুহূর্ত্তে তাহার একটু আভাস পাইয়াছি মাত্র। অমূর্ত্তের

আভাসটুকু লইয়াই মূর্ত্তি গড়িয়াছি—সুতরাং আমাদের হাতে-গড়া এই বস্তুটাই মায়ের রূপ নয়, ইহা রূপাভাস মাত্র। তবে আনন্দের ছিটে ইহাতেও লাগিয়াছে—আমার কল্পনা যতদূর যায়, ততদূর হইতে বিচিত্র সৌন্দর্য্য আহরণ করিয়া আনিয়া এই রূপটী গড়িয়াছি—তাই আমার নিত্যদৃষ্ট বিরূপের জগতে এই রূপটীকেই অন্তরের রসব্যাকুলতার অবলম্বনস্বরূপে ধরিতে চাই। কিন্তু কেবল ইহার মাঝেই তো মজিয়া থাকা চলে না। ইন্দ্রিয়ানুভূতির সংস্কার লইয়া যে রূপ গড়িয়াছি, তাহার আর গভীরতা কতটুকু? ইন্দ্রিয় ইহার মাঝেই আত্মহারা হইতে পারে বটে, কিন্তু তার পরেও যে আমার মাঝে কত পিপাসা রহিয়া গেল, সে তো শুধু ইন্দ্রিয়াশ্রিত রূপে মিটিবার নয়।

তাই ইন্দ্রিয়াতীত লোকে আবার মাতৃ-মূর্ত্তির সন্ধানে বাহির হইতে হয়, নতুবা পূর্ণ তৃপ্তি পাই না—শুধু একটী বিশেষ রূপ দিয়া জগতের সমস্ত বিচিত্র রূপের রহস্য বুঝিতে পারি না। আনন্দ, সৌন্দর্য্য, চেতনা জগতের সর্ব্বত্রই। তুমি মানুষ, তোমার মাঝে যেমন আনন্দের প্রেরণা, তেমনি প্রেরণা তো পশু-পক্ষী কীট-পতঙ্গের মাঝেও আছে। তাহাদের মাঝেও মাতৃত্বের, সন্তানত্বের উন্মেষ আছে এবং সে উন্মেষেরও রূপ পর আছে। বিশ্বজননীর জননীত্ব তো তাহাদেরও জীবনের আধার। কিন্তু মায়ের মানুষী রূপ দিয়া তো সেখানকার ভাবকে আশ্রয় দেওয়া চলে না। তাই বলি, মায়ের শুধু একরূপেই সব রূপের সামঞ্জস্য হয় না। মাতৃসত্তা দিয়া নিখিল জগৎকে অনুপ্রাণিত ভাবিতে গেলে শুধু মানুষী মূর্ত্তির কল্পনাতে চলে না। এই জন্য মায়ের ধ্যান সম্পূর্ণ হইতে হইলে রূপকে অতিক্রম করিয়া যাইবার প্রয়োজন আছে।

মায়ের রূপ আছে, কিন্তু সে রূপ মায়ের সমস্ত ব্যষ্টিরূপের সমষ্টি। এক অবিভক্ত চৈতন্যই অন্তঃকরণের মধ্যস্থতায় কত বিচিত্র রূপে প্রকাশ পাইতেছে। যদি অন্তঃকরণ ধরিয়া বুঝিতে যাই, তবে তাহার বৈচিত্র্যের আর শেষ পাই না—চৈতন্যকেও বুঝিতে পারি না। কিন্তু মূলে এক চৈতন্য ধরিয়া সমস্ত অন্তঃকরণের মাঝেই সামঞ্জস্য করিয়া লইতে পারি। উপনিষদ্ এই কথাটী দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝাইয়াছেন, "এককে জানিলে সব জানা যায়, যেমন একটী মৃত্তিকাখণ্ডের তত্ত্ব জানিলে মৃত্তিকানির্ম্মিত সমস্ত বস্তুরই তত্ত্ব জানিতে পারা যায়, একটী নরুণের তত্ত্ব জানিলে লৌহনির্ম্মিত সমস্ত বস্তুরই তত্ত্ব জানা যায়।" যেমন চৈতন্যের বেলাতে, তেমনি রূপের বেলাতেও এই উপমা খাটে। চাই মায়ের রূপ; কিন্তু বিকারের জগতে তো মায়ের আসল রূপটি দেখিতে পাইব না। এখানে আধারভেদে মায়ের কত রূপই দেখি, কিন্তু যে আদিরূপ হইতে এই সমস্ত প্রপঞ্চ-জগতের রূপ ঝরিয়া পড়িয়াছে, তাহাকে তো কোনও এক বিশেষ রূপের মাঝে অবরুদ্ধ করা যায় না। তোমার কল্পিত মাতৃমূর্ত্তি তোমার জাতীয় সংস্কার দ্বারা বিশিষ্ট। এমনি আরও কত জাতির সংস্কার দ্বারা বিশিষ্ট কত মাতৃমূর্ত্তি অহরহঃ দেখিতেছি—চক্ষুর অন্তরালে এমন আরও কত আছে, তাহা জানি না। কিন্তু অখিলা-ধার মায়ের মূর্ত্তিতে তো ইহাদের সামঞ্জস্য হওয়া চাই। সে সামঞ্জস্য যেমন রূপে, তেমনি অরূপে। অর্থাৎ শুধু রূপবিবর্জ্জিত ভাবরসটুকুকেই মায়ের বিগ্রহ বলিলে চলিবে

না—বিশেষ বিশেষ জাতির সহিত যে বিশেষ বিশেষ রূপের সংস্কার জড়িত রহিয়াছে, এক সর্ব্বঘন মাতৃমূর্ত্তি হইতে তাহাদেরও তৃপ্তি চাই। তাই মায়ের ভাবজ্ঞেয় রূপ, তখন মা আমার সবিশেষে নির্ব্বিশেষ—অরূপের আশ্রয়ে নিখিল রূপের সমন্বয়। সে রূপে দেশ, কাল, নিমিত্তের পরিচ্ছেদ নাই, অথচ দেশ, কাল, নিমিত্ত-সংস্থানের সমস্ত সম্ভাব্যতা তাহার কুক্ষিগত।

এমন মাকে যদি পাই, তবে আমারও সন্তানের গর্ব্ব চরিতার্থতা লাভ করে। বিশ্বপ্রসবিনী জননীর বিশ্বই তো সন্তান—বিশ্বের অনন্ত সন্তানের কাছে মা আমার অনন্তরূপে বিলসিতা। আমার কাছে যদি সেই অনন্তরূপিণী ভাবৈকগম্যা জননীর অপরূপ মূর্ত্তিখানি বিকশিত হয়, তবে আমিও যে আমার সন্তানত্বের পরিধিকে আর সংস্কারের সীমায় অবরুদ্ধ রাখিতে পারিব না—আমিও তখন বিশ্বজননীর বিশ্বরূপী সন্তান। আমারও রূপের অন্ত নাই, অথচ আমার সমস্ত রূপ এক অরূপেই সমাহিত।

এই তো মায়ের ভাবজ্ঞেয় রসঘন মূর্ত্তি। আবার তত্ত্ববিচার কর, মায়ের জগন্মূর্ত্তি তোমার কাছে প্রকটিত হইবে। মা কোথায়? আমার জড়চক্ষুর অন্তরালে কোন লোকে কি? তা যদি হইবে, তবে এই জড়জগৎকে বক্ষে ধরিয়া আশ্রয় দিবে কে? তাই জানি, মা আমার যেমন চরম প্রত্যক্ষের বিষয়, তেমনি তিনি এই স্থূল প্রত্যক্ষেও ধরা দিয়াছেন—শক্তিরূপে। মা আমার শক্তিরূপিণী। নির্ব্বিশেষ চৈতন্যের কথা শুনিলাম, সর্ব্বব্যাপী একরস সত্তাতে চরাচরকে ব্যাপ্ত করিয়া তাহারও ঊর্দ্ধে অমৃত হইয়া রহিয়াছে। সেই চৈতন্যে আমারও "আমি" আলোকিত, তাহা অনুভব করিতেছি। আর দেখিতেছি, আমার "অহং" ব্যতিরিক্ত এই "ইদং"এর জড়পিণ্ড। আমি দ্রষ্টা আর সমস্তই দৃশ্য। ইন্দ্রিয়সহায়ে স্থূল জগৎকে দৃশ্যরূপে তো দেখিতেছিই—অন্তঃকরণ দিয়া আবার যখনই অন্তরের যে ভাবকে অতিক্রম করিয়া ঊর্দ্ধে অবস্থান করিতেছি, তখনই সে ভাব আমার দৃশ্যরূপে প্রতিভাত হইতেছে। দ্রষ্টা চেতন, তদ্বিপরীত দৃশ্য অচেতন—তবে দুইয়ে সংযোগ ঘটাইল কে?

এইখানেই শক্তি স্বীকার করিতে হয়। চৈতন্যকে নির্ব্বিকার মানিয়া লইলাম, কিন্তু জড়ের মাঝে দেখি, বিকারের অন্ত নাই। এই বিকার কোথা হইতে আসিল? শক্তিই বিকার ঘটাইতেছে। কাহার শক্তি?—চৈতন্যেরই শক্তি। যেমন চৈতন্যের আলোক ছাড়া জড়ের দৃশ্যত্ব সাধিত হইতে পারে না, তেমনি চৈতন্যের আশ্রয় ছাড়া শক্তির স্পন্দনও কোথাও স্ফুরিত হইতে পারে না। চৈতন্য নাই, অথচ শক্তি আছে—এ অসম্ভব। বাহ্যতঃ জড়ে শক্তির ক্রিয়া দৃশ্য হইলেও দ্রষ্টৃ চৈতন্যের সহিত একাত্মভাবে সংমিশ্রিত না হইয়া দৃশ্য ক্রিয়াও তো কখনও জ্ঞানগোচর হইত না। তা ছাড়া, শক্তি যে চৈতন্যের আশ্রিত, তাহাও অনুভবসিদ্ধ। তোমার মাঝেও বিকার ঘটিতেছে। যাহা পরতঃ বিকার, তাহার তুমি অনুভবিতা। তোমার অনুভব না থাকিলে পরতঃ-বিকারের কোনও অস্তিত্ব থাকে না। আর যাহা স্বতঃ-বিকার, সে তো তোমারই কর্তৃত্ব হইতে উদ্ভূত—তুমিই তো তোমার ইচ্ছাতে সে বিকার ঘটাইতেছ। সুতরাং কি স্বতঃ,

কি পরতঃ, উভয়ত্র চৈতন্য আশ্রয় না করিয়া শক্তির সত্তা সিদ্ধ হইতেছে না। চৈতন্য প্রত্যক্ষানুভবসিদ্ধ—শক্তি তাহারই আশ্রিত; সুতরাং শক্তিও প্রত্যক্ষদৃষ্টিতে সপ্রমাণ।

এই শক্তিকেই বলি মা। স্বতঃ ও পরতঃ—এই দুই রূপে শক্তির বিকাশ দেখিয়াছি। স্বতঃ আর পরতঃ ভেদ আধারের সঙ্কীর্ণতা হেতু। যদি আমার আমিত্বকে বিশ্বময় ব্যাপ্ত করিতে পারি, তবে শক্তির সমস্ত পরতঃ বিকাশই আমার স্বতঃ স্ফুরণের অন্তর্ভুক্ত হইবে অর্থাৎ তখন শক্তির একমাত্র রূপ থাকিবে—তাহা **ইচ্ছা**। এই ইচ্ছা বা বাসনাই জগতের বীজ—ইচ্ছাকে অবলম্বন করিয়াই নির্ব্বিকার ব্রহ্ম বিকারে বিবর্ত্তিত হইতেছেন, আর আমাদের অধ্যস্ত দৃষ্টিতে বিকারী বস্তু সমূহ পরিণাম প্রাপ্ত হইতেছে। বিরাট ভাবে যখন এই তত্ত্বটী উপলব্ধি করি, তখনই বলি, ইচ্ছাময়ী মা আমার ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডোদরী, মা আমার শিবসোহাগিনী। মা আমার চৈতন্যরূপিণী, অথচ তাঁহার কটাক্ষের ইঙ্গিতে অনন্ত কোটী জড় জগতের সৃষ্টিপ্রলয় সাধিত হইতেছে—তাহাদের অণু-পরমাণুতে মা আমার শক্তিরূপে অনুপ্রবিষ্ট। বুঝিতে পারি না, মা আমার সগুণা কি নির্গুণা, তাই বলি তিনি অনির্ব্বচনীয়া। জড়কে বিশ্লেষণ করিয়া চরমে শক্তিকেন্দ্র ছাড়া আর কিছু পাই না—এক মহাশক্তির বিলাসেই এই বিচিত্র মায়াজগতের উৎপত্তি—তাই বলি, সগুণে মা আমার জগন্মূর্ত্তি। এই সগুণ ভাবও যেমন তাঁহার নিত্য, তেমনি ব্রহ্মস্বরূপে লীন নির্গুণ ভাবও নিত্য। শক্তি শক্তিমানে ভেদ নাই, অনির্ব্বচনীয় তত্ত্বে উভয়ে সম্পুটিত। তাই মা আমার একাধারে মহামায়া ও যোগমায়া—অতএব অনির্ব্বচনীয়া।

আবার নিজের মাঝে দেবশক্তিকে জাগ্রৎ করিতে চেষ্টা কর, মায়ের সংঘমূর্ত্তি দেখিতে পাইবে। আত্মশক্তির উদ্বোধনে তাহার স্ফুরণ। দশভুজা দুর্গতিনাশিনী দুর্গার উপাসনায় আজ আমরা প্রবৃত্ত। এখন মায়ের এই রূপই আমাদের বড় প্রয়োজন হইয়াছে; আমরা আজ বিচ্ছিন্ন, হৃতশক্তি, হীনপ্রভ। একা একা কিছুই করিতে পারি না—অথচ সকলেরই হৃদয়ে আগুন ধূমায়িত রহিয়াছে। একবার আমাদের সংহত হওয়া প্রয়োজন—সকলের হৃদয়ের আগুনকে এক জায়গায় জ্বালিয়া তোলা প্রয়োজন। হৃদয়ে হৃদয়ে যোগ হইলে নিখিল তেজের সমবায়ে আপনা হইতেই দশপ্রহরণধারিণী শক্তিরূপিণী মায়ের আবির্ভাব হইবে—তাঁহার অঙ্গপ্রভায় ত্রিলোক পরিব্যাপ্ত হইবে, দেবতার কার্য্য অনায়াসে সফল হইবে। দেবকণ্ঠে আজ আমরাও বলিব—

দেব্যা যয়া ততমিদং জগদাত্মশক্ত্যা
নিঃশেষদেবগণশক্তিসমূহমূর্ত্ত্যা।
তামম্বিকামখিলদেবমহর্ষিপূজ্যাং
ভক্ত্যা নতাঃ স্ম বিদধাতু শুভানি সা নঃ॥

প্রেম

—*—

"এই পরিবর্ত্তনশীল বিশ্বের আমিই আদি, আমিই অন্ত। 'সূত্রে মণিগণা ইব' আমাতেই সব গাঁথা রয়েছে—আমার পরে আর কিছুই নাই। চন্দ্র সূর্য্যের জ্যোতিঃ আমি, আমিই সলিলের স্বাদ, কল্যাণ চিন্তার বীর্য্যসার আমি, —আমি শব্দের শব্দ, মানুষের মানুষ, প্রাণের প্রাণ।

"প্রেম-ভক্তির কেন্দ্রবিন্দু আমি—আমি সর্ব্বভুতের বীজ, বলীর বল, জ্ঞানীর জ্ঞান। আমার সত্য উপাসক যারা, তাদের কর্ম্মে আমার বিধানকে সফল করি। আমাকেই তারা পরাগতি বলে জানে, তাই আমার প্রেমে তাদের হৃদয় ভরা। আমিই তাদের জীবনের ধ্রুবতারা, মৃত্যু-সংসার-সাগর হতে আমিই তাদের উদ্ধার করি।

"কার এষণায় মন বিষয়ে যুক্ত হয়? প্রাণের গতি কার প্রেরণায়? কার আলোকে বুদ্ধি আলোকিত? চক্ষুকর্ণই বা কার জ্যোতিতে সমুজ্জ্বল?

"যিনি চক্ষুর চক্ষু, মনের মন, বাক্যের বাক্য, প্রাণের প্রাণ, আমার আমি, দুঃখ আর মৃত্যু তাঁরই বেদন।"

জানা মানে সত্যকে ভালবাসা। সত্য কি?—তত্ত্বমসি বা প্রেম স্বয়ম্।

এক অনভিব্যক্ত প্রেমই বিভিন্ন স্তরে আত্মপ্রকাশ করে—তাই অনুরাগ, সংযোগ, মাধ্যাকর্ষণ, লোভ, বাসনা, উচ্চাকাঙ্ক্ষা। স্পন্দনের বিভিন্ন অবস্থায় একই প্রেম চুম্বক-শক্তি, বিদ্যুৎ, তাপ, আলোক প্রভৃতি বিভিন্ন আকারে প্রকাশিত হয়—শক্তি কেন্দ্র রূপে জড় জগতের অণুসমূহের যে সূক্ষ্মতত্ত্ব ব্যাখ্যান করা হয়, তা এই প্রেমেরই ধর্ম্ম। জড়ের চরম বিশ্লেষণে তা প্রেমেরই ঘনীভূত রূপে প্রকাশিত হয়। জগতের নিয়ম কি? —বহুর মাঝে এক, বৈষম্যের মাঝে সমতা, বৈচিত্র্যের মাঝে মিলনের আবিষ্কারই হচ্ছে নিয়ম। সে তো প্রেমেরই একটী বিশেষ প্রকাশ। গুপ্তচরের কৌতূহলে, ছিদ্রান্বেষীর ছলনায়, বন্ধুর বিশ্বাসঘাতকতায়, শত্রুর ভ্রূকুটীতে, সর্ব্বত্রই তো একমাত্র প্রেমেরই ক্রিয়া।

প্রেম ছাড়া জগতে আর কোনও শাসন নাই। কার্লাইল বলেছিলেন, ঘৃণা প্রেমেরই বিপর্য্যস্ত রূপ। প্রেমের কঠিন অবস্থাই ভয় —নইলে প্রেম ভয়কে জয় করে কি করে? হাজার টাকার তোড়া নিয়ে জঙ্গলের মাঝ দিয়ে যেতে মানুষ **ভয়** করে, কেননা সে যে টাকাগুলিকে **ভালবাসে**। যার বন্ধন নাই, সে যাকে দেখে, তাকেই বন্ধু বলে অভিনন্দিত করতে পারে। প্রেমই যখন একমাত্র সত্য শক্তি, তখন প্রেমের সঙ্গে নিজকে একাত্ম অনুভব করাই হল **মুক্তি**। গুণাতীত প্রেমের অনুভূতি লাভ করবার জন্য জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে চেষ্টা করাই **জীবন**; এই লক্ষ্যে পৌছাবার জন্য সব চেয়ে সহজ ও দ্রুত পথ অনুসরণ করবার ইচ্ছাই হল **সুবুদ্ধি**; আর বিভিন্ন প্রেম শক্তিকে এক লক্ষ্যে সংহত করাই **ধর্ম্ম**।

প্রেমে অবিশ্বাসের কোনও ঠাঁই নাই— প্রেমিক কখনও বিশ্বাসঘাতক হতে পারে না।

কোনও ব্যক্তিই অবিশ্বাসী নয়। কেউ ইহুদী, যবন, ব্রাহ্মণ বা শূদ্র হয়েছে বলে তার ভবিষ্যৎ সম্ভাব্যতাকে আমাদের খাটো করে দেখবার কোনও অধিকারই নাই। যারা যুগ-যুগ ধরে গোঁড়ামীর গোলাম, তাদেরও পরিত্রাণের পথ আছে। শ্রীকৃষ্ণ যেমন গোপীদের পতিকুল থেকে আকর্ষণ করে এনেছিলেন, তেমনি সত্যস্বরূপ ভগবান তোমাকে গতানুগতিকতা ও গোঁড়ামীর গ্রাস থেকে একদিনই উদ্ধার করবেনই।

যা কিছু সৎ, তাই কল্যাণ। যা যোগ্য, যথার্থ—তাই ভগবান্। আপনাকে যোগ্য করে তুলবার অবিরাম চেষ্টাই হচ্ছে জগতের গতির স্বরূপ। কাজেই বলব, জগৎ একটা অবিচ্ছেদ কল্যাণের প্রবাহ মাত্র। অতীতের সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলা হল গোঁড়ামী; বর্ত্তমানের অভিনব সচল ব্যবস্থার সঙ্গে তার নিত্য বিরোধ। কিন্তু অভিনব ব্যবস্থাই হল ভগবানের রূপ, কেউ তাকে রোধ করতে পারে না। অভিনব ব্যবস্থা যখন প্রাচীন ব্যবস্থাকে অভিভূত করে আত্মপ্রকাশ করে, তখন চারদিকে একটা সোরগোল ওঠে—আলোয় আলোয় চোখ ঝল্‌সে যায়। একেই বলে বিপ্লব।

বদলে কিছু না পেলে আমরা কিছু ছাড়তে চাই না। উন্নতি ক্রমে ক্রমে হয়। প্রেম আর অনুরাগ হচ্ছে এক ভূমিতে দাঁড়িয়ে একটা কিছু আঁকড়ে ধরবার চেষ্টা; আর এক ভূমি হতে দেখলে ত্যাগ ছাড়া সে তো আর কিছু নয়। প্রেমের বস্তু সর্ব্বদাই রূপ বদলাচ্ছে—আর তার পরিণতি বা বিকাশের প্রতি স্তরেই সে বহু প্রাচীন সংস্কারের মায়া কাটাচ্ছে। এমনি করে ধীরে ধীরে অবশেষে এমন একটা সময় আসে যখন প্রেমিক প্রেমকেই শুধু ভালবাসে—প্রেমের বস্তু তখন, শুধু তার নয়—জগতেরই আত্মস্বরূপ হয়ে দাঁড়ায়। প্রেমিক তখন তার পরমাত্মস্বরূপে পুনর্মিলিত হয়—এই তার বিবাহ। এই বিবাহের পর প্রেমিক দেখে—বিশ্বজগত তারই বাহুর আবেষ্টনে, সবই তার বুকে। এমন প্রেমিকের আর কামনার কি থাকে? প্রিয়াকে যখন আমার বাহুবন্ধনের মাঝেই পেলাম, তখন আর তাকে খুঁজতে যাব কোথায়?

গুণাতীত প্রেমই মানুষের স্বরূপ। তুমিই প্রেম। শোন, তুমি বিশ্বাত্মা। লয়লার অরুণ কপোলে গোলাপের রাঙ্গা হাসি ফুটিয়ে তুলছ তুমি—আবার সেই তুমিই তৃষিত মজনুর শোণিতাপ্লুত হৃদয়ে প্রকাশ হচ্ছ। বাস্তব জীবনে এই সত্যকে অনুভব করাই হল ব্রহ্মচর্য্য। কিন্তু যে নাকি বিষয় খুঁজে বেড়ায়, নিজ হতে ভিন্ন আর কাউকে পাবার আশায় ছুটাছুটি করে, সে তার ভাগবতী তনুকে দ্বিখণ্ডিত করে—কাজেই তার ব্রহ্মচর্য্যকেও খণ্ডিত করে। কেবল এড়িয়ে চলা, কেবল কুকুর-কুণ্ডলী হয়ে থাকাই ব্রহ্মচর্য্য নয়; সৌন্দর্য্যকে প্রতিহত বা প্রত্যাখ্যাত করাই ব্রহ্মচর্য্য নয়। যে অবস্থায় সমস্ত সৌন্দর্য্য আমার মাঝেই সমাহিত অনুভব করি, সকলের সঙ্গে আমার অধ্যাত্ম-মিলনকে এত নিবিড় বলে অনুভব করি যে কাউকে দেখা বা কথা বলার কল্পনাতেও বিরহের আশঙ্কায় ব্যাকুল হয়ে উঠি—সেই অবস্থাই হচ্ছে যথার্থ ব্রহ্মচর্য্য।

টেনিসন্ বলছেন, "কথা কইতে হলে তাঁর সঙ্গেই কও—কেননা তিনি শোনেন—আত্মায় আত্মায় যোগ সম্ভব। তোমার

হাত পা, শ্বাস-প্রশ্বাসের চেয়েও তিনি তোমার কাছে। চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্র, পাহাড়, পর্ব্বত—সমস্তই কি সেই বিশ্বরাজের রূপ নয় ?"

হে সত্যস্বরূপ, হে প্রেমময়, ঝঞ্ঝার আবর্ত্তে আমি তোমার কণ্ঠস্বর শুনি, স্রোতস্বিনীতে তোমার গতি অনুভব করি। সূর্য্যের উদয়ে তুমি সুন্দর, অস্তেও তুমি সুন্দর। তুমি আমার দূরে, তবু নিকটে; তোমার সুর সদাই শুনি—তোমার সুরেই আমায় ভুলিয়ে কোথায় নিয়ে যায়। মরব —তবুও তোমায় ছাড়ব না।

আত্মস্বরূপকে সবার স্বরূপ বলে যে জান্‌তে পারে, তার আর চাইবার কিছু থাকে না—সব বস্তুকেই সে তখন আপন বলে ভোগ করতে পারে। আপন কর্ম্মকে সে তখন কল্যাণরূপেই দেখে। সমস্ত বস্তু হতেই তার অপার আনন্দ। মৃৎখণ্ড হতে মেঘমালা পর্য্যন্ত, অণুপরমাণু হতে মহাসূর্য্য পর্য্যন্ত, অতি ক্ষুদ্র কীটাণু হতে দূরতম জ্যোতিষ্ক পর্য্যন্ত সবাই তার পায়ে লুটায়, তার গুণ গায়। এমন ব্যক্তির কাছে "নেহ নানাস্তি কিঞ্চন।"

সংসারটাই যেন তোমার কাছে চরম হয়ে না দাঁড়ায়। আমার সামনে দুটী বস্তু রয়েছে—একটী ফুল, আর একটী মেয়ে। ফুলটাকে বিশ্লেষণ করলাম। তার মাঝে দেখি আকর্ষণী শক্তির খেলা—তাইতে তার ভিন্ন ভিন্ন খণ্ডগুলি একত্র গেঁথে রেখেছে। তা ছাড়া তার মাঝে তাপ, মাধ্যাকর্ষণ, চৌম্বকশক্তি প্রভৃতির খেলাও আছে। আবার মেয়েটীর মাঝেও দেখি, কল্পনার অতীত সব অপরূপ বস্তু তার মাঝে আছে—বিশেষতঃ তার মাথাটীতে। নিখিল বিশ্বব্যাপী অনন্ত দেশ আর অনন্ত কাল ওইখানে বাঁধা পড়েছে।' মস্তক নামক একটী ক্ষুদ্র গোলকের মাঝেই সমগ্র বিশ্বের অধিষ্ঠান। কিন্তু সমস্ত জগৎ মাথার মাঝে আছে শুধু ভাবের আকারে—সেখানে কেবল জগতের ভাব-রূপ। এই জগৎভাব যদি এক মস্তক হতে আর এক মস্তকে সঞ্চারিত না হত, ঠিক একটা বলের মত, ভাব নিয়ে যদি লুফালুফি না হত, তাহলে জগৎ বলে কোনও কিছু থাকত না। এই যে জগৎভাবরূপী সম্মোহন নিদ্রা—এটাই আমরা এক পুরুষ হতে আর এক পুরুষে, এক দেশ হতে আর এক দেশে সঞ্চারিত করেছি—আর তা হতেই এই বিশাল জগতের উদ্ভব—তাই দিয়ে তোমার জগৎ, তোমার ভাব, তোমার কর্ম্ম।

"ত্যাগেনৈকেনামৃতত্বমানশুঃ"—এই জগৎটা শুধু একটা পিণ্ড, আর তুমিই যে সবার সব—এই কথাটা সর্ব্বদা মনের সামনে জাগিয়ে রেখে সকল আশঙ্কা, ভয়, উদ্বেগ, ব্যস্ততা, মনস্তাপ একবারে ঝেড়ে ফেলে দেবে। এগুলিকে ত্যাগ করাই যথার্থ ত্যাগ। তোমার করণীয় কিছুই নাই, কারু কাছে বাঁধা নও, কারু কাছে দায়ী নও, কারু খাতক নও তুমি। জাতি, সমাজ প্রভৃতি যা কিছু আছে জগতে—সবার উপর জেগে থাক্‌বে কেবল তোমার ব্যক্তিত্ব। এই হচ্ছে বেদান্ত। সমাজ, আচার, ব্যবহার, আইন, কানুন, বিশ্লেষণ, সমালোচন—কোনও কিছুতেই তোমার আত্মস্বরূপকে স্পর্শ করতে পারে না। উদকবিজ্ঞান বলে, এক নালক,

লেও মহাসমুদ্রের চাপকে সুষম রাখতে পারে। হে ব্যক্তিরূপী অনন্ত দেব, সাহস করে একবার আপন পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াও দেখি—এই ভারকে তুমি ঠেলে ফেলতে পার কি না! একবার অনুভব কর এই সত্য! ভয় দূর হয়ে যাক্, উদ্বেগ মুছে যাক্, সঙ্কীর্ণ পরাজয়ী আমির বিলয় হোক্ আজ! ওঁকারে এই ভাব সম্পুটিত করে নাও—তারপর অবিরাম প্রণবঝঙ্কার তোল—ওঁ—ওঁ—ওঁ!*

* স্বামী রামতীর্থ

যোগসূত্রবৃত্তি

বিভূতিপাদ

পরশরীরে প্রবেশ একটি সিদ্ধি। বন্ধনের কারণের শৈথিল্য এবং চিত্তের প্রচার জ্ঞান হইতে তাহা সিদ্ধ হইয়া থাকে। চিত্ত এবং আত্মা উভয়েই ব্যাপক। কিন্তু স্বরূপতঃ ব্যাপক হইলেও কর্ম্মবশতঃ তাহারা শরীরের অন্তর্গত হইয়া ভোগ্য ও ভোক্তৃ রূপে অনুভূত হয়। ব্যাপক চিত্ত ও আত্মার সঙ্কোচ-সাধক কর্ম্মও নিয়ত অর্থাৎ ক্রমানুসারে শৃঙ্খলিত। চিত্ত ও আত্মাকে যে শরীরের অন্তর্গত বলিয়া বোধ হয়, তাহাই তাহাদের পক্ষে বন্ধন। কর্ম্মফলে যে ধর্ম্ম ও অধর্ম্মাখ্য সংস্কার উৎপন্ন হয়, তাহাই এই বন্ধনের কারণ। সমাধি হইলে এই কারণ শিথিল হইয়া থাকে। তখন যোগী চিত্তের প্রচার বুঝিতে পারেন। হৃদয়প্রদেশ হইতে ইন্দ্রিয়দ্বার দিয়া চিত্ত যে বিষয়ের অভিমুখে ধাবিত হয়, তাহাই তাহার প্রচার। সমাধিবশতঃ যোগী জানিতে পারেন, এইটী চিত্তবহা নাড়ী, এই নাড়ীর আশ্রয়ে চিত্ত গতিশীল হইয়া থাকে, রসবহা ও প্রাণবহা নাড়ী হইতে ইহা পৃথক। এমনি করিয়া নিজের ও পরের শরীরে যখন চিত্তের সঞ্চার জানিতে পারেন, তখন যোগী পরের জীবিত কিম্বা মৃত শরীরে চিত্ত-সঞ্চার দ্বারা প্রবেশ করিতে পারেন। চিত্ত ইন্দ্রিয়সমূহের রাজা—সুতরাং চিত্ত পরশরীরে প্রবেশ করিলে মধুকরেরা যেমন মধুকররাজের অনুবর্ত্তন করে, তেমনি ইন্দ্রিয়-সমূহও চিত্তের অনুবর্ত্তন করিয়া থাকে। এইরূপে পরশরীরে প্রবেশ করিয়া যোগী তাহাকে স্বশরীরের মতই পরিচালনা করিতে পারেন। ব্যাপক চিত্ত ও আত্মার যে ভোগ দ্বারা সঙ্কোচ ঘটিয়া থাকে, তাহার একমাত্র কারণই হইল কর্ম্ম। সমাধিবশতঃ এই কর্ম্ম যদি উৎক্ষিপ্ত হয়, তবে স্বাতন্ত্র্যবশতঃ যোগীর সর্ব্বত্রই ভোগ নিষ্পন্ন হইবে, ইহাতে সন্দেহ কি? (৩৮)

আর একটী সিদ্ধি এই—উদান বায়ু জয় করিলে জল, পঙ্ক, কণ্টক প্রভৃতিতে শরীর স্পৃষ্ট হয় না, জলাদি হইতে উৎক্রান্তিও সিদ্ধ

হয়। ইহা বুঝিতে হইলে প্রথমতঃ বায়ুতত্ত্ব বোঝা আবশ্যক। তুষানলের মত সমস্ত ইন্দ্রিয় যে যুগপৎ উত্থিত হইয়া স্বকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতেছে, ইহাই জীবনের স্বরূপ। এই জীবনেরই ক্রিয়াভেদবশতঃ প্রাণ, অপান প্রভৃতি সংজ্ঞা দ্বারা নির্দ্দেশ করা হইয়া থাকে। যে বায়ু হৃদয় হইতে মুখ ও নাসিকা দ্বারা প্রণীত বা ঊর্দ্ধদিকে নীত হয়, তাহাকে বলে প্রাণ। নাভিদেশ হইতে পাদাঙ্গুষ্ঠ পর্য্যন্ত যাহা অপনীত বা অধোদিকে নীত হয়, তাহাকে বলে অপান। নাভিদেশকে বেষ্টন করিয়া যাহা সমভাবে চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হয়, তাহার নাম সমান। নাসিকাগ্র হইতে শিরোদেশ পর্য্যন্ত ঊর্দ্ধবৃত্তি বায়ুর নাম উদান। ব্যাপকভাবে সর্ব্বশরীরে নীত বায়ুর নাম ব্যান। এই সমস্ত বায়ুর মধ্যে উদান বায়ুতে সংযম করিয়া অপর বায়ু নিরুদ্ধ করিলে, যোগীর ঊর্দ্ধগতি সিদ্ধ হইয়া থাকে এবং শরীরের অতিলঘুত্বহেতু জলে, কর্দ্দম, তীক্ষ্ণ কণ্টকাদিতে নিক্ষিপ্ত হইয়াও তিনি তাহাদের দ্বারা স্পৃষ্ট হন না, জলে নিক্ষিপ্ত হইলে তুলাপিণ্ডের মত ভাসিয়া উঠেন। (৩৯)

সমান বায়ু নাভিদেশস্থ অগ্নিকে বেষ্টন করিয়া অবস্থান করিতেছে। সংযম দ্বারা তাহাকে জয় করিলে অগ্নির আবরণ উন্মুক্ত হওয়াতে তাহার তেজে যোগীকে জ্বলন্ত তেজোময় বলিয়া মনে হয়। (৪০)

শ্রোত্র ও আকাশের সম্বন্ধে সংযম করিলে দিব্য শ্রোত্র লাভ হয়। শ্রোত্র শব্দগ্রাহক অহঙ্কারযুক্ত ইন্দ্রিয়। আকাশ শব্দতন্মাত্রের কার্য্য। উভয়ের মাঝে দেশ দেশী সম্বন্ধ বিদ্যমান; তাহাতে সংযম করিলে যোগী যুগপৎ সূক্ষ্ম, ব্যবহিত ও বিপ্রকৃষ্ট শব্দও গ্রহণ করিতে [illegible] হন। (৪১)

শরীর ও আকাশের সম্বন্ধে সংযম করিলে এবং তুলার ন্যায় লঘু বস্তুতে চিত্ত সমাপন্ন করিলে আকাশগমন সিদ্ধ হয়। তন্ময়ীভাবকে সমাপত্তি বলে। উক্তরূপ সংযম ও সমাপত্তির বলে যোগীর দেহ অত্যন্ত লঘু হওয়াতে প্রথমতঃ তিনি ইচ্ছামত জলে সঞ্চরণ করিতে পারেন, পরে মাকড়সার জাল অবলম্বন করিয়াও বিচরণ করিতে পারেন এবং অবশেষে সূর্য্যরশ্মি অবলম্বন করিয়া স্বেচ্ছামত আকাশবিহার করিতে সমর্থ হন। (৪২)

মহাবিদেহা-সংজ্ঞক মনের অকল্পিতা বহির্বৃত্তি হইতে প্রকাশের আবরণ ক্ষয় সিদ্ধ হইয়া থাকে। তাৎপর্য্য এই—শরীরের বাহিরে শরীর নিরপেক্ষ হইয়া মনের যে অবস্থান, তাহার নাম **মহাবিদেহা**। ইহাতে দেহাভিমানরূপ সংস্কারের দৃঢ়তা নষ্ট হইয়া যায়। শরীরের অহঙ্কার থাকিতেও মনের বহির্বৃত্তি প্রতিনিয়ত হইতেছে, তাহাই কল্পিতা বৃত্তি। কিন্তু দেহাভিমান ত্যাগ করিয়া স্বতন্ত্রভাবে মনের অবস্থিতিকে বলে **অকল্পিতা** বৃত্তি। ইহাতে সংযম করিলে সাত্ত্বিক চিত্তের প্রকাশরূপ ধর্ম্মের আবরণ যে ক্লেশ, কর্ম্ম প্রভৃতি,—তাহাদের ক্ষয় হওয়াতে যোগীর চিত্তমল দূর হইয়া যায়।

এতক্ষণ পর্য্যন্ত বাহ্য ও আভ্যন্তর নানাপ্রকার সিদ্ধি নিরূপিত হইল। ইহাদের দ্বারা চিত্তের দৃঢ়তা সম্পাদিত হয় বলিয়া সমাধিতে তাহাদের স্থান কল্পিত হইয়াছে। এখন আত্মদর্শনের উপযোগী সবীজ ও নির্ব্বীজ সমাধি সিদ্ধ করিবার জন্য অন্যান্য উপায়ের অবতারণ করা হইতেছে। ভূতসমূহের স্থূল, স্বরূপ, সূক্ষ্ম, অন্বয় ও অর্থবত্ত্ব—এই পাঁচটী অবস্থায় যথাক্রমে সংযম করিতে পারিলে ভূত জয় করা যায়।

ভূতসমূহকে যে বিশিষ্ট আকারে অবস্থান করিতে দেখা যায়, তাহাই তাহাদের স্থূল অবস্থা। গন্ধ, স্নেহ, উষ্ণতা, প্রেরণা ও অবকাশদানরূপ কার্য্যসমূহই যথাক্রমে তাহাদের স্বরূপাবস্থা। ভূতসমূহের কারণ-রূপে ব্যবস্থিত গন্ধাদি তন্মাত্রই তাহাদের সূক্ষ্মাবস্থা। প্রকাশ, প্রবৃত্তি ও স্থিতিরূপে সত্ব, রজঃ ও তমোগুণ যে সর্ব্বদাই তাহাদের সহিত অন্বিত রহিয়াছে, তাহাই অন্বয়াবস্থা। সেই সমস্ত গুণে যে ভোগ ও অপবর্গসাধক শক্তি নিহিত থাকিয়া ভূতসমূহকে বিশেষ বিশেষ প্রয়োজনে ব্যাপারিত করিতেছে, তাহাই তাহাদের অর্থবত্ব। ভূতসমূহের এই পাঁচটী ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার প্রত্যেকটীতে সংযম করিলে যোগী ভূতজয়ী হইয়া থাকেন। প্রথমে স্থূলে, তারপর স্বরূপে, তারপর সূক্ষ্মে—এইরূপ করিয়া পর পর এক একটী অবস্থায় সংযম করিতে হয়। ভূতজয় হইলে, গাভী যেরূপ বৎসের অনুসরণ করিয়া থাকে, ভূতসমূহও সেইরূপ যোগীর সঙ্কল্পের অনুবর্ত্তন করিয়া থাকে। (৪৪)

এই প্রকারে ভূতজয় হইলে যোগীর অণিমাদি অষ্ট ঐশ্বর্য্য, কায়সম্পদ্ ও তাহার ধর্ম্মানভিঘাত সিদ্ধ হইয়া থাকে। অণিমা মহিমা, লঘিমা, প্রাপ্তি, প্রাকাম্য, ঈশিত্ব, বশিত্ব ও যত্রকামাবসায়িত্ব—এই আটটী ঐশ্বর্য্য। **অণিমা** বলে যোগী পরমাণুর মত সূক্ষ্ম হইতে পারেন, **মহিমা** বলে মহান্ হইতে পারেন, **লঘিমা** বলে তূলার পিণ্ডের মত লঘু হইতে পারেন

লির অগ্রভাগ দ্বারা চন্দ্রাদি পর্য্যন্ত স্পর্শ করিবার শক্তি **প্রাপ্তি**। ইচ্ছার অনভিঘাত **প্রাকাম্য**, যেমন ইচ্ছামত ভূগর্ভে নিমজ্জিত হওয়া ইত্যাদি। শরীর ও অন্তঃকরণের উপর প্রভুত্বই **ঈশিত্ব**। সর্ব্বত্র প্রভাবশালী হওয়াই **বশিত্ব**—ইহার ফলে ভূতসমূহ তাঁহার অনুগামী হয়, কখনও তাঁহার বাক্যের অন্যথাচরণ করে না। **যত্রকামাবসায়িত্বের** বলে যোগীর যে বিষয়ে কাম বা ইচ্ছা হয়, সে বিষয়েই ব্যবসায় হইয়া থাকে, অর্থাৎ সে বিষয়ের অঙ্গীকার করিয়া স্বীয় অভিলাষপূরণরূপ সার্থকতা সম্পাদন করিয়া থাকেন। ভূতজয় হইলেই সমাধির সন্নিহিত এই সমস্ত ঐশ্বর্য্য লাভ হইয়া থাকে। যোগী তখন পরমাণুরূপে বজ্রেরও অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে পারেন ইত্যাদি। অণিমাদি আটটী গুণকে মহাসিদ্ধি বলে।

ভূতজয়ের ফলে কায়সম্পদ লাভ হয়—তাহার কথা পরসূত্রে বলা হইতেছে। ইহা ছাড়া যোগীর **কায়ধর্ম্মানভিঘাতও** লাভ হয়। রূপ প্রভৃতি কায়ের ধর্ম্ম; কোনও নিমিত্তবশতঃ তাহাদের নাশ বা বিকার না হওয়ার নাম অনভিঘাত। অর্থাৎ সিদ্ধ যোগীর রূপ অগ্নিতে দগ্ধ হয় না, বায়ুতে শোষিত হয় না, জলে ক্লিন্ন হয় না ইত্যাদি। ইহাই কায়ধর্ম্মানভিঘাত। (৪৫)

রূপ-লাবণ্য, বল, বজ্রের ন্যায় কঠিনত্ব—এইগুলি হইল **কায়সম্পৎ**। ভূতজয় দ্বারা যোগী ইহা লাভ করিয়া থাকেন। (৪৬)

ভূতজয় দ্বারা যিনি বিশেষ একটী ভূমিকায় অবস্থিত হইলেন, তিনি ইন্দ্রিয়জয়রূপ পরবর্ত্তী ভূমিকা সিদ্ধির জন্য যত্ন করিতে পারেন। গ্রহণ, স্বরূপ, অস্মিতা, অন্বয় ও অর্থবত্ব—ইন্দ্রিয়েরও এই পাঁচটী অবস্থা। ইন্দ্রিয়ের বিষয়াভিমুখী বৃত্তিই গ্রহণ। সাধারণভাবে ইন্দ্রিয়ের প্রকাশকত্বই তাহার স্বরূপ। ইন্দ্রিয়ে অহং-অভিমানের অনুবৃত্তিই অস্মিতা।

অন্বয় ও অর্থবত্বের কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, (৪৪ সূত্র)। ইন্দ্রিয় সমূহের এই পাঁচটী অবস্থাতে সংযম করিলে যোগী ইন্দ্রিয়জয়ী হইয়া থাকেন। (৪৭)

ইন্দ্রিয়জয়ের ফলে যোগীর মনোজবিত্ব, বিকরণভাব ও প্রধানজয় সিদ্ধ হইয়া থাকে। শরীরের মনের মত অনুত্তম গতি লাভই **মনোজবিত্ব**। শরীরের নিরপেক্ষ হইয়া ইন্দ্রিয়াদির নির্ম্মাণ ও অবস্থান হইল **বিকরণ ভাব**। সর্ব্ববশিত্বই **প্রধান জয়**। জিতেন্দ্রিয় যোগীর এই সমস্ত সিদ্ধি লাভ হইয়া থাকে। যোগশাস্ত্রে ইহাদের সংজ্ঞা **মধুপ্রতীক**। (৪৮)

ইন্দ্রিয়জয়ের পর অন্তঃকরণ জয়। অন্তঃকরণ শুদ্ধসত্বের পরিণাম। ইহাতে সংযম করিলে সত্ব ও পুরুষের বিবেক জ্ঞান উৎপন্ন হয় এবং তাহাতে গুণসমূহের কর্তৃত্বাভিমান শিথিল হইয়া যায়। ইহার ফলে যোগী সর্ব্বজ্ঞ বা সর্ব্বভাবের অধিষ্ঠাতা হন। গুণের পরিণামকেই **ভাব** বলে; যোগী ইহার উপর প্রভুত্ব করিয়া থাকেন। আবার গুণসমূহ শান্ত, উদিত, ও অব্যপদেশ্য ধর্ম্মীরূপে কখন কি ভাবে অবস্থান করে, যথাযথ তাহার বিবেকজ্ঞান হইলে যোগী সর্ব্বজ্ঞত্ব লাভ করেন। যোগশাস্ত্রে এই সিদ্ধির নাম **বিশোকা**। (৪৯)

এই বিশোকা সিদ্ধিতেও যখন যোগীর বৈরাগ্য উপস্থিত হয়, তখন সমস্ত দোষবীজ ক্ষয় হওয়াতে যোগী কৈবল্য লাভ করেন। রাগ, দ্বেষ প্রভৃতিই দোষ, অবিদ্যা প্রভৃতি তাহার বীজ বা হেতু। গুণের অধিকার সমাপ্ত হইলে পুরুষ স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়া যে আত্যন্তিক দুঃখ নিবৃত্তি লাভ করিয়া থাকেন, তাহাই **কৈবল্য**। (৫০)

এই কৈবল্যে কি প্রকারে স্থিতি লাভ করিতে হইবে, সে বিষয়ে যোগী অবহিত হইবেন। যোগী চারি প্রকার প্রথমকল্পিক, মধুভূমিক, প্রজ্ঞাজ্যোতিঃ ও অতিক্রান্তভাবনীয়। তন্মধ্যে যাঁহার জ্ঞান মাত্র প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, এইরূপ অভ্যাসযুক্ত যোগী **প্রথম কল্পিক**। যাঁহার ঋতম্ভরা প্রজ্ঞা লাভ হইয়াছে, তিনি **মধুভূমিক**। যিনি ভূত ও ইন্দ্রিয়সমূহ জয় করিয়াছেন, তিনি **প্রজ্ঞা জ্যোতিঃ**। এই অবস্থায় যোগী সর্ব্বপ্রকার ভাবিত বিষয়-সমূহ আয়ত্ত করেন এবং ভাবনীয় বিষয় সমূহে সাধনযুক্ত হইয়া থাকেন। সমস্ত ভাবনীয় বিষয় অতিক্রম করিয়া যিনি চতুর্থ যোগীর পদ লাভ করিয়াছেন, তিনি জীবন্মুক্ত, তাঁহার চিত্ত বিলয়রূপ একমাত্র পুরুষার্থ অবশিষ্ট রহিয়াছে। ইহারই সপ্তবিধ প্রান্তভূমি প্রজ্ঞা। (সাধনপাদ, ২৭ সূত্র দ্রষ্টব্য)

অতিক্রান্তভাবনীয় যোগী যখন মধুমতী প্রজ্ঞাভূমি সাক্ষাৎ করেন, তখন সেই স্থানের অধিপতি দেবতারা তাঁহার সত্ত্ববিশুদ্ধি দর্শন করিয়া তত্রত্য বিচিত্র ভোগসমূহে তাঁহাকে প্রলুব্ধ করিবার জন্য বলেন, "হে মহাত্মন্, এখানে উপবেশন করুন, এখানে আনন্দ করুন—এই ভোগ কমনীয়, এই কন্যা কমনীয়া, এই রসায়ন সেবনে জরামৃত্যুরহিত হওয়া যায়, এই যান আকাশগামী—ওই যে কল্পবৃক্ষসমূহ, ওই মন্দাকিনী। এই যে সিদ্ধ মহর্ষিরা রহিয়াছেন—এই সমস্ত রূপলাবণ্যবতী অপ্সরারা অনুকূল হইয়া আপনার সেবা করিবে—আপনার দিব্য কর্ণ, দিব্য চক্ষু, বজ্রদৃঢ় শরীর হইবে। হে আয়ুষ্মান, আপনি নিজগুণে এই সমস্ত অর্জ্জন করিয়াছেন, এই অক্ষয়, অজর ও অমর স্থান দেবতাদের প্রিয়,

আপনি এই সমস্ত ভোগ গ্রহণ করুন।"—দেবতারা এই রূপে প্রলুব্ধ করিলে, যোগী আসক্তির দোষ সমূহ ভাবনা করিয়া চিন্তা করিবেন, "সংসারাগ্নিতে দগ্ধ হইয়া জন্মমৃত্যু রূপ অন্ধকারে ঘুরিতে ঘুরিতে কোনও প্রকারে ক্লেশতিমিরবিনাশী যোগপ্রদীপ প্রাপ্ত হইয়াছি, আর আজ তৃষ্ণাসমুদ্ভূত বিষয়পবন তাহার প্রতিপক্ষ হইয়া দেখা দিল। আমি আলোকের সন্ধান পাইয়াছি, এখন আবার কি করিয়া এই বিষয়রূপ মৃগতৃষ্ণিকায় প্রবঞ্চিত হইয়া নিজকে সংসারবহ্নির ইন্ধন করিব? হে দেবগণ, আপনাদের এই স্বপ্নবৎ রমণীয় ও অসার, কৃপণজনপ্রার্থনীয় বিষয় সমূহ অমনিষ্ট থাকুক"—এই বলিয়া যোগী পুনরায় সমাধি ভাবনা করিবেন

আসক্তি তো থাকিবেই না, "আমি দেবগণেরও অনুনয়ের পাত্র" এই মনে করিয়া গর্ব্ব বা বিস্ময়ও অনুভব করিবেন না। গর্ব্বহেতু মানুষ নিজকে সুপ্রতিষ্ঠিত মনে করে, মৃত্যু যে আমার কেশ ধরিয়া রহিয়াছে, এরূপ চিন্তা তখন মনে আসে না। এই ছিদ্র অবলম্বন করিয়া যদি যোগীর প্রমাদ উপস্থিত হয়, তবেই সর্ব্বনাশ। সুতরাং সমাধির প্রতিষ্ঠার জন্য যোগী ভোগসিদ্ধিতে আসক্তি ও গর্ব্ব পরিহার করিবেন। (৫১)

পূর্ব্বোক্ত সংযম ছাড়া বিবেকখ্যাতির আরও একটী উপায় আছে। ক্ষণ ও তাহার ক্রমে সংযম করিলে বিবেকজ্ঞান উৎপন্ন হয়। কালের সর্ব্বসূক্ষ্ম অবয়ব, যাহার আর অংশ করা সম্ভব নয়—তাহাকে বলে ক্ষণ। ক্ষণের পৌর্ব্বাপর্য্য নিমিত্ত যে পরিণাম, তাহাই ক্রম। এই কালক্ষণ পূর্ব্ববর্ত্তী আর এইটী পরবর্ত্তী—এইরূপ ভাবনা দ্বারা অত্যন্ত সূক্ষ্ম ক্ষণক্রমে সংযমহেতু তাহার সাক্ষাৎকার হইলে মহত্তত্ত্ব প্রভৃতি অন্যান্য সূক্ষ্ম বিষয়ও সাক্ষাৎকার করিবার সামর্থ্য জন্মে; এবং তাহা হইতেও বিবেক জ্ঞান উৎপন্ন হয়। (৫২)

যদিও বিবেকজ্ঞান দ্বারা সমস্ত সূক্ষ্ম তত্ত্বই জানা যায়, তথাপি অভ্যাসের সৌকর্য্যহেতু সূত্রকার বিবেকজ্ঞানের একটী বিষয় উপন্যস্ত করিতেছেন। জাতি, লক্ষণ ও দেশের পৃথকত্ব দ্বারা অবচ্ছিন্ন হয় না বলিয়া যেখানে দুইটী বস্তু আপাতদৃষ্টিতে তুল্য বলিয়া মনে হয়, সেখানেও বিবেকজ্ঞানদ্বারা ভেদের প্রতিপত্তি হইতে পারে।

সাধারণতঃ জাতি, লক্ষণ ও দেশদ্বারাই পদার্থের ভেদ করা হইয়া থাকে। কোথাও কোথাও জাতিই ভেদের হেতু—যেমন, "এটা গরু আর এটা মহিষ।" জাতিতে যাহারা তুল্য, লক্ষণদ্বারা তাহাদের ভেদ করা হয়।—যেমন, "এই গরুটা শাদা—এইটা লাল।" জাতি ও লক্ষণে তুল্য হইলে দেশদ্বারা ভেদ করা যাইতে পারে—যেমন দুটী আমলকী যদি একই আকারের হয়, তবে তাহারা ভিন্ন ভিন্ন দেশ অধিকার করিয়া আছে বলিয়া তাহাদের ভেদ বুঝা যায়। কিন্তু যেখানে ভেদের কোনও অবধারিত হেতু পাওয়া যায় না—যেমন দুইটী শুক্ল পার্থিব পরমাণু যদি একদেশে অবস্থিত থাকে—তবে সেখানে ভেদের জন্য সংযম করিলে ভেদজ্ঞান উৎপন্ন হইয়া থাকে। এইরূপে ক্রমশঃ অভ্যাসদ্বারা সূক্ষ্ম তত্ত্বসমূহেরও ভেদজ্ঞান হইয়া থাকে। (৫৩)

এইরূপ সংযমের ফলে অন্ত্যভূমিতে যে বিবেকজ্ঞান উৎপন্ন হয়, যোগীকে অগাধ সংসার সমুদ্র হইতে ত্রাণ করে বলিয়া তাহাকে তারক জ্ঞান বলে। মহদাদি সমস্ত তত্ত্বই

তাহার বিষয়। এই জ্ঞানের স্বভাব এই যে, তত্ত্বসমূহ যে অবস্থাতেই থাকুক না কেন, স্থূল সূক্ষ্মাদিভেদে যে পরিণামই প্রাপ্ত হউক না কেন, তারক জ্ঞান তাহাদিগকেও গ্রহণ করিতে পারে। এই জ্ঞানের আর একটি বিশেষত্ব এই যে, ইহা ক্রমহীন অর্থাৎ বস্তুমাত্রই পরিণামকালে যে তিনটী ক্রমকে আশ্রয় করে, তারক জ্ঞান বস্তু গ্রহণের সময় সে ক্রমের অপেক্ষা রাখে না—সমস্ত বিষয়ই তাহার নিকট করামলকবৎ প্রত্যক্ষ হয়। (৫৪)

এই তারক জ্ঞানের ফলে সত্ত্ব ও পুরুষের সমভাবে শুদ্ধি হওয়াতে পুরুষের কৈবল্য বা মোক্ষ হইয়া থাকে। সর্ব্বপ্রকার কর্তৃত্বাভিমানরহিত হইয়া সত্ত্ব যদি স্বকারণে অনুপ্রবিষ্ট হয়, তবে তাহাই তাহার শুদ্ধি। তেমনি পুরুষে যে ভোক্তৃত্ব উপচরিত হইয়াছে তাহার অভাব হইলেই পুরুষের শুদ্ধি। ইহার ফলেই পুরুষের কৈবল্য হয়। (৫৫)

বস্তু সংক্ষেপ

বিভূতিপাদে প্রথমতঃ তিনটী অন্তরঙ্গ যোগের কথা বলা হইল। তারপর সংযমের কথা। সংযম বুঝাইবার জন্য ত্রিবিধ পরিণামের ব্যাখ্যা করা হইল। তারপর সমাধিতে আস্থা উৎপন্ন করিবার জন্য সংযমবলে যে সমস্ত বাহ্য ও আভ্যন্তর সিদ্ধি লাভ হইতে পারে, তাহাদের বিবরণ দেওয়া হইল। তৎপরে সমাধির উপদেশে ভূত ও ইন্দ্রিয় জয়ের উপায় বলিয়া পরমপুরুষার্থ সিদ্ধির উপায়স্বরূপ বিবেকজ্ঞানের পন্থা নিরূপিত হইল। পরিশেষে বিবেকরূপ তারকজ্ঞান যে সমস্ত সমাধির চরম অবস্থা, তাহা বলিয়া তন্মূল কৈবল্যের উপদেশও দেওয়া হইল।

ইতি পাতঞ্জল যোগসূত্রবৃত্তিতে
বিভূতিপাদ।

মায়ের মায়া

অহং-এর কেন্দ্র হতেই দৃষ্টি প্রসারণ কর—দেখবে প্রকৃতির বিরাট রূপ, কোথাও তার অন্ত নাই, তার রূপের শেষ নাই, নামের সীমা নাই। একটী একটী করে আবরণ ঘুচিয়ে চেতনাকে প্রস্ফুট করতে চাই, কিন্তু অখণ্ডকে ধরতে গিয়েও দেখি একটুখানি সূক্ষ্ম যবনিকা যেন থেকেই যায়—একটু বিকল্পের ছায়া যেন আছেই—পুরুষ তারও পরে। অহং বুদ্ধিই বিকল্পের আশ্রয়—তাই প্রকৃতির সূক্ষ্মতম বন্ধন। তাকে স্বচ্ছ করলেও সে যেন একেবারে ফাঁকা হয়ে যেতে চায় না। মনে হয়, প্রকৃতি তাঁর বিরাট জঠর হতে এক একটী বিচিত্র আমিত্বের বুদ্বুদ জাগিয়ে তুলছেন, চেতনার দীপ্তি তাঁর মাতৃস্নেহের আবরণে স্নিগ্ধ। তোমার "আমিত্ব"-বোধের সঙ্গে এ স্নেহ জড়িয়ে আছে, তাই একে ছাড়াতে গেলেও ছাড়ে না—অহং-শূন্য মহাব্যোমে মিশ্‌তে গিয়ে নিরাশ্রয় সাধক ভীত শিশুর মত

আকুল হয়ে "মা-মা" বলে আবার সেই স্নেহময়ীর কোলেই ঝাঁপিয়ে পড়ে।

তাই ভূমার এ পারে এই মহাশক্তিকে মা বলেই জানি—তাঁকে নমস্যা বলে জানি। মহাশক্তির কাছে আপনাকে নত করে দিতে হবে—প্রসন্ন চিত্তে তাঁর স্নেহের দান মাথায় তুলে নিতে হবে, তাঁর বিচিত্র লীলার তরঙ্গে পরস্পরের বুকে মিশে থাক্‌তে হবে। মুক্তির কথা ভেবে আকুল তুমি—কিন্তু কি করে মুক্তি পাবে, মা যদি পথ না ছাড়েন? তিনি বেঁধেছেন বটে, কিন্তু এ যে তাঁর স্নেহের বাঁধন, এই কথাটাই প্রসন্ন চিত্তে বিশ্বাস করতে শিখ। এই স্নেহটুকু দিয়েই তিনি আমাদের নিঃশেষ চৈতন্যের দিকে আকর্ষণ করছেন—তাঁর সন্তানের কাছে তাঁর অনন্ত ভাণ্ডারের কোনও সম্পদই আবৃত রাখেননি। তবে ধৈর্য্যহারা হলে কিছুই পাবে না—প্রপন্ন চিত্তে যে প্রেম জেগে উঠে, সেই প্রেম দিয়ে তাঁর স্নেহের মর্য্যাদা রাখতে না জান্‌লে সন্তানের দাবী তো খাটবে না।

তাই এই দেহের আবরণ হতে দ্বন্দ্বহীন আমিত্বের ভাস্বর আবরণটুকু পর্য্যন্ত সমস্তই মায়ের কল্যাণ আশীর্ব্বাদ বলে মাথায় তুলে নিতে হবে। এই কল্যাণ পরম্পরার প্রান্ত ভূমিতেই সবিকল্প সমাধি—এই সগুণ ব্রহ্মের স্বরূপ— এই মা।

সৈষা প্রসন্না বরদা নৃণাং ভবতি মুক্তয়ে—তবে তিনি প্রসন্না হয়েই আছেন, সন্তানের কল্যাণে তাঁর বরাভয়কর উদ্যত হয়েই আছে। যদি এ কথা প্রাণে প্রাণে না বুঝে থাকি, তবে তা বুঝবার জন্যই সাধনা করতে হবে। সাধনা শক্তিকে আয়ত্ত করবার জন্য নয়—তাঁর প্রসাদ লাভ করবার জন্য। শক্তি মাতৃস্বরূপিণী, প্রাণস্বরূপিণী, তাঁর সঙ্গে বিরোধ কোথায় যে, সাধনবলে তাঁকে জয় করতে হবে? তবে নাড়ীর টানে সন্তানের সঙ্গে মা বাঁধা বটে।

শক্তি সত্ত্বে চৈতন্যের স্ফুরণ—তাই লৌকিক সংস্কার দিয়ে তাঁর সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করা যায় না—নিষেধমুখেই তাঁর রহস্য আমরা জান্‌তে পারি। "নেতি নেতি" করে তাঁর এক একটা বিভাব অতিক্রম করে যেতে হবে—বর্জ্জন করে নয়, ঊর্দ্ধতন প্রকাশ দিয়ে অধস্তন প্রকাশকে কুক্ষিগত করে। এমনি করে চরম নিষেধের পরে শুদ্ধ চৈতন্য—তিনি আর নিষেধের লক্ষ্য নন, তিনি ওঁ বা হাঁ—অস্তীত্যুপলব্ধব্যঃ। তিনিই প্রকৃতিকে উদ্ভাসিত করছেন। প্রকৃতি তাঁর প্রিয়া। এখানে সাধনা নাই, উপাসনা নাই—এই হল সিদ্ধ ভাব। এই ভাব মর্ত্ত্যে নামিয়ে আনলেই প্রেমের বৃন্দাবন ফুটে ওঠে।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং

জ্ঞানেশ্বর

—*—

দাক্ষিণাত্যের ইতিহাস কেহ মনোযোগসহকারে পর্য্যালোচনা করিলে বুঝিতে পারিবেন, আর্য্যভাব দাক্ষিণাত্যে মূলতঃ আগন্তক হইলেও আর্য্যাবর্ত্ত অপেক্ষা সেখানে তাহার বিশুদ্ধি অধিক। আর্য্যাবর্ত্ত ও দাক্ষিণাত্যের ভৌগোলিক অবস্থানই তাহার হেতু। প্রাচীন কালে বাহির হইতে বিপ্লবের পর বিপ্লব আসিয়া আর্য্যাবর্ত্তকে প্লাবিত করিয়াছে, আর্য্য ভাব ও আদর্শের সহিত বিজাতীয় ভাব ও আদর্শের সঙ্কর ঘটিয়াছে, কিন্তু বিন্ধ্য ও সহ্যাদ্রির দুর্ভেদ্য দুর্গের মাঝে দাক্ষিণাত্য আপনার ভাববিশুদ্ধিকে সযত্নে রক্ষা করিয়াছে। দাক্ষিণাত্যের এই সম্পদ সঞ্চিত ছিল বলিয়াই বৌদ্ধযুগের প্লাবন হইতে দাক্ষিণাত্যপ্রসূত আচার্য্য শঙ্কর ভারতবর্ষকে পুনরুদ্ধার করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

আমরা যখনকার কথা বলিতেছি, তখন মুসলমান অভিযানে উত্তর ভারত বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছে। মুসলমান আসিয়াছে একহাতে কোরান আর একহাতে তরবারি লইয়া—তাহার আগমনে শুধু রাষ্ট্রে বিপ্লব নয়, ধর্ম্মেও বিপ্লব আরম্ভ হইয়াছে। আর্য্যাবর্ত্ত পদানত করিয়া মুসলমান আসিয়া দাক্ষিণাত্যের দুয়ারেও হানা দিয়াছে—এই সঙ্কটের সময় নিবৃত্তিনাথ, জ্ঞানেশ্বর, নামদেব, একনাথ প্রভৃতি যুগপ্রবর্ত্তক প্রচারকদের জন্ম। ইঁহারা কি কাজ করিবেন, তাহা পূর্ব্ব হইতেই নিরূপিত—তাই ইঁহারা জগতে আসিয়াছেন সিদ্ধ সম্পদ লইয়া। মহাপুরুষের জীবনকেও আমরা সাধারণ জীবনের সঙ্গে তুলনা করিয়া দেখিতে চাই; তাই সাধারণ মানুষকে যেমন যুঝিয়া যুঝিয়া ধীরে ধীরে লক্ষ্যপথে অগ্রসর হইতে দেখি, মহাপুরুষেরাও তেমনি করিয়া জীবন গড়িয়া তুলিবেন, ইহাই আশা করিয়া থাকি। পাঁচবৎসর বয়সে শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য বেদবিৎ হইলেন—ইহা আমাদের কাছে অবিশ্বাস্য, কেননা ওই বয়সে আমাদের যে বর্ণপরিচয় মাত্র হইয়াছিল। কিন্তু শঙ্করাচার্য্যের জীবনের প্রয়োজনীয়তা কি আমাদের জীবনের প্রয়োজনীয়তার সামিল? আমাদের জীবন ক্ষুদ্র গণ্ডীর মাঝে আবদ্ধ, তাই রহিয়া সহিয়া কষ্ট করিয়া আমাদিগকে সমস্তই উপার্জ্জন করিয়া লইতে হয়। কিন্তু জগতের বন্ধন মোচন করিবার জন্য ভগবান যাঁহাদিগকে পাঠান, তাঁহাদিগকে আজন্মসিদ্ধ সম্পদ দিয়াই জগতে পাঠাইয়া থাকেন। বিট্‌ঠলপন্থের পুত্রকন্যাকে ভগবান্ এমনিভাবে তৈয়ারী করিয়াই জগতে পাঠাইয়াছিলেন।

দাক্ষিণাত্যের আজ সমূহ বিপদ উপস্থিত। বিজাতীয় আক্রমণ হইতে শুধু দেশ নয়, ধর্ম্মকেও বাঁচাইতে হইবে। রাজা তাহার সৈন্য লইয়া শত্রুকে ভূমিজয়ে বাধা দিতে পারেন, কিন্তু ধর্ম্মজয়ে বাধা দিতে হইলে যে দেশের সমগ্র জনসাধারণকে সংঘবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইতে হইবে। এই সময় সমগ্র দেশের উপযোগী একটী সার্ব্বভৌম আদর্শ চাই, এবং সেই আদর্শে জনসাধারণকে উদ্‌বুদ্ধ করিতে পারে, এমন বলিষ্ঠ, নিষ্কাম, নিষ্কলুষ নেতাও চাই। এই নেতার আসন গ্রহণ করিবার জন্য তখন দাক্ষিণাত্যে বহু

মহাপুরুষেরই আবির্ভাব হইয়াছিল বটে, কিন্তু বিশেষ করিয়া এই ভার পড়িল বিট্‌ঠল-পন্থের গৃহহীন সমাজচ্যুত সন্তানদের উপর।

পৈঠানের সমাজপতিদের পাঁতিতে ইঁহারা সমাজে প্রবেশ করিবার অধিকার পাইয়াছেন। সমাজের সঙ্গে যোগ হওয়াতে এইবার তাঁহাদের কাজ আরম্ভ করিবার সুবিধা হইল। তাঁহাদের কাজ, দেশকে উদ্বুদ্ধ করা। বালক নিবৃত্তিনাথ স্বয়ং মহাজ্ঞানী, তিনি কর্ম্মে লিপ্ত হইতে চাহিলেন না, কিন্তু শিষ্য ও অনুজ জ্ঞানেশ্বরের ভিতরে প্রেরণা দিয়া তাঁহাকে দিয়া কর্ম্ম করাইতে লাগিলেন। জ্ঞানেশ্বরও জ্ঞানী; কিন্তু চারিদিক দেখিয়া শুনিয়া তিনি বুঝিতে পারিলেন, জ্ঞানের সু-উচ্চ আদর্শ সর্ব্বসাধারণের উপযোগী নহে। তাহাদিগের স্বাভাবিক কর্ম্মপ্রবৃত্তি নষ্ট করিলে চলিবে না, কেননা কর্ম্ম না করিলে অজ্ঞানীর গুণক্ষয় হইবে না। অথচ অপ্রবুদ্ধ ভাবে কর্ম্ম করিলে তাহা বন্ধনেরই কারণ হইবে। অতএব কর্ম্মে ভক্তির রসায়ন সংযোগ করিয়া তাহাই সর্ব্বজন-আচরণীয় ধর্ম্মরূপে প্রচার করিতে হইবে। নিবৃত্তিনাথের প্রেরণায় জ্ঞানেশ্বর এই মহাকার্য্যের ভার মাথায় তুলিয়া লইলেন—তাঁহার কার্য্যের সহায়ক হইলেন ভ্রাতা সোপানদেব ও ভগিনী মুক্তাবাই।

আট বৎসরের বালক প্রচারক!—কথাটা শুনিলে আশ্চর্য্য হইতে হয় বটে। কিন্তু বালকবালিকার মত অত সহজে হৃদয় জয় করিতে কে পারে? এই চারিটী বালক-বালিকার মাঝে যে কি শক্তি নিহিত রহিয়াছে, তাহা অপরে জানে না, কিন্তু অজ্ঞাতসারে তাহার অলঙ্ঘ্য আকর্ষণে সকলকে অবনত হইতে হয়। চারিটী ভাই-বোন গৃহহীন, ভিক্ষা করিয়া খাওয়া ছাড়া তাহাদের জীবিকার আর উপায় নাই। তাহারা লোকের দুয়ারে দুয়ারে গান গাহিয়া ভক্তের কথা, ভগবানের কথা বলিয়া বেড়ায়—কিন্তু কি আশ্চর্য্য তাহাদের আকর্ষণ, যে বাড়ীতে একবার তাহারা গিয়াছে, সেখান হইতে কেহ তাহাদিগকে ছাড়িয়া দিতে চায় না। যেখানে তাহারা যায়, সেখানেই যেন আনন্দের হাট বসিয়া যায়। তাহাদের মুখে সুমধুর ভক্তকথা শুনিয়া বিষয়জর্জ্জর বৃদ্ধেরও অন্তস্তল হইতে বৈরাগ্যভরা সুগভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস আন্দোলিত হইয়া উঠে—কি যেন কি ভাবিয়া চক্ষু বাষ্পসজল হইয়া আসে।

এমন করিয়া চারিটী ভাইবোন মহারাষ্ট্রের গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। গৃহহীন হইয়াও সকলের গৃহই তাহাদের আশ্রয়, স্বজনহীন হইয়াও দেশবাসী সকলেই তাহাদের আপন জন। গ্রাম হইতে গ্রামে তাহাদের কীর্ত্তি ছড়াইয়া পড়িল—তাহারা আসিবে শুনিলে গ্রামবাসীরা সতৃষ্ণ নয়নে পথ চাহিয়া থাকিত। এমনভাবে কার্য্য আরম্ভ হইল। কিন্তু এখনও হৃদয়ে হৃদয়ে অতি সঙ্গোপনে ভাবের বিদ্যুৎ সঞ্চার হইতেছে মাত্র; দেশের মাঝে একটা সাড়া পড়িয়াছে, কিন্তু এখনও দেশ মাতিয়া উঠে নাই। বিট্‌ঠলপন্থের পুত্রকন্যারা হাসিতে, কথাতে, চাহনিতে দেশের হৃদয় জয় করিয়াছে, কিন্তু এখনও দেশ তাহাদের শক্তির প্রকৃত পরিচয় পায় নাই। তাহার জন্য আরও কয়েক বৎসর প্রতীক্ষা করিতে হইবে।

ক্রমে জ্ঞানেশ্বর পঞ্চদশ বৎসরে উপনীত হইলেন—বাল্যের পর যৌবনের নবীন কিরণ দেখা দিল, অন্তরের রুদ্ধ শক্তি ফুটিয়া বাহির হইবার জন্য আকুল বিকুল করিতে লাগিল।

জ্ঞানেশ্বর বুঝিলেন, এই উপযুক্ত সময়—এই বার দেশকে মাতাইতে হইবে। এখন আর চারিটী ভাই-বোন একা নহেন, ফুলের গন্ধে আকৃষ্ট ভ্রমরের মত বহু পিপাসিত ভক্ত হৃদয় আসিয়া তাঁহাদিগকে বেড়িয়া রহিয়াছে,—জ্ঞানেশ্বর এখন এক প্রচারসঙ্ঘের পরিচালক। "নিবাস" গ্রামের মন্দিরাঙ্গনে আসিয়া তাঁহারা সমবেত হইয়াছেন, এখন কিছুদিন এইখানেই অবস্থান করিবেন। এই অবসরে জ্ঞানেশ্বর তাঁহার অমর কীর্ত্তি ভাবার্থ-দীপিকা নামে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ভাষ্যগ্রন্থ রচনা করিলেন।

এই গ্রন্থ রচনাতেও তাঁহার 'বিশেষত্ব আছে। তিনি হাতে কলমে কিছু করিয়া যান নাই, মন্দিরাঙ্গনে সমবেত ভক্তগণের কাছে ভাবাবিষ্ট হৃদয়ে তিনি গীতার শ্লোকের পর শ্লোক ব্যাখ্যা করিয়া যাইতেন, আর তাঁহার শিষ্য সচ্চিদানন্দ তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিতেন। কি ভাষার লালিত্যে, কি ভাবের সৌন্দর্য্যে জ্ঞানেশ্বরের এই গীতা-ভাষ্য মহারাষ্ট্রসাহিত্যে আজ পর্য্যন্ত অমর হইয়া রহিয়াছে। আমরা নিম্নে তাহার কোনও কোনও অংশের মর্ম্মোদ্ধার করিয়া দিলাম—ইহা হইতেই পাঠক এই গ্রন্থের রসমাধুর্য্য কিয়ৎপরিমাণে আস্বাদন করিতে পারিবেন।

গীতার ভূমিকাতে তিনি বিনয়সহকারে বলিতেছেন, "আমি গীতা ব্যাখ্যা করিবার দুঃসাহস প্রকাশ করিয়াছি, কিন্তু এই কার্য্য যে কতদূর দুঃসাধ্য তাহা বিবেচনা করি নাই। অসম্ভব যদি সম্ভব হয়, জোনাকী পোকা যদি সূর্য্যকে আলোকিত করিতে পারে, ক্ষুদ্র চটক পক্ষী যদি সমুদ্র শোষণ করিতে পারে, তবে হয়ত আমার এই চেষ্টা ফলবতী হইবে। আকাশের বিশালতা ধারণায় আনিতে যে কল্পনাকেও যেমন বিরাট করা প্রয়োজন, তেমনি গীতা ব্যাখ্যা করিতে হইলে ব্যাখ্যাকারকেও জ্ঞানে ও পাণ্ডিত্যে গীতার রচয়িতার সমতুল্য হইতে হইবে। কিন্তু আমি এরূপ দুঃসাহস করিতেছি শুধু এই ভরসায় যে, আমি এই ব্যাখ্যার নিমিত্ত মাত্র—বাস্তবিক আমার গুরু নিবৃত্তিনাথই ইহার বক্তা। কাঠের পুতুল যখন জীবন্তের মত নড়া-চড়া করে, তখন তাদের প্রাণ আছে বলিয়া কি তাহারা এরূপ করে? পিছনে থাকিয়া যে সূত্র ধরিয়া রহিয়াছে, এ খেলা কি তাহারই শক্তিতে নয়? কাজেই আমি সঙ্কোচই করিব কেন? কামদুঘা আমার জননী। আমি লৌহখণ্ডের মত তুচ্ছ হইতে পারি, কিন্তু এখানে যে পরশমণিও আছে—সোনা হইতে আমার কতক্ষণ?"

কিছুদূর অগ্রসর হইয়াই জ্ঞানেশ্বরের সঙ্কোচ ভাব কাটিয়া গিয়াছে—আত্মপ্রত্যয়ের অসীম বীর্য্যে সন্দীপিত হইয়া তিনি বলিতেছেন—

"সূর্য্যকে তোমরা আর কত বড় দেখ? কিন্তু তাহারই আলোতে জগৎ প্লাবিত নয় কি? তেমনি আমিও যা বলিব, তাহা সংক্ষিপ্ত হইতে পারে বটে, কিন্তু তাহার অর্থ সমুদ্রের মত গভীর, আকাশের মত বিশাল। আমার বাক্যে তোমাদের সমস্ত সংশয় ছিন্ন হইয়া যাইবে, কল্পতরুর মত আমার বাণী তোমাদের সকল কামনা পূর্ণ করিবে।

"এই পুণ্য কাহিনীর মাধুর্য্যের নিকট কোথায় লাগে অমৃতের আস্বাদন, সঙ্গীতের মাধুর্য্য, মলয় সমীরণের সুগন্ধ? এই কাহিনী শুনিলে যুগপৎ তোমাদের সকল ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তি হইবে। দুগ্ধপানে যদি ব্যাধি দূর হয়,

তবে কে তিক্ত ঔষধ সেবন করিতে যায়? যদি মোক্ষ চাও, তবে তাহার জন্য মনোজয় ইন্দ্রিয়নিগ্রহ কিছুই করিতে হইবে না—শুধু আমার বর্ণিত এই কাহিনী শ্রবণ করিলেই মোক্ষের অধিকার লাভ করিবে।"

জ্ঞানেশ্বর দর্শনকেও যে কাব্যের মত কেমন সুকুমার করিয়া তুলিয়াছিলেন, ৬ষ্ঠ অধ্যায়ের ১০।১১ শ্লোকের ব্যাখ্যা হইতে তাহার একটু নিদর্শন উদ্ধৃত হইল—

"যোগী কিরূপ স্থানে যোগ করিবেন?—সে স্থান অতি নির্জ্জন—মনোরম তরুরাজির ঘনসন্নিবেশ আতপ-তাপ হইতে তাহাকে রক্ষা করিতেছে। বৃক্ষপত্রের অন্তরাল হইতে খণ্ডিত সৌরকিরণে তাহা আলোকিত—সুগন্ধ শীতল, মন্দানিল সেখানে প্রবাহিত। বিহঙ্গের কাকলি ও ভ্রমরগুঞ্জন ছাড়া আর কোনও শব্দ সেখানে নাই। সম্মুখে সরোবর, সেখানে কলহংস, চক্রবাক সন্তরণ করিয়া বেড়াইতেছে। সে কুঞ্জে যদি কোকিলের কুহুধ্বনি বা ময়ূরের কেকারব শুনিতে পাই, তবে উহাদিগকে তাড়াইয়া দিব কি?—মোট কথা, স্থানটী যেমন আমাদের চিত্ত প্রফুল্ল করিবে, তেমনি অন্তরের সমস্ত সুপ্ত শক্তিকেও জাগ্রৎ করিয়া তুলিবে। সেখানে গেলে বিষয়ীর কলুষকালিমা মুছিয়া যাইবে, সাধকের হৃদয় নবভাবে উদ্বুদ্ধ হইবে—এমন কি রাজাও যদি সেখানে যান, তবে মণিমুকুট ফেলিয়া দিয়া তাঁহারও সেখানে যোগাসনে বসিতে সাধ হইবে।"

অর্জ্জুনের বিশ্বরূপ দর্শনের আকাঙ্ক্ষা জাগিয়াছে, কিন্তু মুখ ফুটিয়া ভগবানকে তাহা বলিতে তাঁহার সাহস হইতেছে না। বিশ্বরূপ দর্শন অধ্যায়ের ভূমিকায় অর্জ্জুনের মুখ দিয়া এই দ্বিধার ভাবটুকু জ্ঞানেশ্বর এইরূপে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন—

"কিন্তু আমার হৃদয়ে যে আর একটী নূতন সাধের উদয় হইয়াছে! মুখ ফুটিয়া তাহা বলিব কি? না বলিবই বা কেন? মাছ জলে থাকে; সে যদি নড়িয়া চড়িয়া জলকেই উতোল করিয়া না তোলে, তবে তাহার আর যাইবার ঠাঁই কোথায়? শিশু যদি মায়ের বুক হইতে স্তন্য সুধা পান করিতে সঙ্কোচ বোধ করে, তবে সে বাঁচিবে কি করিয়া? হে ভগবান, আমরাও যদি হৃদয়ের আশা-আকাঙ্ক্ষা লইয়া তোমার কাছেই আসিয়া না দাঁড়াই, তবে আর যাইব কোথায়? যে সাধ আমার জাগিয়াছে, আমি তাহার যোগ্য কিনা জানি না। কিন্তু আমি রোগী, বৈদ্যের কাছে রোগের লক্ষণ বলাই হইল আমার কর্ত্তব্য। আমি যোগ্য কি অযোগ্য, সে বিচারে আমার কি প্রয়োজন? ক্ষুধিতের কি মনে হয় না যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডটাকে সে গ্রাস করিয়া ফেলিতে পারে? তোমাকে যে আমি দেখিতে চাহিব, এ তো আমার স্বভাব, কিন্তু হে প্রভো, দেখা দিবে কি না, সে তুমিই জান। তবে অন্তর বলিতেছে, আমার এ বাসনা তুমি পূর্ণ করিবেই—আমার অধ্যাত্মসম্পদের পুঁজি আছে বলিয়া নয়, তোমারই করুণার সীমা নাই বলিয়া। যে দানবেরা তোমার শত্রু ছিল, তাহাদেরও কি তুমি মোক্ষবিধান কর নাই? তোমার শত্রুতেও যে অধিকার পায়, সেখানে তোমার সেবক, তোমার সখা, তোমার সন্তানই বা সঙ্কুচিত হইবে কেন? ধ্রুবকে যদি তুমি করুণা করিলে, তবে অর্জ্জুনকেই বা করিবে না কেন?" (সমাপ্য)

শ্রীশ্রীরূপ-সনাতন

(শ্রীমন্মহাপ্রভুসূত্রিত অভিধেয়সাধনভক্তিতত্ত্ব)

জ্ঞান-ভক্তির বিরোধভঞ্জন

শ্রীভগবান বলিতে লাগিলেন, "যাহার আসক্তি দূর হয় নাই, সে কি প্রকারে বৈরাগ্য অভ্যাস করিয়া কর্ম্মযোগদ্বারা জ্ঞানভক্তির অধিকারী হইতে পারে, তাহা বলিয়াছি। এখন জ্ঞানপ্রাপ্তির পূর্ব্বে জ্ঞানযোগীর কি কর্ত্তব্য তাহাই বলিব। জ্ঞানযোগী কর্ম্মানুষ্ঠানকে দুঃখহেতু বলিয়া জানেন, এই জন্য কর্ম্মফলের প্রতি তাঁহার অনুরাগ নাই—তিনি ফল লক্ষ্য করিয়া কর্ম্ম করিতে চাহেন না। তিনি ইন্দ্রিয়-সমূহ সংযত করিয়া অভ্যাসযোগদ্বারা মনকে নিশ্চলভাবে ধারণ করিয়া থাকেন। তবে প্রথম প্রথম মনকে সর্ব্বদা আত্মচিন্তায় ধারণ করা সম্ভব হয় না, ধরিতে গেলে মন চঞ্চল হইয়া ছুটিয়া বেড়ায়। কিন্তু জ্ঞানযোগী তাহাতে বিচলিত হইবেন না—মনকে তাহার স্বভাবানুসারে কিছু দূর চলিতে দিয়া সুযোগ বুঝিয়া আবার তাহাকে নিগৃহীত করিবেন। তবে সর্ব্বদা অতন্দ্রিত থাকিয়া মনের গতিবিধি লক্ষ্য করিবেন, মন চঞ্চল হইলেও লক্ষ্য ভুলিবেন না। মন যদি আবার আগের মত হইয়া যায়, তবে তাহাতেও ক্ষতি নাই, কিন্তু জ্ঞানী যেন কখনও তাহার গতি পর্য্যবেক্ষণ করিতে না ভুলিয়া যান। প্রাণ ও ইন্দ্রিয় জয় করিলে সাত্ত্বিকী বুদ্ধির আবির্ভাব হয়; সেই বুদ্ধি দ্বারা মনকে স্ববশে আনিতে হইবে। মনকে এই ভাবে গুটাইয়া আনা আমার মতে শ্রেষ্ঠ যোগ। যেমন একটা দুষ্ট ঘোড়াকে যদি বশ করিতে হয়, তবে সোওয়ার কেবল জবরদস্তী করিয়া রাশ টানিয়া ধরিলেই হয় না, ঘোড়ার মনের ভাব বুঝিয়া আপন খুসী মত তাহাকে কিছু দূর চলিতেও দিতে হয়, তারপর সুযোগ বুঝিয়া তাহাকে বাগ মানাইতে হয়।

"এইরূপ মন একটু বশীভূত হইলে তত্ত্ববিবেক করিতে আরম্ভ করিবে। প্রকৃতি হইতে ভূত পর্য্যন্ত তত্ত্ব-সমূহ থরে থরে সাজান রহিয়াছে। জ্ঞানী একবার প্রতিলোমভাবে অর্থাৎ পৃথিবীতত্ত্ব হইতে প্রকৃতি-তত্ত্ব পর্য্যন্ত ভাবনা করিবেন, আবার একবার অনুলোমে প্রকৃতি হইতে পৃথিবী পর্য্যন্ত ভাবনা করিবেন। এইরূপ ভাবনার ফলে মন প্রসন্ন হইয়া নিশ্চল হইবে। অবশ্য মন সহজে পোষ মানিতে চায় না, তাহাকে হাজার নির্য্যাতন করিলেও আবার সে বিষয়ের দিকে ছুটিয়া যায়, কিন্তু সাধকের ইহাতে নিরাশ হইলে চলিবে না, পুনঃ পুনঃ অভ্যাসদ্বারা মনকে নিগৃহীত করিতে চেষ্টা করিতে হইবে। তত্ত্বসমূহের বিবেক করিলে জ্ঞান হইবে। ইহাদের তো কোনও ধ্রুব স্বরূপ নাই, ইহারা সংসারে আসে যায়, স্থির হইয়া থাকে

না, সুতরাং সব দিক দিয়াই ইহারা সীমাবদ্ধ। ইহাদের লইয়াই সংসার—অতএব সংসার অনিত্য, তাহার ফল তুচ্ছ। এইরূপ সংসারে নির্ব্বেদ ও বৈরাগ্য জন্মিলে গুরূপদিষ্টবিষয়ের পুনঃ পুনঃ চিন্তা দ্বারা মনের দেহাদি অভিমান নষ্ট হইয়া যায়। যম, নিয়ম প্রভৃতি যোগাঙ্গদ্বারা কিম্বা তত্ত্বমসি মহাবাক্য বিচার দ্বারা, কিম্বা আমার অর্চ্চনা উপাসনা দ্বারা মনকে বশ করিতে চেষ্টা করিবে -এই তিনটী উপায় ছাড়া অন্য কিছুতে মনকে সংলগ্ন রাখিবে না।

"জ্ঞানযোগী বা ভক্তিযোগী যদি প্রমাদবশতঃ কোনও পাপও করেন, তবে তাঁহাদের জ্ঞানাভ্যাস বা নামকীর্ত্তনাদি দ্বারাই সে পাপ নষ্ট হইয়া যায়, তাহার জন্য আর পৃথক্ কোনও প্রায়শ্চিত্তের অনুষ্ঠান করিতে হয় না। এই কথায় কাহারও মনে সংশয় হইতে পারে যে, নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্ম্ম যেমন সত্ত্বশুদ্ধির সহায় বলিয়া গুণরূপে গণ্য হয়, হিংসাদি অশুদ্ধ কর্ম্মও সেইরূপ দোষ বলিয়া গণ্য হইবে। প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা এই দোষ ক্ষালন করা যায়, সুতরাং প্রায়শ্চিত্তও তো গুণকর্ম্ম। কর্ম্মে এইরূপ গুণদোষ বিচার আছে বলিয়াই স্থানকালপাত্রভেদে বেদে কর্ম্মব্যবস্থা রহিয়াছে। দূষণীয় কর্ম্ম করিয়া তাহার নিবর্ত্তক প্রায়শ্চিত্ত অনুষ্ঠান না করিলে কেবলমাত্র যোগাভ্যাস দ্বারা (সে জ্ঞানযোগই হউক বা ভক্তিযোগই হউক) কিরূপে দোষ ক্ষালন হইবে ?

"ইহার উত্তরে বলি, নিজ নিজ অধিকারে যে নিষ্ঠা, তাহাই গুণ—এই হইল প্রথম কথা। যাহার যেরূপ স্বভাব, যেরূপ প্রবৃত্তি, তাহার সেইরূপ অধিকার। কর্ম্মযোগীর পক্ষে যেমন কর্ম্মই গুণ, কর্ম্মেই নিষ্ঠা, তেমনি জ্ঞানযোগী বা ভক্তিযোগীর পক্ষে জ্ঞান বা ভক্তিই গুণ, তাহাতেই তাহাদের নিষ্ঠা রাখিতে হইবে, সমস্ত বিষয়ে তাহাই আশ্রয় করিয়া চলিতে হইবে। সুতরাং জ্ঞানী বা ভক্তের পক্ষে কর্মানুষ্ঠান দ্বারা দোষ ক্ষালন করিবার প্রয়োজন নাই, যোগেই তাঁহাদের সমস্ত দোষ নষ্ট হইয়া যাইবে।

"মূল তত্ত্বটী হইল এই, বাস্তবিক কর্ম্ম মাত্রই অশুভ, উৎপত্তির সঙ্গে সঙ্গেই তাহা দোষদুষ্ট। তাহার প্রমাণ দেখ, কর্ম্মে আসক্তি বশতঃই মানুষের মাঝে জ্ঞান ও ভক্তি স্ফুরিত হইতে পারে না। কর্মের সঙ্গে পুরুষের প্রবৃত্তির অতি ঘনিষ্ঠ যোগ, প্রবৃত্তি না থাকিলে কর্ম হইতেই পারে না। সুতরাং মূলে মানুষের প্রবৃত্তিই অশুদ্ধ, স্বভাবতঃই তাহা মলিন। সুতরাং প্রবৃত্তিকে সঙ্কুচিত করিয়া মানুষকে পথে ফিরাইয়া আনিতে হইবে। কিন্তু প্রবৃত্তির নিবৃত্তি তো একদিনে হইবার নয়—সহসা মানুষকে সকল দিক হইতে নিবৃত্ত করিয়া তাহার কর্মবন্ধন ছিন্ন করিয়া দেওয়া যায় না। এই জন্যই কর্মের মাঝে গুণদোষের বিচার করিয়া এইটী কর্ত্তব্য, এইটী অকর্ত্তব্য—এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়া অল্পে অল্পে মানুষের প্রবৃত্তিকে সঙ্কুচিত করিয়া আনিতে হয়। এই জন্যই গুণদোষভেদে কর্মের ব্যবস্থা—উদ্দেশ্য, ইহাতে কর্মে আসক্তি শিথিল হইয়া আসিবে। কিন্তু যোগীর তো স্বভাবতঃই কোনও প্রবৃত্তি নাই সুতরাং তাঁহার পক্ষে আবার কর্মের বিধান কেন ? এই জন্য তাঁহার পাপ ক্ষালন হয় যোগদ্বারা, জ্ঞান দ্বারা—প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা নয়।"

এইরূপে কর্ম্মযোগ ও জ্ঞানযোগ ব্যাখ্যা করিয়া ভক্তিযোগের প্রসঙ্গে শ্রীভগবান বলিতে

ছেন, "ভক্তের লক্ষণ এই, আমার কথায় তাঁর শ্রদ্ধা জন্মিয়াছে, কর্ম্মানুষ্ঠানে তাঁহার নির্ব্বেদ উপস্থিত হইয়াছে, কিন্তু এখনও তাহার ফলের প্রতি তাঁহার বিরক্তি জন্মায় নাই। কর্ম্মের ফল যে দুঃখময়, তাহা তিনি জানেন—কিন্তু তথাপি তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া যাইবার সাধ্য তাঁহার নাই। এ অবস্থায় আমার প্রতি ভক্তি থাকিলেই সিদ্ধি হইবে এইরূপ দৃঢ়নিশ্চয় হেতু শ্রদ্ধাযুক্ত চিত্তে তিনি আমারই ভজনা করিয়া থাকেন। তিনি কাম্য বিষয়সমূহ ভোগ করেন বটে, কিন্তু তাহাদের ফল যে দুঃখময়, এই কথা স্মরণ করিয়া সর্ব্বদাই তাহাদিগকে ত্যাগ করিয়া যাইতে চান, কিন্তু নিজকে ত্যাগ করিবার বা গ্রহণ করিবার কর্ত্তা বলিয়া মনে করিতে পারেন না।"

ভগবানের কথিত এই লক্ষণ প্রবর্ত্ত ভক্তিযোগীর। একটু স্থির চিত্তে চিন্তা করিলেই বুঝা যায়, ভগবান কেন বিষয়ের সঙ্গে ভক্তকে জড়াইয়া রাখিতেছেন। কর্ম্মের সঙ্গে সকল সাধকেরই যোগ আছে—যাঁহার যেমন অধিকার, যেমন স্বভাব, তিনি কর্ম্মকে সেই ভাবে গ্রহণ করিয়া থাকেন। কর্ম্মযোগী কর্ম্মকেই সাধনরূপে গ্রহণ করিয়া ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ অভ্যাস করিয়া যোগসিদ্ধ হইতেছেন। জ্ঞানী প্রথমতঃই নির্ব্বেদ ও বৈরাগ্য দ্বারা কর্ম বর্জ্জন করিয়া সংসার নিরপেক্ষ হইয়া সূক্ষ্ম তত্ত্বসমূহের ভাবনা করিতেছেন। আর ভক্তিযোগী বাঞ্ছিত জনকে ভালবাসিয়া, তাঁহাতে আত্মসর্পণ করিয়া তৃপ্ত। তাই তাঁহার মাঝে কোথায় কোনও কামনা আছে কি না আছে, তাহার খোঁজ করিতে তিনি ব্যস্ত নন। যদি কামনাতে দুঃখ থাকে, তবে সে দুঃখ হইতে নিস্তার পাইবার জন্য আপনিই চিত্তে দৈন্য বা প্রপন্নভাব জাগিয়া উঠিবে। এই আর্ত্তি, এই ব্যাকুলতাটুকু জাগাইবার জন্যই ভগবান প্রবর্ত্ত ভক্তের হৃদয়ে একটু কামনার দুঃখ রাখিয়া দিলেন। তাই তিনি কামনাকে দুঃখাত্মক জানিয়াও "পরিত্যাগেঽপি অনীশ্বরঃ"—ছাড়িয়াও যাইতে পারিতেছেন না। ইহাতে তাঁহার দুঃখও শত গুণে উথলিয়া উঠিতেছে, আর সেই দুঃখ দৈন্যের উপর ভগবানের করুণা অজস্রধারে ঝরিয়া পড়িতেছে। দুঃখী না হইলে কি দয়া মিলে?

কিন্তু দুঃখ চিরদিন থাকে না। তাই শ্রীভগবান বলিতেছেন, "কিন্তু কামনা থাকিলেও ভক্তিযোগদ্বারা যিনি বারবার আমার ভজনা করেন, আমি তাহার হৃদয়ে আবির্ভূত হই—তাঁহার হৃদয় হইতে সমস্ত কামনা দূর হইয়া যায়, অহঙ্কাররূপ হৃদয়গ্রন্থি খুলিয়া যায়, সমস্ত সংশয় ছিন্ন হইয়া যায়, আমাকে অখিল জগতের আত্মস্বরূপে দর্শন করিয়া সংসারের হেতুভূত সমস্ত কর্ম্মও ক্ষীণ হইয়া যায়।"

তারপর কর্ম্ম, জ্ঞান, ও ভক্তি এই তিনটীর যে অধিকার স্বতন্ত্র, তাহাও দেখাইয়া ভক্তিযোগ সম্বন্ধে অপরের নিরপেক্ষতা বুঝাইবার জন্য ভগবান্ বলিলেন—"তাহা হইলেই দেখিতেছ, যে যোগী ভক্তিযুক্ত হইয়া আমাতেই নিজকে সমর্পণ করিয়াছেন, প্রায়শঃ (প্রায়ঃ) ভক্তি সাধনে (ইহ) জ্ঞান ও বৈরাগ্য তাঁহার পক্ষে শ্রেয়স্কর হয় না।" যেখানে অধিকার স্বতন্ত্র, সেখানে একটী অপরের অঙ্গীভূত না হওয়ারই তো কথা। কিন্তু ইহাতে কি উভয়ের মধ্যে এমন কোনও

মর্ম্মান্তিক বিরোধ সূচিত হইতেছে, যে জ্ঞানী ভক্তকে বুঝিতে পারিবেন না বা ভক্ত জ্ঞানীকে বুঝিবেন না ?

তারপর ভগবান আরও বলিতেছেন, "কর্ম, তপস্যা, জ্ঞান, বৈরাগ্য, যোগ, দান ও অন্যান্য শ্রেয়স্কর কর্ম দ্বারা যাহা লাভ করা যায়, আমার ভক্ত ভক্তিযোগ দ্বারা অনায়াসে তাহা সমস্তই লাভ করিয়া থাকেন—কর্মের ফল স্বর্গ, জ্ঞানের ফল অপবর্গ ও ভক্তির ফল আমার ধাম—ভক্ত যদি ইচ্ছা করেন, তবে সমস্তই লাভ করিতে পারেন। কিন্তু ধীর-স্বভাব ভক্ত সাধু একান্তভাবে আমাতেই আত্মসমর্পণ করেন বলিয়া আমি পুনর্জন্মরহিত কৈবল্য দিতে গেলেও তিনি তাহা চান না। কোনও কিছুর প্রত্যাশা না করাই মহৎ শ্রেয়ের একমাত্র নিদান। সুতরাং যাহার আকাঙ্ক্ষা নাই, কোনও ফলের প্রতি অপেক্ষা নাই, তাঁহারই আমার প্রতি ভক্তি হইবে।"

এই শেষের কথাটাই সাধন-রাজ্যের সার কথা। কি জ্ঞানে, কি ভক্তিতে কোথাও ফলাকাঙ্ক্ষা থাকিলে চলিবে না। জ্ঞানশাস্ত্রে ভক্তিশাস্ত্রে উভয়ত্র ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে। কিন্তু সাম্প্রদায়িকতায় অন্ধ হইয়া গালি দিবার সময় ভক্তি-পন্থী বলিবেন, জ্ঞানী মুক্তি চান, ভক্ত মুক্তি দিলেও নেন না—অতএব ভক্ত বড়। কিন্তু জ্ঞানীর মোক্ষ যে স্বভাবমাত্র, তাহা যে প্রাপ্য, বিকার্য্য বা সংস্কার্য্য কোনও অনিত্য বস্তু নয়, ভক্ত তাহা ভুলিয়া যান, কিম্বা তাহার খোঁজ রাখাও প্রয়োজন মনে করেন না। সাক্ষিভাবে বন্ধ মোক্ষ ব্যবহারও যে মিথ্যা, এ কথার তাৎপর্য্য কেহ তলাইয়া দেখেন কি ?

উপসংহারে ভগবান বলিতেছেন, "আমার একান্ত ভক্ত যাঁরা, কর্ম্মের গুণদোষ হইতে উৎপন্ন পাপপুণ্য তাঁহাদিগকে স্পর্শ করে না, কেননা তাঁহারা সাধু, সর্ব্বত্র সমচিত্ত এবং বুদ্ধির পরপারে গিয়াছেন। এইরূপে আমি যে তিনটী পথের কথা বলিলাম, যাঁহারা ইহাদের ধরিয়া চলেন, তাঁহারা কল্যাণলাভ করিয়া আমার স্থান প্রাপ্ত হন এবং পর-ব্রহ্মকে জানিতে পারেন।" তিনটীই ভগ-বান্নির্দ্দিষ্ট পথ, তিনটীই কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্ত, তিনটীই অধিকার ভেদে ব্যবস্থিত এবং চরমে তিনটীই পরম পুরুষার্থ সিদ্ধ করে। তবে তাহাদের মধ্যে বিরোধ কোথায় ? এখানে ছোট বড়র কথাও বা আসে কোথা হইতে ?

আর একটী ভগবদুক্তি উদ্ধৃত করিয়াই আমরা এ প্রসঙ্গ শেষ করিব। শ্রীভগবান উদ্ধবকে বলিতেছেন—"যিনি আত্মতত্ত্ব অনুভব সহকারে শ্রবণ করিয়া তাহা পরিজ্ঞাত হইয়াছেন, কেবল অনুমান দ্বারাই তৃপ্ত থাকেন নাই—তিনি জগৎকে মায়ামাত্র জানেন, এবং সেই জ্ঞানও আমাতে সংন্যস্ত করেন। জ্ঞানীরও আমিই ইষ্ট—ফল, তদুপযোগী সাধন, স্বর্গ বা অপবর্গ—আমি ছাড়া এই সমস্ত কিছুই তাঁহার কাছে প্রিয় নয়। জ্ঞান ও বিজ্ঞানে সিদ্ধ ব্যক্তিরাই আমার শ্রেষ্ঠ পদ লাভ করিয়াছেন—এই জন্য জ্ঞানী আমার প্রিয়তম, কেননা জ্ঞান দ্বারা তিনি আমাকেই ধারণ করিয়াছেন। জ্ঞানের এক কলাতে যে সিদ্ধি মিলে, তপস্যা, তীর্থভ্রমণ, জপ, দান প্রভৃতি পুণ্যকর্ম্মে সেইটুকু সিদ্ধি মিলে না। অতএব, হে উদ্ধব, জ্ঞানসহকারে নিজকে জানিয়া, জ্ঞানবিজ্ঞানসম্পন্ন হইয়া ভক্তিভাবে আমার ভজনা কর।" ইহার উপর আর টীকা নিষ্প্রয়োজন; আমাদের যাহা বক্তব্য, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

শিক্ষা-মঙ্গল

—*—

নিঃশব্দে নিজকে দান করতে হবে—এই হচ্ছে আচার্য্যের ব্রত। চারদিক হতে সকল রকম উচ্ছ্বাসকে সংযত করে আনতে হবে—নিজের মাঝে অবিচলিত হয়ে সমস্ত বিক্ষোভ গ্রহণ করতে হবে—এই হবে দিনের পর দিন আচার্য্যের সাধনা।

চারিধারের পারিপার্শ্বিককে এমনি সহজ, এমনি অনায়াস করে তুলতে হবে যে, তাতে যেমন নাকি উষার কিরণস্পর্শে পদ্মকোরক তার অরুণরাগের দলগুলি মেলে ধরে, তেমনি করে তরুণ জীবনও তার আনন্দের দলগুলি বিকসিত করে তুলবে।

এর জন্য চাই তপস্যা। আবার চিত্তের একাগ্রতা না জন্মালে তপস্যা হয় না। বিচিত্র কর্ম্মের আবর্ত্তে আবর্ত্তিত হয়ে ফিরেও একটী একাগ্র সাধনাকে সমস্ত দিনের সম্মুখে অবিশ্রান্ত পরম আনন্দে বহন করা—এই হল তপস্যার পরিচয়। এক দিক তোমার কাজ করছে—আর এক দিক অন্তরের ভাবব্যূঢ় অবস্থায় সমাহিত রয়েছে—এ যদি না ঘটে, তাহলে ঠিক কোন পথে যে তুমি চলবে এবং অপরকে চালাবে—তা কিছুতেই ধরতে পারবে না।

আর চাই আনন্দ। ওরে মূঢ়, কেবল কামনা করে, হতাশা নিয়ে—এ কূলে তুমি পাড়ি জমাবে? আঘাত করে তুমি ফুল ফোটাবে? তা তো হবার নয়। ব্যথার ভার যে তোমাকেই বইতে হবে। এক হাতে বুক চেপে আর চোখের জল মুছে, আর এক হাতে সত্যের পতাকা নিয়ে তোমায় এগিয়ে যেতে হবে।

যদি একথা মনে না ধ্রুব হয়, যে, এ জীবনে আর তোমার কোন সাধ নাই, আহ্লাদ নাই—শুধু এই বিলিয়ে দেওয়ার ব্রত, এই একটী মাত্র ফুলের কালকে বিশ্বেশ্বরের আলোর ভাণ্ডার হতে প্রসাদ দিয়ে বাঁচিয়ে তোলা—এই তোমার জীবনের একমাত্র কাজ—এটুকু যদি অন্তরের সঙ্গে না ভাবতে পার—তবে তোমার সমস্ত চেষ্টাই বিশৃঙ্খল ও বৃথা হবে।

পেছনপানে চেয়ো না মোটেই। যে আনন্দের সঞ্চয়ে তোমার বুক ভরে আছে—সে ফুরাবে না কোনও দিন—যদি অকুণ্ঠিত চিত্তে তা দান করে যেতে পার। তোমার পূর্ণতা নিয়েই তুমি কাজের আসরে নেমেছ—এইমাত্র তোমার ভরসা। তার পর সে আনন্দ যে কোথায় দিয়ে কোন্ কাচফলকের মাঝে বিচ্ছুরিত হয়ে পড়বে—তার ভাবনা তোমার কেন? সে তো আলোই—তার শুভ্রতা যদি বিকৃত হয়, তবে তা রঙের বৈচিত্র্যেই ফুটে উঠবে। এই সত্য—এই তোমার সঞ্চয়! এগিয়ে চল হে বীর!

*

কিছুতেই তোমাকে দমলে চলবে না—বা আপন ইচ্ছাটাকেই বড় করে দেখলে হবে না। যদি তোমার কর্ত্তৃত্ব তোমার অনুবর্ত্তীর পক্ষে যথার্থ কল্যাণকর করতে চাও, তাহলে তোমাকে যথেষ্ট সহ্য করতে

হবে। তুমি চিন্তার যে ধারাটা ধরে চলছ তারা যদি ঠিক সেই ধারায় না চলে, তবে তাদের দোষ দেওয়া চলে না। এখানে ত্রুটা কি, তা খুঁজে দেখতে হবে; আর তাই নিয়ে নিরপেক্ষ হয়ে বিচার করতে হবে। হয়ত তোমার পরিণত চিত্ত যেখানে সঙ্কল্পের দৃঢ়তায় উৎসাহী হয়ে উঠছে—সেখানে তোমার অপরিণতচিত্ত অনুবর্ত্তী তোমার সঙ্গে সায় দিতে পারল না। এখানে ব্যঙ্গ করে, বাঁকা কথা বলে কি তুমি তাকে তোমার পথে টানতে পারবে? তোমার চিত্তের উষ্ণতায় যে তার চিত্তকেও তপ্ত করে তোলে।

তবে কিম্বা অবিবেচনা, তাই ঘটতে দিতে হবে? যদি অসাধ্য হয়—তবে দিতে হবে বই কি? যা অসাধ্য, তা মানুষ করবে কি করে? তোমার যদি সাধ্য না থাকে, কিম্বা তুমি যদি বোঝ, তোমার ছাত্র তার সাধ্যের পরিমাণ ঠিক বুঝতে পারছে না। তবে দূর হতে বাক্যবাণে বিদ্ধ করে তুমি তার প্রাণ জাগাতে পারবে না—তোমাকেও তার কাজের মাঝে নেমে আসতে হবে—অতি সন্তর্পণে স্নিগ্ধতায়। এমনি করে ভালবেসে, আনন্দ দিয়ে, বোঝা হালকা করে, দরকার পড়লে দায়িত্ব থেকে মুক্তি দিয়ে কাজকে দৃঢ় করে নিতে হবে।

কথার ওজন সব জায়গাতেই চাই। এ কথা মনে রেখো যে, তোমার কাছে তোমার মূল্য যাই হোক না কেন, যাদের উপর সত্যকার কর্তৃত্বাধিকার তোমার জন্মেছে, তারা তোমার একটা কথাকেও খাটো করে দেখে না। তোমার মুখের একটা মিষ্টি কথা, একটু হাসি তাদের সমস্ত কর্ম্মকে আনন্দশ্রীতে উজ্জ্বল করে তুলতে পারে। কাজেই কি দিয়ে কিসের প্রতিদান দিচ্ছ—তা খুবই লক্ষ্য রাখতে হবে। দরকার হলে শুধু শুধুই দুটো মিষ্ট কথা ছড়াতে হবে।

কিন্তু এ সমস্ত হল নীতি—সত্যের এরা পোষাক মাত্র। আসল কথা হচ্ছে—আনন্দ। যদি নিজকে হারিয়ে ফেল, তবে আনন্দকেও হারাবে। তখন কর্ম্ম হয়ে উঠবে জঞ্জাল—আর কিছুতেই তা এগুতে চাইবে না।

তাই, যাই কর না কেন—আনন্দের মাঝে যেন কোনও মালিন্যের স্পর্শ না লাগে—এইটাই তোমার সর্ব্বপ্রথম সাধ্য। ভাল মন্দ, সফলতা-বিফলতা আছেই—শুধু দেখে যাও—রঙের খেলা।

*

কুঁড়ি পেয়েছ, তাকে ফুলে ফুটিয়ে তুলতে হবে—মাতৃস্নেহের আলোকে। ভেবেছ কি আচার্য্য শুধু পুরুষ? তা নয়; স্নেহে, মমতায়, সেবায় সে যে করুণাময়ী জননী। যারা মা-হারা হয়ে তোমার কোলে এসেছে, তাদের মায়ের অভাব তোমাকে মিটাতে হবে। শুধু কতকগুলি কর্ত্তব্য পালন করেই মনে করো না স্নেহের পরিচয় দিয়েছ। মমতা কর্ত্তব্যেরও পরের জিনিষ। আশ্রিতেরা যে তোমার নাড়ীছেঁড়া—এটুকু যতদিন তোমার সমস্ত কর্ত্তব্যকে ছাপিয়ে না উঠবে, ততদিন নিজকে কেবলি নত করে রেখো—কর্তৃত্বের অভিমানে উদ্ধত হয়ে উঠো না।

যে ভালবাসে, সে জানে ভালবাসার দরদ কতখানি। কি করে যে সে নিজকে তার ভালবাসার ধনের মাঝে বিলিয়ে দেবে, তাই তার আকুল চিত্তের একমাত্র ভাবনা। সে ভাবনা যেন নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের মতই অনায়াস, বিরামহীন। জীবে দয়ার বড়াই করতে

পার, কিন্তু সে কেবল খোস-মেজাজে থেকে সময়-মাফিক একটু আহা-উহু করা নয় —সে হচ্ছে অহরহ ব্যাকুল বিরহের সন্তাপে দগ্ধ হওয়া। এই দয়া দিয়ে তোমায় বুঝতে হবে ভগবান জীবকে কতখানি ভালবাসেন—আর সেই ভালবাসার গৌরবে পরকে প্রাণের মমতা বিলিয়ে দিতে হবে।

তোমার ভালবাসা ফুটবে কিসে?—বীর্য্যে। ভালবাসা তো মায়িক কিছু নয়—অন্তরের অনাহত অনাবিল আনন্দ সে। প্রতিদিনের সবল নিষ্ঠাপূর্ণ কর্ম্মের মাঝে সেই আনন্দ যাতে ব্যক্ত হয়ে উঠে, তারি জন্য প্রাণপাতী প্রয়াস তোমায় করতে হবে। যারা কাছে এসেছে—কত দুর্ব্বল তারা—কত নির্ভরশীল। এই নির্ভরতাটুকুকে মমতা দিয়ে সমস্ত কঠিন সঙ্কটে বাঁচিয়ে চলতে হবে—ক্ষমাস্নিগ্ধ সকরুণ ভালবাসার সম্মোহন মন্ত্রে—এ কি তোমার পক্ষে কম পৌরুষের কথা!

শুধু মনে করো না, বাইরে থেকে চেপে ধরলেই তুমি অপরের প্রবৃত্তিকে সঙ্কুচিত করতে পারবে। তা পারা যায় না কখনই—তাতে অন্যায়ে আরো অন্যায়টাই শুধু বেড়ে যায়। কিন্তু ভালবাসার আলো যদি ছড়িয়ে দিতে পার, তাহলে দেখবে, সূর্য্যমুখী ফুলটীর মত ওই তরুণ চিত্তগুলিও তোমার চিত্তের দিকে নুয়ে পড়েছে—শাসন দ্বারা যে উচ্ছৃঙ্খলতাকে দমন করতে পারনি—সে যেন কিসের সম্মোহনে কোথায় উড়ে গিয়েছে। তাই হৃদয়ে হৃদয়ে যে অমোঘ-শক্তির বিদ্যুৎ-সঞ্চারণ চলতে পারে, সে কথায় বিশ্বাস করে—হৃদয় পাবার আর হৃদয় দেবার তপস্যা আরম্ভ করে দাও।

যারা তোমার সহায় হবে—তাদের বীর্য্য-বন্ত করে তোল। আগে তারা শিখুক নিষ্ঠা—অভ্যাস তাদের দৃঢ় হোক। তারপর চিত্তে ভাবের বীজ বপন করে দাও—জীবন নিতান্তই বৃথা যাবে না।

প্রকৃতির মাঝে কখনো কখনো বিশ্রাম প্রয়োজন—যাতে গৃহপ্রাচীরে অবরুদ্ধ প্রাণ একটু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচতে পারে—কি স্বল্প উপকরণে অনায়াস অথচ অফুরন্ত আনন্দ চারদিকে ছড়িয়ে রয়েছে বুঝতে পারে।

*

মানুষের জীবন নিয়ে—বিশেষতঃ যাদের গড়ন এখনো শেষ হয়নি, তাদের নিয়ে নাড়া-চাড়া করাটা যে কত বড় দায়িত্ব—এ বোঝা বইতে হলে যে কতখানি শক্তির প্রয়োজন, আগে তাই বুঝতে হবে। শুধু পড়ানো আর হুকুম হাঁকানো তো নয়—রীতিমত প্রাণ-প্রতিষ্ঠা! এমনি সন্তর্পণে নিজকে বিলিয়ে দেওয়া যে, যাকে দিচ্ছ—সে কিছুই বুঝতে না পারে। অথচ তোমার আশাটাই যে ফলবে, এমন দুরাশা মনের ত্রিসীমাতেও ঠাঁই দিতে পারবে না—কেননা যা নিয়ে কারবার করছ, তার সম্বন্ধে স্পষ্ট কথা আর ক'টাই বা তুমি বলতে পারবে?—তুমি আঁচে-আন্দাজে যতটুকু বুঝতে পেরেছ, ততটুকুর উপরেই না তোমার কারিগরি!

নিস্তব্ধ শান্ত করে নিজকে আগে প্রতিষ্ঠা করতে হবে—তার পর অন্য কথা। তুমি তো শুধু আচার্য্য নও—একাধারে তুমি যে এতগুলি প্রাণের শাস্তা পিতা আর ধাত্রী মাতা। হর-গৌরীর সম্মিলন যে তোমার মাঝেই সার্থক

হয়েছে। এই ভাবটুকু ধরে যদি বাহ্যজীবনের সঙ্গে অন্তর্জীবনও ফুটিয়ে তুলতে পার; তবে শুধু তৃপ্তি নয়—একটা রসের সাধনার সার্থকতাও তোমার মাঝে ঘটবে।

হে আচার্য্য, এই রসময় পুরুষের স্পর্শ—যিনি এক হয়েও চণকবৎ দ্বিদল বিরাজ করছেন—তাঁর অমৃতময় স্পর্শ তোমার জীবনে তুমি লাভ কর—সে তোমার শুভ্র শুচি ললাটতটে জ্যোতির্ম্ময় রাজটীকার মত জ্বল্ জ্বল্ করে উঠুক—তোমার আগুণ ছুঁয়ে হাজার প্রাণে আগুণের হল্কা বয়ে যাক!

মহৎ কর্ত্তব্য তোমার সম্মুখে। নির্ভয়ে বুক পেতে দাও! বুক ভেঙ্গে যাবে?—যাক না!—একদিন তো ভেঙ্গে যেতই—মমতা দিয়ে আর তুমি তাকে ক'দিন বাঁচিয়ে রাখতে পারতে? তাই বলি, আজ নির্ভয়ে সাহস-বিস্তৃত বক্ষপট নিয়ে এসে সম্মুখে দাঁড়াও! তোমার ধৈর্য্যে, তোমার সেবায় জগতের কর্ম্মশৃঙ্খলা কতটুকু নিয়ন্ত্রিত হবে, তার হিসাব করো না—তার মাঝে তোমার সার্থকতা নয়। শুধু এই জেনো—তুমি নিঃশেষে আপনাকে উপ্‌চে দিয়েছ—এই তোমার চরম সার্থকতা। তোমাকে যারা পাবে—তারা অন্তরে ধ্রুবসম্পদ রূপেই পাবে—বাইরে তার হিসাব যত ছোটই দেখাক্ না কেন। দেশের সেবা তো এই—এই আত্মপ্রসারণেই তো দেশ জেগে উঠবে—তোমার প্রাণের বিদ্যুৎস্ফুরণে চমকে উঠবে!

*

হে আচার্য্য!—শুভ্র তুমি—দীপ্ত তুমি! বিদ্যুজ্জ্বালাবিচ্ছুরিত তোমার উদার ললাট—তার মাঝে সন্ধ্যাতারার মত স্নিগ্ধ আঁখি দুটী—সুধার স্পর্শে সমস্ত গ্লানি ক্ষয় করে দিচ্ছে—এই তো তোমার মানস রূপ! জান তো, গহন তোমার পথ—আঁধার তাহে রাত্রি! হে সঙ্গীহীন, অনন্ত কাল ধরে চিরসঙ্গী যে, তাকেই খুঁজে এসেছ—আজ এই কচি মুখের কমলবনে আবার তাকেই খুঁজে ফিরো—এই তো তোমার ব্রত। যদি কাঁটার ঘায়ে ব্যথা পাও—তোমার নয়ন যদি বা অশ্রুসজল হয়ে ওঠে—হৃদয় যেন তোমার অমৃত ক্ষরণ করে।

দিনের পর রাত্র, আবার রাত্রের পর দিন—এই আবর্ত্তনই তোমার জপমালা। এর প্রত্যেকটী অবকাশ তোমাকে অমৃত দিয়ে পূরে নিতে হবে—তোমার আভাস পেয়ে অতি নিবিড় ব্যথাও যেন প্রশান্ত হাসিতে স্নিগ্ধ হয়ে ওঠে।

দীপালির উৎসব হবে দেশে—সে কোন নবযুগের তোরণদ্বারে? কিন্তু হে দীপক, সেই উৎসবদিনের আলোকশিখাকেই আজ তোমার ঘরের কোণের এই অনাড়ম্বর মৃৎপ্রদীপের বুকে জ্বালিয়ে তুলতে হবে। এর চেয়ে বড় কামনা আর তোমার জীবনে কি হতে পারে? খ্যাতির হাটে যারা সস্তা দরে বিকিয়ে গেল, তাদের পরে তুমি লোভ করো না—অখ্যাতির আবর্জ্জনার মাঝেই তোমার লুকানো মাণিক! তোমার সার্থকতার ঋণ আনন্দের অফুরন্ত পসরা দিয়েই তোমার অন্তর্য্যামী শোধ করবেন—করছেন। তুমি শুধু তাঁরি দক্ষিণ মুখের হাসিটীর লক্ষ্য ঊর্দ্ধমুখ হয়ে বসে থেকো!—সাড়া একদিন পুলকে পুলকে সারা গায়ে শিউরে উঠবে।

আরণ্যক

"যজ্ঞেন বাচঃ পদবীয়মায়ন্ তামন্ববিন্দন্ ঋষিষু প্রবিষ্টাম্॥"

—ঋগ্বেদ সংহিতা ১০।৬।৩

অভিমান বজায় রাখিয়া চলিলে শুধু তাঁহার দয়ার, তাঁহার স্নেহের অপমান করা হয়।—আমাদের চলিতে হইবে অবিচারে তাঁহার আদেশ পালন করিয়া—তাহার মাঝে নিজের কোনও "মতলব থাকিবে না। তিনিই জীবনের লক্ষ্য, তাঁর কাজ করিতে করিতেই তাঁহাকে পাইব—এই বিশ্বাসই স্থির রাখিতে হইবে। সব ভুলিয়া তাঁর কাজ করিতে করিতেই তাঁহাকে পাইব। শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—"মৎকর্ম্মপরমো ভব" —আরও বলিয়াছেন—"মদর্থমপি কর্ম্মাণি কুর্ব্বন্ সিদ্ধিমবাপ্স্যসি।"

*

আমরা চলব নদীর মত। নদী যেমন বাধা-বিপত্তি কিছুই মানে না, পাহাড় পর্ব্বত কিছুতেই ঠেকে না—আমরাও তেমনি আমাদের গন্তব্য পথে চলে যাব। নদী বয়ে চলছে আপন মনে—পিপাসিতের পিপাসা হরণ করে, কূলে কূলে শ্যামল শস্যসম্ভার বিলিয়ে দিয়ে। সে যেন প্রত্যেক মুহূর্ত্তে আনন্দের ঢেউ তুলে হাসতে হাসতে, নাচতে নাচতে চলছে। আমরাও এমনি করে চলতে চাই। আমাদের উপর শত নির্য্যাতন, শত বাধা-বিপত্তি ঘনিয়ে আসলেও, আমাদের আনন্দ অটুট রেখে, অক্লান্ত মনে, অসীম উৎসাহে, অদম্য গতিতে যেন তাঁর দিকেই ছুটে যেতে থাকি। আর আমাদের সংস্পর্শ যারা পাবে, তাদের চিত্তও যেন শান্তিতে স্বস্তিতে ভরে ওঠে। হিংসা দ্বেষ, কাম, ক্রোধ, সকলই আমাদের এই অদম্য স্রোতের মুখে সামান্য একটা তৃণখণ্ডের মত ভেসে যাবে। আমরা হাসি মুখে সমস্ত বাসনা-কামনার অবরোধ ভেঙ্গে চুড়ে সব এক ভূমিতে মিশিয়ে দিয়ে, প্রভুর নাম করতে করতে প্রভুর পানে ছুটে চলব। বাধা-বিপত্তির উপরও থাকবে শান্তি, আনন্দ, কর্ম্মফলে ঔদাসীন্য—আর থাকবে তাঁর কাজে, তাঁর সেবায় অসীম উৎসাহ।

*

আমাদের একটা মন এই বাহ্য জগৎ নিয়া সর্ব্বদা চঞ্চল, আর একটা মন এই চঞ্চলতার আড়ালে নিষ্কম্প জ্যোতিঃশিখাবৎ স্থির হইয়া আছে—আমাদের এই জাগতিক কোনও প্রকার সংস্কারের দাগ তাহাকে মলিন করিতে পারে না। সংস্কারের মলিনতায় ভারাক্রান্ত হয় আমাদের এই বাহিরের চঞ্চল মনটী; কিন্তু আসল মনটী সব জায়গায় ও সকল রকম অবস্থায় একরূপ থাকে। সেই মনই বিশ্বের সত্তা। আমাদের বাহিরের এই সদা-চঞ্চল মনকে নিরোধ করিতে পারিলে, সেই ভাস্বর জ্যোতিঃর সাক্ষাৎ মিলিবে, সে তোমার দূরে নয়—অতি নিকটে, প্রাণের অন্তস্তলে; অথচ বাইরের এই বিরাট বিশ্বকে সে জুড়িয়া আছে। তার প্রশান্তির মাঝে যদি সমাহিত হইতে পার, তবে দেখিবে,

কি আনন্দ তোমার দেহমন ছাপিয়া কোন্ অজানা দিব্যলোকে—যেন আনন্দের স্বপ্নরাজ্যে তোমায় লইয়া যাইতেছে। পূর্ব্বে যে ইন্দ্রিয়কে তুমি নিরোধ করিতে চাহিয়াছিলে, তখন তাহাদের প্রত্যেকটী অনন্ত গুণ শক্তিসম্পন্ন হইয়া উঠিবে। তখন মনে হইবে—কত অসাড়, কত ঘৃণিত, কত অশক্ত এই পঞ্চভূতে গড়া দেহকারাগার; কিসের মোহে মানুষ স্বেচ্ছায় এখানে বন্দী থাকে?

*

আমি দুর্ব্বল, আমি কৃপণ—এমনিতর কলুষিত ভাবনা করে প্রাণময় ব্রহ্মকে আমরা পাব?—কিছুতেই না। জ্ঞানের দীপেই অজ্ঞান আঁধারের স্তূপ ভেঙ্গে খান্ খান্ হয়ে যায়। যখনই জেনেছি, ভুল পথে চলেছিলাম—, তখনই ভুল হতে মুক্তি পেয়েছি—এই সত্য। বৈরাগীর হৃদয়ে অনুশোচনার ঠাঁই নাই।

কিন্তু শুধু জানলেই হয় না—শক্তি চাই—ভালবাসার মাঝেও শক্তি চাই—নির্ম্মম হবারও শক্তি চাই। স্তব্ধ হয়ে আপনার মাঝে ডুবে গিয়ে দেখ, শক্তিরূপিণী উমার সাক্ষাৎ পাও কি না।

আর এক সত্য এই যে, খাঁটী হতে হবে তোমার নিজের দিকে তাকিয়ে—আর কিছুর মমতা বা সুবিধার দরুণ নয়। যদি ভাব, তোমাকে খাঁটী হতে হবে—কেননা এই কাজের ভার তোমাকে নিতে হবে, বা তুমি ভুল পথে চল্‌লে আর কারু প্রাণে ব্যথা লাগ্‌বে—তা হলে অমন খাঁটী হওয়ার মাঝে এক কাণা কড়ার সত্তাও থাকবে না। তাতে হয় নিজকে ফাঁকি দেবে, নয় জগৎকে দেবে। খাঁটী হতে হলে নিমিত্তের নিরপেক্ষ হয়ে খাঁটী হতে হবে।

তা বলে উদাসীন হবে না—কেননা তোমায় যে ভালবাসতে হবে সকলকে। জগতের কাছে পাওনার আবদার ঘুচে যাবে বটে, কিন্তু তা বলে তোমার দেনা তো একতিলও কমবে না। তুমি ভালবাসবে, প্রাণ দেবে—কিন্তু কারু ভালবাসা চাইবে না বা কারু প্রাণের দানের ভরসা করবে না—এই হল জগতের সঙ্গে তোমার সম্পর্ক।

কিন্তু দিতে গিয়েও বাইরে ছটকে পড়লে তো তোমার চলবে না। যদি দিতে হয়, তবে বাইরে কিছু দিও না—চুপি চুপি প্রাণের নিবিড় দানে অপরের প্রাণকে সার্থক করে তোল। তুমি যে দিয়েছ—এ কথা যেন কেউ না জানে।

*

কামনা ব্যাহত হইলেই আমরা ক্ষুব্ধ হইয়া উঠি। উহার মূলে আমাদের অহংবোধ। আমিত্বের অভিমান কোথাও নত হইতে চাহে না। বিবেকজ্ঞানশূন্য মূঢ় ব্যক্তিদের পক্ষে, এই আহত অভিমানই ক্রমশঃ দারুণ ক্রোধের কারণ হইয়া উঠে ও অবশেষে পতঙ্গ যেমন নিজেই আগুনে ছুটিয়া গিয়া পুড়িয়া মরে, তেমনি ক্রোধান্ধ ব্যক্তিগণও আপনিই আপনার বিনাশের কারণ হইয়া থাকে; অন্য কেহ সে জন্য বাস্তবিক দায়ী নহে। আপন মনের বল্গা ধরিতে শিখিলেও সময় সময় অভিমান আহত হইয়া বিপথে টানিয়া লইতে পারে, কিন্তু পূর্ব্ব হইতে সাবধান থাকায় ক্রোধ আসিয়া সাক্ষাৎভাবে কাহাকেও পরাভূত করিতে পারে না। কিন্তু অনেক সময় মনের কোনে সূক্ষ্মভাবে প্রচ্ছন্ন থাকিয়া এই সমস্ত রিপু সাধকের বিপত্তি

বটাইয়া থাকে। এইখানেই বিপদ বেশী। তাই সর্ব্বদা আত্মানুসন্ধান দ্বারা নিজকে পরীক্ষা করিতে হয়। অভিমান অক্ষত থাকিলে আনন্দ স্বাভাবিক; কিন্তু অভিমান ক্ষুণ্ণ হইলেও যদি আনন্দ অক্ষুণ্ণ থাকে, তবেই জানিবে, মান অপমানকে জয় করিতে শিখিয়াছ। মান অপমান ছাড়িয়া কাজ করাই সেবা—নতুবা আর সকলই ভূতের বেগার খাটা মাত্র।

*

চুপটি করে ঘরে বসে ভগবানের প্রেরণা পাওয়া যায় না। যার ভিতর তিনি প্রেরণা দেবেন, সে কাজ করতে করতেই তাঁর আদেশ, তাঁর বাণী, তাঁর ইচ্ছা বুঝতে পারবে। তাঁর কাজ করে যাও, তাঁর প্রেরণা তোমার মাঝে শ্রাবণের বারিধারার মত অনবরত ঝরে পড়বে।

*

ভগবানকে পেতে সবাই চায়—কেউ প্রাণে প্রাণে, কেউ সখ করে। যার পেতেই হবে এমনি তাগাদ, তার পাওয়ার উপায়ও আপনি এসে জোটে। ক্ষুধা যখন পায়, তখন মানুষ খাবারেরও যোগাড় করে—সেটা স্বভাবেই করিয়ে নেয়। তেমনি ভগবানকে পেতে যার ইচ্ছা হয়, তাকে আর উপায় বলে দিতে হয় না—ভগবান তাকে আপনি এসেই ডাকেন। সে ডাক যার কানে যায়, তার বাঁধন আপনি টুটে যায়। ডাক কানে গেলেই মনে হবে পথের কথা—মন তখন গেয়ে ওঠে—

আকাশ ভরে দূরের গানে,
অলখ দেশে হৃদয় টানে,
ওগো সুদূর, ওগো মধুর,
পথ বলে দাও পরাণ-বঁধুর,
সব আবরণ তোল তোল॥

এই পথের কথা মনে হলে তাঁর বাঁশী কানে আপনি বেজে ওঠে।

*

সেবার ভিতরে নিজকে ডুবিয়া দিলে তবে তার রস গ্রহণ করা যায়। যে সেবক, সে যার তার সেবা করে বেড়ায় না। তার সেবা ভগবানেই নিবদ্ধ। আমরা দেখি সে হাড়িডোম সকলেরই সেবা করছে, কিন্তু তার চোখ তো হাড়ি ডোম দেখে না—তার চোখ দেখে তার প্রাণের ঠাকুরটী—তার মন প্রাণ করে তাঁরই সেবা। তাই প্রতি জীবে শিব দর্শন না করতে পারলে সেবার রস পাওয়া যায় না।

*

মন নিস্তেজ ও জড়বৎ থাকিলে সেই সুযোগে পাপ ঢুকিবার সম্ভাবনা। তখন ভাল কাজ তোমার দ্বারা হউক বা না হউক, মন্দ কাজ হইবার সম্ভাবনাটাই বেশী হইয়া দাঁড়ায়। কেননা মানুষের মন স্বভাবতঃ প্রবৃত্তির পথেই চলে, রাশ টানিয়া তাহাকে নিবৃত্তির পথে চালাইতে হয়; সুতরাং রাশ ছাড়িলেই আবার সে প্রবৃত্তির দিকে ছুটিবে। প্রবৃত্তি পথ রোধ করিতে হইলে মনের জড়ত্বের জন্য দুঃখ করিয়া বেড়াইলে লাভ নাই। বরং জড়ত্ব তাহাতে বাড়িবে বই কমিবে না। জড়ত্ব দূর করিতে হইলে তাহার বিপরীতবৃত্তি সাত্ত্বিক আনন্দের অনুশীলন কর। রোগীকে ঔষধ খাওয়ানোর মত, জোর করিয়া হইলেও এইটী করা চাই। মনে একটু আনন্দ জাগিলেই অন্ধকারে একটু আলোর রেখা পড়িবে। সঙ্গে সঙ্গে জড়তাও দূর হইয়া যাইবে। শূন্য মন সয়তানের কারখানা, উদ্বেগে ব্যতিব্যস্ত মনও তাই। তবে কাজ করিতে হয়, করিয়া যাইবে—কিন্তু সংসারের সমস্ত ঝঞ্ঝাটের উপরেও মনকে সাত্ত্বিকভাব দ্বারা অনুপ্রাণিত বলিয়া ভাবনা করিবে। সাত্ত্বিকতা হইতেই ভগবৎ প্রেরণা জাগিবে—নূতন প্রাণের সঞ্চার হইবে।

সংবাদ ও মন্তব্য

আশ্রমসংবাদ

শ্রীমৎ পরমহংসদেব শারদীয় পূজার সময় মঠে আসিবেন, আমরা এইরূপ সংবাদই পাইয়া ছিলাম। কিন্তু দুঃখের বিষয়, নানা কারণে সম্প্রতি তাঁহার মঠে আসা হইল না। এখন তিনি পুরীধামে অবস্থান করিতেছেন—কিছুদিন সেখানেই থাকিবেন।

আর্য্যমহিলাপরিষৎ

৺কাশীধাম জগৎগঞ্জে "আর্য্যমহিলা হিতকারিণী মহাপরিষৎ" নামে একটী পরিষৎ স্থাপিত হইয়াছে। তাহার প্রধানাধ্যক্ষা শ্রীমতী মহারাণী শিবকুমারী (নরসিংগড়) নিখিল ভারতবর্ষীয় আর্য্যমাতা ও ভগিনীগণের নিকটে নিবেদন করিতেছেন :—

"আর্য্যমহিলাগণের সর্ব্ববিধ উন্নতির জন্যই এই পরিষৎ সংস্থাপিত হইয়াছে। এবং ইহার নিয়ম সমূহের মধ্যে সুবিধানুসারে মধ্যে মধ্যে সাধারণ ও বৃহৎ অধিবেশন করাও অন্যতম নিয়ম। তদনুসারে পরিষদের কয়েকজন সভ্যা শ্রীকাশীধামে যথাসম্ভব শীঘ্র ভারতবর্ষীয় আর্য্যমহিলাগণের একটী অধিবেশন করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। উক্ত অধিবেশনে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উপর বিবেচনা করা স্থির হইয়াছে।

১। স্ত্রীশিক্ষার স্বরূপ নির্ণয়।

২। স্কুল-কলেজে পুরুষগণেকে ধর্ম্মশিক্ষা দিবার জন্য মহামণ্ডল যেরূপ ব্যবস্থা করিয়াছেন, স্ত্রীগণের সম্বন্ধেও তদনুরূপ ব্যবস্থা করিবার প্রযত্ন করা।

৩। প্রাচীনকালে স্ত্রীগণ ধাত্রীবিদ্যা ও শিশু চিকিৎসা যেরূপ জানিতেন, বর্ত্তমান সময়ে সুশিক্ষিতা স্ত্রীগণও তাহা অবগত ন'ন। এই অভাব দূরীকরণের জন্য বিবিধ প্রযত্ন করা।

৪। বর্ত্তমান সময়ানুসারে সামাজিক রীতি, নীতি এবং ব্রতোৎসবাদি সংগ্রহ করিয়া পুনরুজ্জীবিত করিবার উদ্যোগ করা।

৫। পুস্তক, পুস্তিকা, পত্র ও বিজ্ঞাপনাদি প্রকাশের দ্বারা এবং উপদেশিকাগণকে প্রেরণ করিয়া সর্ব্বসাধারণ স্ত্রীসমাজে প্রেম, সাধুতা, কর্ত্তব্য-পরায়ণতা ও ধর্ম্মভাবের বিস্তার করা।

এতদ্ব্যতিরিক্ত অন্যান্য যে সমস্ত বিষয় অধিবেশনে আলোচনা করা মহিলারা কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচনা করেন, অনুগ্রহপূর্ব্বক তাহা লিখিয়া জানাইবেন। যোগ্য বিবেচিত হইলে বিচারণীয় বিষয়সমূহের মধ্যে তাহাও সন্নিবেশিত করিয়া দেওয়া হইবে।"

পত্রাদি লিখিবার ঠিকানা—সহকারী মন্ত্রী, আর্য্যমহিলা হিতকারিণী মহাপরিষদ্, মহামণ্ডল-ভবন, জগৎগঞ্জ, বেনারস।

গ্রাহকগণের প্রতি

আগামী কার্ত্তিক সংখ্যা আর্য্য-দর্পণ ১৫ই কার্ত্তিক প্রকাশিত হইবে আশা করি। শারদীয়া পূজা উপলক্ষ্যে যাঁহারা স্থানান্তরে যাইবেন, তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া কার্ত্তিকের প্রথম সপ্তাহের মধ্যেই ঠিকানা পরিবর্ত্তনের কথা কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইবেন, নতুবা পত্রিকা পাইতে গোলমাল হইতে পারে।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং

ক্রমিক সং
শ্রেণী সং
কলিকাতা।

ওঁ তৎ সৎ

আর্য্য-দর্পণ

(সনাতন ধর্ম্মের মুখপত্র)

১৩শ বর্ষ } কার্ত্তিক { ৭ম সংখ্যা

অগ্নির্নেতা.

—•—

[ঋগ্বেদসংহিতা—১।২৭।৬]

অগ্নে নয় সুপথা রায়ে অস্মান্
বিশ্বানি দেব বয়ুনানি বিদ্বান্।
যুযোধ্যস্মজ্জুহুরাণমেনো
ভুয়িষ্ঠাং তে নম উক্তিং বিধেমঃ॥

অগ্নে ত্বং পারয়া নব্যো অস্মান্ত্
স্বস্তিভিরতি দুর্গাণি বিশ্বা।
পূশ্চ পৃথ্বী বহুলা ন উর্ব্বী
ভবা তোকায় তনয়ায় শংযোঃ॥

অগ্নে ত্বমস্মদ্ যুযোধ্যমীবা
অনগ্নিত্রা অভ্যমন্ত কৃষ্টীঃ।
পুনরস্মভ্যং সুবিতায় দেব
ক্ষাং বিশ্বেভিরমৃতেভি র্যজত্র ॥

পাহি নো অগ্নে পায়ুভিরজস্রৈ-
রুত প্রিয়ে সদনে আশুশুক্বান্।
মা তে ভয়ং জরিতারং যবিষ্ঠ
নূনং বিদন্ মা পরং সহস্বঃ॥

বিশ্বের প্রজ্ঞান যত, হে দেবতা, বিদিত তোমার,
পুণ্যপথে আমাদেরে নিয়ে যাও মহা-ঋদ্ধি পার;—
কুটিল পাপের গতি—যুঝি তারে করি দাও দূর,
গাহি গাথা নমি পায় শতবার শ্রদ্ধাভারাতুর।

দুর্গম এ বিশ্ব-সিন্ধু, তাহে তুমি নবীন নাবিক,
স্বস্তি হোক্—নিয়ে চল পারে তার দেখাইয়া দিক্;
এই পুরী, এই পৃথ্বী,—ইহাদেরে দাও বিথারিয়া,
তনয়েরো তনয়েরে চাহ দেব করুণা করিয়া।

অগ্নি, তুমি আমাদের যুঝি দূর কর রোগ-শোক,
তব ভাগ নাহি দেয় হিংসা করি যত দুষ্ট লোক;—
যজমানহিতকারী, আমাদের কর ঋদ্ধি দান,
বিশ্ব-দেবগণ সাথে যজ্ঞভূমে হও অধিষ্ঠান।

রক্ষ অগ্নি আমাদের দিয়া তব অজস্র কল্যাণ,
প্রিয় এই যজ্ঞভূমে আসি ত্বরা হও দীপ্তিমান্
নবীন যৌবন তব, রহ তুমি ভুবনে অজয়—
তব গাথা গাহি কবি যেন আজি তরে সর্ব্বভয়।

বিশ্রাম

—*—

তোমার জীবনে দায়িত্ব অনেক; অনেক দিক দিয়ে তোমার দেহ-মনকে খাটাতে হয়। এতে তোমার মেজাজটা যে চড়া সুরে বাঁধা থাকবে, তা তো আশ্চর্য্য নয়। কিন্তু বাইরের ব্যাপার যদি সব সময়েই তোমাকে এমনি করে খুঁড়ে খায়, তবে তোমার মরণ ঘনিয়ে এসেছে বুঝতে হবে।

কি করে এর হাত হতে বাঁচা যায়? বাম বলছেন না যে, কাজকর্ম্ম ছেড়ে দাও বা নিত্যকাজে অবহেলা দেখাও। কিন্তু তোমার অভ্যাস এমনি তৈরী করতে হবে যে, অতি কঠোর একঘেয়ে বিরক্তিকর কাজ করতে গেলেও তুমি সব সময়েই বিশ্রামেই থাক। রামের উপদেশটা আর কিছু নয়—বৈদান্তিক ত্যাগ। ত্যাগের অচলশৃঙ্গে সর্ব্বদা নিজেকে প্রতিষ্ঠিত বলে জানবে। ওই জায়গাটীতে একবার পোক্ত হয়ে বসে, যখন যে কাজ হাতের কাছে আসে, তার মাঝেই নিজেকে ছেড়ে দাও—তোমার ক্লান্তি আসবে না, যেমন কাজই পড়ুক না কেন, পিছু হটে আসতে হবে না।

কথাটা বুঝিয়ে বলি। কাজ যখন করছ, তখন মাঝে মাঝে এক আধ মুহূর্ত্তের জন্য হলেও থমকে গিয়ে ভাব—ব্রহ্মস্বরূপ তুমি ছাড়া আর কোনও সত্তা নাই জগতে—দেহাদি বন্ধনের সঙ্গে তোমার কোনও সম্পর্ক নাই। তুমি সাক্ষিমাত্র—ফল নিয়ে ভাববার কিছুই নাই তোমার। এই ভেবে চোখ বুজে শরীরের পেশীগুলিকে শিথিল করে দাও—দেহটাকে একেবারে ছেড়ে দাও—মন হতে সব রকম চিন্তা ঝেড়ে ফেলে দাও। কাঁধ থেকে চিন্তার ভার যতই নামবে, ততই নিজকে শক্তিশালী বলে অনুভব করতে পারবে।

স্নায়ুমণ্ডলী দেহের জীবনীশক্তিকে রক্ষা করে—তা ছাড়া চিন্তাকেও তারা ধারণ করে। পরিপাকক্রিয়া, রক্তসঞ্চালন, কেশোদ্গম সকলই চরম স্নায়ুমণ্ডলীর উপর নির্ভর করে। যদি তোমার চিন্তা বিক্ষিপ্ত হয়ে যায়, হাইপাঁশ নানা ভাবনায় মনটা পাগল পাগল হয়ে ওঠে, তবে তাতে স্নায়ুর উপর বড্ড বেশী চাপ পড়ে। এমনিতর চিন্তার কঠোর পরিশ্রম একদিক দিয়ে লাভ বলে মনে হতে পারে, কিন্তু আর একদিক দিয়ে এতে খুবই লোকসান—এ কথা একেবারে ঠিক। যদি জীবনীশক্তি অক্ষুণ্ণ রাখতে চাও, স্বাস্থ্য অটুট রাখতে চাও, স্নায়ুমণ্ডলীকে উৎপীড়ন না করে জীবনকে লঘু করতে চাও, তবে অহংবুদ্ধির ভাবনার বোঝাটা একটু হাল্‌কা করতে শিখো। দুশ্চিন্তায়, আবোলতাবোল ভাবনায় জীবনের সমস্তটুকু রস নিঃশেষ করে ফেলো না। স্বাস্থ্য অটুট আর দেহ যুবার মত কর্ম্মক্ষম রাখতে হলে কি করতে হয় জান?—মনকে সর্ব্বদা লঘু ও প্রফুল্ল রাখবে—কোনও ভয়ে বা ভাবনায় সে যেন উদ্বিগ্ন না থাকে, মুসড়ে না পড়ে।

যথার্থ শিক্ষার একমাত্র উদ্দেশ্যই হচ্ছে, মানুষকে কেবল কর্ত্তব্য কাজ করতে শিখানো

নয়—কর্ম্মকে ভোগ করতেও শিখানো বটে; কেবল পরিশ্রমী হলেই চলবে না—পরিশ্রমকে ভালবাসতে হবে।

সার কথা

ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডল আমার সুধাপাত্র—আকাশ ভরা আঁলোর স্রোতে তা পরিপূর্ণ

খাওয়া-পরার যোগাড় করবে, কারু সুনজরে পড়বে, কাউকে খুসী করবে বা সংসারের এটা-সেটা জুটিয়ে নেবে—এই যে তোমার কর্ত্তব্য, তা মনে করো না। সব রকম আশা-আকাঙ্ক্ষা ছেড়ে দাও—লাভালাভের দিকে না তাকিয়ে, পারিপার্শ্বিকের দিকে দৃষ্টি না রেখে নিজকে সর্ব্বদা শান্তি আর আনন্দে ভরপুর রাখাই হল তোমার একমাত্র কর্ত্তব্য —ওই তোমার একমাত্র ব্যবসায়, জীবনের একমাত্র লক্ষ্য। এ জগতে ভগবান তোমার ওপর সব চেয়ে গুরু কর্ত্তব্যের ভার এই চাপিয়ে দিয়েছেন যে, তোমাকে আনন্দে থাকতে হবে। সামাজিকতা হিসাবে তোমার প্রতিবাসীরা চায় যে তুমি সর্ব্বদা হাসিখুসী থাক। পারিবারিক কর্ত্তব্য হিসাবে তোমার সব চেয়ে গুরুতর কাজ হচ্ছে, আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে হাসিখুসী হয়ে থাকা। আর নিজের প্রতি তোমার সব চেয়ে গুরুতর কর্ত্তব্যও হচ্ছে, সকল অবস্থাতেই আনন্দে থাকা।

নিজের কাছে খাঁটী থেকো—জগতের আর কিছুকে ভ্রূক্ষেপও করো না। জানি, সবাই তোমার পায়ে লুটিয়ে পড়বেই—কিন্তু লুটিয়ে পড়ুক আর না পড়ুক, তুমি কারু ভরসা না করেই আনন্দে থাকবে। মুখ আঁধার করে, মনমরা হয়ে থাকা—ধর্ম্ম, সমাজ, রাষ্ট্র, পরিবার—সকলের চোখেই অপরাধ; একমাত্র এই অপরাধেই তুমি অপরাধী হতে পার, তোমার সকল রকম অপরাধ বা ত্রুটীবিচ্যুতির এই হচ্ছে একমাত্র নিদান। তুমি প্রশান্ত হও, অনুচ্ছসিত শান্তিতে সমাহিত হও, দেখবে, তোমার পারিপার্শ্বিক আপনা হতে কিসের জোরে যেন তোমার মত হয়েই গড়ে উঠছে। কোনও কিছু নিয়ে তাড়াতাড়ি করাটা তোমার কাজ নয়। আত্মসমাহিত, আত্মনিষ্ঠ, আত্মরতি থাকবে—এই হচ্ছে তোমার একমাত্র কর্ত্তব্য।

বাস্তবিক আমাদের কর্ত্তব্য নাই, আমাদের ঘাড়ে কোথাও বোঝা চাপান হয়নি। শান্তি ও আনন্দের পুণ্য বিধান লঙ্ঘন করলে নিজের কাছেই তুমি ভীষণ অপরাধে অপরাধী হয়ে থাকবে। অপরে না হয় ঘুম থেকে উঠে ভাববে, তাদের কত কাজ পড়ে রয়েছে—ঘর-দোর ঝেঁটোতে নিকোতে হবে, আপীসে যেতে হবে, কাপড় কাচতে হবে, পাক করতে হবে, পড়তে হবে,—আরো না কত কিছু করতে হবে। কিন্তু তোমার কথা স্বতন্ত্র। ঘুম হতে উঠেই তুমি ভাববে, অনন্ত আনন্দ স্রোতে তুমি ভেসে যাচ্ছ; আনন্দে থাকা—এই হচ্ছে তোমার একমাত্র কর্ত্তব্য। তার মানে এ নয় যে তুমি কাজে ফাঁকী দেবে বা গৃহস্থালীর কাজকর্ম্ম এড়িয়ে যাবে। তুমি জানবে, এগুলি যেন আমোদ-প্রমোদের মত তোমার কাছে আনুষঙ্গিক ব্যাপার মাত্র। তোমার আধ্যাত্মিক স্বাস্থ্য অটুট রাখতে হলে তোমাকে তো কিছু করতে হবে, একটু খেলা ধূলা তো চাই—এ যেন তাই মাত্র। কিন্তু যাই কর না কেন, এ কথা ভুলো না যে, তুমি যে কাজটাকে সংসারের পক্ষে সব চেয়ে দরকারী মনে

করছ, সেটাই হল সব চেয়ে অদরকারী। নিজকে আনন্দে রাখাই হচ্ছে তোমার এক-মাত্র কর্ত্তব্য। ছাত্রদের বলছি, পরীক্ষার ফলের উপর যদি তোমাদের ভবিষ্যৎসুখ নির্ভর করছে ভাব, আর তাই ভেবে এখন কেবল সন্দেহের দোলায় দোল খেতে থাক, তা হলে সুখের আশায় হাঁ করে থাকবে বটে, কিন্তু সুখ কপালে ঘটবে না। যেমন দেবতা, তার তেমনি পূজা। ব্রহ্মানন্দ তোমার মাঝে জেগে উঠুক—দেখবে সিদ্ধি তোমার পায়ে লোটায়। এই হচ্ছে আইন।

"হাসলে পরে দেখবে, জগৎ তোমার সঙ্গে হাসছে; কাঁদলে দেখবে, তুমি একাই কাঁদছ। কেননা পৃথিবীর বুকে দুঃখের বোঝা তো কম নয়, তার দরকার শুধু একটু আনন্দ। গান গাও—পাহাড়ে পাহাড়ে তার প্রতিধ্বনি জাগবে, আর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেল—তা শুধু শূন্যে মিলিয়ে যাবে। কেননা আনন্দের সাড়া পেলে প্রতিধ্বনি তা দূর দূরান্তরে ছড়িয়ে দেয়, কিন্তু দুঃখ-বেদনার ভাষা সে বোঝে না। উৎসব করলে কত লোক এসে আপনি জড় হবে, শোক করতে বসলে তারা আপনি ফিরে যাবে। কেননা তোমার আনন্দের ভাগ তারা চায়, কিন্তু দুঃখের ভাগ কেউ নিতে চায় না। তুমি খুশী হয়ে উঠলে বন্ধু বান্ধবের ভাবনা হবে না—কিন্তু মুখখানা আঁধার হলে সবাইকে হারাবে। কেননা তোমার আনন্দসুধা তারা প্রত্যাখ্যান করতে চায় না—কিন্তু জীবনমন্থনকরা হলাহল একা তোমাকেই পান করতে হবে। ভোজ লাগিয়ে দাও—অভ্যাগতের অভাব হবে না; উপবাস কর—কেউ ফিরেও তাকাবে না। অর্জ্জন কর, দান কর—সবাই তোমার বাঁচার সহায় হবে, কিন্তু তোমার মরার সহায় তো কেউ হবে না। আনন্দের রাজপথে সকলকে নিয়ে মহাসমারোহে যাত্রা কর—পথ প্রশস্ত রয়েছে; কিন্তু দুঃখের অলি-গলিতে চলতে হলে তোমাকে একা একাই যেতে হবে।"

আনন্দই কল্যাণ; আনন্দ করবার সময় মাত্র এই বর্ত্তমান কাল; আনন্দ করবে এই এখানে—এই এখনি; আনন্দ করবে পরকে আনন্দ দিয়ে।

উপসংহার

রাম তোমাদের দুটী কথা বিশেষ করে লক্ষ্য করতে বলছেন—

১। মিথ্যা আমির নিরসন

২। সত্য আমির প্রতিষ্ঠা।

প্রথমতঃ, নিরসন বলতে বেদান্ত বোঝেন, সম্পূর্ণ ত্যাগ, বিরতি বা বিশ্রাম। যখনই সময় পাও, তখনই চেয়ারে কিম্বা বিছানায় শরীরটাকে ছুড়ে ফেলবে—যেন ও বোঝা তোমাকে কখনও বইতে হয়নি, ওর সঙ্গে যেন তোমার কোনও কারবার নাই, একটা ঢেলার মত ও যেন তোমার কাছে নিঃসম্পর্ক। শরীরটা মড়ার মত কিছুক্ষণ পড়ে থাক, তোমার ইচ্ছা বা ভাবনার ঘাড়ে যেন তাকে তুলে না ধরে, মনে যেন শরীরের জন্য কোনও ভাবনা চিন্তা না থাকে। বাসনা, আশা, ভরসা, উচ্চাকাঙ্ক্ষা সব ছেড়ে দাও, ওদের কাছে ঘেঁসতে দিও না। এই হচ্ছে ত্যাগ। তোমার মালপত্র মাটীর উপরেই পড়ে থাক, সে তোমার বুকে চাপতে যাবে কেন?

দ্বিতীয়তঃ—ব্রহ্মত্ব। ভগবানের ইচ্ছাই তোমার ইচ্ছা হোক্। তাঁর অভিপ্রায়কে তোমারই অভিপ্রায় জেনে তার জন্য লড়াই কর—তাতে ভালই হোক আর মন্দই হোক। তুমি বস্তু ঊর্দ্ধে—দেহ আর তার পারিপার্শ্বিক, মন আর তার মতলব, সংসার আর তার মতামত—এ সকলের পরপারে তুমি। অনুভব কর—তুমি সর্ব্বব্যাপী, বিভু সবিতার সবিতা; কারণের অতীত, কার্য্যের অতীত তুমি আনন্দে আত্মহারা তুমি মুক্ত, তুমি "রাম।"

ভিতর থেকে আপনা হতে যে সুর জেগে ওঠে, সেই সুরে প্রণব গান কর। তা হলে আপনা হতেই তোমার আধি-ব্যাধির সকল হেতু দূর হয়ে যাবে। এই জগৎটাকে আর তোমার পারিপার্শ্বিককে তুমি যেমন ভাববে, তারা তেমনি হয়ে দেখা দেবে। সংসারের চিন্তা যেন তোমার বুকে পাথর হয়ে না বসে। দিনরাত কেবল এই সত্য ভাবনা কর যে, জগতে যত মত আর যত সমাজ, সবই তোমার কল্পনা হতে জন্মেছে—তুমিই শক্তির মূল প্রস্রবণ, তোমার নিঃশ্বাসেই এই জগতের সৃষ্টি। তোমার স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়ছে কেন জান? তুমি ভদ্রতা দেখিয়ে অপরের কথা মেনে চলতে চাও—এখন সে কথা যতই নড়-চড়ে, যতই ধোঁয়া ধোঁয়া হোক না কেন; কিন্তু তোমার বুকের মাঝে বাস করছেন যে সত্য পরমাত্মা, তাঁর বাণী তুমি কানে তোল না। তোমার গরজে তোমায় বাঁচতে হবে, পরের গরজে নয়। মুক্ত হও—আত্মরূপী এক ও অদ্বিতীয় প্রভুরই সেবা কর—তিনিই তোমার স্বামী, তোমার অন্তরদেবতা। দশকে খুসী করে তুমি কিছুতেই চলতে পারবে না—ওই দশাননের খেয়াল জুগিয়ে চলতে তো তুমি বাধ্য নও। তুমি নিজেই নিজকে গড়বে। আপন মনে গান গেয়ে যাও—যেন তুমি একা রয়েছ, আর কেউ শুনতে আসে নি। তোমার আত্মা তুষ্ট হলেই জগৎ তুষ্ট হবে। এই হচ্ছে আইন।

কেবল ভাবনা-চিন্তার রাজ্যে যার বাস—সে মোহে আর ব্যাধিতে আপনাকে ঘিরে রেখেছে। বাইরে থেকে তাকে যত পণ্ডিত আর জ্ঞানী বলে মনে হোক না কেন, তার গুণ জ্ঞান সবই উইয়ে খাওয়া কাঠের মত অসার। তাই বলি, চিন্তা তোমায় ঘিরে থাকবে বটে, কিন্তু তা দিয়ে তুমি বাঁধা থেকো না—গরম লাগলে মানুষ যেমন গায়ের কাপড় খুলে রাখে, মিস্ত্রী যেমন কাজ সারা হলে যন্ত্রপাতি তুলে রাখে, তেমনি চিন্তাকেও সরিয়ে রাখতে শিখতে হবে।

যখন কাজ করবে, তখন তোমার চিন্তা সম্পূর্ণভাবে কাজেই নিমজ্জিত থাকবে—অপ্রাসঙ্গিক কোনও ব্যাপারেই তাকে বিচলিত হতে দিও না। একটা প্রকাণ্ড ইঞ্জিন পূর্ণ শক্তিতে একমুখী হয়ে চললে যেমন হয়, তার কোনও অংশই ক্ষয়ে যায় না—তেমনি করে তোমার চিন্তাকে সমঞ্জস রূপে চালাতে হবে।

তার পর কাজ শেষ হয়ে গেলে যখন আর যন্ত্রটার প্রয়োজন থাকবে না, তখন ওটাকে একেবারে থামিয়ে রাখতে হবে—তখন আর কোনও হাঙ্গামা থাকবে না—ছেলেরা এসে ইঞ্জিন-ঘরে খেলা-ধূলা জুড়ে দেবে। যেখানে তোমার আত্মার আসন, কর্ম্মান্তে তোমাকে সেই পরম-চেতনার মাঝে ডুবে যেতে হবে।

ওঁ। হে অমৃতের পুত্রগণ, আমাকে তোমরা ভজনা না করে অন্য দেবতার পূজা করছ কেন? আমার মাঝে কি সৌন্দর্য্য নাই? মুক্ত হওয়াটা কি এতই কঠিন? অন্তরের দিকে তাকিয়ে দেখ, আমি তোমার সাথে, আমি তোমার মাঝে। চোখ মেলে তাকাও একবার—সত্তারূপে তোমায় জাগতে বলছি শুধু—যেমন অনায়াস তোমার নিঃশ্বাস, তেমনি সহজভাবে মুক্ত হও তুমি—আমার সৃষ্টিকে সার্থক কর, দেখে আমার বুক ভরে উঠুক। আঁধাররাতে কোথায় তুমি পা ফেলেছ, পথিক, তা আমি জানি। ঈশ্বরের ছায়াকে পথের প্রদীপ করতে চেয়েছিলে। কিন্তু আজ তোমার পৌরুষের সুপ্রভাত—ছায়াহীন আত্মার প্রকাশ আজ! বহুর মায়া টুটে গিয়েছে, তার অভ্রভেদী স্পর্দ্ধা লুটিয়ে পড়েছে প্রাণরূপে আমিই জেগেছি। আমার রসে তোমার জীবন কোরকের মত বিকসিত হবে। জীবন তোমার সম্মুখে, মরণ তোমার কোথায়? কিন্তু আপন রুচির বিকারে যে সব দেবতা তুমি গড়েছিলে, যারা দিতও, নিতও—করুণা আর ক্রোধের বিকারে যারা ক্ষমাও করত, শাসনও করত—তারা কীটের মত আজ ঝরে পড়বে—তারা বাঁচবে না তারা মরবে। *

* স্বামী রামতীর্থ

ক্রমিক সং
শ্রেণী সং

বেদান্তসার

[চতুর্থ খণ্ড—বিবৃতি—সাধনবিচার]

বৈরাগ্য

সাধনচতুষ্টয়ের প্রথম সাধন বিবেকের কথা বলা হইল। তার পর বৈরাগ্য। বিবেকদ্বারা কোন্ বস্তু নিত্য এবং কোন্ বস্তু অনিত্য, তাহা স্থিরীকৃত হয়। আমরা দেখিয়াছি, বিবেকের বিচারে ব্রহ্ম ব্যাতিরিক্ত যাবতীয় বস্তুই অনিত্য বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। একমাত্র ব্রহ্মই নিত্য; কিন্তু তাহা হইলেও আমরা ব্রহ্মবিদ্যার প্রতি কোনও আকর্ষণ অনুভব করি না—ইন্দ্রিয়সমূহ বহির্গামী বলিয়া তাহাদের আহৃত অনিত্য বিষয় সমূহ লইয়াই আমরা মত্ত থাকি। এই বিষয়ের প্রতি তৃষ্ণা যদি দূর না হয়, তবে ব্রহ্মবিদ্যা অর্জ্জনের প্রবৃত্তিও হইবে না। তৃষ্ণাও স্বাভাবিক, সুতরাং একদিনের নিষেধেই তাহা নিবৃত্ত হইবার নয়—তাহার জন্য চিত্তে বিচারজাত দৃঢ়

সংস্কার উৎপন্ন করা চাই। বিবেক-বিচার দ্বারা সেই সংস্কার উৎপন্ন হয়। ব্রহ্মের নিত্যত্ব ও বিষয়ের অনিত্যত্ব শ্রুতি ও যুক্তি প্রমাণ সহ নিরন্তর মনন করিলে তদ্বিষয়ক সংস্কার উৎপন্ন হইবে এবং অনিত্য বলিয়া বিষয়কে হেয়, এবং নিত্য বলিয়া ব্রহ্মকে উপাদেয় মনে হইবে। চিত্তের এই প্রকার সংস্কারারূঢ় অবস্থাই বৈরাগ্য অভ্যাসের উপযুক্ত সময়।

বৈরাগ্যে ঐহিক ও পারলৌকিক সকল প্রকার সুখভোগের প্রতিই বিতৃষ্ণা জন্মিবে। যে সমস্ত ভোগ ঐহিক, শরীরের সঙ্গে তাহাদের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ। মাল্য, চন্দন প্রভৃতি বিলাসদ্রব্য, কলত্র, ভৃত্য, গৃহ, ক্ষেত্র, পশু ইত্যাদি বিচিত্র বিষয়ের সংস্পর্শহেতু যে সুখ উৎপন্ন হয়, তাহাই ভোগ। কেহ কৃষিদ্বারা, কেহ রাজসেবা দ্বারা, কেহ বা দানশীল ব্যক্তির নিকট হইতে প্রতিগ্রহ করিয়া এই ভোগের উপকরণ সঞ্চয় করিয়া থাকে। সুতরাং ভোগ যে কর্ম্ম হইতে উৎপন্ন, তাহাতে সন্দেহ নাই। যাহা কর্ম্ম হইতে উৎপন্ন, তাহা অনিত্য, কেননা কর্ম্ম হইলেই তাহার কর্ত্তা ও করণ এই দুইটী বিভাগ থাকিবে। বিবেক-বিচার প্রসঙ্গে আমরা দেখিয়াছি, যাহা বিভক্ত, তাহাই অনিত্য; সুতরাং কর্ত্তৃত্ব ও করণত্ব নিশ্চয়ই অনিত্য ধর্ম্ম। অতএব তৎসহযোগে উৎপন্ন কর্ম্মও অনিত্য ও তজ্জাত-ফলরূপ ভোগও অনিত্য।

যেরূপ যুক্তিতে ঐহিক ভোগসমূহ অনিত্য বলিয়া প্রমাণিত হয়, সেইরূপ যুক্তিতে পারলৌকিক ভোগসমূহও অনিত্য বলিয়া নিরূপিত হয়। আমরা যাগযজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করিয়া থাকি—তাহার ফলে স্বর্গ লাভ ও সেখানে অমৃতাদি বিষয় ভোগ হইবে বলিয়া। এই বিষয়-ভোগের আনন্দও কর্ম্মজন্য বলিয়া অনিত্য, অতএব হেয়। ইহলোক ও পরলোকের বিষয়সমূহকে বমির অন্নের মত নিতান্ত তুচ্ছ ও ঘৃণিত জানিয়া তাহাদের ফলভোগে যে বিতৃষ্ণা, তাহাই বৈরাগ্য।

টীকাকার রামতীর্থ এই কথাটীকেই নানা দৃষ্টান্ত দিয়া আর একটু বিশদভাবে বলিতেছেন,—সমস্ত প্রাণীর চিত্তেই এই প্রকার অভিনিবেশ রহিয়াছে যে আমার যেন সর্ব্বদাই সুখ হয়, অণুমাত্র দুঃখও যেন আমাকে ভোগ করিতে না হয়। এই অভিনিবেশ বা আগ্রহ থাকাতে প্রতি জীবেরই সুখ উপার্জ্জনে নিরতিশয় উৎসাহ ও যত্ন দেখা যায়। সুখের জন্য তাহারা কেবল দৈবের ভরসা করিয়া বসিয়া থাকে না, পুরুষকার অবলম্বন করিয়াও যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া থাকে। কিন্তু এত চেষ্টা যত্নের পরেও যে কেহ চিরদিনের জন্য নিরতিশয় সুখ পাইয়াছে বা চিরদিনের জন্য তাহার দুঃখ দূর হইয়া গিয়াছে, এমনটী তো দেখা যায় না। সংসারে দেখ, সুখের আশায় কেহ বাণিজ্য কারবার জন্য সাগর লঙ্ঘন করিল বা রাজসেবায় জীবন উৎসর্গ করিল, কিন্তু এত কষ্টের ফলটী মিলিবার সময়ই হয়ত বেচারী মরিয়া গেল। কেহ হয়ত ফল পাইল, কিন্তু ভোগের সময় ব্যাধি প্রভৃতি উৎপাত আসিয়া উপস্থিত হইল, সুতরাং তাহার আর ভোগ করা হইল না। কাহারও হয়ত একটু আধটু ভোগ হয়, কিন্তু তাহার পক্ষেও বাধা কত! হয়ত তাহার স্ত্রীপুত্রাদি, ভোগের উপকরণগুলিই নষ্ট হইয়া গেল, কিম্বা তাহাদের সঙ্গে বনিবনাও হইল না, অথবা ভোগের উপকরণ লইয়া অপরের

সহিত স্পর্দ্ধা, পরশ্রীকাতরতা প্রভৃতি চিত্ত-বিকার উপস্থিত হইয়া নিরতিশয় সুখভোগকে কণ্টকিত করিয়া তুলিল। ইহাতেও নিস্তার নাই; ভোগ্য বিষয় নষ্ট না হইলেও, নষ্ট হইয়া যাইতে পারে, এই ভয় ভোগীর চিত্ত হইতে যায় না। তাহা ছাড়া ঝড়, অনাবৃষ্টি, ভূমিকম্প, প্লাবন প্রভৃতি কত দৈবদুর্ব্বিপাকের আশঙ্কা আছে; ইহাদের চিন্তাও কম ক্লেশকর নয়। সুতরাং ভোগ্যবস্তুর নাশভয়ে সর্ব্বদা যে ব্যাকুল, তাহার ভোগেই বা তৃপ্তি কোথায়? তা ছাড়া মানুষের দুঃখ-দারিদ্র্য আছে, ক্ষুৎপিপাসার তাড়না আছে, কেহ হয়ত অন্ধ, কুব্জ, ক্লীব কিম্বা বধির—সুতরাং এইরূপ অবস্থায় বিষয় হইতে মানুষের নিরতিশয় সুখভোগ কি করিয়া হইতে পারে? যিনি ধীরচিত্তে এই সমস্ত কথা বিচার করিয়া দেখেন, তিনি দুঃখবহুল সংসারে কখনও কোনো উপায়ে একটু আধটু সুখ পাইয়া কৃপণের মত তাহা আঁকড়িয়া রাখিতে চাহেন না—বরং বিরক্তি সহকারে তাহা প্রত্যাখ্যান করিয়া নিত্যসুখের আশায় নিত্য বস্তুর সন্ধানে নিজকে নিয়োজিত করেন।

লৌকিক ভোগের হেয়ত্ব বুঝাইবার জন্য যে সমস্ত দৃষ্টান্ত উপস্থিত করা হইল, তাহাদের যৌক্তিকতা স্বীকার করিতে পারি, কেননা ইহারা আমাদের প্রত্যক্ষ সিদ্ধ। কিন্তু অলৌকিক ভোগের বেলায় তাহার অনিত্যত্ব সম্বন্ধে একটু আপত্তি আছে।

স্বর্গ প্রভৃতি অলৌকিকবিষয় লাভ করিবার জন্য আমরা যে যাগযজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করিয়া থাকি, তাহাকে অলৌকিক উপায় বলিতে হইবে, কেননা স্বর্গ যেমন লৌকিক বস্তু নহে, তেমনি তাহাকে পাইবার কোনও লৌকিক উপায়ও নাই। যাগযজ্ঞ করিলে যে স্বর্গলাভ হয়, ইহার কোনও লৌকিক প্রমাণও পাই না। তবে এরূপ স্থলে আমাদের প্রবৃত্তি হয় কি করিয়া?—না বেদের শাসন মানিয়া। বেদই স্বর্গাদি অলৌকিক বিষয়ের ও যাগযজ্ঞাদি অলৌকিক উপায়ের নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অলৌকিক বস্তু জ্ঞাপন করেন বলিয়া বেদের একটা স্বতঃসিদ্ধ প্রামাণ্য আছে। অলৌকিক বিষয়ের বেলায় সে-প্রামাণ্যই সব চেয়ে বড়, সেখানে লৌকিক প্রমাণে অন্য রকম কথা বলিলেও আমরা তাহা শুনিতে বাধ্য নই। এই হইল আস্তিকদের মত।

এরূপ অবস্থায় যাগযজ্ঞাদি কর্ম্ম বলিয়া তাহার ফল স্বর্গাদি অনিত্য সুতরাং তাহা আমাদের বৈরাগ্যের বিষয়, এইরূপ যুক্তি আশ্রয় করিবার পূর্ব্বে আমাদিগকে দেখিতে হইবে, বেদ এ সম্বন্ধে কি বলিতেছেন। বেদে যদি এই লৌকিক যুক্তির বিরোধী কোনও কথা পাই, তবে তাহার প্রামাণ্যই বলবত্তর হইবে। বেদে এক জায়গায় আছে, "অক্ষয্যং হ বৈ চাতুর্ম্মাস্যযাজিনঃ সুকৃতং ভবতি—যিনি চাতুর্ম্মাস্য যাগ করেন, তাহার যে পুণ্য হয়, তাহাকে ক্ষয় করিতে পারা যায় না।" (শতপথ, ২, ৬, ৩, ১)। চাতুর্ম্মাস্য যাগের ফল অক্ষয়, স্বয়ং বেদই যদি এ কথা বলেন, তবে আর সেখানে লৌকিক যুক্তির কোনও অবকাশই থাকে না।

তাহা হইলে পারলৌকিক বিষয়ও যে অনিত্য বলিয়া বিরাগযোগ্য, এই কথাটী প্রমাণ করিবার জন্য একটু বেগ পাইতে হইবে। লৌকিক প্রমাণ আর এখানে খাটিবে না, এর জন্য বেদ হইতেই প্রমাণ

সংগ্রহ করিয়া বিচার করিতে হইবে। এই বিচারপদ্ধতির সম্বন্ধে পূর্ব্বে দুই চারিটা কথা না বলিলে বক্তব্য বিষয় পরিস্ফুট হইবে না।

বেদ অলৌকিক বস্তুলাভের অলৌকিক উপায়ের জ্ঞাপক। বেদবেদ্য বিষয় অলৌকিক, বলিয়া তাহার সম্বন্ধে সমস্ত লৌকিক প্রমাণই নিরস্ত হইতেছে—অতএব বেদের প্রামাণ্য স্থাপিত করিতে হইলে তাহাকে স্বতঃপ্রমাণ বলা ছাড়া আর উপায় নাই। কিন্তু তাহা হইলে বেদের প্রত্যেকটা কথাকে শ্রদ্ধার সহিত প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে, কেননা স্বতঃপ্রমাণ বিষয়ে যদি অপ্রাসঙ্গিক বা অবান্তর কোনও বিষয়ের উল্লেখ থাকে, তবে তাহার স্বতঃপ্রামাণ্য নষ্ট হইয়া যায়। বেদ উপায়ের জ্ঞাপক, সুতরাং আমাদিগকে ধর্মে প্রচোদিত করা বা প্রেরণা দেওয়াই তাহার কার্য্য। এই হিসাবে বেদের সমস্ত বাক্যকে বিধি কিম্বা নিষেধ রূপে প্রতিষ্ঠিত জানিতে হইবে। অবশ্য একথা কর্মকাণ্ড সম্বন্ধে খাটে। কিন্তু বিধি ও নিষেধ ছাড়াও আমরা বেদে অন্য কথা পাই। যেমন একটা যজ্ঞের বিধি দিয়া বেদ বলিলেন, "যে এই কর্ম অনুষ্ঠান করে, তাহার পশু ও প্রজা লাভ হয়।" এইরূপ স্থলে এ বাক্যটার মাঝে বিধি কিম্বা নিষেধের কিছুই পাওয়া যায় না, সুতরাং ইহাকে প্রবৃত্তিসমর্থক প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করি কি করিয়া? এই সমস্ত বাক্যকে অর্থবাদ বলে। মীমাংসকারেরা সিদ্ধান্ত করিলেন, অর্থবাদসমূহকে বিধি কিম্বা নিষেধেরই অঙ্গীভূত ধরিতে হইবে, কেননা বাস্তবিক তাহারা বিধিটা যে প্রশস্ত অতএব অনুষ্ঠেয়, কিম্বা নিষিদ্ধ বিষয়টা যে নিন্দার্হ অতএব পরিত্যাজ্য, ইহাই মাত্র জ্ঞাপন করিয়া থাকে। সুতরাং পুরুষের প্রবৃত্তি উদ্বোধনের সহায়করূপে বিধি-নিষেধের অঙ্গীভূত বলিয়া তাহারাও প্রমাণ বই কি?

কিন্তু এখানে আর একটা কথা বুঝিতে হইবে। বিধি কিম্বা নিষেধটা একটা বাক্য হওয়া চাই। যদি বাক্য ভেদ হয়, তবে বুদ্ধিভেদ হইবে এবং প্রবৃত্তিবিঘাত জন্মিবে। আজ্ঞা মাত্রেরই ইহা নিয়ম। আমি তোমাকে একবারে একটা হুকুমই করিতে পারি। যুগপৎ দুইটা হুকুম করিলে তুমি কোনটা তামিল করিবে? সুতরাং বিধি বা নিষেধ শাস্ত্রের একবাক্যতা থাকা চাই। সেই হিসাবে, অর্থবাদেরও বিধি বা নিষেধ হইতে পৃথক প্রামাণ্য স্বীকার করা যায় না, কেননা তাহা হইলে বাক্য-ভেদ উপস্থিত হইয়া প্রবৃত্তিবিঘাত জন্মিবে। অতএব মীমাংসকদিগের এই সিদ্ধান্ত হইল যে, অর্থবাদের বিধিবাক্যের সহিতই একবাক্যতা রহিয়াছে, সুতরাং তাহার আর স্বতন্ত্র প্রামাণ্য নাই, বিধিবাক্যের প্রামাণ্যেই তাহার প্রামাণ্য, অতএব "তাহা অন্যতন্ত্র অর্থাৎ অপরের আশ্রিত, সুতরাং স্বতন্ত্র বাক্য অপেক্ষা তাহার প্রামাণ্য দুর্ব্বল।

আবার বেদের জ্ঞানকাণ্ডে রহিয়াছে বস্তু নির্দ্দেশ; সেখানে কর্ম্মের প্রসঙ্গ নাই—বিধিনিষেধও নাই। কর্ম্মকাণ্ড প্রতিপাদন করিতেছে অলৌকিক উপায়, আর জ্ঞানকাণ্ডের প্রতিপাদ্য অলৌকিক বস্তু। সুতরাং উভয়েই স্বতঃপ্রমাণ। কিন্তু বস্তুর বিশেষত্ব এই যে, তাহা যাহা, ঠিক তাই, তাহার নড়চড় হয় না। কর্ম্ম করাও যায়, না করাও যায়, উলটাইয়া পালটাইয়া অন্য রকমও করা যায়। কিন্তু বস্তু স্বরূপেই প্রমাণের বিষয়। অতএব বস্তুবোধক বাক্য

যে সম্পূর্ণভাবে অনন্যপর বা স্বতন্ত্র হইবে, সুতরাং তাহার প্রামাণ্য যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হইবে, ইহাতে সন্দেহ নাই।

এখন আমাদের বিচার্য্য বিষয় নিয়া আলোচনা করা যাক্। যাগযজ্ঞাদির ফলের নিত্যতা সম্বন্ধে আমরা দুইটী বেদবাক্য পাইতেছি। একটী কর্ম্ম-কাণ্ডের, তাহার উল্লেখ আমরা পূর্ব্বেই করিয়াছি। অপরটী জ্ঞানকাণ্ডের ; সেটী এই, "তদ্ যথা ইহ কর্ম্মজিতো লোকঃ ক্ষীয়তে এবম্ এব অমুত্র পুণ্যজিতো লোকঃ ক্ষীয়তে—যেমন ইহ লোকে কর্ম্মদ্বারা উপার্জ্জিত প্রতিষ্ঠা ক্ষয় পায়, তেমনি পরলোকেও পুণ্য দ্বারা উপার্জ্জিত প্রতিষ্ঠা ক্ষয় পায়।" (ছান্দোগ্য ৮.১.৬)। এখন এই দুইটী শ্রুতির বলাবল পরীক্ষা করিতে হইবে।

দুইটী শ্রুতি পাশাপাশি রাখিয়া তাহাদের লক্ষণ গুলি নির্দ্দেশ করিয়া গেলেই বিচার সহজ হইবে। প্রথম শ্রুতিটী একটী অর্থবাদ, সুতরাং তাহা বিধিবাক্যের প্রশস্ততা বুঝাইয়া তাহার সহিত একবাক্যতাসূত্রে গ্রথিত হইতেছে, অতএব তাহা অন্যতন্ত্র। দ্বিতীয় শ্রুতিটি নিরপেক্ষভাবে একটি সত্য প্রকাশ করিতেছে, সুতরাং বস্তুবলকে অবলম্বন করিয়া তাহা প্রবৃত্ত। অতএব তাহা অনন্যপর বা স্বতন্ত্র। পরতন্ত্র শ্রুতি অপেক্ষা স্বতন্ত্র শ্রুতিরই প্রামাণ্য অধিক। সুতরাং পারলৌকিক ভোগের নিত্যত্ব সম্বন্ধে পূর্ব্বপক্ষী যে শ্রুতিবাক্য প্রমাণ-স্বরূপ উপস্থিত করিয়াছিলেন, তাহা এই শ্রুতি দ্বারা বাধিত হইল।

কিন্তু তথাপি অর্থবাদবাক্যে যে যাগের পুণ্যকে অক্ষয় বলা হইয়াছে, তাহার একটা তাৎপর্য্য আমরাও স্বীকার করি। যাগফলের অক্ষয়ত্ব আপেক্ষিক—"আভূতসংপ্লবং স্থানম্ অমৃতত্বং হি ভাষ্যতে"—এই নিত্যত্ব, অমৃতত্ব বা অক্ষয়ত্ব এক মহাপ্রলয় পর্য্যন্তই, সুতরাং তাহা আপেক্ষিক। এইরূপ মীমাংসা হইলে উভয় শ্রুতিরই মর্য্যাদা রক্ষিত হয়।

বাস্তবিক যাহা উৎপন্ন, তাহা যে কখনও নিত্য হইতে পারে, ইহা অসম্ভব—এমনটী কোথাও দেখা যায় না। সুতরাং ঐহিক ভোগের মত আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত সমস্ত ভোগই অনিত্য, অতএব বৈরাগ্যের বিষয়। এইজন্যই ভগবান ব্যাসদেব বলিয়াছেন—

যচ্চ কামসুখং লোকে যচ্চ দিব্যং মহৎ সুখম্।
তৃষ্ণাক্ষয়সুখস্যৈতে নার্হতি ষোড়শীং কলাম্॥

—ইহলোকে কামনার যে সুখ বা পরলোকে যে দিব্য মহৎ সুখ, তাহাদের কেহই তৃষ্ণাক্ষয় সুখের ষোড়শ ভাগের এক ভাগও নয়। (১৭)

কালের স্বপন

অতীত নিয়ে আজ গালে হাত দিয়ে ভাবতে বসলে তোমার চলবে না। তোমার কাছে একমাত্র কাল আছে—তা হচ্ছে বর্ত্তমান। তোমার জীবনের যা কিছু রস, যা কিছু একান্ত অনুভূতি, তা এই বর্ত্তমানেই। অতীতকে তার কবর থেকে টেনেই তোল, আর স্বপ্নের ভূমিকায় ভবিষ্যৎকে ফলিয়েই তোল, সবই বর্ত্তমানের কোঠায় না নামলে তোমার অনুভূতির সামিল হচ্ছে না। কাজেই কালকে যে তুমি অতীত, বর্ত্তমান আর ভবিষ্যতের কোঠায় ভাগ করছ—এইটাই তো তোমার মোহ—এই তো মায়া। এই মায়াতে মুগ্ধ হয়েই নিষ্ফল অতীতের জন্য তুমি আজ কাঁদতে বসেছ, আর সফল ভবিষ্যতের আশায় নিজকে উত্তেজিত করছ।

কিন্তু বিলাপ বা উত্তেজনা—কোনটাই তো তোমার স্বরূপ নয়। তুমি সমাহিত রয়েছ অনুচ্ছসিত বর্ত্তমানে—নিত্য কল্যাণে তা জ্যোতির্ম্ময়, নিত্য প্রাণলীলায় তা আনন্দময়। তোমার বর্ত্তমানকে তুমি কতটুকু ভাব?—সে কি এক মুহূর্ত্ত মাত্র? তার পরেই কি তা অতীত হয়ে যায়? এই তো তোমার ভুল। তোমার বর্ত্তমান যে নিত্য বর্ত্তমান, অনন্ত কালকে কুক্ষিগত করে যে সে বর্ত্তমান। তার কাছে মুহূর্ত্ত আর যুগান্তের পরিমাণ যে এক! এই কালের অধিষ্ঠাতা তুমি—সাক্ষী চেতাঃ কেবলো নির্গুণশ্চ।

কিন্তু সে কথা ভুলে গিয়ে তুমি ভাব, সংসারের এই হট্টগোলের মাঝেই বুঝি তোমার জীবন আবদ্ধ; তাই এর যত সুখ, দুঃখ, কান্না, হাসি, সবই তুমি যথার্থ মনে করে তার দাম ধরতে যাও। তাই তোমার জগতে সুখের পর দুঃখ, আবার দুঃখের পর সুখ—কিন্তু শান্তি নাই কোথাও। মানলাম, সুখ-দুঃখও সত্য, তাই কালের পর্য্যায়ে তারা স্থান পেয়েছে একটার পর একটা এসে তোমার হৃদয় জুড়ে বসছে, তাই তাদের নিয়ে তুমি অতীত আর ভবিষ্যৎ গড়ে তুলছ। কিন্তু এই চঞ্চলতার সত্তাটাকেই তুমি একমাত্র সত্য ভাবছ কেন? যদি চঞ্চলতারও একটা স্থির আধার না থাকত, তবে তা দাঁড়াত কোথায়? একটার পর একটা এসে কোন আশ্রয়ে সে স্থিতি লাভ করত?

চঞ্চল ভাবের, চঞ্চল কালের পরেও যে নিত্য অচঞ্চল সত্তা রয়েছে, তাই তোমার স্বরূপ। সে তো শুধু চঞ্চলতাকে অতিক্রম করে যায়নি, সে যে তাকে গ্রাস করেও রয়েছে। তোমার অবিচল অন্তহীন সমুদ্রবৎ সত্তার মাঝেই না চঞ্চলতার ঢেউ উঠেছে! সবটাকে তুমি জড়িয়ে দেখতে পাচ্ছ না বলেই তোমার দুঃখের অন্ত নাই। তোমার কাছে এই মুহূর্ত্তের সুখ নিছক সুখই, আবার এর পরমুহূর্ত্তের দুঃখও একেবারে নিছক দুঃখ। কিন্তু এ দুটাকে যদি আরও একটু উচ্চভূমি হতে দেখতে, তাহলে বুঝতে, তোমার কাছে কোনটাই তো একান্তভাবে আঁকড়ে ধরবার কিছু নয়। এ দুই-ই যে খেলা—একটা ঢেউএরই যে এদিকের আর ওদিকের ভাঙ্গন! এমনি করে মুহূর্ত্তের পর মুহূর্ত্তের তরঙ্গমালা উঠছে পড়ছে—একরূপে অনন্ত-

বিস্তার সমুদ্র হয়ে তুমি বুক পেতে দিয়েছ তাদের আশ্রয়ের জন্য, আর একরূপে সবিতা হয়ে তরঙ্গের উপর আলো ঢেলে দিচ্ছ। তরঙ্গের ঘাতে-প্রতিঘাতে সে আলো শত শত বর্ণবৈচিত্র্যে বিচ্ছুরিত হয়ে পড়ছে—কিন্তু তুমি সবিতার মতই স্থির-ভাস্বর, সমুদ্রের মতই উদার-গম্ভীর !

এমনি করে নিজকে বড় বলে ভাবতে শিখ। প্রতিদিনের খুঁটিনাটী নিয়ে শুধু মাথা ঘামিও না। মুহূর্ত্তগুলিকেই অত গরজের করে তুলো না, তাদের বিচ্ছিন্ন করে দেখো না—তোমার গরজ হচ্ছে সকল মুহূর্ত্ত জড়িয়ে নিয়ে এক মহাবর্ত্তমানে প্রতিষ্ঠিত থাকা। অতীতের অনুশোচনাও তোমার নাই, ভবিষ্যতের প্রতীক্ষাও তোমার নাই। সবই তোমার কাছে সৎস্বরূপে বর্ত্তমান রয়েছে, বাইরের জগতে কালের আশ্রয়ে তারা বিকসিত হচ্ছে, কিন্তু তোমার স্থান সে কাল-অনুভূতির অতীত রাজ্য। সেখানে থেকে নিজকে নামিয়ে এনে দণ্ড-পলের হিসাব করতে যাওয়াই হচ্ছে মায়া।

অতীতে অপরাধ হয়েছে, আজ তারই ভাবনা করতে বসেছ তুমি? ভেবে কি করবে তুমি? ভবিষ্যতের জন্য শোধরাবে? কিন্তু কালের রহস্য না বুঝলে তা তুমি পাবে কি? যে কাল অতীতের বিভীষিকায় আজ তোমায় এমন উদ্‌ভ্রান্ত করে তুলেছে, ভবিষ্যতের মাঝেও সে যে তোমায় ফাঁকি দেবে না, তার বিশ্বাস কি? অপরাধের ক্ষালন যদি করতে চাও, তবে কালের কথা ভুলে যাও! অতীতের বোঝা আর বর্ত্তমানের ঘাড়ে চাপাতে হবে না—শুধু বর্ত্তমানকে মহাশক্তিমান বলে অনুভব কর, সমস্ত অপরাধের গ্লানি ঘুচে যাবে।

পাপ, পুণ্য সব কালের সৃষ্টি। কালের সংস্কার রয়েছে বলেই তোমার ভালমন্দের বিচার আসে। নতুবা নিত্যজাগ্রৎ নিত্য-বর্ত্তমান চেতনার মাঝে কোনও ভালমন্দের বালাই নাই। তোমাকে মন্দ হতেও বলছি না—ভাল হতেও বলছি না—তোমাকে বলছি ভালমন্দের অতীত হতে। যারা অপরাধের দণ্ডকে ভয় করে, তারাই অনুশোচনা করতে বসে। তার স্বরূপকে ভাল বাসে না, নিজের বিরূপকে ভালবাসে বলেই দণ্ডের দুঃখ হতে তাকে বাঁচিয়ে রাখতে চায়। কিন্তু দণ্ডকে তুমি ভয় করবে কেন? তোমার তো কিছুর উপরই লোভ থাকবে না জগতে, যে তাকে বাঁচাবার জন্য দণ্ডের হাত এড়াতে চাইবে, আর তার জন্য অতীতকে গাল দিয়ে ভবিষ্যতকে নানা সম্ভব অসম্ভব প্রতিশ্রুতি দেবে। যা হয়েছে, তা হয়েছেই—যা হবে তা হবেই; তুমি শুধু যা হচ্ছে, তাই দেখে যাও—আর এই হওয়ার পরিধিটাকে নিখিল ব্রহ্মাণ্ডে বিস্তৃত করে দাও।

তুমি মহান্, তুমি বিরাট—কত জন্ম-জন্মান্তর তোমার বুকে বুদ্বুদের মত উঠেছে, ভেঙেছে—অভিনয় মঞ্চের উপর দিয়ে রঙীন পোষাক পরে কতজন হেসে নেচে গেয়ে চলে গিয়েছে—তুমি শুধু স্থির দীপশিখার মত সবার উপর আলো ঢেলে দিয়েছ, ভাল ভেবেও কাউকে সমাদর করনি, মন্দ ভেবেও কাউকে বঞ্চিত করনি।

এই ভাবে প্রতিষ্ঠিত থাক—দেখবে পাপপুণ্যের সকল দ্বন্দ্ব ঘুচে গিয়েছে, আনন্দ-জ্যোতিঃতে হৃদয় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। "স্বল্পমপ্যস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ"—এই বিরাটত্বের কথা শুধু ভাবতে গেলেও হৃদয়ে তুমি বল পাবে। যে অপরাধ, যে গ্লানির হাত হতে রক্ষা পাবার জন্য অনুশোচনা করতে বসেছিলে, তাকে জয় করবারও মহাবীর্য্য লাভ করবে, তার দণ্ডকে সহ্য করবারও শক্তি পাবে।

সংস্কার-বন্ধন

জীবনের বৈশিষ্ট্যের মূলেই হইল সংস্কার। জগৎ হয়ত একই রকম আছে, কিন্তু আমাদের সংস্কার বিভিন্ন বলিয়া তাহাকে আমরা বিভিন্ন দেখি। মানুষে মানুষে পার্থক্য শুধু এই সংস্কারের পার্থক্য। জাতি, কুল, দেশ কালের কত সংস্কার যে পুঁজি রহিয়াছে, তাহার সীমা নাই; পার্থক্য তো ইহাতে বাড়িতেছেই, তা ছাড়া চিত্তের নির্মাণ অনুযায়ী যত সংস্কার বর্তমানে আমরা পুঁজি করিতেছি, তাহাও ভেদের মাত্রাই বাড়াইয়া তুলিতেছে। সত্যদর্শনের পক্ষে বাধা এই সংস্কারের বাধা। কতকগুলি জিনিষকে আমরা নিজস্ব ভাবিয়া লইয়াছি যেমন দেহ ও তাহার সুখ দুঃখ, ইন্দ্রিয়ের বিকার ইত্যাদি। ইহারা কেন আসে যায়, তাহার কারণ অনুসন্ধান করি না, কিন্তু ঘাড় হেঁট করিয়া তাহাদের মানিয়া চলি। মানিয়া চলাটা এমনই অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছে যে আজ সেটাকেই জীবনের একমাত্র আয়েস বলিয়া মনে করি। যদি তাহার প্রতিকূলে কিছু উপস্থিত হয়, তবে আর অস্বস্তির সীমা থাকে না যদি আয়েসেই জীবন কাটিয়া যায় অর্থাৎ আমার সংস্কারের বিরোধী কিছু আসিয়া উপস্থিত না হয়, তবে সেটাকেই আমরা পরম লাভ মনে করি। ইহাতে সুখ মিলিতে পারে, কিন্তু সত্য তো মিলিবে না।

এমনি আয়েসে সংসারের মাঝে দিন কাটিয়া যাইতেছে, ইহাতে যে বিপত্তিটা কোথায়, তাহা বুঝিতে পারি না, তাই মনে করি বেশ আছি। কিন্তু মাথার উপরে যে একজন আছেন, তিনি তো বেশ থাকিতে দেন না। সুখের ঘরেও হঠাৎ এমন করিয়া তিনি আগুন লাগাইয়া দেন যে, তখন আর পথ খুঁজিয়া পাইনা। তখন দেখি, যে সংস্কারকেই এতদিন পরম আশ্রয় ভাবিয়া সযত্নে পুষিয়া আসিয়াছি, তাহাই আজ গলার ফাঁস হইয়া দেখা দিয়াছে নূতন বিপদে নূতন করিয়া যে একটা পথ খুঁজিবা বাহির করিব, তাহার সামর্থ্য রাখে নাই। তখন মনে হয়, এমন করিয়া নিজেই নিজের পায়ে বেড়ী পরাইলাম কেন?

শুধু বিপদই যে সংস্কারকে আঘাত করে, তা নয়। সংস্কারের পীড়নে বিবেকীর চিত্তে যে অস্বস্তির আগুন জ্বলিয়া উঠে, তাহার যন্ত্রণার কাছে সাংসারিক আপদ-বিপদও তুচ্ছ। হয়ত করুণাময়ের ডাক আসিয়া প্রাণের গহন পুরীতে পৌঁছিয়াছে, বন্ধনের দিন ফুরাইয়া আসিয়াছে—এই সময় বন্ধনের জ্বালায় প্রাণে যে বিদ্রোহের আগুন জ্বলিয়া উঠে, তাহা ভুক্তভোগী ভিন্ন কে বুঝিবে? যা চাই, সবই আছে, অথচ পিপাসা মিটিতেছে না এর দরদ কে বুঝিবে? সংস্কারের জ্বালা যে কত ভীষণ, তখন তাহাই বোঝা যায়। নিজের হাতে নিজের কণ্ঠরোধ করিয়াও যেন তখন নিস্তার নাই। আঁধারের পর আঁধারের স্রোত গর্জিয়া আসিতেছে—শুধু এক জন্মের নয়, জন্মজন্মান্তরের যত বোঝা সব যেন আজ নির্মম হইয়া বুকের উপর চাপিয়া বসিতেছে—এ পেষণ, এ পীড়ন হইতে বাঁচাইবার কি কেহ নাই?

এই যে জ্বালা, সকলের জীবনেই ইহা

একদিন দেখা দিবে। প্রকৃতি যুগ যুগ ধরিয়া আবরণের পর আবরণ জড়াইয়া আসিয়াছে, তখন বুঝিতেও পারি নাই, নিষেধও করি নাই। কিন্তু আজ জাগ্রতে সে আবরণ খুলিবার দিন আসিয়াছে। যতটুকু দেনা জমিয়াছে, আজ কড়া ক্রান্তি হিসাব করিয়া তাহার শোধ দিতে হইবে—পিছাইয়া পড়িলে মহাজন ছাড়িবে কেন?

জন্মজন্মান্তরেও একদিন এই হিসাব-নিকাশ তলব হইতে পারে জানিয়াই হিন্দু ঋষি দিনের পর দিন সে হিসাব মিটাইয়া রাখিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। সংস্কারের প্রচণ্ড পীড়নে একদিন জাগিতেই হইবে, তবে আঘাত সহিয়া জাগার চেয়ে আপনা হইতেই জাগিবার চেষ্টাটা মন্দ কিসে? শাস্ত্র তোমাকে শুচি হইতে বলেন, সংযম সদাচার পালন করিতে বলেন, অজস্র নিয়মের বাঁধনে অষ্টপ্রহর বাঁধিয়া রাখিতে চাহেন—সকলেরই মূল উদ্দেশ্য, জন্মাবধি যে সংস্কারের দেনা জমিয়াছে একটু একটু করিয়া তাহা শোধ কর, আর ঋণ বাড়াইও না। আজ তোমার কাছে নিয়ম সংযমের বেড়া-জাল অসহ্য বলিয়া মনে হইতেছে, কিন্তু বাহিরে বাঁধা না পড়িলেও অন্তরে যে দিনের পর দিন বাঁধন আঁটিয়া বসিতেছে, তাহার খবর রাখ কি? সে বাঁধন এড়াইবে কোথায় গিয়া? একবার ভবে আসিলেই তো সকল ল্যাঠা চুকিয়া যাইবে না—হিসাব-তলব একদিন হইবেই হইবে। বাস্তবিক জন্মের পর জন্ম ধরিয়া কি করিয়া আসিয়াছি? সেই একঘেয়ে সংসার জীবনেরই তো পুনরাবৃত্তি হইয়া আসিয়াছে—ইহার মাঝে আর নূতনত্ব কোথায়? চিরদিন সংসার একই ভাবে আছে, আমরাও একই রঙ্গমঞ্চে একই অভিনয় করিবার জন্য বার বার আসিয়াছি—কিন্তু তবুও আজ তৃষ্ণার ক্ষয় হইল না। এতবার অভিনয় করিয়াও নূতন লাভ কিছুই হয় নাই, কেবল পুরাতন সংস্কারগুলি পাকা হইয়াছে মাত্র। তারপর তার হিসাব দাখিল করিবার দিন যেদিন আসিবে, সেদিন আর কৈফিয়ৎ দিবার ছল খুঁজিয়া পাইব না। সংসার আয়েসের এই তো পরিণাম!

তাই বলি, দিনের দিনে এই সংসারের বাঁধন একটু আলগা করিয়া দিই না কেন? কেবল প্রতিদিনের কাজে-কর্ম্মে একটু আয়েস ছাড়িয়া চলা, নিজকে আরাম হইতে একটু বঞ্চিত করা—এটুকু কি খুবই কঠিন? অথচ এই ত্যাগের অভ্যাস হইতেই একদিন মহাপরীক্ষা হইতে পরিত্রাণ পাইব, ধর্ম্ম-কর্ম্মের আর কিছু না বুঝিলেও এটুকু তো সহজ বুদ্ধিতে সবাই বুঝিতে পারি।

কেবল এই কথাটা ভাবিতে হইবে, দেহের দিক দিয়া হোক, মনের দিক দিয়া হোক, আজ যতটুকু আয়েসের উপকরণ আমি জুটাইয়া লইতেছি, তাহার কমে কি আমার চলিত না? ভিখারীর মত কেবল লোলুপ-দৃষ্টিতে ভোগের দিকে তাকাইয়াই কি আমার দিন কাটিয়া যাইবে? নিজকে বঞ্চিত করিবার সৌভাগ্য কি কোনও দিনই হইবে না? অহরহ এইরূপ ভাবনাদ্বারা কেবল বাহ্য উপকরণের বাহুল্য বর্জ্জন করিতে শিখিলেই অন্তর-লক্ষ্মী তাহার অনন্ত ভাণ্ডার আমাদের কাছে উন্মুক্ত করিয়া দিবেন। পথই তখন পথের সন্ধান বলিয়া দিবে।

জাগরণ

—*—

স্তব্ধ হোক্ বিশ্বকলরোল !—
এই মত্ত চিত্ত উতরোল;
আশার কুহকে মজি' এতদিন গেঁথেছে কল্পনা,
কামনার বর্ণরাগে শূন্যপটে মিথ্যা যত এঁকেছে আল্পনা,
আপনার মর্ম্ম পীড়ি আপনারে করেছে বিকল।—
আজি হেরি, মিথ্যা হল তার যত আঁখিজল—
উৎসব-অঙ্গন মাঝে যত তার হাস্য-কলরব
মিথ্যা হল—তুচ্ছ হল—রিক্ত হল সব!
স্তব্ধ বক্ষে থেমে গেছে আকুলি-বিকুলি,
অবশ অঙ্গুলি হতে খসে পড়ে কল্পনার তুলি,
পাষাণ-নিথর হল যত ছিল ভাবেনোচ্ছ্বাস—
রুদ্ধ হয়ে এসেছে নিঃশ্বাস!
অন্তহীন অন্ধকারি চরাচর করিয়াছে গ্রাস—
তারি বুকে ফুটেছে আশ্বাস
সন্ধ্যাতারা সম
জননীর স্নিগ্ধ আঁখিপাতে—শ্রান্ত শান্ত বক্ষোমাঝে মম।
ঘুচে গেল নিত্য হাহাকার,
চিত্তভরা তিক্ততার রিক্ত হল যত গুরুভার,—
লভিলাম মথিয়া মরণ
তমসার পরপারে অমরার কূলে নব-জাগরণ!

—*—

করালিনী

আনন্দ আমাদের স্বরূপ—আনন্দ মায়ের স্বরূপ; তাই যেখানে যা কিছু আনন্দের পাইয়াছি, তাহাই আনিয়া মায়ের আনন্দময়ী মূর্তিখানি কল্পনা করিয়াছি। এই আনন্দ-কল্পনা ক্রমে গভীর হইতে গভীরতর হউক, আনন্দের নিবিড়তম স্পর্শে চিত্ত এলাইয়া পড়ুক, দেশকাল সব ভুলিয়া আনন্দের মাঝে মিলাইয়া যাই—এই তো আমাদের প্রাণের কামনা।

কিন্তু সে কামনা তো সহজে পূরে না। আনন্দ কল্পনায় মুগ্ধ চিত্তকেও যে সংসারের প্রচণ্ড আঘাতে আবার বস্তুজগতে ফিরিয়া আসিতে হয়। বস্তুজগতের সকল কঠোরতা নির্বাসিত করিয়া মনের অন্তরালে ভাবে-সুকোমল যে মূর্তিখানি গড়িয়াছিলাম, আর বুঝি তাহাকে আঁকড়িয়া রাখিতে পারিলাম না। চিত্তে কামনার হাহাকার জাগাইয়া কল্পনার মূর্তি আবার কোথায় মিলাইয়া যায়, বিজলী-চমকের মত একবার দেখা দিয়া আবার সে কোথায় লুকায়?

তখনই ভাবি, কেন মাকে ওই রূপে চাহিয়াছিলাম? আমি আছি রোগ, শোক, দুঃখ, দারিদ্র্যে ভরা এই বস্তু-জগতে। সুখ যে কিছুই তাহাতে নাই, তা বলি না। কিন্তু অতি সুখের লোভী বলিয়াই বুঝি আমি এখানে কেবল দুঃখটাকেই বড় করিয়া দেখি। এই দুঃখকে প্রত্যাখ্যান করিয়া কল্পনায় যখন সুখের উপকরণ দিয়া মায়ের মূর্তি গড়িয়া তুলি, তখন কোন ভুলই করি না কি? মা আমার আনন্দময়ী, সে কথা সহস্রবার স্বীকার করিব, না বুঝিলেও স্বীকার করিব—কেননা তা নইলে যে আমার সন্তানের প্রাণ কিছুতেই প্রবোধ মানে না। কিন্তু কি সে আনন্দের স্বরূপ? সংসারে যাহাকে বলি সুখ, তাহাই কি আনন্দের নিশানা? দুঃখ তবে কি? সুখের মাঝেই শুধু মায়ের মুখের মধু-হাসিটী ফুটিয়া উঠিয়াছে? দুঃখ তবে তাঁর কোন রূপ? দুঃখের আড়ালে কি মায়ের অশ্রুসজল করুণাময়ী মূর্তিটী প্রচ্ছন্ন রহে নাই?

একটাকে ছাড়িয়া, আর একটাকে দিয়া যে মায়ের পরিচয় লইব, তাহা তো হইতে পারে না। মা যদি আমার সর্বময়ী, তবে সুখেও তাঁহাকে পাইব, দুঃখেও পাইব। মা যদি আনন্দময়ী, তবে তাঁর আনন্দ সুখেও উছলিয়া উঠিয়াছে, দুঃখেও উছলিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু সে কথা তো সহজে বুঝিতে পারি না। মাকে যখন চাই, তখন সুখের মূর্তিতেই চাই, দুঃখরূপে তো চাই না।

সুখকে যে আনন্দ মনে করি, এইখানেই আমাদের ভুল। সুখ খণ্ডিত, আনন্দ অখণ্ড। সুখের উপাদান আছে, গ্রাহক আছে, কিন্তু আনন্দ একরস, স্বরূপাবস্থা, গ্রাহ্য-গ্রাহকের ভেদ সেখানে নাই। এই কথাটী বুঝিবার জন্য সাধকের সুখ-দুঃখকে একবার বাজাইয়া লইতে হয়। সুখ পুষ্টি, আর দুঃখ বিনাশ, এ কথা সবাই বুঝে। কিন্তু কাহার পুষ্টি, কাহার বিনাশ, তাহা তো ভাবিয়া দেখি না। যদি সুখে আমার দেহের পুষ্টি, ইন্দ্রিয়ের পুষ্টি মাত্রই হয়, তবে সুখ চাহি কেন! আর দুঃখে যদি দেহের অভিমান, ইন্দ্রিয়ের স্বেচ্ছা-

চায় বিনষ্ট হয়, তবে দুঃখকেও তো বরণ করিতে ...

তাই যদি হয়, তবে শুধু দেহ, ইন্দ্রিয় আর মনের খণ্ড তৃপ্তিকে লক্ষ্য করিয়া আপন মনগড়া সুখের উপকরণ দিয়া যেখানে মাকে কল্পনা করিয়াছি, সেখানে ভাল করি নাই। অন্তরে সোনার সিংহাসনে মণিরত্নে সাজাইয়া মাকে পূজা করিলাম, ভাবের মদিরতায় বিভোল হইয়া থাকিলাম, কিন্তু মায়ের অঙ্গদ্যুতি যদি বহির্জগতের দুঃখশোকের উপরেও ফুটিয়া না উঠিল, তবে ভাবের নেশায় দিন কাটাইয়া আমার কি লাভ হইল? সুখের কাঙ্গাল আমি, তাই দুঃখ হইতে বাঁচিয়া কেবল সুখটুকুই ভোগ করিতে চাই। তাই বাস্তবের দুঃখকেও সুখের কল্পনা দিয়া ঢাকিতে চাই বলিয়া সুখরূপিণী মাকেই চাহিয়াছি, দুঃখরূপিণীকে চিনি নাই।

কিন্তু ভোগলোলুপ চিত্তের জন্য তো দুঃখের দাগাই সব চেয়ে প্রয়োজন। আনন্দকে যখন চিনি না, সুখের বিকারকেই যখন আনন্দ বলিয়া মনে করি, তখন মায়ের আনন্দময়ী-রূপেরও কল্পনা করিব না—আজ চাই তাঁর করালিনী মূর্ত্তি। আমরা সাধক, সিদ্ধ-সম্পদের পরিচয় জানি না, তাই তাহার বিলাসও চাহি না—প্রাণের স্তরে স্তরে যে আঁধার পুঞ্জীভূত হইয়া রহিয়াছে, তাই দিয়া মায়ের মূর্ত্তিখানি গড়িয়া তুলিব। সৃষ্টির বেলায় মা "সুন্দরীর্ব্বাঙ্গসুন্দরী"—আভাসে হইলেও এ কথাটা বুঝিতে পারি, কিন্তু স্রষ্টার অভিমান নিয়া তো আমাদের চলিবার সাধ্য নাই, তাই আজ সৌন্দর্য্যের পিপাসী হইলে চলিবে না। সৌন্দর্য্য সিদ্ধের হৃদয়ে গোপন রহিয়াছে, যে দিন সিদ্ধি মিলিবে, সে দিন আপনা হইতে তাহা ফুটিয়া উঠিবে। হে সাধক, তুমি তোমার হৃদয় খুঁজিয়া দেখ, তুমি সৃষ্টির পথে চলিয়াছ, না ধ্বংসের পথে? কালের ক্রীড়নক তুমি, বিনাশ-পথের পথিক তুমি—কাহাকে তুমি ঋদ্ধি বল, কাহাকে বল পুষ্টি? তোমার শৈশব যৌবনে প্রস্ফুটিত হইল, কিন্তু তাহার চারিদিকে যে কালের আবেষ্টন, তাহা কি ধ্বংসেরই সূচনা করিতেছে না? তোমার সকল সুখ, সকল আশার পিছনে ধ্বংসরূপিণী কালশক্তি কালী-করালিনীর খড়্গ যে উদ্যত রহিয়াছে, তাহা দেখিতে পাইতেছ কি?

মেঘের কোলেই বিজলীর শোভা, অন্ধকারের ভূমিকাতেই আলোর প্রকাশ। একেই তো দুঃখে-শোকে তোমার চিত্ত আঁধার হইয়া রহিয়াছে—সমস্ত কামনা, সমস্ত আশা নির্ব্বাপিত করিয়া সে চিত্তকে আরও আঁধার করিয়া তোল, করালিনীর কালোরূপে তোমার চিত্ত লীন হইয়া যাক্। অমানিশার অন্ধকারে জগৎ ডুবিয়া গিয়াছে, বিশ্বের বুকে প্রাণের স্পন্দন যেন থামিয়া গিয়াছে—শুধু ঊর্দ্ধে আকাশের আঁখিতারা হইতে অস্ফুট আলোক ঝরিয়া পড়িয়া নিশীথের অন্ধকারকে আরও ভীষণ করিয়া তুলিয়াছে—মূঢ়, চাহিয়া দেখ, মায়ের ভীষণ রূপ! তোমার কেহ নাই, কোনও আশ্রয় নাই—ওই সীমাহীন অন্ধকারের মাঝে তুমি একা! প্রাণ কাঁপিয়া ওঠে না কি? আলোকোজ্জ্বল পৃথিবীর বুকে এতটুকু ভূমিখণ্ডের জন্য ভাইয়ের বুকে ছুরী বসাইতেও দ্বিধা কর নাই, আজ দেখ, এই অনন্ত জগৎ তোমারই, একা তুমিই ইহার ভোক্তা—আঁধারের রাজত্বে তুমিই রাজা। একটু আলোর আভাসও এখন নাই, নিবিড় জলদজালে আকাশ ছাইয়া ফেলিয়াছে, শত্রু কি মিত্র বলিয়া চিনিয়া লইবে, এমন কোনও দোসর

আজ তোমার নাই—এই একার রাজত্বে তোমার সকল বাসনার তৃপ্তি হইবে না কি? কিন্তু মন যে বড় ভয় পায়। এই অসীম অন্ধকার তাহার পক্ষে অসহন। সে একটু আলোর কাঙ্গাল। একটু আলো হইলেই অসীম অন্ধকারে সসীম বস্তুর নিরূপণ হইত। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সীমাবদ্ধ বস্তু লইয়া ক্ষুদ্র জীবনের ছেলে-খেলা সুরু হইয়া যাইত। সসীম জগতে ক্ষুদ্র সুখে মানুষের ক্ষুদ্র কামনার তৃপ্তি—আপন ক্ষুদ্রতার সংস্কার দিয়া মাকেও সে ক্ষুদ্র করিয়া গড়িয়া সুখ পায়। তার ক্ষুদ্র, সুখের হাট ভাঙ্গিয়া দিতে হইবে, তাই বিশ্ব-ব্যাপিনী মৃত্যুরূপিণী করালিনীর আবাহন জীবনে এত প্রয়োজন।

জ্ঞানী হও, ভাবুক হও, কর্ম্মী হও, যাই হও না কেন—কামনা ছাড়িতে হইবে, ক্ষুদ্রতা ভুলিতে হইবে, নতুবা শক্তি জাগিবে না। মায়ের অনন্ত ভাণ্ডারের কিছু কিছু এ জীবনে পাইয়াছ, কিন্তু তাহাতে তো সবটুকুর পরিচয় মিলিবে না। আভাসমাত্র পাইয়াছ, কিন্তু বিলাস করিবার অধিকার পাও নাই। বিলাসের পিপাসা হৃদয়ে আছে, হৃদয়েই তাহা লুকাইয়া থাক্, আগে বিনাশের মাঝে নিজকে আহুতি দাও। তোমার সবটুকু ছাড়িলে তবে তাঁর সবটুকু পাইবে। তাই বলি, মৃত্যু-আঁধার জগতে আজ ভোগের মশাল জ্বালিয়া কেবল ধূম আর কালিমা সঞ্চয় করিয়া কি লাভ? মশাল নিবাইয়া দাও, আঁধারে বিশ্ব ডুবিয়া যাক্, মহাশূন্যের মাঝে নিরাশ্রয়ের আতঙ্কে প্রাণ কণ্টকিত হইয়া উঠুক—তারপর মায়ের অভয় মূর্ত্তি দেখিতে পাইবে, অমানিশার অন্তে নবীন উষার উদয় হইবে।

ভয়কে জয় করিতে হইবে, মৃত্যুকে লঙ্ঘন করিতে হইবে—তবে না মায়ের দেখা মিলিবে! চিন্ময়ীর সন্তান বলিয়া গর্ব্ব করা কি সোজা কথা? মা যদি চিন্ময়ী, তবে ছেলেও তো চিন্ময়, তখন তাকে আর এই রক্ত-মাংসের খাঁচা বলিয়া বিশ্বাস করি কি করিয়া? কিন্তু এই খাঁচার মায়া কি কাটাইতে পারিয়াছ? নিজের চিন্ময়ত্ব অনুভব করিয়া মাকে মা বলিয়া ডাকিয়াছ? যদি তাহা না করিয়া থাক, তবে শুধু আবদার করিয়াই মায়ের প্রাণ গলাইবে? এ তো স্নেহে অন্ধ লৌকিক মায়ের প্রাণ নয় যে সন্তানের পরিণাম চিন্তা তাঁর মাঝে নাই। এ মায়ে-ছেলে যে সম্পর্ক, তা একেবারে জীবনের মর্ম্মমূলে গাঁথা রহিয়াছে, সেইখানে পশিয়া সেই ভাবে রসিয়া ডাক দিলে তবে মা ডাক শুনিবেন।

তাই বলি সে ডাকের যোগ্যতা হইয়াছে কিনা, মায়ের ভীষণ ভ্রূকুটীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া আজ তাহার পরীক্ষা হোক্। শিবসোহাগিনী অন্নপূর্ণাকে আজ চাহি না, এখনও জ্ঞানদায়িনী বীণাপাণির সাক্ষাৎ লাভ করি নাই, জ্ঞান না হইলে মায়ের মাধুর্য্যময়ী সৌন্দর্য্যময়ী মূর্ত্তি কি করিয়া ধারণা করিব,—কি করিয়া কামনা-মলিন চিত্তে মায়ের মহৈশ্বর্য্যের ভার বহন করিব। তাই আজ চাই কালী-করালিনীর মূর্ত্তি। সন্তানের ছিন্নমুণ্ড গলে দুলাইয়া, সন্তানের রুধিরে খর্পর পূর্ণ করিয়া মায়ের যে মূর্ত্তি শ্মশানে নৃত্য করিয়া ফিরিতেছে, আজ তাহারই সম্মুখীন হইতে চাহি! মূঢ়, ভয় কর কেন? বিলাসের সজ্জা দিয়া মাকে সাজাইতে চাহিয়াছিলে, তোমার কামনার কলুষ কি মা জানিতে পারেন নাই? তাই আজ এই বিভীষণা মূর্ত্তিতে মা আসিয়া সম্মুখে দাঁড়াইয়াছেন—এ রূপ

যদি সহ্য করিতে না পার, তবে ঐশ্বর্য্যের রূপের দিকে তাকাইয়াছিলে কোন দৃষ্টি নিয়া? সে কি তোমার জ্ঞানদৃষ্টি না ভোগদৃষ্টি?

যদি অন্তরে বীর্য্য সঞ্চয় করিয়া থাক, তবে আজ করালিনীর আবাহন কর। ভয় করিও না—সে-ও মায়েরই রূপ; একবার আঁখি মেলিয়া চাহিয়া দেখ, সে মূর্ত্তি যেমন খড়্গ-খর্পরধারিণী, তেমনি আবার বরাভয়-করাও বটে। তোমার কামনা-কলুষিত জীবনে মায়ের এই মূর্ত্তিই সত্য হইয়া উঠুক্—যদি মায়ের মাতৃত্বে সত্য সত্য বিশ্বাস থাকে, তবে ভয়ের কিছু থাকিবে না, করালিনী রূপেও মাকে চিনিতে পারিবে।

পথের সঙ্কেত

(উপসংহার)

যখন কাজ সুরু করিবে, তখন বাইরে-ভিতরে এক সঙ্গে কাজ করিতে হইবে। বাহিরের আচারও বজায় রাখিতে হইবে, আবার ভিতরের ভাবকেও উজ্জ্বল করিয়া তুলিতে হইবে। অনেক সময় আচার পরিমার্জ্জিত হইলেই মানুষ মনে করে, তাহার সকল কর্ত্তব্য শেষ হইয়া গেল। কিন্তু তা তো নয়; আচার হইল শুধু একটা বাহ্য উপায়, ভিতরটাকে জাগাইতে পারিলে তবেই না তাহার সার্থকতা। যেখানে ভিতরে কোনও আনন্দের সাড়া পড়ে নাই, অথচ বাহিরে আচারের ঠাটটী বজায় রহিয়াছে, সেখানে নিশ্চয়ই আত্মপ্রবঞ্চনা আছে। শাসনের ভয়ে বা সংস্কারবশতঃ আচার অভ্যস্ত হইয়া যাইতে পারে বটে, তাহাতে আচার পালনের যে দুঃখ সেটুকু পরিপাক হইয়া যায়, কিন্তু মনের সঙ্কীর্ণতা কিছুতেই ঘুচে না, ভিতরের সঙ্গে কোন যোগ না থাকাতে সকল অবস্থার সঙ্গে আচারকে খাপ খাওয়াইয়া নেওয়া চলে না এবং ফলে আচার-সর্ব্বস্ব মানুষ জগতের মাঝে কোনঠেসা হইয়া পড়িয়া থাকে। কিন্তু আচারের প্রেরণা যেখানে ভিতর হইতে আসে, সেখানে যেমন চিত্তের সঙ্গে নিত্য নূতন সংঘর্ষের ফলে তাহার সঞ্চিত গুণ-সমূহের ক্ষয় হইবার সম্ভাবনা ঘটে, তেমনি অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা করিবার স্বাধীনতা থাকাতে চিত্তের কখনও আড়ষ্টভাব উপস্থিত হয় না।

যেমন ভিতরের সঙ্গে যোগ না থাকিলে বাহিরের আচার বৃথা হইয়া যায়, তেমনি আবার বাহিরের আচারের অবলম্বন না পাইলে ভিতরের ভাবও ফুটিতে পারে না। শুধু ভাবও ভাল নয়, শুধু আচারও ভাল নয়—দুয়ে সামঞ্জস্য করিয়া তোমাকে চলিতে হইবে। যৌবনে চিত্তে যখন নূতন নূতন শক্তি মুঞ্জরিত হইতে থাকে, তখন ভাবুকতা আসিয়া

তোমাকে আবিষ্ট করিতে পারে, কিন্তু ভাবের আবেশে গা ঢালিয়া দিলেই তোমার মরণ। যৌবন যে সুখের সময়, আয়েসের সময়, এ কথা জানি। তখন সুখ, গড়িয়া তুলিতে বেশী আয়োজনের প্রয়োজন হয় না। অতি অল্প উপকরণের ভিতর হইতে যুবক যতখানি সুখ নিঙরাইয়া বাহির করিতে পারে, তাহা দেখিলে বৃদ্ধেরা ঈর্ষ্যায় জ্বলিয়া মরে। কিন্তু যৌবনের এই আয়েস কিসের জোরে মিলে, তাহাও একবার বিবেচনা করিতে হইবে। যৌবন পূর্ণশক্তি প্রস্ফুটিত হওয়ার কাল বলিয়া তাহা পূর্ণ বিশ্রাম-সুখেরও কাল। যুবকের শক্তি আছে, ভোগের সামর্থ্য আছে, তাই তার সুখও প্রচুর। কিন্তু সুখের আকার প্রকারও যেমন নির্দ্দিষ্ট নহে, তেমনি শক্তির প্রচারকেও সীমাবদ্ধ করিয়া দেওয়া যায় না, যুবককে এই কথাটী স্মরণ রাখিতে হইবে। কোনও অবস্থাতেই তাহার থামিয়া থাকিবার যো নাই, তাহাকে ক্রমশঃ আত্মপ্রসার করিয়া চলিতে হইবে। অন্তরে যদি সে ভাব পায়, তবে তাহা লইয়া আয়েসে চক্ষু মুদিয়া রোমন্থন করিতে বসিলে সে তাহার শক্তির পরিচয় পাইবে না। কর্ম্মের সংঘাতে তাহার ভাবের সাঁচ্চা-মেকী পরখ করিয়া লইতে হইবে। পূর্ব্ব সঞ্চয়ের রোমন্থন করা বার্দ্ধক্যেই সাজে, কেননা প্রকৃতি তখন আর বহির্মুখে বিকশিত হইতে চাহে না—বহির্বিকাশকে গুটাইয়া অন্তর্লীন করিয়া দেওয়াই তাহার সাধনা। কিন্তু যৌবনে যদি বিপুল অভিজ্ঞতার সঞ্চয় না হইয়া থাকে, কর্ম্মক্ষেত্রে যদি ভাবের পরীক্ষা ও শক্তির পরিচয় না ঘটিয়া থাকে, তবে বার্দ্ধক্যের অন্তঃসমাহিত বৃত্তি জীবনে কেবল অতৃপ্তি ও নৈরাশ্যই আনিবে, রসের সন্ধান মিলাইয়া দিবে না।

তাই বলি, ভাব লইয়া নিজের মাঝে গুটাইয়া বসিয়া থাকিও না। যেমন ভাব পাইয়াছ, তেমনি করিয়া জগৎ গড়িয়া তোল। তোমার মুখে চোখে কাজে-কর্ম্মে অন্তরের ভাব ফুটিয়া বাহির হউক। কেবল আনন্দের আবেশে এলাইয়া পড়িলেই তো তোমার শক্তির সার্থকতা হইবে না—ভাবে যে আনন্দ মিলে, তোমাকে তাহা সম্পূর্ণভাবে গ্রাস করিয়া আরও নূতন ভাবের জন্য সপ্রতীক্ষ হইয়া থাকিতে হইবে। ভাবের অনুরূপ আচার হউক, তাহাতে ভাবেরও পরিপাক ঘটিবে। ভাব তো সকল সময় আসে না, নিমেষের জন্য দেখা দিয়া আবার সে লুকাইয়া পড়ে। কিন্তু তবুও অভাব হইবে না, যদি তোমার আচারের মাঝে তাহার রেশটুকু থাকিয়া যায়। ভাবের অনুকূল আচার ধরিয়া চলিতে চলিতে দেখিবে, আবার সে ভাব নূতন-বেশে আসিয়া দেখা দিয়াছে। এমনিভাবে জীবনকে সচল করিয়া তুলিতে হইবে, একটু কিছু পাইলেই ছেলেমানুষের মত বসিয়া বসিয়া তাহা খুঁটিলেই চলিবে না।

চিত্তকে সর্ব্বদা সচেতন, প্রতীক্ষমাণ রাখিতে হইবে। একটু সুখের আবেশই তো তোমার জীবনের চরম নিয়তি নয়—এর পরে আরও আছে, আরও আছে—তোমাকে তাহার সন্ধানে বাহির হইতে হইবে। সমস্ত সংস্কার ধ্বংস না হইয়া গেলে চরম আনন্দের সাক্ষাৎ মিলে না। কিন্তু যৌবন তো সংস্কার ধ্বংসের সময় নয়, সংস্কার উন্মেষের সময়। যদি সংস্কার ভালও হয়, তবুও তা পূর্ণতার সন্ধান দিবে না। তাই যুবককে সংস্কারের উচ্ছেদের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া ভাবের আনন্দকে গ্রহণ করিতে হইবে, মনে করিতে হইবে

যাহা পাইয়াছি, তাহাতেই খুশী থাকিলে চলিবে না—যে পর্য্যন্ত সংস্কার শেষ না হইবে, সে পর্য্যন্ত আরও চাই—আরও চাই।

কিন্তু তা বলিয়া তোমাকে উচ্ছৃঙ্খল হইতে বলিতেছি না। শক্তির পূর্ণবিকাশ যেখানে, উচ্ছৃঙ্খলতা সেখানে হইতেই পারে না। ভরা কলসীর জল চলিতে গেলে ছলকিয়া পড়ে না—কলসে কমতী থাকিলেই চলিতে গেলে জল টলিতে থাকে। যখন যাহাই আসুক না কেন, তাহাকে গ্রাস করিয়া তুমি যদি তাহার উপর রাজা হইতে পার, তবে তোমার মাঝে নূতন নূতন শক্তির বিকাশ হইবে অথচ উচ্ছৃঙ্খলতা আসিবে না।

বয়সে যারা তরুণ, মনে যারা তরুণ, তাদের উপরই দেশের আশা-ভরসা। কিন্তু তাহাদেরও আপনাকে চিনিতে হইবে। তরুণ চিত্তে শক্তির স্ফুরণ হয় বটে, কিন্তু সবাই তো তাহার যথার্থ পরিচালনা জানে না। এই জন্য সত্যদর্শী প্রাজ্ঞ ব্যক্তির নিকট নতি স্বীকার করাও তরুণ জীবনের পক্ষে বড় প্রয়োজন। তরুণের শক্তি জ্ঞানবৃদ্ধের বহুদর্শিতা দ্বারা পরিচালিত হইলেই দেশের যথার্থ মঙ্গল।

কিন্তু আজ কাল বড় সঙ্কটের সময় উপস্থিত হইয়াছে। সত্য সাম্প্রদায়িকতা দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে—সর্ব্বদর্শিতার স্থান একদেশদর্শিতা আসিয়া অধিকার করিয়াছে। স্বার্থের চর্চ্চা বহুদিন ধরিয়া দেশের সব বিভাগেই চলিয়াছে, তাই স্বার্থপরতা জাতির একটা মজ্জাগত সংস্কার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। স্বার্থের পঙ্ক হইতে জাতিকে উদ্ধার করিতে হইলে এখনও এক যুগ তপস্যার প্রয়োজন। সে তপস্যা তরুণকেই করিতে হইবে। ব্যক্তিগত তপস্যার কতটুকু সিদ্ধি হইল, তাহার হিসাব লইবার কোনও প্রয়োজন নাই। জাতির তপোভাণ্ডার পূর্ণ করিতে হইলে প্রত্যেক ব্যক্তিকেই তপস্যার ফলের প্রতি নিঃস্পৃহ হইয়া তপস্যা করিতে হইবে। সম্পূর্ণ সার্থকতা আজ তোমার মিলিল না, তাহাতে ক্ষতি কি? তুমি যতটুকু করিতে পারিলে, ততটুকুতেই জাতি-সৌধের একটী ইষ্টক স্থাপিত হইল, এই মনে করিয়াই গৌরব অনুভব কর না কেন?

জীবনকে কিছু দ্বারাই খণ্ডিত করিও না—অনন্ত দেশে, অনন্ত কালে, অনন্ত ব্যক্তিতে তাহাকে প্রসারিত করিয়া দাও। তোমার জীবন তোমার প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য নয়, উহা বিশ্বেশ্বরেরই মহাপ্রয়োজন সিদ্ধ করিতেছে। নারায়ণের হাতে 'বিশ্বের লীলা' কমল ফুটিয়া আছে, তোমার জীবনও তাহারই একটী পাঁপড়ি মাত্র। বিশ্বের যোগ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখিলে তাহার কোনও সার্থকতা নাই। তোমার আচার-বিচার, ধর্ম্ম-কর্ম্ম, সমস্ত বিশ্বলীলারই অন্তর্ভুক্ত—তাহাদের লইয়া গোড়ামী করিও না, অপরের সহিত তুলনা করিয়া তাহাদের উৎকর্ষ-অপকর্ষ নিরূপণে ব্যস্ত হইও না।

ভাবিতে শিখ; শুধু যা তা ভাবা নয়, উদারভাবে ভাবিতে শিখ। তুমি যে সকলেরই আত্মীয়, দেশ, কাল, পাত্রের কোনও বিরোধই যে তোমাকে জগতের কাহারও নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন করিতে পারে না, এই ভাবটী চিত্তে দৃঢ় সংস্কাররূপে বদ্ধ হইয়া যাক্। অবশ্য তোমার একটা বৈশিষ্ট্য আছে, তাহা স্বীকার করি। কিন্তু এই বৈশিষ্ট্য তোমার অন্তর্নিহিত সার্ব্বভৌম সত্তা প্রকাশেরই একটা ভঙ্গী মাত্র। সকলের সঙ্গে যুক্ত হইতে পারিলেই তোমার বৈশিষ্ট্য হইতে

লীলার আনন্দ ফুটিয়া উঠিবে, নতুবা তোমার বৈশিষ্ট্যের দর্পে যদি সকলের নিকট হইতে নিজকে পৃথক করিয়াই রাখ, তবে তোমারই মৃত্যু অনিবার্য্য। তোমার বৈশিষ্ট্য বিশ্বেশ্বরেরই সৃষ্টি, তোমার সৃষ্টি নয়—এই দিক দিয়া ইহাকে ভাবিয়া দেখ।

জীব স্বরূপতঃ শিব। তোমার শিবস্বরূপ অবিদ্যায় আচ্ছন্ন। এই আচ্ছাদন দূর করিতে হইলে কর্ম্ম করিতে হইবে। কর্ম্ম সৎ হওয়া চাই। যে কর্ম্ম ভগবদিচ্ছার অনুকূল, বিশ্বহিতকল্পে অনুষ্ঠিত, ব্যক্তিগত কামনাবর্জ্জিত, তাহাই সৎকর্ম্ম। এই সৎকর্ম্ম করিবার অধিকার সকলেরই আছে; তাহার জন্য কোনও সভা সমিতির প্রয়োজন নাই, প্রোগ্রাম রেগুলেশনের দরকার নাই—কোনও আড়ম্বরের প্রয়োজন নাই। দৃষ্টিকে অন্তর্মুখী করিয়া ভগবদিচ্ছার স্বরূপ বুঝিয়া লইতে হইবে; তাঁহার ইচ্ছা মনশ্চক্ষে সুস্পষ্ট হইলেই আর কর্ম্মের জন্য ভাবনা-চিন্তা করিতে হইবে না—তাঁহার ইচ্ছার বেগেই আপনা হইতে কর্ম্ম হইতে থাকিবে—সে কর্ম্মে তোমার জীবনও যেমন নিত্য নূতন সৌন্দর্য্যে নবীন আনন্দে ফুলের মত বিকসিত হইবে, তেমনি জগতের লক্ষ্যপথে অগ্রসর হইতেও সহায়তা করা হইবে।

সৎকর্ম্ম আড়ম্বরশূন্য, কেননা তাহার গতি অন্তর্মুখী। লক্ষ্য বহির্মুখী হইলেই বাহ্য আড়ম্বরের প্রয়োজন হয়। কাজ আরম্ভ করিতে তোমার কত মানুষের প্রয়োজন? যদি কর্ম্ম দ্বারা গুণক্ষয় করিয়া আত্মাকে জাগাইতে চাও, তবে যাহাদের হাতের কাছে পাইয়াছ, তাহাদের লইয়াই কাজ আরম্ভ করিয়া দাও—তাহারও পূর্ব্বে নিজকে লইয়াই কাজ আরম্ভ কর না কেন? কর্ম্ম গভীর হউক, তবেই তাহা সত্য হইবে। নিজের ভালই কর, আর দশের ভালই কর, আগে অন্তরটী ভাল করিতে চেষ্টা করিও। হাজারটী ছেলের জন্য এক ইস্কুল পাতিয়া তাহাদের বিদ্যা শিখানো, আর একটী ছেলের মাঝে মনুষ্যত্ব জাগাইয়া আত্মজ্ঞানের সাধনায় প্রবুদ্ধ করা—এ দুয়ের মাঝে কোন কাজটা ওজনে ভারী, তাহা বিবেচনা করিও। এমনি করিয়া সকল কাজেই বিচার করিতে হইবে।

সংযম, তপস্যা, শুদ্ধি—এই তিনটী সকল সাধনার গোড়া। কর্ম্মকে ইহাদের উপর প্রতিষ্ঠিত কর—ভাব আপনা হইতেই ফুটিবে। বাহিরের আড়ম্বর চাহিও না, দলের ভরসা করিও না—তোমাকে লইয়াই তোমার কাজের পত্তন। অথচ কাহারও সহিত তোমার বিরোধ নাই। সে কেমন করিয়া হয়? আপনাকে বিলাইতে শিখ, তবেই বুঝিবে। অধিকার লইয়া যেখানে অপরের সহিত বাধিবে, সেখানেই তোমার স্বার্থের আঁট তুমি ছাড়িয়া দিও। অপরকে তোমার অধিকার ছাড়িয়া দাও, তোমার মাঝে তুমি ডুবিয়া যাও—তোমার আসন তাহার উপরেও থাকিবে, ক্ষুদ্রের মায়া ছাড়িয়া তুমি বৃহতের অধিকার লাভ করিবে। এমনি করিয়া ছাড়িতে ছাড়িতে অবশেষে তোমার শিবস্বরূপ ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট থাকিবে না—তখন তুমিই রাজার রাজা—বিশ্বের কর্ম্ম তোমারই কর্ম্ম—তুমি আপ্তকাম, সর্ব্বরস। ওঁ শান্তিঃ।

জ্ঞানেশ্বর

ভগবদ্‌গীতার টীকা শেষ হইল—দিনের পর দিন বহুদূরাগত শ্রোতারা মন্ত্রমুগ্ধের মত তাহা শুনিল—জ্ঞানেশ্বরের যশ সমস্ত দাক্ষিণাত্যময় ব্যাপ্ত হইল। গুরু নিবৃত্তিনাথ সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, "তোমার গীতা ব্যাখ্যা বড়ই সুন্দর হইয়াছে বটে, কিন্তু তবুও ইহা টীকা গ্রন্থ মাত্র—এবার মৌলিক কিছু রচনা কর।"

গুরুর আদেশে জ্ঞানেশ্বর "জ্ঞানেশ্বরী" নামে অদ্বৈতবেদান্তের একখানা বিরাট গ্রন্থ রচনা করেন। এই গ্রন্থখানা সবিশেষ পাণ্ডিত্যপূর্ণ হইলেও সমাজে ইহা 'তেমন' প্রতিষ্ঠা লাভ করে নাই। গ্রন্থের দুরূহতাই তাহার প্রধান কারণ। জ্ঞানেশ্বরের ধর্ম্মপ্রচার আপামর সর্ব্বসাধারণের জন্য; সেইজন্য শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতার মত সার্ব্বভৌম মহাগ্রন্থকে অবলম্বন করিয়া ভক্তিরসে অভিষিক্ত করিয়া তিনি তাঁহার "ভাবার্থ-দীপিকা" রচনা করিয়াছিলেন। যে তত্ত্ব সাধারণ বুদ্ধির অগম্য, তাহাকে যথাযথ ব্যক্ত করিবার প্রয়াস করিলে সর্ব্বসাধারণে তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিত না, যে যুগ-প্রয়োজনে জ্ঞানেশ্বর অবতীর্ণ, তাহাও সিদ্ধ হইত না। কিন্তু সর্ব্বসাধারণে তাঁহার যে মূর্ত্তি দেখিয়াছে, তাহার অন্তরালেও যে তাঁহার ব্রহ্মানন্দ জ্ঞানমূর্ত্তি প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে, তাহা তিনি "জ্ঞানেশ্বরী" গ্রন্থে প্রকট করিয়াছেন—সেখানে তিনি দেখাইয়াছেন যে, তিনি বাহ্যতঃ যাহাই হউন না কেন, অন্তরে তিনি নিবৃত্তিনাথের মত মহাজ্ঞানীরই সোসর।

জ্ঞানেশ্বরের বৈশিষ্ট্যই এখানে। আপনাকে তিনি গোপন রাখিয়া জনহিতের জন্য মাধুর্য্যের পসরা বিলাইয়া দিয়াছেন। অধমের প্রতি করুণা তাঁহাকে ব্রহ্মানন্দাস্বাদনের উচ্চ ভূমিকা হইতে দেশের বুকে নামাইয়া আনিয়াছে। এই কারুণ্য-কোমল ভাবই তাঁহার মাঝে বিপুল কর্ম্মশক্তি জাগাইয়াছে। বাস্তবিক যাঁহারা ভগবন্নির্দ্দিষ্ট দেশনায়ক, তাঁহাদের হৃদয়ে এই দ্বৈতভাব দেখা যায়—একরূপে তাঁহারা বিশ্বের সঙ্গে ও আর একরূপে বিশ্বপতির সঙ্গে যুক্ত। অন্তরের যোগ যদি সম্পূর্ণ না হয়, তবে বাহিরের কর্ম্মচেষ্টা সার্থক হয় না, তাহা মানুষকে উদ্বুদ্ধ, সঞ্জীবিত করিতে পারে না। আবার শুধু অন্তরে সমাহিত থাকিলেও সাক্ষাৎভাবে বাহিরের কর্ম্মে যোগ দেওয়া চলে না। এই জন্য জ্ঞানী নিষ্কামভাবে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হন—গীতার কথায় তাঁহার কর্ম 'লোকোপসংগ্রহের জন্য; এইজন্য তারা কর্মসঙ্গী অজ্ঞানীর বুদ্ধিভেদ জন্মায় না, প্রজার উৎসাদ করে না; আবার জ্ঞানী দেখেন তিন লোকে তাঁহার কর্ত্তব্য কিছুই নাই, তথচ তিনি কর্ম লইয়াই ব্যস্ত রহিয়াছেন।' এই কর্মের প্রয়োজন মাত্র ভূতহিত। জ্ঞানেশ্বরের জীবনে এটী সুন্দররূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

জ্ঞানেশ্বরের প্রচার-সঙ্ঘ যে কোনও সাম্প্রদায়িক ভাব দ্বারা কলুষিত ছিল না, তাহা সঙ্ঘান্তর্গত ব্যক্তিগণের পরিচয় হইতেই জানা যায়। নিবৃত্তিনাথের মত পরম জ্ঞানী

হইতে নামদেব নন্দ প্রভৃতির মত পরম ভক্ত পর্য্যন্ত এই সঙ্ঘের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন—বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ হইতে অন্ত্যজ জাতি পর্য্যন্ত ইহাতে স্থান পাইয়াছে। ইহা দেখিয়া কেহ কেহ বলিতে চাহেন যে, জ্ঞানেশ্বর যে প্রচার আরম্ভ করিয়াছিলেন, সমাজকে ভাঙ্গিয়া একাকার করাই ছিল তাহার উদ্দেশ্য। কিন্তু এটা একটা মহাভ্রম। একটা কথা সত্য বটে যে, শৈশব হইতে সমাজ-পরিত্যক্তের গৃহে সমাজের ঔদাসীন্য ও লাঞ্ছনা দ্বারা নিপীড়িত হইয়া তাঁহাদিগকে জীবন যাপন করিতে হইয়াছিল। ইহাতে সমাজপত্তনের গৌরবের প্রতি তাঁহাদের কোনও অনুরাগ না থাকারই কথা। কিন্তু এ বিষয় নিয়া তাঁহারা যে মোটেই মাথা ঘামান নাই, তাহা তাঁহাদের জীবনের লক্ষ্য হইতেই বুঝা যায়। তাঁহারা চাহিয়াছেন দেশকে জাগাইতে—যে সত্য তাঁহারা দেশের সম্মুখে ধরিয়াছিলেন, তাহার কাছে সামাজিক মান মর্য্যাদা বা বাঁধাবাঁধির কথা উঠিতেই পারে না। কিন্তু তাই বলিয়া বর্ণাশ্রমধর্ম্মকে কথায় বা লেখায় কোথায়ও তাঁহারা আঘাত করেন নাই। তাঁহারা সমাজ ভাঙ্গেন নাই, বরং সামাজিক অনুদারতায় বিশ্লিষ্ট সমাজকে ধর্ম্মের বন্ধনে আরও দৃঢ়ভাবে বন্ধন করিয়াছেন। এই রূপে ভগবদ্ভক্তি দ্বারা দেশকে অনুপ্রাণিত করিয়া স্বাজাত্যবোধকে উদ্বুদ্ধ করিতে না পারিলে পরবর্ত্তী যুগে মুসলমান প্লাবন হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য দেশ কখনও সমবেতভাবে চেষ্টা করিতে পারিত না।

জ্ঞানেশ্বরের জীবনে দু' একটা অলৌকিক ঘটনা ঘটিয়াছিল। মহাপুরুষের জীবন-লক্ষ্য যেখানে আমাদের নিকট পরিস্ফুট, সেখানে অলৌকিক ঘটনা দ্বারা তাঁহার মহিমা প্রতিষ্ঠা করিবার চেষ্টা অপ্রাসঙ্গিক বলিয়া মনে হয়, এই জন্য আমরা তাহার উল্লেখ করিলাম না।

এই তরুণ সন্ন্যাসী মাত্র বাইশ বৎসর বয়সে দেহরক্ষা করিয়াছিলেন। মহারাষ্ট্রবাসীর জীবনে তিনি যে নূতন ভাব আনিয়া দিয়াছিলেন তাহা যেমন আজ পর্য্যন্ত তরুণ রহিয়াছে, তাঁহার মূর্ত্তিখানিও তেমন আমাদের হৃদয়ে তরুণ হইয়াই জাগিতেছে।

যোগসূত্রবৃত্তি

কৈবল্যপাদ

কৈবল্য সম্বন্ধে নানা সন্দেহ হইতে মানুষ ভ্রমে পতিত হইতে পারে। সেই সমস্ত সন্দেহ ও ভ্রম দূর করিবার জন্য সম্প্রতি যুক্তি দ্বারা কৈবল্যের স্বরূপ প্রতিষ্ঠিত করা হইবে। যোগসূত্রের চতুর্থ খণ্ড কৈবল্যপাদের ইহাই উদ্দেশ্য।

পূর্ব্বে যে সমস্ত সিদ্ধির কথা বলা হইয়াছে, দেখা যায়, সমাধি ব্যতীত জন্ম প্রভৃতি কারণ হইতেও তাহারা উৎপন্ন হইতে পারে। ইহাতে সমাধিই সিদ্ধির কারণ, এইরূপ ব্যবস্থা ক্ষুণ্ণ হইয়া থাকে। কিন্তু এই বিষয়ের এইরূপ মীমাংসাও করা চলে যে, এই সমস্ত সিদ্ধি পূর্ব্বজন্মে অভ্যস্ত সমাধিবলেই অর্জ্জিত হইয়াছে, এখন কেবল জন্মান্তররূপ নিমিত্ত আশ্রয় করিয়া তাহাদের প্রাদুর্ভাব হইল মাত্র। তাহাতে প্রমাণ হয় যে, সমাধিও সহজ নহে, তাহাও বহুজন্মসাধ্য। ইহাতে সমাধির প্রাধান্যের কোনও ক্ষতি হয় না, যোগীও আশ্বস্ত চিত্তে সমাধি অবলম্বনে কৈবল্য লাভ করিবার জন্য উৎসাহিত হইয়া থাকেন। ফল কথা, সিদ্ধি লাভের কারণ সমূহের মধ্যে সমাধিই প্রধান।

সমাধি ছাড়া জন্ম, ওষধি, মন্ত্র ও তপস্যা হইতে সিদ্ধি উৎপন্ন হইয়া থাকে। পক্ষীরা যে আকাশে গমনাগমন করিতে পারে, ইহা তাহাদের জন্মনিমিত্ত সিদ্ধি। কিম্বা কপিল প্রভৃতি মহর্ষিদিগের জন্মের অব্যবহিত পরক্ষণেই উৎপন্ন জ্ঞান প্রভৃতি স্বাভাবিক গুণ সমূহ তাঁহাদের জন্মসিদ্ধি। পারদাদি রসায়ন প্রয়োগে শরীরের অবস্থান্তর ঘটান যাইতে পারে—ইহাই ওষধি-সিদ্ধি। মন্ত্র জপ করিয়া আকাশে উড়িবার ক্ষমতা ইত্যাদি লাভ করা মন্ত্রসিদ্ধি। বিশ্বামিত্র প্রভৃতি ঋষিরা তপস্যায় সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। সমাধি-সিদ্ধির কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। পূর্ব্বজন্মে যদি সমাধির বিঘ্নস্বরূপ ক্লেশ সমূহ ক্ষীণ হইয়া গিয়া থাকে, তবেই এই সমস্ত সিদ্ধি লাভ হয়। সুতরাং সমাধি-সিদ্ধিতে সমাধিই যেমন সিদ্ধির অসামান্য কারণ, তেমনি অন্যান্য সিদ্ধিতেও পূর্ব্বজন্মাভ্যস্ত সমাধিই কারণ—জন্ম, ওষধি প্রভৃতি সিদ্ধির নিমিত্ত মাত্র। (১)

তবে ইহাও দেখা যায় যে, সিদ্ধিলাভে কখনও কখনও জন্মান্তরের অপেক্ষা থাকে না। যেমন নন্দীশ্বরের ইহজন্মেই জাতি-পরিণাম ঘটিয়াছিল; সুতরাং এরূপ স্থলে পূর্ব্বজন্মাভ্যস্ত 'সমাধিকে কিরূপে কারণ বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে? ইহার উত্তরে এই বলা যাইতে পারে, প্রকৃতির আপূরণ বা অনুপ্রবেশ বশতঃ ভিন্নজাতিতে পরিণাম হইতে পারে সুতরাং ইহজন্মেই জাত্যন্তর পরিণাম অসম্ভব নহে। তাৎপর্য্য এই, জীবের বিভিন্ন প্রকৃতি রহিয়াছে। প্রত্যেক প্রকৃতির যত প্রকার পরিণাম

হইতে পারে, তাহার সমস্তই বীজাকারে জীবে নিহিত রহিয়াছে, উপযুক্ত অবসর পাইলেই ধর্ম্ম প্রভৃতি নিমিত্তকে আশ্রয় করিয়া তাহা আত্মপ্রকাশ করিবে। সুতরাং ইহার জন্য জন্মান্তরের অপেক্ষা করিবার প্রয়োজন হয় না। (২)

জাত্যন্তর পরিণাম কিরূপে ঘটিয়া থাকে, তাহা সূত্রকার বুঝাইয়া বলিতেছেন। প্রকৃতির অর্থান্তরপরিণামে ধর্ম্মাধর্ম্মাদি নিমিত্তকে প্রয়োজক বলিয়া স্বীকার করা যায় না। কেননা প্রকৃতি সকলের কারণ; ধর্ম্ম অধর্ম্ম প্রভৃতিও প্রকৃতিরই কার্য্য। কার্য্যদ্বারা কারণ প্রবর্ত্তিত হইতে পারে না, কারণ দ্বারাই কার্য্য প্রবর্ত্তিত হয়, ইহাই স্বাভাবিক। সুতরাং ধর্ম্মাধর্ম্মাদি প্রকৃতির বিষয়ান্তর-পরিণামের প্রয়োজক হইতে পারে না।

তবে ধর্ম্মাদির ব্যাপার কি করিয়া সিদ্ধ হইতে পারে?—ধর্ম্মের আবরক অধর্ম্ম। উহা ধর্ম্মের বিরোধী। ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে, তাহার আবরক অধর্ম্মের ভেদ বা ক্ষয় হইয়া থাকে। প্রতিবন্ধক দূর হইয়া গেলেই প্রকৃতি স্বয়ং অভিমত কার্য্যে প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে। যেমন কৃষক ক্ষেত্রে আলি বাঁধিয়া জল আটকাইয়া রাখিয়াছে। যদি এক ক্ষেত্র হইতে অপর ক্ষেত্রে জল লইয়া যাইবার প্রয়োজন হয়, তবে সে কেবল আলি কাটিয়া দেয়, তাহাতেই জল আপনা হইতে প্রবাহিত হইয়া অপর ক্ষেত্রের আকারে পরিণত হয়, জলকে প্রবাহিত করিবার জন্য কৃষককে আর কোনও চেষ্টা করিতে হয় না। ধর্ম্মানুষ্ঠান সেইরূপে কেবল অধর্ম্মরূপ আবরণ ভেদ করিয়া প্রকৃতির প্রসারের সহায়ক হয়, প্রকৃতির আপূরণে তাহাদের অন্য কোনও প্রকার প্রযত্নের প্রয়োজন নাই। (৩)

আর একটী প্রশ্ন হইতে পারে। মনে কর, যোগী তত্ত্ব সাক্ষাৎকার করিয়াছেন, তাঁহার প্রচুর বিভূতিশক্তি সঞ্চিত হইয়াছে। এক্ষণে যুগপৎ বহু কর্ম্মফল ভোগ করিবার জন্য তাঁহার তত্তৎ কর্ম্মভোগের উপযোগী যুগপৎ বহু শরীর নির্ম্মাণ করিবার ইচ্ছা হইল। এক্ষণে এই বহু শরীরের বিভিন্ন চিত্ত সমূহ কোথা হইতে আবির্ভূত হইবে?—চিত্তের মূল কারণ অস্মিতা। যেমন মূল অগ্নি হইতে স্ফুলিঙ্গের উৎপত্তি হয়, সেইরূপ অস্মিতা হইতেই যোগীর ইচ্ছাবশতঃ বহু শরীরের উপযোগী বহু চিত্তের যুগপৎ আবির্ভাব হইবে। (৪)

কিন্তু বহু চিত্তের অভিপ্রায় ভিন্ন ভিন্ন হইবে। সুতরাং তাহাদের উপর একের কর্তৃত্ব কিরূপে ঘটিবে?—চিত্তের প্রবৃত্তি ভেদ হইতে নানা ব্যাপার নিষ্পন্ন হইবে বটে, কিন্তু যোগীর একটি চিত্ত অধিষ্ঠাতৃরূপে তাহাদিগকে প্রয়োজিত করিবে। কাজেই ভিন্নমত হইবার আশঙ্কা থাকিবে না। যেমন এই এক শরীরেই মন অধিষ্ঠাতৃ হইয়া চক্ষু-কর্ণ হস্ত-পদাদিগকে নিজের ইচ্ছামত পরিচালিত করিয়া থাকে, বিভিন্ন শরীরেও সেইরূপই করিবে। (৫)

জন্ম প্রভৃতি নিমিত্ত হইতে যে সিদ্ধি লাভ হয় তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। তদনুযায়ী সিদ্ধ চিত্তও পাঁচ প্রকার। উক্ত পাঁচ প্রকার সিদ্ধ চিত্তের মধ্যে একমাত্র সমাধিজ চিত্তই অনাশয় অর্থাৎ কর্ম্মবাসনা রহিত। (৬)

যেমন অন্যের চিত্ত হইতে যোগীর চিত্ত ভিন্ন লক্ষণাক্রান্ত, তেমনি তাঁহার কর্ম্মও বিলক্ষণ। সাধারণতঃ কর্ম্ম চারি প্রকার—কৃষ্ণ, শুক্লকৃষ্ণ, শুক্ল, অশুক্লকৃষ্ণ। যাগ প্রভৃতি কর্ম্ম হইতে শুভ ফল উৎপন্ন হইয়া থাকে বলিয়া তাহারা শুক্ল। অশুভফলদায়ী ব্রহ্ম-

ইত্যাদি কৃষ্ণ কর্ম। আর এতদুভয়ের সংমিশ্রণে উৎপন্ন কর্ম শুক্লকৃষ্ণ। যাঁহারা বিচক্ষণ, দান-তপস্যা-স্বাধ্যায়াদিসম্পন্ন, তাঁহারা শুক্ল কর্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। নারকীরা কৃষ্ণ কর্মের অনুষ্ঠান করে। সাধারণ মনুষ্যের কর্ম শুক্লকৃষ্ণ। যোগী কর্মফল-সন্ন্যাসী, সুতরাং তাঁহার কর্ম ঐ তিন প্রকার কর্মের বিপরীত। তিনি ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিয়া কর্ম অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন বলিয়া তাঁহার কর্ম ফলপ্রসূ হয় না। এই জন্য ইহাকে শুক্লও বলা চলে না, কৃষ্ণও বলা চলে না। (৭)

কর্ম্মের বাসনা দুই প্রকার—একের ফল স্মৃতিমাত্র, অপরের ফল জাতি আয়ু ও ভোগ। আমরা শুক্ল, কৃষ্ণ বহুবিধ কর্ম্ম অনুষ্ঠান করিয়া থাকি। কর্ম্মবাসনা জন্ম, আয়ু ও ভোগের প্রয়োজক। কিন্তু সমস্ত কর্ম্মবাসনাই যুগপৎ জন্মাদির প্রবর্ত্তক হয় না। এক জন্মের কিম্বা বহুজন্মের বাসনা-সমূহ মিলিত হইয়া এই জন্মের প্রবর্ত্তন করিয়াছে। এক্ষণে কোন্ কোন্ বাসনা প্রকটিত হইবে, তাহা এই জন্মই নিরূপণ করিয়া দিবে। যে সমস্ত বাসনা বর্ত্তমান জাতি, আয়ু বা ভোগের অনুকূল নহে, তাহারা প্রচ্ছন্ন থাকিবে। ইহাদিগকেই স্মৃতিমাত্রফলা বলা হইতেছে। কেন, তাহা বলিতেছি। দেবতা, মনুষ্য ও তির্য্যক দেহের মধ্যে যে কর্ম্ম দ্বারা এই জন্মে তোমার যেরূপ দেহ প্রাপ্তি ঘটিয়াছে, সেই কর্মের পরিপাকের অনুরূপ যে সমস্ত বাসনা বা ভোগসংস্কার-সমূহ তোমাতে সঞ্চিত ছিল, ইহজন্মে কেবল তাহাদেরই অভিব্যক্তি হইবে। পূর্ব্বে কোন এক কর্মবশতঃ তোমার দেবশরীর লাভ হইয়াছিল, তারপর শত শত জন্মের পর আবার সেই কর্মের অনুবৃত্তিবশতঃ পুনরায় তুমি দেবদেহ পাইলে। এক্ষণে এই দেবদেহের আরম্ভের অনুকূল বাসনা-সমূহ শত শত জন্মের ব্যবধান লঙ্ঘন করিয়াও আবার তোমার স্মৃতিপথে উদিত হইবে, অলৌকিক বিষয় সমস্ত তোমার স্মরণে আসিবে। আর ইহার মধ্যে শত শত জন্মে অনুষ্ঠিত কর্ম্মদ্বারা দেবদেহের অননুকূল যে সমস্ত বাসনা সঞ্চিত হইয়াছিল, তাহারা অনভিব্যক্ত থাকিবে। দেবদশায় নারকী-শরীরোদ্ভব বাসনা সমূহের অভিব্যক্তি হইবে না। (৮)

সদৃশ জন্মের প্রয়োজক বাসনা-সমূহের মধ্যে কার্য্য কারণ ভাব কিরূপে উপপন্ন হইতে পারে, সে সম্বন্ধে সংশয় জন্মিতে পারে। কিন্তু সূত্রকার বলিতেছেন, স্মৃতি ও সংস্কার এক রূপ বলিয়া জন্ম, দেশ ও কালের ব্যবধান থাকিলেও বাসনা সমূহ অব্যবহিতের ন্যায় সমুদিত হয়।

জীব নানা যোনিতে ভ্রমণ করিতেছে। কোনও এক যোনিতে জন্ম গ্রহণ করিয়া সহস্র জন্মের ব্যবধানে যখন সেই যোনিতেই আবার সে জন্মগ্রহণ করে, তখন পূর্ব্বানুভূত জন্মে সেই জন্মের অনুকূল শরীরাদি ব্যঞ্জকের অপেক্ষায় যে সমস্ত বাসনা প্রকটিত হইয়াছিল, আবার বাসনা-ব্যঞ্জক পূর্ব্বোক্ত শরীর লাভ হওয়াতে সেই সমস্ত বাসনাই প্রকটিত হইয়া থাকে। মধ্যে বাসনার অভিব্যঞ্জক শরীর ছিল না বলিয়া বাসনাও ফুটে নাই। এক্ষণে উপযুক্ত শরীর পাইয়া আবার তাহারা ফুটিয়া উঠিয়াছে। এই যে বাসনা উদ্বুদ্ধ হয়, ইহা স্মৃতি সহকৃত হইয়া থাকে। জন্ম, দেশ ও কালের ব্যবধান সত্ত্বেও বাসনাসমূহ অব্যবহিতরূপে স্মৃতিকে উদ্বুদ্ধ করিয়া থাকে। স্মৃতি ও সংস্কার একরূপ বলিয়াই ইহা হইয়া

থাকে। কর্ম্ম অনুষ্ঠান করিলে তাহা হইতে চিত্তসত্ত্বে বাসনারূপ সংস্কার উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই সংস্কার স্বর্গ-নরকাদি ফলের অঙ্কুররূপে গণ্য হইতে পারে; কিম্বা ভবিষ্যৎ যাগাদি কর্ম্মের প্রয়োজিকা শক্তিরূপে তাহা অবস্থান করে। কিম্বা উক্ত সংস্কারকে কর্ত্তার ভোগ-ভোক্তৃত্ব রূপ সামর্থ্যও বলা যাইতে পারে। এই সংস্কার হইতে স্মৃতি উৎপন্ন হয় এবং স্মৃতি হইতে সুখ-দুঃখাদির অনুভব হইয়া থাকে। আবার সেই অনুভব হইতে সংস্কার ও সংস্কার হইতে স্মৃতি উৎপন্ন হয়। এরূপ অবস্থায় সংস্কার ও স্মৃতি যদি ভিন্ন ভিন্ন অধিকরণ দ্বারা নিরূপিত হয়, তবে তাহারা অব্যবহিত না হইলে তাহাদের মধ্যে কার্য্য-কারণভাব কল্পনা করা দুর্ঘট হইতে পারে। কিন্তু আমরা দেখিতেছি বর্ত্তমান স্থলে অনুভবই সংস্কারী অর্থাৎ অনুভব হইতে সংস্কার জন্মিয়া থাকে এবং সেই সংস্কারই স্মৃতিরূপে পরিণত হয়। সুতরাং শত শত জন্মের ব্যবধান সত্ত্বেও একই চিত্ত যেখানে সেতুরূপে উভয়ের যোগরক্ষা করিতেছে, সেখানে কার্য্যকারণ ভাব থাকা তো অসম্ভব নহে। (৯)

ক্রমিক সং
শ্রেণী সং
কলিকাতা।

আরণ্যক

"যজ্ঞেন বাচঃ পদবীয়মায়ন্ তামন্ববিন্দন্ ঋষিষু প্রবিষ্টাম্॥"

—ঋগ্বেদ সংহিতা ১০।৬।৩

আত্মনিবেদনই প্রেমের পূর্ণতা। যাকে ভালবাসি, নিজের উদ্ধত বাসনাকে তার কাছে খর্ব্ব করতেই হবে, নইলে আর ভালবাসার মান থাকে না। তবে কি ভালবাসতে হলে চাইতে নাই? তা আছে বই কি? কিন্তু সে চাওয়া তো ক্ষুদ্র কিছু চাওয়া নয়—সে চাওয়া ভূমাকে।

প্রেম আমারই প্রতিরূপ। সে আমি বিভু, বিশ্বরাট—সর্ব্বোপরি সে আমি জ্ঞানে সমুজ্জ্বল। যে মহামোহের তাড়নায় অসংখ্য বন্ধনের মাঝে এই জগৎ ঘুরপাক খেয়ে মরছে, প্রেম সে কলুষ আবর্ত্তের বহু উর্দ্ধে। অথচ তার দরদের অন্ত নাই। প্রেম সীমার মাঝে অসীম—তাই সে আমাদের কাছে চির রহস্যময়। অনন্ত আকাশের বুকে সে যেন সৃষ্টির আদিম রূপরেখা। তার কি প্রয়োজন তা আমরা জানি না, তার কিসে সার্থকতা তা আমরা বুঝি না—কিন্তু তবুও জানি, জীবনে সেই আমাদের পরমানন্দ—সে আমাদের আত্মার স্বভাব।

জগতে কে বড়, যে ভালবাসা চায়, না যে ভালবাসা দেয়? যে চায়, তার হৃদয়ের হাহাকার তো কোনও দিনই মিটবে না, কেননা তার সংশয়াতুর চিত্ত কোন প্রমাণে বুঝবে যে সে পেয়েছে? কিন্তু যে দিয়েছে, সে জানে তার দান ব্যর্থ হয়নি। অসহিষ্ণুর

মত্ততায় প্রেমের কুঞ্জবনকে সে তো দলিত করে ফিরেনি—তার ধৈর্য্য যে তার স্নেহের মতই সুগভীর। আত্মার স্ফূর্ত্তিতে যে তৃপ্ত, তার শঙ্কা কোথায়? সে তো ভালকেও ভালবাসেনি, বা মন্দকেও ভালবাসেনি। সে পূজা ক'রছে তার বিজনচারী মনোদেবতার—সেইখানেই তার প্রেম সার্থক।

*

কাজ করিবে দীন হীন কাঙ্গালের মত নয় বা হৃদয়ের দুর্ব্বলতা লইয়া ভয়ে ভয়ে নয়—কাজ করবে রাজার মত, আপন খুসীতে। কর্ম্মক্ষেত্রে প্রতি পদক্ষেপে, ধমনীর প্রতি স্পন্দনে চিত্তে তোমার আনন্দ উথলিয়া উঠিবে। "আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে"—আনন্দ হইতেই বিশ্বের উৎপত্তি—আনন্দই ভগবানের স্বরূপ। আনন্দই তোমার অন্তরের স্বাভাবিক সম্পদ। স্বার্থপ্রণোদিত হইয়া একদেশদর্শীর মত কোনও কিছু ভাবিলে বা করিলে ভগবান ক্ষুণ্ণ হন, তাই অন্তরের আনন্দও পরাভূত থাকে, হৃদয়ও শুষ্ক রুক্ষ মরুভূমিতে পরিণত হয়। এই রুক্ষ হৃদয় কামনার গ্লানিতে পরিপূর্ণ হইলে উদাম উৎসাহ অন্তর্হিত হয়; জগতের কাহাকেও আর ভালবাসার মধুময় দৃষ্টি দিয়া দেখা যায় না—অপরের হাসিমুখ দেখিলেও প্রাণ ঈর্ষ্যানলে দগ্ধ হইতে থাকে। কাজেই যে চিন্তায় যে কাজে তোমার স্বাভাবিক আনন্দ স্ফুরণের পথে বিঘ্ন উপস্থিত করিবে, সেই কাজের পিছনেই তোমার দৈন্য, অভিমান বা এমনিতর অন্তরের কোন কলুষ প্রচ্ছন্ন আছে জানিয়া সাবধানে তাহাকে দূর করিয়া দিতে সচেষ্ট হইবে। তবেই আনন্দময়ের আনন্দস্পর্শে তোমার প্রাণ মন সর্ব্বদাই পরিপূর্ণ থাকিবে। তখন বলিতে পারিবে—

"মোরা আনন্দমাঝে মন,আজি করিব বিসর্জন,
জয় জয় আনন্দময়!
সকল বিশ্বে, সকল দৃশ্যে, আনন্দ-নিকেতন;
জয় জয় আনন্দময়!
আনন্দ চিত্ত মাঝে, আনন্দ সর্ব্ব কাজে,
আনন্দ সর্ব্ব কালে, দুঃখ বিপদ জালে,
আনন্দ সর্ব্বলোকে, মৃত্যু বিরহ শোকে,
জয় জয় আনন্দময়!"

*

দূর হতে দাঁড়িয়ে নিজকে না দেখতে পারলে, নিজকে বোঝা যায় না—নিজকে চালানও দুর্ঘট হয়ে ওঠে। জীবন অনায়াস হওয়া বাঞ্ছনীয় বটে - কিন্তু তা কি এমনি করে অনায়াস হওয়া—ধুলা-কাদা, ছাই-মাটীর মাঝে থেকেই? আগে জীবন ফুটে উঠুক, পদ্মকলির মত—তার পর আনন্দ জীবনে সহজ হবে। কিন্তু সে কথা আমরা বুঝি না। আমরা চলি আপন খেয়াল মত, তাতে আয়েসটুকু মিললেই হল। কিন্তু এমন চলার মাঝে নিশ্চিন্ত ভাব থাকলেও নির্ভর নিশ্চয়ই নাই। এটা আমাদের প্রবৃত্তিমুখী গতি মাত্র। তা যদি না হত, তাহলে এই চলার ফলে অন্তরে বীর্য্য সঞ্চয় হত, তাতে সমস্ত বাধা, জড়তা ভস্মসাৎ হয়ে যেত, চিত্ত স্বচ্ছ অকলুষ হয়ে উঠত, সংসারের সমস্ত ক্ষতি সহ্য করবার ধৈর্য্য মিলত। কিন্তু অনায়াস জীবন যাপন করতে গিয়ে কি তা আমাদের ভাগ্যে ঘটে? তবেই বুঝতে হবে, এমনি চলার মাঝে তাঁর প্রতি নির্ভরের ভাব আমাদের নাই, তাঁর প্রেরণাকে আমরা হৃদয়ে গ্রহণ করতে পারি না—আমাদের চলার মাঝে অভিমানই প্রভু—তারই ঠেলাতে

আমাদের যা হবার হচ্ছে। তাই অনায়াস থাকতে চাইলেও থাকতে পারি না—পদে পদে মান, অভিমান, অসন্তোষ, প্রমাদের আর অন্ত থাকে না।

*

সময় সময় তোমার ভিতর যে কর্ম্মের প্রেরণা জাগে, আর তাহারই সার্থকতায় তুমি অহঙ্কৃত হইয়া ওঠ—নিজকে কর্ত্তা বলিয়া অভিমান কর, ইহাই বন্ধন। "প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ"—প্রকৃতি গুণকে আশ্রয় করিয়া কর্ম্মসমূহ নিষ্পন্ন করেন, তুমি উদাসীন নির্বিকার সাক্ষিস্বরূপ—এইটুকু উপলব্ধি করাই মুক্তি। কিন্তু অটুট সঙ্কল্প ও দৃঢ় অধ্যবসায় সহকারে সাধন না করিলে এই উপলব্ধিটুকু মিলে না। প্রতি মুহূর্ত্তের প্রত্যেকটী কার্য্যে নিজকে স্বতন্ত্র রাখিয়া দ্রষ্টার ভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকিতে অভ্যাস করিও—কাজের মাঝে নিজকে হারাইয়া ফেলিও না। তাহা হইলে বুঝিতে পারিবে, কোন প্রেরণার বশে কোন কার্য্য হইতেছে—অথবা কোন প্রবৃত্তি তোমাকে বলপূর্ব্বক কার্য্যে নিয়োজিত করিতেছে। এই ভাবে বুঝিতে পারিলে কোন অবস্থাই আর তোমাকে অভিভূত করিতে পারিবে না—প্রবৃত্তির সমস্ত বিক্ষোভই তোমার অন্তরের অক্ষুণ্ণ প্রশান্তির মাঝে স্তব্ধ হইয়া যাইবে। জাগ্রৎ জীবনে এই ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইলে ক্রমশঃ সাধনা দ্বারা—ঐকান্তিক চেষ্টা দ্বারা স্বপ্ন ও সুষুপ্তির মাঝেও যে দিন নিজে স্বতন্ত্র, সদা জাগ্রৎ, সাক্ষিস্বরূপে অবস্থিতি করিতে পারিবে, সেই দিনই নিজের শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত স্বভাব উপলব্ধি করিয়া জীবন সার্থক করিতে পারিবে।

*

সংসারে হয়ত তোমার কোনো দৈন্য নাই, আরাম উপভোগের কোনো উপকরণেরই অভাব নাই; তবুও তোমার ভিতর একটা অতৃপ্তি, একটা হাহাকার সর্ব্বদাই জাগিয়া ওঠে। এই অজ্ঞাত রহস্যের কারণ তোমার অন্তরেই নিহিত। চৈতন্যরূপে তোমার মাঝে যিনি রহিয়াছেন, অবিদ্যায় আচ্ছন্ন হইয়া তিনি নিজকে ক্ষুদ্র ব্যষ্টিরূপে বদ্ধ মনে করিয়া মূঢ় সাজিয়াছেন। কিন্তু পূর্ব্বে তিনি আপন মুক্ত স্বভাবের যে মহান আনন্দ উপভোগ করিয়াছেন, সেই আনন্দের কাছে সাংসারিক সুখস্পৃহার পরিতৃপ্তি অতি তুচ্ছ, অতি হেয়। তাই মহামায়ার মোহনিগড় ছিন্ন করিয়া তিনি চলিয়াছেন আত্মপ্রবোধনের পথে—নিজের মুক্ত স্বরূপ লাভের জন্য। যত দিন এই মুক্ত স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত না হইবে, তত দিনই তোমার হৃদয় হইতে স্বতঃ উত্থিত এই মর্ম্মভেদী ক্রন্দন থামিবে না।

*

ক্ষুদ্র অভিমান বড় বালাই। কি করে যে এই অসহিষ্ণু অহমিকা হতে আমরা নিস্তার পাব, সেই তো এক সমস্যা। আবার দেখ এ অভিমান আসে কোথা থেকে, না আবদ্যা থেকে। সবটুকু আমরা জানি না বলেই নিজের পারিপার্শ্বিককেও ছোট করে দেখি, নিজকেও ছোট বলে জানি। নিজকে ছোট বলে জানি বলেই আমাদের মাঝে কর্ত্তৃত্ব এসে পড়ছে, আর তাই নিয়ে মন গুমোরে ফেটে পড়ছে। এই অভিমানের হাত হতে বাঁচবো বলে যদি নিজকে ফাঁকা করে দিই, নিজের ভিতর যদি কোনও বাসনা-কামনাই না রাখি, তবুও যেন সব যায় না, একটু সূক্ষ্ম আবরণ তবুও যেন চিত্তের উপর থেকে যায়। নিজকে শূন্য করতে পারি, কিন্তু নিজকে

হীন করতে পারি না, এই তো অভিমানের আর এক রূপ। কিন্তু এমন করে তো দিন চলে না। তাই কোনও রকমে যখন আর তরী সামলাতে পারি না তখন মনে হয়, না, নিজকে কাঙ্গাল না করলে আর উপায় নাই। অন্তরাত্মা তখন আকুল হয়ে বলে ওঠে, হে প্রভো, আমার এই উদ্ধত চিত্তকে আজ তোমার পায় সঁপে দিলাম—একে সুন্দর করে তোলবার দায়িত্বও আর আমার উপর রাখতে চাই না। একে দিয়ে যে তোমায় সুখী করব, এ স্পর্দ্ধাও আর আমার মাঝে কই? আজ তুমি একে নাও, নিয়ে তোমার যা খুসী তাই কর। আমার এই পরাজয়ে যদি তোমার জয় হয় আজ, তবে সেই আমার পরম আনন্দ, প্রভো! আমি উদাসীন নই, আমি পূর্ণরূপেই সজাগ—কিন্তু এ জাগরণের মাঝে আমার নিজের চেষ্টা কিছুই নাই, আছে শুধু তোমার কৃপা। আজ কৃপাভিখারী হয়ে তোমার দুয়ারে দাঁড়ালাম, তোমাকে আমার মনমত গড়ে তুলবার চেষ্টায় আমি হয়রাণ হয়েছি, এবার তুমিই আমাকে তোমার মনমত করে গড়ে তোল। এ আর্ত্তি শুধু তোমার কাছে নয়—বিশ্বের প্রতি জনের কাছে। তাদের মাঝে যে মহিমা রয়েছে, তাতে তোমাকে প্রত্যক্ষ করে আজ নিঃসঙ্কোচে সকলের কাছে মাথা লুটিয়ে দিলাম। আমি জানি, আমি তোমারই, কিন্তু এ-ও জানি; সে-ও তোমারই করুণায়।

সম্বাদ ও মন্তব্য

আশ্রম-সংবাদ

মঠাধিষ্ঠাতা শ্রীমৎ পরমহংসদেব বর্ত্তমানে পুরীধামে অবস্থিতি করিতেছেন।

নিখিল ভারতীয় দেবভাষা পরিষদ

ইতিপূর্ব্বে অত্র পরিষদ বিজ্ঞাপন দিয়াছিলেন যে সংস্কৃত ভাষার মহত্ত্ব বিষয়ে সংস্কৃতভাষায় নাগরী অক্ষরে লিখিত অন্যূন ১০০ শত পংক্তির প্রথম ও দ্বিতীয় প্রবন্ধের জন্য যথাক্রমে ১৫৲ টাকা ও ১০৲ টাকা পুরস্কার প্রদত্ত হইবে, এবং প্রবন্ধ ৩০শে সেপ্টেম্বরের মধ্যে পাঠাইতে হইবে। কিন্তু এ পর্য্যন্ত যথেষ্ট সংখ্যক প্রবন্ধ হস্তগত না হওয়ায় প্রবন্ধ গ্রহণের সময় বর্দ্ধিত করিয়া ৩০শে নবেম্বর পর্য্যন্ত করা হইল। কেবলমাত্র ভারতের ছাত্রগণই এই প্রতিযোগিতায় সম্মিলিত হইতে পারিবে। আশা করি তাহারা এই সুযোগ পূর্ণরূপে গ্রহণ করিবে।

শ্রীসুরেশ চন্দ্র শর্ম্মা মজুমদার,
সাধারণ সম্পাদক।
পোঃ সীবান PO. Siwan
জিলা সারণ

ওঁ তৎ সৎ

আর্য্য-দর্পণ

(সনাতন ধর্ম্মের মুখপত্র)

১৩শ বর্ষ } অগ্রহায়ণ { ৮ম সংখ্যা

বৃহস্পতিঃ

[ঋগ্বেদ সংহিতা—১।২৪।১১]

অনর্ব্বাণং বৃষভং মন্দ্রজিহ্বং
বৃহস্পতিং বর্দ্ধয়া নব্যমর্কৈঃ।
গাথান্যঃ সুরুচো যস্য দেবা
আশৃণ্বন্তি নবমানস্য মর্ত্তাঃ॥

তমৃত্বিয়া উপবাচঃ সচন্তে
সর্গো নয়ো দেবয়তামসর্জি।
বৃহস্পতিঃ স হঞ্জো বরাংসি
বিভ্বাভবৎ সমৃতে মাতরিশ্বা॥

উপস্তুতিং নমস উদ্যতিং চ
শ্লোকং যংসৎ সবিতেব প্রবাহূ।
অস্য ক্রত্বা হন্যো যো অস্তি
মৃগো ন ভীমো অরক্ষসস্তুবিষ্মান্॥

অস্য শ্লোকো দিবীয়তে পৃথিব্যাম্
অত্যো ন যংসদ্ যক্ষভৃদ্বিচেতাঃ।
মৃগাণাং ন হেতয়ো যন্তি চেমা
বৃহস্পতেরহিমায়াঁ অভিদ্যূন্।।

মধুবাক্ বৃহস্পতি, বীর্য্যশালী, সেবক-শরণ,
বিশ্ব-স্তুত্য—গাথা তাঁর গাও আজি যজমানগণ;
দীপ্তি তাঁর দেবকণ্ঠে ওই শোন ফুটায়েছে গান—
স্তব্ধ হয়ে মর্ত্ত্যবাসী শোনে তাঁর মহিমা বাখান।

ঋতুচক্রবিহারিণী বিশ্ববাণী মিলে তাঁর পায়—
স্রষ্টা তিনি—দেবকামী-কাম্যফল স্বজেন হেলায়;
ভক্তহৃদে বরণীয় সম্পদের জাগান আভাস—
মাতরিশ্বা-মহাকায়ে হেরি যজ্ঞে তাঁহার প্রকাশ।

প্রণতি-প্রয়াস, স্তুতি, কীর্ত্তিগাথা—সঁপি যা সতত—
প্রসারিয়া কর তারে নিয়েছেন সবিতার মত;
ওই সূর্য্য সিংহসম ভীমকান্তি মহাতেজীয়ান—
রক্ষোহন্তা বৃহস্পতি-বীর্য্যে তারে হেরি আগুয়ান।

কীর্ত্তি তাঁর মর্ত্ত্য বুকে আনিয়াছে অমরা-বিলাস,
সবিতা কল্যাণবাহী বিশ্বে যেন করেছে বিকাশ—
ওই তাঁর অস্ত্র ধায় মৃগযূথে করিয়া বিকল,
বৃহস্পতি-বীর্য্যে নিত্য দানবের টুটে মায়াবল।

কথানক

—*—

নিরানব্বইয়ের পাল্লা

লোকে বলে, খবরদার, নিরানব্বইয়ের পাল্লায় পড়ো না যেন। এ কথার অর্থ কি?

স্বামী-স্ত্রী কুঁড়ে ঘরে বাস করত। বেশ মনের আনন্দে তাদের দিনগুলি কাট্‌ছিল।

স্বামী সারাদিন খেটে যা রোজগার করত, তাতে কোনও রকমে দু'জনার দিন চলে যেত। সংসারে তার আশা ভরসা বড় বিশেষ উঁচু ছিল না, মনে কোনও কামনা ছিল না, কাউকে সে হিংসা করত না, সৎভাবে থেকে গতর খাটিয়ে রোজগার করত। তার প্রতিবেশী ছিল একজন মস্ত লোক। এই মস্ত লোকটীর কিন্তু দুশ্চিন্তার আর অবধি ছিল না—বেচারী সুখ কাকে বলে জানত না।

একবার এক বৈদান্তিক সন্ন্যাসী এসে তার বাড়ীতে অতিথি হলেন। বড় লোকটীর মানসিক দুরবস্থা দেখে তিনি বললেন যে, তার এত দুশ্চিন্তা আর দুর্ভাবনার মূলই হচ্ছে তার ধনসম্পদ্‌। টাকা-পয়সা তো তার মুঠোতে নয়, সে-ই টাকা-পয়সার মুঠোতে—টাকাতেই তাকে চেপে রেখেছে, তার জন্যই তার মন কেবল একটা থেকে আর একটাতে ছিট্‌কে ছিট্‌কে পড়ছে। তার গরীব প্রতিবাসীকে দেখিয়ে সন্ন্যাসী বললেন, "একবার ওকে দেখ দেখি—এক কাণাকড়ি তার ট্যাঁকে নাই, তবু আনন্দের ছটায় তার মুখখানা ঝলমল করছে—তার কেমন চওড়া বুক, কেমন মজবুত গড়ন। এমনি আনন্দ নিয়েই সে দিন-রাত খাট্‌ছে—সারাদিন শুধু আনন্দের গানই গাইছে।"

এমন সুখ ভোগ করা বড় মানুষের ভাগ্যে তো কখনো হবার নয়। অপর লোকে যেমন পছন্দ করবে, তেমনি করে সে তার ধন-সম্পদকে সাজিয়ে-গুছিয়ে রাখবে। সাধুর কথাগুলো সেই বড় মানুষটীর মনে লাগল, অর্থের প্রত্যাশাই যে দুঃখের মূল, তা সে বুঝতে পারল। তখন তার ইচ্ছা হল, একবার সাধুর কথাটা সে পরখ করে দেখে। তাই সাধুরই কথামত, বড় লোকটী গরীবের ঘরে গোপনে একটা টাকার থলে রেখে এল, তার মাঝে নিরানব্বইটী টাকা ছিল।

পরদিন দেখা গেল, গরীবের কুঁড়ে ঘরে আর আগুন জ্বলে না। সারাদিন খেটে বেচারী যা কামাতো, তাই দিয়ে বাজার করে আন্‌ত, আর তার স্ত্রী পরম যত্নে তাই স্বামীকে রেঁধে দিত। কিন্তু সে দিন আর তাদের উনুন ধরানো হল না, পাক-সাক হলো না, সারা দিনরাত স্বামী-স্ত্রীতে উপোস করে রইল। পর দিন সাধু বড় লোকটীকে সঙ্গে করে গরীবের বাড়ী গিয়ে, আজ তাদের উনুন জ্বল্‌ল না কেন, তাই জিজ্ঞাসা করলেন। সাধুর কাছে তো আর ফাঁকী দেওয়া চলে না—তাই বেচারীকে বাধ্য হয়ে সত্য কথা বল্‌তে হল।

গরীব লোকটী বলল, "এতদিন পর্য্যন্ত

সারাদিন খেটে-খুটে দু'চার আনা যা পেতাম, তাই দিয়ে বাজার থেকে চাল-ডাল কিনে রান্না-বান্না করে স্বামী-স্ত্রীতে খেতাম। কিন্তু কাল উনুন ধরাবার আগে একটা ছোট থলেতে নিরানব্বইটা টাকা পেলাম। টাকাগুলো দেখে মনে হল যে আর এক টাকা হ'লেই তো এক শ' টাকা পূরত। তাই টাকাটা পূরা-বার জন্য হিসাব করে দেখলাম, আমরা যদি একদিন অন্তর একদিন উপোস দিই, তা হলে যে কয়েক আনা বাঁচবে, তাতে সপ্তাহখানেকের মধ্যে গোটা টাকাটা পূরতে পারে। তাহলেই আমাদের এক শ' টাকা হয়। তাই আজ আমরা উপোস করে আছি।"

বড় মানুষের কৃপণ স্বভাবের মূল ইতি-হাসটাও এই। যতই তারা পায়, ততই তারা গরীব হয়। যদি নিরানব্বই টাকা পায়, তবে তাকে চায় এক শ' করতে, তেমনি নিরানব্বই হাজার পেলেও তাকে চায় এক লাখ করতে।

কাটারী শাণানো

বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন তাঁর আত্মচরিতে ছেলেবেলার একটা গল্প লিখে গিয়েছেন। ছোটবেলায় তিনি ফিলাডেলফিয়ার এক ইস্কুলে পড়তেন। একদিন ইস্কুলে যাবার পথে দেখ-লেন, এক কামারশালে কামার কাজ করছে। আজকালকার দিনে যন্ত্র-পাতির যেমন উন্নতি হয়েছে, তখনকার দিনে অবশ্য তেমন কিছুই ছিল না। কামার লোহা পিটাচ্ছে, আর বেঞ্জামিন—ছেলেপিলের যেমন স্বভাব—কাছে দাঁড়িয়ে তাই দেখছেন। ছেলেরা সামনে যা দেখতে পায়, তাতেই একেবারে মজে যায়। বেঞ্জামিনের বগলে পুঁথির তাড়া, এখনি ইস্কুলে যেতে হবে, কিন্তু কামারের কাজ দেখতে তিনি এমনি মজে গিয়েছেন যে আর ইস্কুলে যাওয়ার কথা তাঁর মনে নাই।

কামার ছেলেটীর আগ্রহ লক্ষ্য করল। সে তখন কতকগুলি ছুরীকাটারী শাণ দেবে। তার সঙ্গী কি একটা কাজে চলে গিয়েছে, সে তাই একা। ছেলেটী উৎসুক হয়ে কাজ দেখছে দেখে কামার তাকে ডাকল। বেঞ্জা-মিন কাছে গেলে কামার বলল, "আহা, কি লক্ষ্মী ছেলে, সোণা ছেলে—তোমার কি বুদ্ধি-মানের মত চোখ মুখ!" শুনে তো বেঞ্জামিন একেবারে গলে গেলেন। তাঁর মুখে হাসি ফুটে উঠেছে দেখে কামার বলল, "এসো না লক্ষ্মীটী আমার, শাণটা একটু ঘুরাবে—এসো তো।"

বেঞ্জামিন তখনই কাজে লেগে গেলেন। ছেলেরা সাধারণতঃ কাজ কর্ম্ম করতে ভাল বাসে—যাতে শরীরের পেশীর পরিচালনা হয়, এমন কাজ তারা আগ্রহের সঙ্গেই করে। যদি তাদের মেজাজ বুঝে চালাতে পার, তবে তাদের পৃথিবীর অপর প্রান্তে পাঠালেও তারা যাবে। বেঞ্জামিন যতক্ষণ শাণ ঘোরাচ্ছিলেন, ততক্ষণ কামার তাঁকে নানা কথা বলে ভুলিয়ে ভালিয়ে রাখছিল। ছেলে তো কামারের বচনে ভুলে গিয়ে একমনে কাজ করছে। এদিকে অনেকগুলি ছুরী কাটারীতে শাণ দেওয়া হয়ে গিয়েছে। ততক্ষণে বেঞ্জামিন ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন, আর অমনি তাঁর ইস্কুলের কথা মনে পড়ে গেছে। যাঃ, পড়া দেবার ঘণ্টা তো পার হয়ে গেল—বেঞ্জামিন তাড়া-তাড়ি দোকান থেকে ছুটে যেতে চাইলেন। কিন্তু কামার তাঁকে ছাড়বে না—সে তাঁর মন ভুগিয়ে বিনিয়ে বিনিয়ে বলতে লাগল, "আহা লক্ষ্মীটী, অমন তাড়াতাড়ি করো না। তুমি কি ইস্কুলে কখনো মার খেতে পার, তুমি

এমন ভাল ছেলে—তোমার কত বুদ্ধি! অপর ছেলের যা করতে লাগে তিন ঘণ্টা, তুমি একঘণ্টায় তা সেরে ফেলতে পার, কেমন? হাঁ, আমি জানি, মাষ্টার তোমার গায়ে কখনো হাত তোলে না—তুমি এত ভাল ছেলে।"

তার পর একটি একটি করে কাটারী শাণ দেওয়া চলল—আর একটা আবা শাণ দিতেই বেঞ্জামিন আবার চলে যেতে চাইলেন, কিন্তু পারলেন না। দশটার সময় পড়া আরম্ভ হয়ে গিয়েছে—আর বারটার সময় তিনি ছাড়া পেলেন। তারপর ইস্কুলে যেতেই দেরী করে আসার দরুণ তাঁকে বেত খেতে হল। এত ক্ষণ ধরে কাজ করে তিনি ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন—হাতে ব্যথা ধরে গিয়েছে—তার দরুণ তাঁকে সপ্তাহখানেক ভুগতে হল। এদিকে পড়া-শুনারও ক্ষতি হতে লাগল।

এর পর হতে ফ্রাঙ্কলিনকে কেউ খোসামুদে কথা বললেই তিনি ভাবতেন, "ওহো, লোকটা বুঝি কাটারীতে শাণ দেওয়াতে চায়।" জন্মে আর তিনি কখনও কারু তোষামোদে ভুলেননি।

রাজা ও সন্ন্যাসী

এক সন্ন্যাসীর কয়েকটা পয়সা জমেছিল, তিনি তা ছেলেদের বিলিয়ে দেবেন ভাবলেন। গরীব দুঃখী আরো অনেকে এলো পয়সা চাইতে, কিন্তু সন্ন্যাসী তাদের কাউকে দিলেন না। এমন সময় হাতীতে চড়ে এক রাজা এসে সেখানে উপস্থিত। হাওদার ওপর রাজা যেখানে বসে ছিলেন, সন্ন্যাসী পয়সা কয়টা সেখানে ছুঁড়ে দিলেন। সন্ন্যাসীর ব্যবহারে রাজা আশ্চর্য্য হয়ে গেলেন। সাধু বললেন "মহারাজ, পয়সা কয়টা তোমাকে দিলাম, কেননা তুমিই সবচেয়ে গরীব।" রাজা জিজ্ঞাসা করলেন, "আমি গরীব হলাম কি করে?" সাধু উত্তর করলেন, "তুমিই তো সব চেয়ে গরীব, কেননা তোমার এত আছে, তবুও তুমি ধনের তৃষ্ণায় রাজ্যের তৃষ্ণায় ছাতি ফেটে মরছ। কাজেই তোমার মত গরীব আর কে?"

বিষয়ীর সঞ্চয়

এক বড় মানুষ সিন্দুকে টাকা পুরছে। এক সাধু তার বাড়ীর সামনে দিয়ে যাচ্ছেন, শুনে বড় মানুষ তাকে ডাকাল। সাধু গিয়ে দেখেন, বড় মানুষটী সিন্দুকে টাকা বোঝাই করছে: দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, "এ করছ কেন?" বড় মানুষ বলল, "মহারাজ, আপনার ভাবনা কি? দশজনে আপনাকে খেতে পরতে দিচ্ছে; তারা যদি কিছু না-ও দেয়, তবুও আপনি দেহটার জন্য একটুও কেয়ার করেন না। কিন্তু আমাদের কথা আলাদা। অসময়ে লাগতে পারে, এই ভেবে আমাদের কিছু টাকা-কড়ি তো হাতে রাখতে হয়।" সাধু শুনে কিছু বললেন না।

পরদিন বড় মানুষটী সাধুর পচা-পাতার কুটীরে গিয়েছে তাঁকে দর্শন করতে। কুটীরে গিয়ে দেখে, সাধু বহু কষ্টে প্রকাণ্ড একটা গর্ত্ত খুঁড়েছেন, আর তাতে রাজ্যের যত নুড়ি আর পাথর কুড়িয়ে এনে গর্ত্ত বোঝাই করছেন। এমনি করে সারাদিনের পরিশ্রমে এক স্তূপ পাথর জমা হয়েছে। বড় মানুষটী দেখে বলল, "মহারাজ, এ কি করছেন?" সাধু বললেন, "দেখছ-ই তো বাবা, নুড়ি জমাচ্ছি—কেমন সুন্দর গোলগাল, চমৎকার, —নয় কি?" বড় মানুষ হেসে বলল, "তা এত কষ্ট করে এগুলো জমাচ্ছেনই বা কেন? এই তো পাথরের এক পাহাড় পড়ে রয়েছে আপনার সামনে! এগুলি জমিয়ে আর কি হবে?"

সাধু উত্তর করলেন, "বাবা, ঠেকার দিনে কাজে লাগবে, তাই কুড়িয়ে রাখছি। কোন্ দিন কাজ পড়ে, তা তো বলা যায় না। এর মাঝে হয়ত পৃথিবীর বুক হতে পাহাড়টা বেমালুম উড়েও যেতে পারে। তাই আগে থেকে কিছু নুড়ি জমিয়ে রাখছি।" বড় মানুষ বল্ল, "সে কি করে হবে মহারাজ? পাহাড় আবার বেমালুম উড়ে যাবে কোথায়?" সন্ন্যাসী তখন রুখে উঠে' বড় মানুষকে বললেন, "আরে মূর্খ, তুই ই তো আমাকে এই শিক্ষা দিয়েছিস!—ভগবান তোমার খাবারটা জোটাবেন না, এমন দিন কখনও আসবে না। তবে আর সোণা রূপা জমিয়ে তামার অমূল্য সময় আর শক্তির অপব্যয় করা কেন? আমার কাছ থেকে এই শিক্ষা গ্রহণ কর। জীবনটা এমনি অপকর্ম্মে খুইয়ে দেবার জন্য নয়—এটা কৃপণতার ঠাঁই নয়। এমন তুচ্ছ, নোংরা বিষয়ের চর্চ্চা করে জীবনের অপব্যয় করছ কেন?"

বেদান্তীর প্রেম

দরজায় একটা আঘাত শুনতে পেলাম—বেশ জোরেই শব্দটা হল। আমি ডেকে জিজ্ঞাসা করলাম, "কে গো তুমি?"

এই বলে অবাক্ হয়ে প্রতীক্ষা করছি—কেন যেন প্রাণমন এলিয়ে পড়েছে, এমন সময় প্রেম এসে চুপি চুপি আমার কাণে বলল, "ওগো, এ যে তুমিই তোমার দুয়ারে কর হেনেছ, তা কি জাননা বন্ধু?"

তবে বন্ধু আমার, তুমি এসেছ?—এসো, আরও কাছে এসো! হাসিতে, দিঠিতে, নৃত্যে, গীতে আমি তার অভ্যর্থনা করলাম—বেদনাভরা দীর্ঘনিঃশ্বাসে পায়ে লুটিয়ে পড়লাম—

কিন্তু বন্ধু আমার নির্ব্বাক্!

—করুণ মিনতিতে আপনাকে বিলিয়ে দিলাম তার পায়, সে একবার ফিরেও তাকাল না—নিঃশব্দে সে চলে যায়!

"ওগো, অমন করে আমায় যাতনা দিও না তুমি, একটু দাঁড়াও—যেও না বন্ধু—"

ধীরে ধীরে সে বলল, "না—আমি যাই।"

মিনতিভরা ব্যাকুল স্বরে বললাম, "এসো প্রভু, একটীবার দাসীর কাছে বসো।"

সে বলল, "আমার কাছে বসবে তুমি? তবে তোমার কাছেই তুমি বসো।"

"একবার আমার সঙ্গে ভাল করে দুটা কথা কও।"

"তা হলে বাক্যহীন স্তব্ধতায় নিজকে ডুবিয়ে দাও।"

"ওগো বন্ধু, আর কিছু চাই না তোমার কাছে, শুধু নিবিড় আলিঙ্গনে তোমায় বেঁধে একটী সোহাগভরা চুম্বন দিব—"

"তোমাকে জড়িয়ে ধরে তুমি চুমো খাবে? তুমি আর আমি যে এক—তা ভুলে যাও কেন বন্ধু? আমার এই দেবকান্তি তো তোমার কান্তিরই প্রতিচ্ছায়া—তুমিই তো সৌন্দর্য্যের আদি নির্ঝর—তুমি কেন তোমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছ? তোমাকে জড়িয়ে রয়েছি আমি—আর আমাকে তুমি ছেড়ে যেতে চাও? কেন যেতে চাও বন্ধু, কেন অমন করে আমায় উপেক্ষা কর?"

তখন বুঝতে পারলাম, কি মধুর প্রেমে বাঁধা পড়েছি। যা দেখছি, যা শুনছি, তার মাঝে তো আমার সেই! বসন্তের মদির বাতাস আমার প্রিয়া—শ্রাবণের ধারায় আমারই করুণা! বৃক্ষপত্রের মর্ম্মরে আমার কাছে প্রেমনিবেদন—গোলাপের রাঙা ঠোঁটে আমার জন্য স্নেহভরা চুম্বন—আকাশের উদার নীলিমায় আমার অভ্যর্থনা—শ্যামল তৃণপল্লবে আমার আবাহন! *

* স্বামী রামতীর্থ

যোগসূত্রবৃত্তি

কৈবল্যপাদ

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, বহুজন্ম ব্যবধান থাকিলেও যথাযোগ্য বাসনা-সমূহ অব্যবহিতের ন্যায় উদিত হয় বলিয়া তাহাদের মধ্যে কার্য্যকারণ ভাব কল্পনা করা যাইতে পারে। আবার এ কথাও বলা হইয়াছে যে, প্রথমতঃ অনুভব ব্যতিরেকে বাসনার উৎপত্তি হইতে পারে না। তাহা হইলে প্রশ্ন হইতে পারে, অনুভব হইতে বাসনা, আবার বাসনা হইতে অনুভব —এইরূপে যে চক্র প্রবর্ত্তিত হইতেছে, তাহার আদি কোথায়? প্রথম যে অনুভব প্রবর্ত্তিত হয়, তাহা কি নিমিত্তশূন্য অথবা পূর্ব্বতন কোনও বাসনা তাহার নিমিত্ত?

তদুত্তরে সূত্রকার বলিতেছেন, বাসনা সমূহ অনাদি, কেননা জীবের আশিষ নিত্য। আশিষ কি?—মহামোহদ্বারা অভিভূত হইয়া জীব সর্ব্বদাই সঙ্কল্প করিয়া থাকে, "সুখের সাধনসমূহ যেন সর্ব্বদাই আমার করতলগত থাকে, ইহাদিগ হইতে যেন আমাকে কখনও বঞ্চিত হইতে না হয়।" এই প্রকার সঙ্কল্পই বাসনাসমূহের কারণ। জীবহৃদয়ে ইহা নিত্য বর্ত্তমান। আশিষ হইল মূল কারণ এবং অনুভব ও সংস্কার হইল তদুৎপন্ন কার্য্যপরম্পরা। কারণ যদি নিয়ত উপস্থিত থাকে, তবে কার্য্যকে কে ঠেকাইয়া রাখিতে পারে? চিত্ত কখনও সঙ্কুচিত কখনও বিকশিত হইতেছে; অনুভব, সংস্কার প্রভৃতি বৃত্তিদ্বারা উহা সর্ব্বদাই অনুবিদ্ধ। চিত্তবৃত্তির অভিব্যঞ্জক যে কারণ, যখন পরিপাক প্রাপ্ত হইতেছে, তাহার প্রেরণাতে চিত্তও তদনুকূল বৃত্তিরূপ ফলে পরিণত হইতেছে। সুখাকাঙ্ক্ষারূপ রাগ নিত্য বলিয়া এই পরম্পরারও নিবৃত্তি নাই। (১০)

তাহা হইলে একটা আশঙ্কা জন্মে। বাসনা যদি অনন্ত হয়, তাহা হইলে হান কি করিয়া সম্ভব হইবে?—বাসনা বলিতে তাহার হেতু, ফল, আশ্রয় ও আলম্বনকে গ্রহণ করিতে হইবে। অব্যবহিত অনুভব বাসনার সাক্ষাৎ হেতু, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। আবার সেই অনুভবের হেতু হইল রাগ প্রভৃতি। (২।৭, ৪।১০ সূত্র দ্রষ্টব্য)। রাগ প্রভৃতির হেতু অবিদ্যা (২।৪)। বাসনার ফল শরীর ও স্মৃতি (৪.৮)। বুদ্ধিসত্ত্বই বাসনার আশ্রয়। অনুভবের যাহা আলম্বন, তাহা বাসনারও আলম্বন—আলম্বন বহু প্রকারের হইতে পারে। যদি জ্ঞান ও যোগ দ্বারা বাসনার মূল হেতু অবিদ্যা দূরীভূত হইয়া যায়, তাহা হইলে তাহার ফল, আশ্রয় ও আলম্বনও আর কার্য্যকরী হয় না। যেমন বীজ দগ্ধ হইলে তাহার আকৃতি পূর্ব্ববৎ থাকিলেও আর তাহা হইতে অঙ্কুরোৎপত্তি হয় না, সেইরূপ জ্ঞান ও যোগ দ্বারা চিত্ত নির্ম্মল হইলে বাসনাও আর অঙ্কুর উৎপন্ন করে না। সুতরাং হানের পক্ষে কোনও বাধা থাকে না। (১১)

আর একটী প্রশ্ন হইতে পারে। চিত্তের সঙ্কোচ বিকাশরূপ ধর্ম্মের তারতম্য দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং সিদ্ধান্ত করিতে হইবে, চিত্ত প্রতিক্ষণেই নশ্বর। আবার তদাশ্রিত বাসনা ও তাহার ফলের মধ্যেও নিশ্চয়ই কার্য্যকারণভাব বর্ত্তমান; সুতরাং তাহারাও যুগপৎ অবস্থান করিতে পারে না, কাজেই তাহাদের মধ্যেও ভেদ আছে। যদি তাহাই হয়, তবে চিত্তের একত্ব প্রতীতি কি করিয়া হইতে পারে? চিত্ত এক না হইলে সাধন ফলই বা প্রবর্ত্তিত হইবে কি করিয়া?

ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে, কালিক অভাব হইতেই আত্যন্তিক অভাব অনুমান করা নিরাপদ নহে। যে ভাব অত্যন্ত অসৎ, তাহার উৎপত্তি সম্ভব নহে, কেননা অসতের সহিত সতের সম্বন্ধ থাকা অসম্ভব। শশক-শৃঙ্গ অসৎ পদার্থ, সুতরাং তাহার সত্ব-সম্বন্ধ কখনও সম্ভব নহে। কার্য্য যদি নিরুপাখ্য, হয়, অর্থাৎ প্রমাণমাত্রের অবিষয় হয়, তবে কাহাকে উদ্দেশ করিয়া কারণ প্রবর্ত্তিত হইবে? একটা বিষয় অন্ততঃ আলোচনা না করিয়া তো কেহ কার্য্যে প্রবৃত্ত হয় না।

আবার যাহা সৎ, তাহারও কখনও অভাব হইতে পারে না—কেননা তাহাতে সদসতের বিরোধ উপস্থিত হয়। যাহা স্বরূপতঃ সত্তাবান্, তাহা কখনও নিরুপাখ্য বা অভাবগ্রস্ত হইতে পারে না, কেননা সৎ কখনও স্ববিরোধী অসৎরূপ গ্রহণ করিতে পারে না। সুতরাং সতের যখন কখনও অভাব সম্ভব নয়, কিম্বা অসতেরও সদ্ভাব সম্ভব নয়, তখন বাহ্যদৃষ্টিতে ধর্ম্মসমূহের বিনাশ দেখিলেও স্বীকার করিতে হইবে, তদাশ্রয়ী ধর্ম্মী সর্ব্বদাই এক রূপে অবস্থান করিতেছে। ধর্ম্ম সমূহ বহু হইতে পারে, ত্রিকালগামী হইতে পারে—তাহাদের পৃথক পৃথক পথের ব্যবস্থা থাকিতে পারে, কিন্তু তাহারা কখনও স্বরূপ হইতে বিচ্যুত হইবে না। উহারা অতীত ও ভবিষ্যৎ কক্ষায় অবস্থান করিবার সময় পুরুষের ভোগ্য হয় না, কেবল বর্ত্তমান কক্ষায় প্রবিষ্ট হইয়াই ভোগ্য হইয়া থাকে বটে—কিন্তু তা বলিয়া অতীত ও অনাগত অবস্থায় তাহাদের স্বরূপহানি ঘটে না। তাহারা থাকে, কিন্তু অনভিব্যক্ত অবস্থায় থাকে। ধর্ম্ম সমূহের এই অতীত ও অনাগত কক্ষায় অবস্থান হইতেই তাহাদের কার্য্য-কারণরূপ ভেদ কল্পিত হইয়া থাকে। বাসনা ধর্ম্ম, চিত্ত ধর্ম্মী; সুতরাং অপবর্গ পর্য্যন্ত এক চিত্তই অনুবৃত্ত বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। (১২)

এই যে ধর্ম্ম ও ধর্ম্মীর কথা বলা হইল, ইহাদিগকে দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়—ব্যক্ত ও সূক্ষ্ম। ইহারা সত্ব, রজঃ ও তমোরূপ গুণসমূহের স্বভাব অর্থাৎ পরিণাম। বাহ্য ও আভ্যন্তর যত প্রকার ভাব দেখা যায়, যথাক্রমে সুখ, দুঃখ ও মোহরূপে সত্ব, রজঃ ও তমোগুণের সহিত তাহাদের অন্বয় দেখা যায়। যে যাহার সহিত অন্বিত, সে নিশ্চয়ই তাহার বিকার। ঘট, শরাব প্রভৃতি মৃত্তিকার সহিত অন্বিত—অতএব তাহারা মৃত্তিকারই পরিণাম। ভাব-সমূহ গুণের সহিত অন্বিত, অতএব তাহারা গুণেরই পরিণাম। (১৩)

কিন্তু একটা কথা আছে। তিনটী গুণকে যদি সকলেরই মূল কারণ বলিয়া স্বীকার করিয়া লওয়া যায়, তবে ধর্ম্মীকে এক বলা যায় কি করিয়া?—যদিও গুণ তিনটা, তথাপি তাহারা অঙ্গাঙ্গিভাবে অবস্থান করিয়া থাকে। অর্থাৎ কখনও হয়ত সত্ব অঙ্গী বা স্ফুটতররূপে

অভিব্যক্ত। রজস্তমঃ যে তখন নাই, এমন কথা নহে—কিন্তু তাহারা তখন সত্ত্বের অঙ্গীভূত। এইরূপে কখনও রজঃ অঙ্গী, কখনও বা তমঃ অঙ্গী। ইহাদের মাঝে অঙ্গাঙ্গিভাব থাকাতে প্রমাণ হয় যে, ইহাদের পরিণাম একরূপ—অর্থাৎ পরিণামকালে ইহাদিগকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখিবার উপায় নাই। যদি তাহাই হয়, তবে ইহাদের সহিত অন্বিত বস্তুর তত্ত্বও একই হইবে। (১৪)

বস্তুতত্ত্ব এক কিম্বা বহু, তাহা লইয়া আপত্তি উপস্থিত হইতে পারে। বিজ্ঞানবাদী বলিবেন, বিজ্ঞান ছাড়া কোনও বস্তুর যদি সত্তা সম্ভব হয়, তবেই না বস্তু এক কি বহু এই তর্ক চলিতে পারে। কিন্তু আমরা বলি, এক বিজ্ঞানই বাসনাবশতঃ কার্য্য-কারণভাব আশ্রয় করিয়া বস্তুরূপে প্রতিভাত হয়। সুতরাং বস্তুসত্তাই যদি না থাকে, তবে তাহার একত্ব কি অনেকত্ব কিছুই সিদ্ধ হয় না।

এই আশঙ্কার উত্তরে সূত্রকার বলিতেছেন—একই বস্তুতে যখন বিভিন্ন চিত্তের বিভিন্ন বিভাব দেখা যায়, তখন বিজ্ঞান ও বিষয়ের পথ যে পৃথক, অর্থাৎ তাহারা যে বিভিন্ন ইহাই স্বীকার করিতে হয়। স্ত্রী প্রভৃতি একই বিষয় বিভিন্ন প্রমাতার সুখ, দুঃখ, মোহ রূপে ভিন্ন হইতে দেখা যায়। যেমন একটী রূপলাবণ্যবতী স্ত্রীলোক সম্মুখে রহিয়াছে তাহাকে দেখিয়া যে তাঁহাকে ভালবাসে তাহার মনে সুখ হইবে, তাহার সপত্নীর দ্বেষ হইবে, এবং সন্ন্যাসীর চিত্তে ঘৃণা উপস্থিত হইবে। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, একই বস্তুর সংস্পর্শে বিভিন্ন চিত্তের উদয় হইয়া থাকে। সুতরাং বস্তুকে চিত্তের কার্য্য বা বিজ্ঞানস্বরূপ কিরূপে বলা যাইতে পারে? কোনও বস্তু যদি একটি চিত্তের কার্য্য হইত, তবে তাহা সর্ব্বদা একরূপেই প্রতিভাত হইত।

আবার বস্তু চিত্তের কার্য্য হইলে, যে বস্তু যে চিত্তের কার্য্য, সেই চিত্ত যখন অন্য কোন বস্তুতে ব্যাপৃত থাকিবে, তখন আর প্রথমোক্ত বস্তুর কোনও সত্তা থাকিবে না। বিজ্ঞানবাদী এই আপত্তি মানিয়াও লইতে পারেন না, কেননা তাহা হইলে একই বস্তু কি করিয়া অপর বহু প্রমাতার উপলব্ধির বিষয় হইতে পারে? অথচ এইরূপ ব্যাপার আমরা নিত্য প্রত্যক্ষ করিতেছি। কাজেই সিদ্ধান্ত হয়, বস্তু চিত্ত-কার্য্য নহে।

বিজ্ঞানবাদী বলিতে পারেন, একটী বস্তু যুগপৎ বহু চিত্ত দ্বারাও নির্মিত হইতে পারে; তাহা হইলে যে বস্তুটী বহু চিত্ত দ্বারা নির্মিত, তাহা সেই বহু চিত্তেরই অন্তর্গত যে কোনও চিত্ত দ্বারা নির্মিত বস্তু হইতে নিশ্চয়ই ভিন্ন লক্ষণাক্রান্ত। তাহা হইলে একই বস্তুতে স্বতঃ ভেদ উপস্থিত হয়। যদি তাহা বিজ্ঞানবাদীর অভিপ্রেত না হয়, তাহা হইলে তাঁহার ব্যবস্থা অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইলে স্বীকার করিতে হইবে যে (বহুচিত্তরূপ) কারণের ভেদ থাকা সত্ত্বেও কার্য্যের ভেদ হইতেছে না। জগৎ জোড়া যদি এই ব্যাপার চলিতে থাকে, তাহা হইলে হয় সমস্ত জগৎ একাকার হইয়া যাইবে, নতুবা নির্হেতুক হইবে। অর্থাৎ কারণ ভিন্ন ভিন্ন হওয়া সত্ত্বে যদি কার্য্য আত্যন্তিকরূপে অভিন্ন হয়, তবে নানা কারণ হইতে উৎপন্ন জগৎও একরূপ হইবে। অথবা কার্য্য জগৎ কারণের ভেদ সমূহের অনুবর্ত্তী হইবে না বলিয়া তাহা অকারণেই উৎপন্ন বলিয়া স্বীকৃত হইবে। কিন্তু এই দুইটার একটাও নিশ্চয়ই বিজ্ঞানবাদীর অভিপ্রেত নহে।

তবে এইরূপ আপত্তিতে বিজ্ঞানবাদী

পালটীয়া প্রশ্ন করিতে পারেন, আমাদের সিদ্ধান্ত যদি অপসিদ্ধান্ত হয়, তাহা হইলে ত্রিগুণাত্মক বস্তু একই প্রমাতার সুখ-দুঃখ-মোহ-রূপ জ্ঞান উৎপন্ন করে কি করিয়া? অর্থাৎ যোগী সমস্ত ভাবকেই ত্রিগুণাত্মক বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন এবং প্রমাতা যে এক ইহাও স্বীকার করিবেন। তবে ত্রিগুণাত্মক বস্তু হইতে একের জ্ঞান যদি উৎপন্ন হয়, নখত কারণভেদ সত্বে কার্য্যের অভেদ যোগীর বেলাতেও হয় নাকি?

যোগী ইহার উত্তরে বলিতেছেন, বিষয়কে যেরূপ ত্রিগুণাত্মক বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে, চিত্তকেও তো সেই রূপ ত্রিগুণাত্মক বলা হইয়াছে। যখন বিষয়জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তখন ধর্ম্মাদি তাহার সহকারি কারণরূপে বর্ত্তমান থাকে। ধর্ম্মাদির উদ্ভব ও অভিভব বশতঃই চিত্তের বিভিন্ন রূপে অভিব্যক্তি হইয়া থাকে। যেমন একটী স্ত্রীলোক রহিয়াছে। কামুক যদি তাহাকে দেখে, তবে সত্ত্বগুণের প্রাধান্যবশতঃ ধর্ম্মসহায়ে তাহার চিত্তের যে পরিণাম হইবে, তাহা সুখময় হইবে অর্থাৎ স্ত্রীলোককে দেখিয়া কামুকের যে সুখ হইবে ইহা-চিত্তের সত্ত্বগুণের কার্য্য এবং ধর্ম্ম-রূপ অনুকূল ব্যাপার দ্বারা তাহা উদ্‌বুদ্ধ। এইরূপে উক্ত স্ত্রীলোকের সপত্নীর অধর্ম্মসহকৃত চিত্তে রজোগুণের প্রাবল্যবশতঃ দুঃখময় পরিণাম ঘটিবে। সপত্নী যদি কোপনা হয়, তবে তার অধর্ম্ম সহকৃত চিত্ত তমোগুণের প্রাবল্য বশতঃ মোহময় পরিণাম লাভ করিবে। ইহা হইতেই প্রমাণ হয়, বিজ্ঞান ছাড়াও বাহ্য বিষয় রহিয়াছে। সুতরাং বিজ্ঞান ও বাহ্য বিষয়ের তাদাত্ম্য হইতে পারে না, তাহাদের বিরোধ হেতু কার্য্যকারণ ভাবও হইতে পারে না। (১৫)

কৃপা

দেখ্‌ছি, সব কৃপার জোরেই হচ্ছে। যেটাকে মনে করেছিলাম আমার কৃতিত্ব, তার কথাও ভাব্‌তে গিয়ে দেখি, কই আমার বাহাদুরী এর মাঝে কোথায়? এই যে বিচিত্র ভাব, বিচিত্র শক্তি, এর কোনটাকে আমি চিনতাম—জেনে শুনে আমার মনের অন্দর হতে এর কোনটাকে বাইরে এনেছি?

কত দিন পার হয়ে গিয়েছে, এত আকুল প্রার্থনা সত্ত্বেও উষর হৃদয়ে এক ফোঁটা বর্ষণ হয়নি। ভেবেছি, জীবন বুঝি বৃথাই গেল। কিন্তু তার পরেই আচম্‌কা এক দিন কোন্ অজানা দেশ হতে ভাবের প্লাবন এসে সব একাকার করে দিয়েছে। আমি জানি-ও না, চিনি-ও না—অথচ যখন এসেছে, তখন বুঝেছি, আমার প্রাণ তো একেই চেয়েছিল। একে কৃপা বলব না তো কি?

তা হলে কি কোন চেষ্টা-চরিত্র করব না? কৃপার ভরসাতেই বসে থাক্‌ব? আরে পাগল, কৃপার মর্ম্ম যে বুঝেছে, সে কি অমন তর্ক ফেঁদে বসে? চিরদিন যে পাটওয়ারী বুদ্ধি

নিয়ে সংসার করে এসেছ, সেই বুদ্ধি দিয়ে রসিকের মন বুঝতে চাও ? কই, সবাই তো চেষ্টা করছে না ; ঝুড়ি ঝুড়ি উপদেশ শুনেও তার একটা পালন করতেও তো কেউ এগুচ্ছে না। আজকে হঠাৎ তোমার মাঝেই বা চেষ্টা জাগল কেন ?—চেষ্টার ফল পাও না পাও, সে পরের কথা ; কিন্তু বলি, চেষ্টাই বা জাগল কেন ? এ-ও কি কৃপা নয় ?

কৃপা তো আর নূতন একটা কিছু নয়। সেটা এই জগতেরই অন্তরের রূপ—তোমারই মর্ম্মের রূপ। রসিক পুরুষের সঙ্গে রসের সম্পর্ক একটা অনাদিকাল ধরেই পাতানো রয়েছে—সেটা তুমি জান না। যেদিন তার একটু আভাস পাও, সে দিন যেন এই জগৎ-টারই রূপ বদলে যায়। তোমার চলা আর তখন নিজের জোরে চলা নয় ; চল্‌ছ—না কিসে যেন তোমায় টানছে—না চলে তুমি পারছ না—অথচ কোথায় চল্‌ছ, কেমন করে চল্‌ছ, তাও কিন্তু জান না। মাতাল যেমন চল্‌ছে—নেশায় বিভোর হয়ে, তেমনি চলা এই জগতে। ব্যবহারের জগতে যেটাকে তুমি বল্‌ছ হুঁস্ হয়ে চলা—সেটাও ওই মাতালের হুঁস হওয়ার মত। টল্‌তে টল্‌তেও এক আধবার তার মনে হয়, সে বুঝি সোজা হয়েই চল্‌ছে, কিন্তু পাশে যে দাঁড়িয়ে আছে, সে ভুলটা বুঝ্‌তে পারে।

অমনি আবেশে চলার মাঝে যে মধু, সে যে না আস্বাদন করেছে, তাকে বোঝান যায় কি করে ? তার যে দৃষ্টিই উল্‌টো। যে না দেখবে, তাকে দেখাবে কি করে ? আবেশেই তো সব চলছে জগতে—অণু-পরমাণু হতে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড পর্য্যন্ত আবিষ্ট হয়েই চল্‌ছে। ওপর-চালাক যারা, তারাই ভাবে জেগে আছি—অর্থাৎ কিনা সেটা তাদের নেশার ওপর আর এক পোঁছ নেশা। তার চেয়ে একবার নেশা করাটাই ভাল—নেশা কাটাবার জন্য নেশা করে বিপদ বাড়ানো কেন।

তিনি আবিষ্ট করে রেখেছেন, আর আমরা আবিষ্ট হয়ে চল্‌ছি—এইটুকু বুঝতে পারাই কৃপালাভ। নিজের দায় থেকে তখন ছুটী অথচ তাতে কি কাজের বিরাম হল ? কিছু মাত্র না। জগৎ যেমন ছিল, তেমনই থাকুল, শুধু আমার চোখ থেকে একটা আবরণ খসে গেল, আগে দেখতাম শুধু চলার ভঙ্গী, এখন যে চালায় তাকেও একটু আধটু দেখছি। যতই দেখ ছি, ততই চিত্ত নির্ভর হচ্ছে, বিশ্বাস দৃঢ় হচ্ছে, আনন্দে প্রাণ পুরে উঠছে—আর তাতে চেষ্টার আরও জোর হচ্ছে ? জোর হচ্ছে কি আমার শক্তিতে ? আমার শক্তি আবার কোথায় ? শক্তি তো তাঁরই। তাঁরই শক্তির ফোয়ারামুখে এক খানা আমিত্বের পাথর চাপা ছিল। তাঁরই ইচ্ছায় আজ সেখানা সরে গিয়েছে—আর অমনি প্রচণ্ড বেগে ফোয়ারার জল উথলে উঠেছে। তার জন্যই তো চেষ্টার এত জোর। কৃপাতেই তো চেষ্টা সার্থক হল, শক্তিশালী হল।

এমনি করে ক্রমে "আমি" লোপ হয়ে যাবে। আমার তো থাকার কথা ছিল না। যিনি থাকবার, তিনিই রয়েছেন, তিনিই থাকবেন—মাঝখানে শুধু একটা আমির স্বপ্ন জেগে উঠেছিল। সেটা কেটে গেল—রইলেন শুধু তিনি—অথবা ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে বললে রইলাম শুধু আমি। সে একই কথা—সোহহং। এ স্পর্দ্ধা নয়, পাটোয়ারী বুদ্ধির কথা নয়—একেবারে মর্ম্মেরও মর্ম্মকথা—অতি সত্য কথা। কৃপাদৃষ্টিতে দৃষ্টি না খুললে এ সত্য তো বুঝবার যো নাই।

---*---

শ্রীশ্রীরূপ-সনাতন

(শ্রীমন্মহাপ্রভুসূত্রিত অভিধেয়সাধনভক্তিতত্ত্ব)

ভক্ত-সঙ্গ

সরিষার মত ছোট একটী বটের বীজ—কিন্তু তার মাঝে ওই প্রকাণ্ড বটগাছটা লুকাইয়া রহিয়াছে। বীজটী দেখিয়া তাহা অসম্ভব বলিয়া মনে হয়, কিন্তু সেই বীজই মাটিতে পুঁতিয়া জলসেচন করিলে কালে অঙ্কুর হয়, অঙ্কুর হইতে কালে প্রকাণ্ড গাছ হয়। আবার যে জাতের বীজ, সেই জাতেরই গাছ হইবে—বটের বীজ হইতে আমগাছ তো জন্মিবে না।

ভক্তির সাধনা যাঁহারা করেন, তাঁহাদের মাঝেও ভক্তির বীজ লুকাইয়া রহিয়াছে—সাধনবারি সিঁচিয়া কেবল তাহাকে অঙ্কুরিত করা। একবার অঙ্কুরোদ্গম হইলে বৃক্ষোৎপত্তি কে রোধ করিবে? ওই এতটুকু অঙ্কুর, আর এই এতবড় গাছ—সত্যদৃষ্টিতে দু'য়ের মাঝে তফাৎ কিছুই নাই—যা কিছু প্রভেদ অভিব্যক্তি লইয়া। যাহারা অল্পদৃষ্টি, তাহারা আকার দেখিয়া বিচার করে, শক্তি দেখিয়া নয়। তাই বীজ আর গাছের মধ্যে আকার দিয়া তাহারা ছোট-বড়র ভেদ করে, কিন্তু সিদ্ধ-দৃষ্টিতে আকার তো প্রকাশক নয়, আকার যে আবরক—শক্তিই যে সত্য রূপ।

এই হিসাবে, নিত্যসিদ্ধ ভক্তিকেও আমরা সাধ্য বলিয়া কল্পনা করি, তাই ভক্তির সাধনার কথা উঠে। বহিরঙ্গ দৃষ্টিতে যে একটা ভেদ দেখি, অন্তরঙ্গ দৃষ্টিতে তো তাহা থাকে না। তবে যতক্ষণ দৃষ্টি শুদ্ধ না হইতেছে, ততক্ষণ অভিব্যক্তির ভেদটাও যে থাকিয়া যাইবে, তাহা মানি। কিন্তু ভেদের পিছনে যে অভেদের স্বরাট্‌রূপ লুকাইয়া রহিয়াছে, এ কথা যেন না ভুলিয়া যাই।

আনন্দ আমাদের সমস্ত আকাঙ্ক্ষার চরম, কিন্তু তাহার ফুটিবার ধারা ভিন্ন হইতে পারে। কোন ধারা ভগবান কাহার মাঝে দিয়াছেন, আমরা তাহা কি জানি? সে খবর ভগবানই জানেন, আর জানেন গুরু। যাহার ভিতর যে ধারা রহিয়াছে, তাহাকে তাহারই অনুকূল ভাবটী ধরাইয়া দিতে পারিলে সাধনা সহজ হইয়া যায়। বাস্তবিক সাধনামাত্রই যে সহজ। ফুলের কলি যে ফুল হইয়া ফুটিবে, তার জন্য ভগবান্ আয়োজনের তো ক্রটী করেন নাই; কিন্তু সে আয়োজনের হিসাব করিতেছে তার্কিকে—ফুল কিন্তু আপনার সহজ ভাব লইয়া ফুটিয়া উঠিতেছে।

সব সাধনারই ওই এক কথা। ভক্তির সাধনাতেও তাই। সাধনভক্তি বলিতে তো আয়োজনের বাহুল্যের কোন কথাই মনে পড়ে না—অবশ্য যদি ঠিক ধারাটী ধরিয়া থাকি। আর ধারার কথাই বা আমরা কি জানি? সে তো গুরুই জানেন। চাই তাঁর

কৃপা, আর কৃপা আকর্ষণ করিবার জন্য শরণাগতি। যে বীজ আছে, সাধনে তাহাই ফুটিবে, সহজভাবে আপনাকে কেবল সঁপিয়া দেওয়া চাই।

তবে সাধনপথের কথা আলোচনা করিলে সাধকের আনন্দ বই নিরানন্দের কোনও কারণই হইতে পারে না। এই আলোচনাও সহজভাবেই করিতে হইবে, জিগীষা প্রবৃত্তি লইয়া নয়, অপর পথ বা মত লইয়া কুতর্ক করিবার জন্য নয়।

বৈধীভক্তির কথাই হইতেছিল। তাহার জন্য যে সমস্ত সাধন-সম্পদের প্রয়োজন, তাহাদের কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, এখন কেবল শেষের কথাটাই বাকী। বৈধীভক্তির চরম ও সর্ব্বোৎকৃষ্ট সাধন, ভক্তের সঙ্গ। কেন তাহা বলিতেছি।

ভক্তিপথের বিশেষত্ব এই যে, এটী বিচারের পথ নয়। জীবের মাঝে যেমন সহজ বিষয়াসক্তি রহিয়াছে, ভগবানের প্রতিও সেইরূপ সহজ আকর্ষণ রহিয়াছে—ভক্ত এ কথা জানেন। জানেন বলিয়াই বলেন, ভক্তিই ভগবানের সঙ্গে জীবের সম্বন্ধের আদি, ভক্তিই তাহার অন্ত। জ্ঞানীও জানেন, এ কথার মাঝে বিরুদ্ধবাদ কিছুই নাই—ইহার আভাস পূর্ব্বে দিয়াছি।

এই যে জগৎটা আমরা দেখিতেছি, সাধারণতঃ ইহার প্রতি আমাদের বিচারের ভাব নাই। আমরা যে চলি, ফিরি, সংসার-ধর্ম্ম করি, স্ত্রী-পুত্র-কন্যাকে ভালবাসি—এগুলি কিছু আর বিচার করিয়া করি না। এগুলি ভাল কি মন্দ, সে কথা এখানে তুলিতেছি না—আমাদের বক্তব্য এই, সাধারণ মানুষ নির্ব্বিচারে জগৎটাকে ভিতরে বাহিরে মানিয়া লইয়াই সুখ পায়। কেন পায়, তাহাই আবিষ্কার করিতে গিয়া ভক্ত বলিতেছেন, ভগবান যে আনন্দময়, সেই আনন্দের কণা যে জীবের হৃদয়, জগতের হৃদয় ছুঁইয়া গিয়াছে—তাহাতেই জীব-জগতে সহজ একটা আনন্দের আকাঙ্ক্ষা, তাহার একটা সহজ তৃপ্তি রহিয়া গিয়াছে।

বেদও বলিতেছেন, আনন্দ হইতে সবার জন্ম, আনন্দে সকলের স্থিতি, আবার প্রয়াণ-কালে আনন্দেই সকলে প্রবেশ করিতেছে। —এই আনন্দই ভগবান্।

এই যে সহজ নির্ব্বিচার আনন্দ-বোধ, ইহাই হইল জীব হৃদয়ের অন্তর্নিহিত ভক্তির ছটা। হৃদয়ের গোপন গহনে যে মণিটী লুকাইয়া রহিয়াছে, এত আবরণেও তাহাকে বারণ করা যাইতেছে না—আবরণের ভিতর দিয়াও তাহার আনন্দের জ্যোতিঃ বাহিরে ছড়াইয়া পড়িতেছে। তাই সংসারে এত দুঃখ সহিয়াও জীব আসক্তির টানে পড়িয়া সংসার ছাড়িয়া যাইতে পারিতেছে না। আহা, এই আসক্তি যেদিন সংসারের সার যে ভগবান্, তাঁহার প্রতি জন্মিবে, সেই দিন এই বিষই যে অমৃত হইয়া উঠিবে।

আসক্তি ভক্তিরই অপর পিঠ। সংসারাসক্ত মানুষ যেমন বিচার না করিয়া সুখ-দুঃখের সমবায়ে গড়া এই জগৎটাকে বুকে তুলিয়া লয়, ভক্তও তেমনি বাছ-বিচার না করিয়া সহজভাবে যতটুকু পাইতেছেন, সবটুকুকে আপন বলিয়া জড়াইয়া ধরিতেছেন। ভক্ত কিছু ছাড়িতে পারেন না, নূতন করিয়া কিছু গড়িতে পারেন না—অন্তরে যে

রসের ফোয়ারা উথলিয়া উঠিয়াছে, তাহাতে সিনান করিয়া যে নূতন আঁখি তিনি পাইয়াছেন, তাহাতেই জগতের রূপ আজ তাঁহার কাছে বদলাইয়া গিয়াছে। কই, এ জগতে অসুন্দর কি? শ্যামসুন্দরের অঙ্গের দ্যুতি যে সবার মাঝেই পড়িয়াছে—সুন্দরে যে অসুন্দর মিলাইয়া গিয়াছে!

:

এই চোখ দিয়া দেখিবার শক্তি গুরু কৃপা করিয়া যাহার মাঝে জাগাইয়া দিয়াছেন, বল দেখি, তাহার সাধনার পথটা কিরূপ হইবে? কিরূপে চলিলে সে তৃপ্তি পাইবে? যম, নিয়ম, আচার, অনুষ্ঠানের আয়োজন তাহার প্রয়োজন হইবে কি? সে তো নিজে ওগুলি গড়িয়া তুলিতে পারিবেই না, জোর করিয়া কেহ ধরাইয়া দিলেও যে তাহাদের ধরিয়া থাকিতে পারিবে, চিত্তের এমন কঠিনতাও তো তাহার মাঝে নাই। সে নিয়ম চায় না, কেননা সে নিয়ম বুঝে না—সে চায় একটী মনের মানুষ। ওই মানুষটী তাহার সম্মুখে উপস্থিত করিয়া দিয়া তাহার ঘাড়ে যত নিয়ম আর তপস্যার বোঝা-ই চাপাইয়া দ্যাও না, সে হাসিমুখে তাহা বহিয়া চলিবে।

:

সঙ্গোবিরহে আকুলহৃদয়া বিরহিণী বসিয়া আছে, মুখে তার অন্ন রোচে না, কাজে তার মন যায় না। সে কি চিরদিনই এইরূপ ছিল? তা তো নয়; সে-ও হাসি খুসী করিতে জানে, সে-ও কাজ করিতে ভালবাসে—যদি তাহার প্রিয় তাহার সম্মুখে থাকে। তখন ওই যে আভরণ-প্রসাধন-সেবা—সকলই সার্থক, কারণ তাহার সকলই তাহার প্রিয়ের জন্য। কাজ আর এখন শুধু কাজ নয়—মনের মানুষের যোগ হইয়াছে বলিয়া কাজ এখন আনন্দময় সেবা।

ভক্তেরও তপস্যা, নিয়ম, সংযম—সমস্তই এইরূপে একটী আপন জনের আশ্রয় পাইলে তবে সার্থক হয়। আপনার উপর যার জোর বেশী, সে আপনার প্রয়োজন বুঝিয়া নিয়ম গড়িবে, সংযম করিবে—কিন্তু বিবশ-হৃদয় ভক্ত তো তাহা পারেন না। তাঁর মাঝে "আমি" বলিয়া কিছু নাই—সেটুকু অনুরাগের আগুনে গলিয়া "তুমি" হইয়া গিয়াছে—এখন আর কে বিচার করিয়া বলিবে যে, এই ভাল আর এই মন্দ, তুমি এই পথে যাও, না ওই পথে যাও! বিরহী হৃদয় শুধু চায় একটী সোণার মানুষের সোণার স্পর্শ।

স্বগণের সঙ্গ-লালসা তাই ভক্তির একটী স্বাভাবিক ধর্ম্ম। মানুষের মাঝে যেমন সবই রহিয়াছে—দেহ বল, মন বল, আত্মা বল—তত্ত্ব বল, বিচার বল, অনুরাগ বল—নিতে হইলে তাহার সবটুকুই লইতে হইবে, দেহটুকু বাদ দিয়া খালি আত্মাটী নেওয়া যায় না, বা আত্মা বাদ দিয়ে শুধু দেহও নেওয়া চলে না—অন্তরের রসায়নে রসাইয়া সবটুকুই লইতে হয়—ভক্তিও তেমনি সবটুকুই লইতে চায়, প্রীতির পরশমণি ছুঁয়াইয়া সবটুকুই সোণা করিয়া নিতে চায়। তাই ভক্তের আসঙ্গ-লিপ্সা বড় প্রবল। ভাগ-জোখ করিয়া সে নিতে চায় না—বাদ-সাদ দিয়াও নিতে জানে না—সে চায় গোটা মানুষটাই। তাই ভক্তের কাছে ভক্ত বড় আদরের—স্বগণ-বিলাস ভক্তিপথের বড় মধুর সম্পদ।

সহজ অবস্থায় যে রস ভক্তহৃদয় হইতে সঞ্চারিত হইয়া নিবিড় ব্যাকুলতায় সকলকে জড়াইয়া ধরে, তাহাকে পাইবার জন্যই সাধন-অব-

হয় তাহার অনুরূপ আচরণ করিতে হয়। এখনও তুমি হৃদয়ে রসের আবেশ অনুভব কর নাই—রসিকের সঙ্গ কর, রস অনুভব করিবে বই কি! তোমাকে যম-নিয়মের কথা আর কি বলিব, কৃচ্ছ্র সাধনই বা কি করিবে—ভক্তি উন্মেষের এই তো সহজ পথ। ভক্তের সঙ্গ কর, ভক্তির বীজ যে হৃদয়ে রহিয়াছে, রসের স্পর্শ পাইলে আচিরেই তাহা অঙ্কুরিত হইবে।

বৈজ্ঞানিক বলেন, তাপ-বিকিরণ জগতের একটা মহাসত্য। উষ্ণ দ্রব্যের সংস্পর্শে শীতল দ্রব্য রাখিলে তাহাও তাপসঞ্চয় করিয়া উষ্ণ হইয়া উঠে। অধ্যাত্মজগতেও এমনি তাপ-বিকিরণ একটা মহাসত্য। জড়জগতে যাহা তাপের আধার, তাহা সান্ত, সুতরাং তাপ বিকিরণ করিয়া ক্রমে সে তাপহীন হইয়া পড়িতে পারে, কিন্তু অধ্যাত্মজগতে যে তাপ সঞ্চিত হয়, তাহার আর ক্ষয় নাই—সে অক্ষয় ভাণ্ডার হইতে তাপ আহরণ করিয়া তুমিও তাপকের সমধর্মী হইতে পার, অক্ষয় জ্যোতিষ্মান্ হইতে পার। এই জন্যই তো মহতের সঙ্গ এত প্রয়োজন।

সঙ্গ করা স্বাভাবিক, তাহার জন্য বিচারের তত প্রয়োজন হয় না হৃদয়ের, উন্মুখীনতার যত প্রয়োজন। সুখে-দুঃখে, সংসারের সকল ব্যাপারেই মানুষ মানুষের কাছে ছুটিয়া যায়। অধ্যাত্ম জগতের সহায়তা লাভ করিবার জন্যও যে মানুষ মানুষের কাছে ছুটিয়া যাইবে, এ তো স্বাভাবিক। যেখানে দেখিব, আধ্যাত্মিক দৈন্য বুঝিয়াও মানুষ মানুষের সন্ধান করিতেছে না, সেখানেই বুঝিব, শ্রদ্ধা, বিশ্বাস ও আনুগত্যের সহজ সরল পথসে লইতেছে না—সে চলিয়াছে আত্মাভিমানের বাঁকা পথ দিয়া। মানুষের ভিতর দিয়া আপনাকে প্রকাশ করিয়াই যে ভগবান এত সহজে ধরা দিয়া রহিয়াছেন, অভাগা মানুষ সে কথাটা বুঝে না কেন?

ভক্তের সঙ্গ করিবে—দম্ভ লইয়া নয়, তর্কবুদ্ধি লইয়া নয়—শ্রদ্ধা লইয়া, দীনতা লইয়া। কৌতূহলী হইয়া বা পরখ করিবার জন্য সাধু দেখার রোগ অনেকের আছে। এর মত কদভ্যাস আর নাই। এমন করিয়া সারা জীবন সাধু সঙ্গ করিলেও তাহার যথার্থ ফল মিলিবে না। ভক্তের সঙ্গ করিবে ভক্তির কাঙ্গাল হইয়া—তোমার যে অভাব রহিয়াছে, অপরের কাছে চাহিয়া তাহা পূরণ করিবার জন্য। এই জন্য আনুগত্য না থাকিলে সঙ্গ করার গুণ পূর্ণভাবে ফুটে না।

আনুগত্য থাকিলেই সঙ্গ-সাধনা সহজ হইবে। আনুগত্য শুধু আচারের আনুগত্য নহে—হৃদয়ের আনুগত্য চাই। মহতের আচরণ সব সময় অনুকরণীয় না-ও হইতে পারে। তিনি যে ভূমিতে রহিয়াছেন, আমি যদি সেখানে আরোহণ না করিতে পারি, তবে শুদ্ধ তাঁহার আচারের অনুকরণ করিয়া অনেক সময় বিপদও ঘটিতে পারে। তাহা হইলে তো শুধু আচার অনুকরণ করিয়া চলিতে গেলে আবার বিচারের প্রয়োজন হইয়া পড়ে। এ সমস্যার মীমাংসা কি?

ইহার মীমাংসা হৃদয়ে। হৃদয় সঁপিয়া দাও—আচারের সঙ্গে আচারের সামঞ্জস্য না ঘটিতেও পারে, কিন্তু হৃদয়ের সঙ্গে হৃদয়ের যোগ কখনও ব্যর্থ হইবার নহে। হৃদয় দিয়া হৃদয় স্পর্শ করিতে পারিলে দেখা যায়, আমি নীচের ভূমিতে থাকিয়া যে আচার পালন করিব, তাহা মহত্তের উচ্চ ভূমিকার আচার দ্বারা সম্পৃক্ত—

আমার আচার তাঁহার স্নেহদৃষ্টিতে অভিষিক্ত ও কল্যাণময়।

এই স্থানেই সেবাবৃত্তির উন্মেষ। মহতের আচারের অনুকরণ করিতে পারি না, কিন্তু প্রাণ ঢালিয়া তাঁহার আচারের আয়োজন করিয়া দিতে পারি। ইহারই নাম সেবা। এইখানেই হৃদয়ের আনুগত্য—আচারের ঐক্য নাই বা থাকিল।

তাহা হইলে বুঝিতে পারিতেছি—সঙ্গ অর্থে সেবা। সেবা কে না করে? মানুষ হইয়া যে জন্মিয়াছে, সে আজন্ম সেবার অধিকার লইয়াই জন্মিয়াছে। মহতের সেবা না করুক—মানুষ মাত্রেই কাহারও না কাহারও সেবা নিশ্চয়ই করে। কেহ স্ত্রী-পুত্রের সেবা করে, কেহ প্রভুর সেবা করে, কেহ রাজার সেবা করে, অন্ততঃ সকলে নিজের দেহের সেবাটা তো করে। সেবাবৃত্তি এমনই সহজ ধর্ম্ম। মানুষের এই সহজ ধর্ম্ম দিয়া যদি মহতের চরণ ছুঁইয়া যাইতে পারি, তবে সাধনা সহজ হইবে, আত্মার সহজ তৃপ্তি হইবে।

তাই বলি ভক্তি লাভ করিবার জন্য, ভক্তের সঙ্গ করিব, সেবা করিব—এর চেয়ে সহজ পথ আর কোথায় আছে! অত শত তর্ক বিতর্ক বুঝি না, আচারের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম তাৎপর্য্য জানি না—চাই শুধু প্রাণ ভরিয়া সেবার অধিকার। মহৎ সেবার সুশীতল সলিল-সিঞ্চনে হৃদয়াস্থিত ভক্তির বীজ অঙ্কুরিত হউক—ভক্তাশীষ ইহাই করুন।

মিলনে

বন্ধু, করুণা বাদল-ধারা ঝরেছে আকুল শ্রাবণে,
ভাসায়ে নিয়েছ মোর সকলি অকূল প্লাবনে!
মুকুতি খুঁজিতে ভাল বেঁধেছ মধুর বাঁধনে—
হৃদয়ে রয়েছ যদি, বল গো কি কাজ সাধনে!

সহজে-রসিক বঁধু, একি খেলা আজ পেতেছ,
পরশ-লালসে ভোলা রভসে বিপুল মেতেছ।
চলিতে চরণ বাধে, রেখেছ কি ছাঁদে ছাঁদিয়া—
এ সুখ-বাসরে তবু কেন মিছে মরি কাঁদিয়া!

যে ব্যথা গোপন বুকে—না পারি তোমায় দেখাতে—
মিলনের হাসিটুকু গিলাল অশ্রু-লেখাতে।
নিয়ো গো নিঠুর বঁধু কুসুমের মধু লুটিয়া—
শুধু, অমল কমল সম বেদনা থাকুক ফুটিয়া!

—*—

শিক্ষায় অন্তর্দৃষ্টি

ভালবাসাই হল শিক্ষার মূল মন্ত্র। কিন্তু ভালবাসা বলতে আমরা কি বুঝব? সে কি কাউকে আগলে বসে থাকা? তা তো নয়। ভালবাসা তখনই জাগে, যখন কাউকে উপলক্ষ্য করে নিজকে দেহমনের গণ্ডীর চেয়ে বৃহৎ মনে করি। এই অর্থে ভালবাসার সঙ্গে কামনার প্রভেদ সুস্পষ্ট। কামনার সঙ্গে দেহ কিম্বা মনের কোন একটা বিকার জড়িত আছেই। কামনা সান্তের পেছনে অনন্তকে দেখতে পায় না—ব্যক্তিগত ইচ্ছার স্থানে ভগবদিচ্ছার প্রেরণাকে উপলব্ধি করতে পারে না। অথচ ভালবাসার দোহাই দিয়ে কাউকে যখন আমরা কামনা করি, তখন তার যে ভাল করতে চাই না, তা তো নয়। কিন্তু সে ভাল করার অর্থ আমিই হয়ত কিছু বুঝি না—ঐশী ইচ্ছার জায়গায় নিজের সংস্কার আর খেয়ালকেই বড় করে দেখি। তাতে সত্যিকার ভাল কারু হতে পারে না।

"ছেলে ভাল করব"—যদি এই কামনা মনে রেখে কাজ করি, তবে কিছুতেই শিক্ষার সত্য ফল ফলবে না। কেননা ভাল করব—এটা হচ্ছে সংস্কারের কথা। কার পক্ষে কতটুকু ভাল, তা আমরা ঠিক ঠিক জানি না—অনেকটা আন্দাজের উপরই আমরা ভালর পরিমাণটা করে থাকি। তাই ভালর আদর্শটা আমাদের সংস্কার অনুযায়ী গড়ে ওঠে। আমার সংস্কার আমার কাছেই ভাল হতে পারে, অপরের পক্ষেও যে তা ভাল হবে—এ কথা কি করে বলি? তাই কাউকে ভাল করবার চেষ্টা করতে গেলে একটু বিপদ আছে। হয়ত আত্মাভিমান নিয়ে ভাল করতে গিয়ে মন্দও করে ফেলতে পারি।

তা ছাড়া, ভাল করব, এই সংকল্প নিয়ে কাজ করতে গেলেই বিফলতায় দুঃখ কিছু না কিছু পেতেই হবে। যে কোনও সংকল্প নিয়ে কাজ করতে গেলেই এই বিপদ। শিক্ষাকে যতক্ষণ পর্য্যন্ত মনের সঙ্কল্প-বিকল্পের অতীত ভূমি হতে দেখতে না শিখব, ততক্ষণ পর্য্যন্ত যথার্থ শিক্ষা—যে শিক্ষাতে আত্মার প্রকাশ, তা কখনও সিদ্ধ হবে না। তুমি শিক্ষক সেজে যতটুকু শিক্ষা দেবে বলে অভিমান করছ, সেটাও শিক্ষার বহিরঙ্গ মাত্র। তোমার অভিমানকে উপলক্ষ্য করেই তার সৃষ্টি। তোমার চেষ্টা ছাড়া প্রকৃতির আরও একটা নিগূঢ় শক্তি শিক্ষাক্ষেত্রে কাজ করছে—সেই হচ্ছে ঐশী প্রেরণা। তাকে ভুললে চলবে না। শিক্ষাক্ষেত্রে যেটা হচ্ছে এবং যেটা হবে, অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে তাকে হৃদয়ঙ্গম করে তারই অনুকূলে নিজের জীবন ঢেলে দিতে পারলে তবে শিক্ষা সার্থক হবে।

এমনি করে প্রকৃতির উপর যদি বেশী পরিমাণে নির্ভর করতে যাই, তবে হয়ত কথা উঠবে যে, এতে শিক্ষাদান পদ্ধতিতে একটা নিশ্চেষ্টতা আসতে পারে, এবং তার ফলে খুব ভাল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেও সফলতার চেয়ে বিফলতার মাত্রা হয়ত বেশী হবে। কিন্তু আমাদের মনে হয় ঠিক তার উলটো।

আমরা ক্ষুদ্র মানুষ, ক্ষুদ্র চেষ্টার ক্ষুদ্র সফলতা দেখলেই আনন্দে আত্মহারা হয়ে যাই, এবং যেখানে চেষ্টার একটা সোরগোল না দেখ্‌তে পাই, সেখানেই ফল সম্বন্ধে হতাশা এবং অবিশ্বাস এসে পড়ে। কিন্তু আমাদের ক্ষুদ্র চেষ্টাকে পুরুষকার বলে আস্ফালন করা, আর ভগবানের নীরব প্রেরণাকে দৈব ভেবে তার প্রতি শ্রদ্ধাহীন হয়ে থাকা—কোনটাই সমীচীন নয়। আমিত্বের নিরসন না হলে ঠিক ঠিক দৈবের উপর নির্ভরতা কারু আসতে পারে না ও যথার্থ পুরুষকারও কারু মাঝে জাগতে পারে না। আমিত্ব দূর করতে পারলেই দৈব আর পুরুষকারের মিলন ঘটবে—তাই হল ভগবদিচ্ছার স্বরূপ।

এই ইচ্ছার স্বরূপ যে বুঝতে পেরেছে, সে যেমন নিজের ক্ষুদ্র চেষ্টার উপর নির্ভর করে কাজ করতে পারে না, তেমনি তার মাঝে নিশ্চেষ্টতা বা জড়ত্বও আসতে পারে না। ভগবদিচ্ছায় যদি বিশ্বাস থাকে, তবে সে ইচ্ছাকে আধা আধি ভাগ করে দেখলে তো চলবে না—সর্ব্বত্রই সে ইচ্ছার লীলা দেখতে হবে। কোনও ঘটনাকেই তখন আকস্মিক বলা চলে না, সকলই তখন অর্থপূর্ণ হয়ে উঠে। তোমার মাঝে যদি ভগবদিচ্ছার শুভ প্রেরণা জেগে থাকে, তবে সেই শুভেচ্ছার পাত্র করে ভগবান যাদের তোমার সঙ্গে যুটিয়ে দিয়েছেন, তাদের আর তোমার মিলনকে কখনও আকস্মিক বলা চলে না। তোমাকে উপলক্ষ্য করে ভগবদিচ্ছা যাদের উপর ক্রিয়া করবে, জন্মজন্মান্তরের সম্বন্ধের টানে তারাই আজ তোমার সঙ্গে মিলেছে—এই বিশ্বাস যদি অন্তরে জাগে, তবে আর নিজের চেষ্টার কোনও বালাই থাকে না। কল্যাণ যেখানে, সেখানকার যোগাযোগ ভগবানেরই প্রেরণায়—এই কথাটী বিশ্বাস করে তাঁরই অভিপ্রায়ের উপর নির্ভর করে, অহমিকা ছেড়ে দিয়ে যথাযথভাবে কর্ত্তব্য পালন করে যেতে হয়। সে কর্ত্তব্যও নিরূপিত হয়—কোনও সঙ্কল্প দ্বারা নয়। যার কাজ তিনিই করিয়ে নেন, আত্মহারা মানুষ বুঝতেও পারে না, কি দিয়ে কি হল—সে কেবল আপনাকে তাঁর যন্ত্র করে দিয়েই আনন্দ পায়।

এমনি করে মন হতে অহং মুছে গিয়ে ভগবানের ইচ্ছা যার মাঝে সুস্পষ্ট হয়ে জেগেছে, সে-ই যথার্থ ভালবাসতে পারে। তার বন্ধনের চিহ্ন বাইরে থাকে না—কিন্তু অন্তরকে সে নিবিড়ভাবে জড়িয়ে থাকে। এই ভালবাসায় স্নিগ্ধতা আছে, শান্তি আছে, বীর্য্য আছে—কিন্তু ফেনিল উচ্ছ্বাস নাই। তার বিক্ষোভহীন প্রচণ্ড শক্তির কাছে প্রতিকূল চিত্তও পরাভূত হয়ে যায়। মানুষ তখন বাস্তবিকই দৈববলে বলীয়ান হয়ে ওঠে। সে দৈব কোন কাকতালে পাওয়া কিছু নয়—সে তার আত্মারই শক্তি!

সম্পূর্ণ সংস্কারবর্জ্জিত না হলে যথার্থরূপে যেমন ভালবাসা যায় না, তেমনি যথার্থ শিক্ষাও দেওয়া যায় না। সাধারণতঃ শিক্ষাকে আমরা যে দৃষ্টিতে দেখি, তাতে তার মাঝে অর্জ্জন করবার পালাটাই বড় করে দেখি। আসলে বর্জ্জন করবার শিক্ষাই হল বড়। সংস্কার বর্জ্জন করতে না পারলে মনুষ্যত্ব জাগবে না—আত্মশক্তির স্ফুরণ হবে না। সংস্কারবর্জ্জিত মনুষ্যত্বের শিক্ষাই হল প্রধান কথা—জ্ঞান, প্রেম, কর্ম্ম, এর কোনটাই সংস্কারের চাপে থেকে যথার্থরূপে বিকশিত হতে পারে না। যদি আত্মার সম্পদই না বিকশিত হয়, তবে তো জীবনই ব্যর্থ হল।

আমরা যেমন ভাবি, তেমন জগতই সৃষ্টি করি। শিক্ষার জগৎও এমনিতর আমাদের মনঃকল্পিত একটা খণ্ড সৃষ্টি—তা আংশিকরূপে সত্য। আংশিক সত্য কখনও নিঃসন্দিগ্ধরূপে কল্যাণকর হতে পারে না। জীবন যদি কল্যাণময় করতে হয়, তবে সত্যকে পূর্ণরূপে গ্রহণ করতে হবে। বাইরের রূপ যাই হোক না কেন, পূর্ণতাকে অন্তরে প্রতিষ্ঠিত রাখতেই হবে। যে শিক্ষা অন্তরের এই পূর্ণতা প্রতিষ্ঠার অনুকূল হবে, তাকেই বলব আদর্শ শিক্ষা। শিক্ষায় এই অন্তর্দৃষ্টি থাকা সব চেয়ে বেশী প্রয়োজন—এই দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে বাইরে যত ইচ্ছা কারিগরী কর, তাতে কোনও গোল হবে না। পূর্ণের মাঝে অংশের স্থান সম্ভব, কিন্তু অংশের মাঝে পূর্ণকে পোরা যায় না। তেমনি আত্মার সম্পদ অর্জ্জন করে বহিরঙ্গ সম্পদ অর্জ্জন করা চলে. কিন্তু বহিরঙ্গ সম্পদ অর্জ্জনে মন থাকলে আত্মা সঙ্কুচিত হন। শিক্ষাকে যদি অর্জ্জনের দিক দিয়েও দেখি, তবুও এ কথাটা ভুলে থাকা চলে না।

শিক্ষক নিজে যেমন ব্রহ্মসদ্ভাবের অনুশীলন করবেন, ছাত্রকেও তেমনি ব্রহ্মদৃষ্টিতে দেখবেন। দুটী বস্তুর মাঝে সাম্য থাকলে, তবে ভালবাসা হয়। আবার এই সাম্য যত নিবিড় হবে, ভালবাসাও তত গভীর হবে। জলের সঙ্গে জল মিশে গেলে, কিম্বা আলোর সঙ্গে আলো মিশে গেলে দ্বৈতের ভেদ কোথায়ও ধরা যায় না। কিন্তু দুটা কঠিন বস্তু মিলবার জন্য পরস্পরের সম্মুখীন হলেও ঠোকাঠুকি করে দুটা পরস্পরের বাইরে পড়ে থাকে, এ স্তভাবে কিছুতেই মিলতে পারে না। শিক্ষা-ক্ষেত্রেও যদি ভালবাসাকে মূল বলে গ্রহণ করতে হয়, তবে সেখানেও শিক্ষক ও ছাত্রে যাতে আত্যন্তিক মিলন সম্ভব হতে পারে, তারই সাধনা করতে হবে। ব্রহ্ম-সদ্ভাবে দুটী সত্তা একাকার না হলে, আত্যন্তিক মিলন কখনও হতেই পারে না। এর মাঝে যদি শুধু দেহ, মন, সংস্কারের কথা ওঠে, তা হলে মিলন কখনও একান্ত হবে না এবং যেখানে ভেদ থাকবে, সেখানে দুঃখ ও অকল্যাণও থাকবে।

শিক্ষার ক্ষেত্র এবং পাত্রকে এমনি সুগভীর অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে অনুবিদ্ধ করে রাখতে হবে। এখানে শুধু মানুষের রক্তমাংসের পিণ্ডটাই দেখছি না—এখানে দেখছি ব্রহ্মকে। এই দৃষ্টি সত্য এবং ব্যাপক—এর কাছে আর সকলই খর্ব্ব হয়ে রয়েছে অথচ কারু সঙ্গে বিরোধ হচ্ছে না। এ দৃষ্টি পেলে আর কৃত্রিম চেষ্টা দিয়ে কোনও কিছু গড়ে তুলবার প্রাণান্তকর প্রয়াস করতে হয় না—সমস্ত সমস্যারই সহজ সমাধান হয়ে যায়।

যদি সিদ্ধদৃষ্টি মিলে, তবে যাকে যা ভাবা যায়, সে তাই হয়ে যায়। আর সে দৃষ্টির অর্থই হচ্ছে—যা সিদ্ধ বা সম্পাদিত, তারই দৃষ্টি অর্থাৎ ব্যক্তিগত ইচ্ছার বালাই সেখানে নাই, কাজেই কোনও সফলতা-বিফলতার কথাও নাই। এই দৃষ্টিতেই মায়ার আবরণ খসে যাবে, সত্য স্বমহিমায় প্রকাশ হবে। শিক্ষক নিজকে এবং শিক্ষার্থীকে এই দৃষ্টিতে দেখতে অভ্যাস করবেন—তবেই শিক্ষা অনাড়ম্বর হলেও যথার্থ হবে।

ক্রমিক সং
শ্রেণী সং
কলিকাতা।

শ্রীনন্দ

—*—

আমরা সাধারণ বুদ্ধির জীব—দুই চারিটা দৃষ্টান্ত হইতেই একটা সিদ্ধান্ত করিয়া বসি এবং সেই সিদ্ধান্ত নিয়া লীলাময়ের অপার লীলারহস্য ভেদ করিবার স্পর্দ্ধা করিয়া থাকি। অবশ্য ভগবানের জগতে যে কোনও আইনের শৃঙ্খলা নাই, এমন কথা বলিতেছি না—কিন্তু তাঁহার সকল আইনের উপর তাঁহার লীলাময়ী ইচ্ছার আইনটাই বড়। আমরা সব সময় তাঁহার ইচ্ছার সকল দিক বুঝিয়া উঠিতে পারি না। যতটুকু বুঝিবার ও কাজ করিবার শক্তি তিনি দিয়াছেন, ততটুকু দিয়াই একটা কিছু গড়িয়া তুলি এবং সেইটাকেই ভগবদনুমোদিত বিধি বলিয়া প্রচার করি। তার পর এক দিন হয়ত দেখি, এক অনাশঙ্কিত দিক হইতে এক অত্যাশ্চর্য্য ব্যতিক্রম আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে,—আমাদের স্বকল্পিত বিধির সঙ্গে তাহাকে খাপ খাওয়াইতেও পারিতেছি না. অথচ অস্বীকার করিতেও পারিতেছি না।

আজি যে মহাপুরুষের জীবনী আমরা আলোচনা করিব, তাঁহার কথা বলিতে গিয়া এই কথাটাই বিশেষ করিয়া মনে পড়ে যে, ভগবানের লীলারহস্য সাধারণ জৈব বুদ্ধি দিয়া বুঝা সম্ভব নয়। আমাদের দেশে যে চাতুর্ব্বর্ণ্য প্রতিষ্ঠিত আছে, তাহার একটা বাস্তব সার্থকতা নিশ্চয়ই আছে—আজ পর্য্যন্তও তাহার পরিচয় আমরা পাইতেছি। এই প্রথার মাঝে স্বাধিকার-প্রমাদের আবর্জ্জনা আসিয়া জুটিলেও, ইহার মাঝে যে সত্য নিহিত রহিয়াছে, তাহা চিন্তাশীল ব্যক্তিকে মানিয়া নিতেই হয়। গীতাতে ভগবান্ বলিয়াছেন, "চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ।" তিনি যে গুণ ও কর্ম্মের নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন, তাহার অনুযায়ী একটা সমাজ আমরা গড়িয়া তুলিয়াছি। ভগবদ্বাণী যে শুধু এই দেশের পক্ষেই খাটে, তাহা নয়। তাঁহার নির্দ্দিষ্ট চাতুর্ব্বর্ণ্য অন্য দেশেও আছে, তবে পারিপার্শ্বিকের গুণে তাহার আকার ভিন্ন।

কিন্তু তাহা সত্ত্বেও ভগবদুক্তির তাৎপর্য্য যে আমরা যথার্থভাবে গ্রহণ করিতে পারিয়াছি, তাহা বলা যায় না। ধর্ম্মচর্চ্চায় ব্রাহ্মণ সমাজের শীর্ষস্থানীয়, ইহা সত্য। কিন্তু তাই বলিয়া অন্যান্য বর্ণের গুণ ও কর্ম্মের যে একটা চরম পুরস্কার নাই, এবং সে পুরস্কার যে গরিমায় বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণের অর্জ্জিত সম্পদের সমকক্ষ হইতে পারে না—এমন কথা বলা যায় না। কিন্তু আমরা বোধ হয় এই কথাটাই বিশেষ করিয়া ভুলিয়া যাই। তাই আমাদের প্রচলিত সংস্কারের বিরোধী কিছু উপস্থিত হইলে নানা অসম্ভব কল্পনা দ্বারা তাহার সমাধান করিতে চেষ্টা করি—এ কথা একবার মনে ভাবি না যে লীলাময়ের লীলারহস্য মানববুদ্ধির অগম্য, তাঁহার শ্রীমুখনিঃসৃত বাণীর তাৎপর্য্য গ্রহণ করাও সব সময় আমাদের সাধ্যে কুলায় না।

শূদ্রের পরিচর্য্যাত্মক কর্ম্মকে আমরা হীন চক্ষে দেখিয়া থাকি, তাই তাহার একটা যথাসম্ভব কম মূল্য আমরা নির্দ্ধারণ করিয়া

রাখিয়াছি। কিন্তু দাক্ষিণাত্যের পারিয়া মহাপুরুষ শ্রীনন্দের জীবন-কথা আলোচনা করিলে এই কথাই দৃঢ়ভাবে প্রতীত হয় যে, ভগবান শূদ্রের পরিচর্য্যারও যে চরম মূল্য নির্দ্ধারিত করিয়া রাখিয়াছেন, তাহা জগতের কোনও কর্ম্মের পুরস্কারের তুলনাতেই হীন নহে। তাহা ছাড়া, এ কথাও বুঝিতে পারি, তিনি সকলের হৃদয়েই প্রকাশ হইবার জন্য আঙ্গুলি-বিঙ্গুলি করিতেছেন—তাঁহার কৃপার নিকটে জাতি, গুণ, কর্ম্মের বাধা একেবারেই মিথ্যা।

প্রায় ছয় শত বৎসর পূর্ব্বে, বর্ত্তমান মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর আরকট জেলার আধনুর গ্রামে মহাপুরুষ নন্দের জন্ম হয়। নন্দ জাতিতে পারিয়া ছিলেন। সামাজিক ব্যবস্থা অনুসারে পারিয়া শূদ্রেরও অধম। শূদ্র তবুও হিন্দুর চাতুর্ব্বর্ণ্যের অন্তর্গত, কিন্তু পারিয়ার সে অধিকারও নাই। চতুর্ব্বর্ণের বাহিরে বলিয়া তাহাদিগকে আজ পর্য্যন্ত "পঞ্চম" জাতি বলা হয়। ঐতিহাসিকেরা অনুমান করেন, পঞ্চমেরা প্রাচীন অনার্য্য জাতির বংশাবশেষ। চারিটী বর্ণ ছাড়াও নিষাদ পঞ্চম বলিয়া আর একটি জাতির কথা শ্রুতিতেও পাওয়া যায়।

সে যাহা হউক, পঞ্চম জাতির সামাজিক ও আর্থিক দুরবস্থা অবর্ণনীয়। ইহাদিগকে শিক্ষা-দীক্ষা দিয়া উন্নত করিবার চেষ্টা কোনও দিনই হয় নাই। তাই আর্য্যপ্রভাবের পার্শ্ববর্ত্তী হইয়াও ইহারা নিজেদের নানা প্রকার সামাজিক কদাচার ও কুসংস্কার হইতে আপনাদিগকে মুক্ত করিতে পারে নাই। গ্রামের বাহিরে অতি অযত্ন পাড়ায় কুটীরে ইহাদের বাস—উচ্চবর্ণের দাসত্ব উপজীবিকা—নানা বিকটাকার তথাকথিত দেবতার রুধির কর্দ্দমময় পূজা ইহাদের ধর্ম্মপ্রণালী। ছয় শত বৎসর পূর্ব্বে ইহারা যেমন ছিল, আজও তেমন রহিয়াছে। কিন্তু তবুও সমাজের লাঞ্ছিত ও অভিশপ্ত এই জাতির মাঝে নন্দের মত মহাপুরুষের আবির্ভাব মানবীয় ব্যবস্থার উপর ভগবানের অহেতুকী কৃপারই প্রাধান্য সূচিত করে।

শিশুকাল হইতেই নন্দের মাঝে একটু বিশেষত্ব দেখা যাইতে লাগিল। পাড়ার অন্যান্য পারিয়া ছেলেরা যেমন খেলা ধূলা লইয়া মত্ত থাকিত, নন্দ তেমন খেলা পছন্দ করিতেন না। তাঁহার খেলা ছিল ঠাকুর দেবতা লইয়া।

শিশু হইলেও নন্দ বড় সুন্দর মূর্ত্তি গড়িতে পারিতেন। পাড়ার ছেলেরা যখন খেলায় মত্ত, নন্দ তখন আপন মনে বসিয়া ঠাকুর গড়িতেছেন। ঠাকুরটীর রং তাঁরই মত কাল, খুব শক্তিশালী চেহারা, প্রকাণ্ড এক জোড়া গোঁফ, মাথায় মস্ত পাগড়ী, পায় দেশী জুতা, হাতে একখানা কাস্তে—কিন্তু চোখ দুটী বড় শান্ত ও কোমল। নন্দের ঠাকুরের মূর্ত্তিটী সাধারণ মূর্ত্তির চেয়ে একটু অপরূপ বটে—কিন্তু ভগবান্ বলিয়াছেন, "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।"

এইরূপ মূর্ত্তি গড়িয়া শিশু নন্দ নানারকম পূজার আয়োজন করিতেন, পূজা করিয়া মধুর স্বরে ঠাকুরের মহিমা গাহিতেন, ঠাকুরকে বেড়িয়া বেড়িয়া অতি মধুর নৃত্য করিতেন। নন্দের নৃত্যই ছিল তাঁহার এক বিশেষত্ব। তিনি নন্দ—কিনা আনন্দ দিয়া গড়া তনু—তাই তাঁহার চলনই ছিল নৃত্যের ভঙ্গীতে। নটরাজ মহাদেবের নৃত্যলীলা তাঁহার হৃদয় স্পর্শ করিয়া গিয়াছিল বলিয়া শিশুকাল হইতেই তিনি নৃত্যের

আনন্দে বিভোর থাকিতেন। তাঁহার নৃত্যের পরিচয় পাঠক ভবিষ্যতে আরও পাইবেন।

শুধু নিজে পূজা করিয়া নন্দ তৃপ্তি পাইতেন না—পূজার সময় পাড়ার শিশু ভক্তদেরও ডাক পড়িত। সকলে মিলিয়া ঠাকুরকে লইয়া মিছিল করিয়া পাড়ায় পাড়ায় ভজন গাহিয়া বেড়াইতেন। এইরূপ ভাবে নন্দকে কেন্দ্র করিয়া শিশুকাল হইতেই পারিয়া-পাড়াতে একটী ভক্তের দল গড়িয়া উঠিল।

শিশু নন্দের দেব-দ্বিজের প্রতি অসীম ভক্তি ছিল। তিনি ছিলেন দৈন্যের অবতার, নিষ্কিঞ্চন কুলে জন্ম বলিয়া নয়—স্বভাবতঃই একটী অনুপম নিষ্কিঞ্চনতার স্নিগ্ধতা তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া থাকিত। যাহা কিছু মহৎ, যাহা কিছু সুন্দর বা, বিচিত্র তাঁহার চোখে পড়িত, তাহাকেই তিনি শ্রদ্ধায়, বিস্ময়ে, মুগ্ধচিত্তে দেবতার লীলা বলিয়া মনে করিতেন। যাহাকে লৌকিক দৃষ্টিতে আমরা ক্ষুদ্র বলিয়া মনে করি, তাহার মাঝেও ভগবানের বিরাটরূপ প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। আমাদের মন অভিমানে পোরা বলিয়া ক্ষুদ্রের মাঝে বিরাট্‌কে ধারণা করিতে পারি না—উপরে উপরে যাহা দেখি, তাহাতেই মনে করি সব তত্ত্ব জানিয়া ফেলিয়াছি। তাই আমরা শুধু ছায়াটাই দেখি, কায়ার সন্ধান পাই না। কিছুই জানি না, কিছুই বুঝি না বলিয়া দৈন্যে যিনি আপনাকে অবনমিত করিতে পারিয়াছেন, ভগবানের মহদদ্ভুত রূপ দেখিবার অধিকার তিনিই পাইয়াছেন। নন্দের নিষ্কিঞ্চন দৈন্য তাঁহাকে এইরূপে সর্ব্বত্র দেবলীলা দর্শনের অধিকারী করিয়াছিল।

অধমুরে যে ক্ষুদ্র শিবমন্দিরটী ছিল, তাহার ক্ষুদ্র তোরণটীর দিকে নন্দ নির্ব্বাক বিস্ময়ে চাহিয়া রহিতেন। ওই মন্দিরটীর মাঝে দেবতার কোন আশ্চর্য্য রহস্য যে লুকাইয়া রহিয়াছে, তাহা আবিষ্কার করিবার জন্য তাঁহার শিশু হৃদয় আকুল হইয়া উঠিত - কে যেন বলিত, ওই তোরণ দ্বারটি পার হইতে পারিলেই তাঁহার জীবন দেবতার সাক্ষাৎ মিলিবে। কিন্তু হায় তিনি যে কুলে জন্মিয়াছেন, সে কুলের পক্ষে মন্দিরে প্রবেশ দূরের কথা, তাহার ছায়া স্পর্শ করাও যে অপরাধ। তাই মন্দিরের দিকে চাহিয়া চাহিয়া ব্যথিতের একটি দীর্ঘশ্বাস দেবতার উদ্দেশে পাঠাইয়া দিয়া নন্দ ঘরে ফিরিয়া আসিতেন

যেদিন মিছিল লইয়া দেবতাকে গ্রামের মধ্য দিয়া লইয়া যাওয়া হইত, নন্দের সে দিন যেন সুখ-স্বপ্নের আবেশে কাটিয়া যাইত। নন্দ দেবদর্শন করিতে পাইতেন না বটে, কিন্তু দূর হইতে তাঁহার ভক্তগণের আনন্দ-ধ্বনি, ব্রাহ্মণদিগের বেদ পাঠ, শঙ্খঘণ্টার বাদ্যরোল তাঁহার কানে আসিত, আর তাঁহার পিপাসিত চিত্ত তাহাই পান করিয়া আনন্দে আত্মহারা হইত

বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নন্দের ভাবপ্রবণতা আরও বাড়িল। এতদিনের ঔৎসুক্য চিত্তে একটী সত্য বস্তুর আভাস জাগাইয়া দিয়াছে। এখন শুধু আর দর্শন করিবার লালসা নয়, সেবা করিবার তীব্র আকাঙ্ক্ষা তাঁহার হৃদয় জুড়িয়া বসিয়াছে। কি করিয়া দেবসেবার তুচ্ছতম কাজটী করিয়া দিয়াও তাঁহার জীবন সার্থক করিবেন—দিবানিশি নন্দের এই চিন্তা। কাছে গিয়া সেবা করিবার অধিকার তাঁহার নাই—কিন্তু তাঁহার

এই নবপ্রস্ফুটিত যৌবন কি দূর হইতেও ভগবানের কোনও সেবাতেই লাগিবে না? যাঁহার সেবা করিবেন, এখনও তাঁহাকে চোখে দেখেন নাই, কিন্তু হৃদয়ে তাঁহার মূর্ত্তি যেন কি করিয়া লাগিয়া গিয়াছে—এখন সেবার সার্থকতা না পাইলে চিত্তের অবরুদ্ধ ভক্তি আর স্বস্তি মানিতেছে না।

হঠাৎ একদিন তাঁহার মনে হইল, কেন, মহাদেবের মন্দিরে যে ঢাক বাজে, তিনি তো তাহার চামড়া যোগাড় করিয়া দিতে পারেন। এই ভাবটী আসা অবধি নন্দ আনন্দে এমনি আত্মহারা হইয়া পড়িলেন যে, এ শুধু তাঁহার কল্পনা বলিয়া তাঁহার মনে হইল না—এ যেন তাঁহার দেবতার নিকট হইতে আদেশ আসিয়াছে। এতদিন ধরিয়া দেবতার কাছে অধিকার চাহিয়া এত যে আকুল প্রার্থনা করিয়াছেন, আজ বুঝি দেবতা সদয় হইয়া সে নিবেদন স্বীকার করিলেন। নন্দের মনে আর কোনও সংশয় রহিল না—মহাদেবই তাহার কাছে এই সেবা চাহিতেছেন, ইহা তাঁহার ধ্রুব বিশ্বাস হইল। পর দিন সঙ্গীদিগকে বলিলেন, প্রভুর আজ্ঞা, তাঁহার সেবার আয়োজন করিতে হইবে, তোমরা আমার সহায় হও।"

বিষ্ণুমায়া

"যিনি শ্রেষ্ঠ ভক্ত, তিনি ইন্দ্রিয়দ্বারা বিষয় গ্রহণ করেন বটে, কিন্তু তাহাতে তাঁহার সুখ কিম্বা দুঃখ কিছুই হয় না—কেননা তিনি এই জগৎকে বিষ্ণুর মায়া বলিয়া জানেন।"

শ্রীমদ্ভাগবত বলিতেছেন, জগৎ বিষ্ণুর মায়া। এখন প্রশ্ন হইতেছে, বিষ্ণুমায়ার স্বরূপ কি? মায়া যে স্বরূপতঃ কি, তাহা কেহ নির্দ্দেশ করিয়া বলিতে পারে না। এই জগতের সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় মায়ারই কার্য্য। কার্য্য দেখিয়া কারণের একটা পরিচয় পাওয়া যাইতে পারে।

আদি পুরুষই ভূত-সমূহের আত্মা বা কারণস্থানীয়। তিনি যে শক্তিবলে মহাভূত-সমূহ সৃষ্টি করিয়া তাহাদিগের দ্বারা এই বিচিত্র ভূতজগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহাই তাঁহার মায়া। জীব আদিপুরুষেরই অংশ-ভূত। জীবের প্রকৃষ্ট সার্থকতা সম্পাদনের জন্যই জগৎ সৃষ্টি। সে সার্থকতা কি প্রকারে হইতে পারে?—মাত্রাপ্রসিদ্ধি ও আত্মপ্রসিদ্ধি দ্বারা। জীবের বিষয়ভোগ মাত্রা-প্রসিদ্ধি এবং মোক্ষ আত্মপ্রসিদ্ধি। আদিপুরুষ জীবের যে ইন্দ্রিয়, প্রাণ, মন, বুদ্ধি সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা বিষয়ভোগ দ্বারা সংসারগতি লাভ করিবার জন্যও বটে, আবার অধ্যাত্ম জ্ঞান অনুশীলন করিয়া মোক্ষলাভ করিবার জন্যও বটে।

জীবেরই উপকারের জন্য আদি পুরুষ মহাভূত হইতে সৃষ্ট ভূতসমূহে অন্তর্য্যামি-রূপে প্রবেশ করিলেন। অন্তর্য্যামিরূপে জীবে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া তিনি একদিকে মন,

রূপে আবার অপর দিকে বাহ্য ইন্দ্রিয়রূপে দশ ভাগে আপনাকে বিভক্ত করিলেন। এইরূপে ইন্দ্রিয় ও মনের সৃষ্টি হইলে আদিপুরুষের প্রেরণায় জীব বিষয়ভোগ করিতে আরম্ভ করিল।

অন্তর্যামী আত্মা জীবের ইন্দ্রিয়সমূহ আলোকিত করিয়া রহিয়াছেন। সেই ইন্দ্রিয় দ্বারা বিষয়ভোগ করিতে করিতে জীব এই সৃষ্ট শরীরকেই আত্মা বলিয়া মনে করে এবং তাহাতে আসক্ত হয়। দেহাসক্ত হইতেই জীবের সংসারগতি হইয়া থাকে।

প্রশ্ন হইতে পারে, ভোগ করিতে করিতে জীব আসক্ত হইবে কেন? বরং ভোগ করিয়া ভোগের পরিসমাপ্তি ঘটিলে জীবের তো মুক্ত হওয়ারই কথা।—জীব কর্ম্মেন্দ্রিয় দ্বারা কর্ম্ম করে। প্রত্যেক কর্ম্মের যেমন একটা নিমিত্ত থাকে তেমনি চিত্তে তাহার বাসনা বা একটা দাগও থাকিয়া যায়। এইরূপ কর্ম্ম করে বলিয়া পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত কর্ম্মফলের পুঁজি লইয়া জীব সংসারচক্রে আবর্ত্তিত হইতে থাকে। কর্ম্মফলও কখনও আত্যন্তিক সুখের কারণ হয় না।—এইরূপে জীবের মুক্তি সম্ভবপর হয় না।

কতকাল ধরিয়া যে এই ভাবে ঘুরিয়া বেড়াইবে তাহা নিশ্চিত করিয়া বলা যায় না। কর্ম্মের গতি বিচিত্র—তাহাতে জীবের কেবল প্রচুর অকল্যাণই সাধিত হয় মাত্র। যে পর্য্যন্ত ব্রহ্মাণ্ডে প্রলয় উপস্থিত না হয় সে পর্য্যন্ত জীব এইরূপে বিচিত্র কর্ম্মপথে জন্ম-মরণের আবর্ত্তে অবশ হইয়া ঘুরিয়া বেড়ায়।

এই হইল ভগবানের মায়াময় সৃষ্টির বিবরণ। তার পর প্রলয়ের কথা।

যখন মহাভূত সমূহের নাশের কারণ উপস্থিত হয়, তখন স্থূল দ্রব্য ও সূক্ষ্ম গুণের সমষ্টি এই যে ব্যক্ত জগৎ, কাল তাহাকে অব্যক্তের দিকে আকর্ষণ করিয়া থাকেন। এই কালের আদিও নাই অন্তও নাই।

প্রলয়ের পূর্ব্বে শতবর্ষ ধরিয়া পৃথিবীতে নিদারুণ অনাবৃষ্টি হয়। সময় বুঝিয়া সূর্য্যের তেজও তখন বাড়ে, ত্রিভুবন তাহাতে পুড়িয়া ছারখার হইয়া যায়। পাতাল হইতে যে ভীষণ অগ্নিশিখা ঊর্দ্ধে উত্থিত হয়, বায়ু দ্বারা চালিত হইয়া তাহা চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়ে। তার পর প্রলয় কালের সাংবর্ত্তক মেঘে আকাশ ছাইয়া ফেলে—শতবর্ষ ধরিয়া ধারা বর্ষণ হইতে থাকে। সে বৃষ্টি বিন্দু বিন্দু করিয়া ঝরিয়া পড়ে না—হাতিশুঁড়ের মত ধারা ধরিয়া তখন বৃষ্টি হইতে থাকে। তার পর সেই জল রাশিতে বিরাট সৃষ্টি লীন হইয়া যায়।

এই বিরাট সৃষ্টির অধিষ্ঠাতা যিনি, উপাধির নাশ হওয়াতে তিনিও অব্যক্ত কারণে প্রবেশ করেন—যেমন ইন্ধন না থাকিলে আগুন আপনা হইতেই নিবিয়া যায়। এইখানে একটু কথা আছে। স্মৃতি বলিতেছেন, যে সমস্ত পুরুষেরা জগতের এক এক অধিকারে নিযুক্ত আছেন প্রলয় উপস্থিত হইলে তাঁহাদের অধিকার কাল শেষ হইয়া যায় সুতরাং তাঁহাদের আর কোনও প্রয়োজন না থাকাতে ব্রহ্মার সঙ্গে তাঁহারাও মোক্ষরূপ পরম স্থান প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। অধিকারী পুরুষেরা অধিকার কাল পর্য্যন্ত অবস্থান করিবেন, এরূপ ব্যবস্থার কথাও আমরা জানিয়াছি। বিরাট সৃষ্টির প্রভু যে বৈরাজ পুরুষ, তিনিই ব্রহ্মা। তিনি ভগবানের পরম ভক্ত। সুতরাং প্রলয় কালে তাঁহার মোক্ষ হওয়ার কথাই বলা উচিত ছিল।

কিন্তু ভাগবত তাহা না বলিয়া অন্যান্য সৃষ্ট পদার্থের ন্যায় তাঁহার মাত্র কারণে প্রবেশের কথা বলিলেন কেন?

এর উত্তরে বলা যাইতে পারে, অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়া কাহারও কাহারও সত্যলোক পর্য্যন্ত গতি হইয়া থাকে। সত্যলোক লোক-সপ্তকের মধ্যে শ্রেষ্ঠ—সেখান হইতে সাধক ব্রহ্মপদ লাভ করিয়া থাকেন। কিন্তু যদি ভক্তি না থাকে, তবে কেবল কর্ম্মের জোরে সত্যলোকে গেলেও সেখান হইতে আবার ফিরিয়া আসিতে হয়। সেইরূপ যদি ব্রহ্মারও ভক্তির অভাব থাকে, তবে প্রলয়কালে তাঁহাকেও প্রকৃতিতে লীন হইয়া পরবর্ত্তী সৃষ্টিতে আবার জন্মিতে হইবে। ইহাতে অভক্তের পক্ষে যে মোক্ষ দুর্লভ, তাহাই সূচিত হয়।

তবে ভাগবত এখানে প্রকৃতি শব্দ উল্লেখ না করিয়া অব্যক্ত কথা ব্যবহার করিয়াছেন। যাহাকে কিছু দিয়াই ব্যক্ত করা যায় না, তাহাকেও অব্যক্ত বলা চলে। তাহা হইলে অব্যক্ত ব্রহ্মকেও বুঝাইতে পারে। এই রূপ ব্যাখ্যা করিলে অব্যক্তে প্রবেশ ব্রহ্মার মোক্ষলাভও হইতে পারে।

বিরাটের লয় হইলে পর ক্ষিত্যপ্‌তেজো-মরুদ্ব্যোম হইতে মহতত্ত্ব পর্য্যন্ত প্রতিলোমক্রমে লীন হইয়া যায়। প্রলয় কালে যে সাংবর্ত্তক বায়ু প্রবাহিত হয়, তাহার উল্লেখ পূর্ব্বেই করা হইয়াছে। বায়ু যে গন্ধ এবং রস হরণ করিতে পারে, তাহা আমরা সকলেই জানি। ব্যোম হইতে ক্ষিতি পর্য্যন্ত প্রত্যেক ভূতের এক একটী বিশেষ গুণ আছে। পূর্ব্ব পূর্ব্ব ভূত হইতে পর পর ভূতে গুণসমূহের সংক্রমণ হইয়া থাকে। এইরূপে ক্ষিতিতে পূর্ব্বের চারিটী ভূতের গুণ যেমন আছে, তেমনি তাহার নিজস্ব একটী গুণও আছে—সেটী গন্ধ। গন্ধ ক্ষিতির বিশেষ গুণ এবং ক্ষিতি সর্ব্বশেষ ভূত বলিয়া এই গুণটী আর কোথাও সংক্রামিত হইতে পারে নাই। এই হিসাবে বলা যাইতে পারে, একমাত্র গন্ধই ক্ষিতিকে অন্যান্য ভূত হইতে পৃথক রাখিয়াছে। ইহাই ক্ষিতির ব্যাবর্ত্তক ধর্ম্ম। প্রলয়-বায়ু যদি ক্ষিতির এই ব্যাবর্ত্তক ধর্ম্মটী আত্মসাৎ করিয়া ফেলে, তবে ক্ষিতির ব্যাবৃত্ত থাকিবার অবকাশ থাকে না—অর্থাৎ ক্ষিতি তখন তাহার উচ্চতর ভূত জলে লীন হইয়া যাইবে।

এইরূপে বায়ু যদি জলের রস-গুণ শোষণ করিয়া লয়, তবে জলও তেজে লীন হইবে। ক্ষিতি ও জল তেজে লয় হইলে প্রলয়কালীন মহান্ধকার আসিয়া তেজের বিশেষ ধর্ম্ম রূপটুকু আত্মসাৎ করে এবং তেজ বায়ুতে মিলাইয়া যায়। বায়ু আকাশ হইতে উৎপন্ন, স্পর্শ তাহার বিশেষ গুণ। আকাশ বায়ুর স্পর্শটুকু লইয়া গেলে বায়ু আকাশে লীন হইয়া যায়।

আকাশের গুণ শব্দ, কাল তাহার প্রভু। শব্দ কালবশতঃ নষ্ট হইয়া থাকে। প্রলয়কালে মহাকাল আকাশের বিশেষ গুণ শব্দকে গ্রহণ করিলে, আকাশ তামস অহঙ্কারে লয় পায়।

অহঙ্কার তিন প্রকার—তামস, রাজস ও সাত্ত্বিক। তামসাহঙ্কার ভূতাদির হেতু, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধি রাজসাহঙ্কার। মন ও বিকারের অধি-ষ্ঠাতা দেবসমূহের মূলে সাত্ত্বিক অহঙ্কার। এই-রূপে তিন গুণের আশ্রয়ে তিনটী আধারে অহ-ঙ্কারের প্রকাশ। অবশ্য এখানে সমষ্টি আধারের কথাই বলা হইতেছে। প্রলয়কালে ত্রিবিধ অহঙ্কার মহৎতত্ত্বে লীন হইয়া যায়। মহৎতত্ত্ব প্রকৃতিতে লীন হয়।

সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় মায়ার কার্য্য। উপরে তাহার বিবরণ দেওয়া গেল। ইহা হইতেই মায়ার পরিচয় পাওয়া যাইবে। এই বিষ্ণুমায়া ত্রিগুণা। আত্মসাক্ষাৎকার না হইলে এই মায়াকে কেহ অতিক্রম করিতে পারে না—যাহাদের বুদ্ধি স্থূল, তাহাদের তো কথাই নাই। কিন্তু তথাপি কিরূপে মায়াজাল হইতে নিস্তার পাওয়া যাইতে পারে, সে সম্বন্ধে সকলেই জিজ্ঞাসু হইতে পারে। শ্রীমদ্ভাগবত তাহারও একটা পথ নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন।

মায়া-পাশ ছেদন করিবার ভক্তিই অদ্বিতীয় উপায়। ভক্তি সাধনারও ক্রম আছে। তন্মধ্যে প্রথমেই হইল শ্রীগুরুর চরণাশ্রয়। বৈরাগ্যই তাহার প্রয়োজক । বৈরাগ্য কিরূপে উৎপন্ন হইবে, তাহা বলিতেছি।

স্ত্রী পুরুষ একত্র হইয়া মানুষ সংসার করিতেছে। সংসার করিতে গেলেই কর্ম্ম করিতে হয়। সে সমস্ত কর্ম্মের উদ্দেশ্য কি—না দুঃখ দূর করা, আর সুখ আহরণ করা। এই আশা লইয়াই মানুষ কর্ম্ম করিয়া যায়, কিন্তু ফল তাহার বিপরীতই দেখা যায়। সাধককে এই ব্যাপারটি লক্ষ্য করিতে হইবে।

মানিলাম, সুখভোগকে উদ্দেশ্য করিয়া যে কর্ম্ম করা হইল, তাহা সফলই হইল। কিন্তু বিচার করিয়া দেখিলে বুঝা যায়, বাস্তবিক কর্ম্মদ্বারা সঞ্চিত ধন-জন কিছুই সুখের নিদান নয়। ঘর বাঁধিলাম, ছেলে-পিলে হইল, বন্ধু বান্ধব জুটিল, গরু বাছুর করিলাম—কিন্তু ইহার কোনটাই তো সঙ্গে যাইবার নয়। আর হওয়ার পরও তো নিত্যই তাহাদের নিয়া একটা ঝঞ্ঝাট লাগিয়া আছে। এগুলি তো চিরদিন থাকিবে না—অথচ ইহার জন্য নিজের মরণ নিজে ডাকিয়া আনিয়াছি। এ কথা ভাবিবার পরও কি আর ইহাদের উপর প্রাণের টান থাকে?

পরলোকের সুখের ভরসাই বা কি করিয়া করা যায়? সে-ও তো কর্ম্ম হইতে উৎপন্ন, অতএব নশ্বর। শ্রুতিও এ বিষয়ে বলিতেছেন—যেমন কর্ম্ম দিয়া ইহলোকে যাহা উপার্জ্জন কর, তাহা চিরদিন থাকে না, তেমনি পুণ্য দ্বারা পরকালেও যাহা অর্জ্জন করিবে, তাহাও চিরদিন থাকিবে না।

পরকালের কথা দূরে থাক, ইহলোকেই কি দেখিতেছি? দেশে যদি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বহু রাজা হয়, তবে কি হয়? তাহারা যদি সমান সমান হয়, তবে পরস্পরের সঙ্গে আড়াআড়ি করে, ছোট হইলে বড়কে ঈর্ষ্যা করে, বড় হইলে কখন তাহার রাজ্য যায় ভাবিয়া সন্ত্রস্ত থাকে। সংসারে যাঁহারা সুখ চায়, তাহাদের ব্যাপারটাও কি এই রকম নয়?

মানুষ তাহার শ্রেয়ঃ কি, তাহা বুঝে না। আপাতসুখকেই সে শ্রেয়ঃ মনে করে। কিন্তু তাহার পক্ষে, যাহা উত্তম শ্রেয়ঃ, তাহা শ্রীগুরু জানেন। বৈরাগ্যদৃষ্টিতে সংসারের তত্ত্ব জানিয়া সেই উত্তম শ্রেয়ঃ জানিবার জন্য শ্রীগুরুর চরণাশ্রয় করিতে হইবে।

শ্রীমদ্ভাগবত বলিতেছেন, শ্রীগুরু শাব্দব্রহ্ম ও পরব্রহ্ম উভয়েরই তত্ত্বজ্ঞ হইবেন। বেদই হইল শাব্দ ব্রহ্ম; ন্যায়যুক্তি দ্বারা তাহার তত্ত্ব নিরূপণ করিতে হইবে। ন্যায় ভিন্ন বুদ্ধির সংস্কার দূর হইবার নয়। তাই শ্রীগুরু ন্যায়তঃ বেদের তত্ত্ব জ্ঞাত হইবেন, নতুবা শিষ্যের সংশয় দূর হইবে না।

আবার শুধু ন্যায়তঃ বেদের তত্ত্ব জানিলেই হয় না—উহার অপরোক্ষ অনুভূতিও থাকা চাই, নতুবা গুরু হইতে শিষ্যে অনুভূতি সঞ্চারিত হইবে না। গুরু যে অপরোক্ষা-

অনুভূতিসম্পন্ন, তাহা তাঁহার শান্ত মূর্ত্তিতেই ফুটিয়া উঠিবে।

শ্রীমদ্ভাগবতের গুরুর লক্ষণ দিয়া গুরু চিনিয়া লওয়া সহজ নহে। গুরু সংস্কারের অতীত তত্ত্ব। আমাদের বুদ্ধি সংস্কার দ্বারা মণ্ডিত। আমরা তো বুদ্ধি দিয়াই লক্ষণ বিচার করি। বুদ্ধি স্বরূপ কথা বুঝিবে না, যাহা বুঝিবে, তাহা সংস্কার দ্বারা বিকৃত। সুতরাং বুদ্ধিমান হইলেই গুরু চেনা যায় না।

তবে তাঁহার আশ্রয় মিলিবে কি করিয়া?—ঠিক বলিতে পারি না। অথচ আশ্রয় যে নিশ্চয় মিলিবে, অকপট চিত্তে তাহা বিশ্বাস করি। ভগবানের রাজ্যে সব জোগাড়ই ঠিক হইয়া আছে। সময় হইলে আপনা হইতেই ব্যবস্থা হইয়া যাইবে। আমাদের শুধু যোগ্য হইবার জন্য প্রাণের ব্যাকুলতা চাই। প্রয়োজনের সময় গুরু আপনি আসিয়া আশ্রয় দেন। তিনিই চিনাইয়া দেন, তাই না তাঁহাকে চিনি।

শ্রীমদ্ভাগবত গুরুর যে লক্ষণ বলিলেন, তাহা গুরু কি বস্তু, তাহারই আভাস দিবার জন্য। কিন্তু লক্ষণ ধরিয়া নির্ব্বাচন করিবার স্পর্দ্ধা যেন আমাদের না হয়, কেননা উহা একেবারে অসম্ভব। গুরু না হইলে গুরু চিনিবে কে?

ভাগবত বলিতেছেন, গুরুকেই পরম দেবতা বলিয়া জানিবে, তাঁহাকে নিজের আত্মা বলিয়া জ্ঞান করিবে। সর্ব্বদা একাগ্রচিত্তে সেবা দ্বারা গুরুকে প্রসন্ন করিয়া তাঁহার নিকট হইতে ভাগবত ধর্ম্ম সমূহ শিক্ষা করিবে। সাবধান, সেবাতে যেন কোনও ফাঁকি না থাকে। শ্রীহরি বস্তুতঃ উপাসকদিগের আত্মস্বরূপ; ভাগবত ধর্ম্মসমূহের অনুশীলন করিলে, তিনিই উপাসকের আত্মস্বরূপ জ্ঞান জন্মাইয়া দেন। শ্রীগুরুর নিকট হইতে এই সমস্ত ভাব শিক্ষা করিতে হয়।

এই ভাগবত ধর্ম্ম সমূহ কি, বলিতেছি। প্রথমতঃ, সমস্ত আসক্তির বিষয় হইতে মনটাকে ছাড়াইয়া আনিতে হইবে এবং এই কাজটা সহজ করিবার জন্য সাধুসঙ্গ করিতে হইবে।

জীবের প্রতি উপাসকের কিরূপ ব্যবহার হইবে?—যাহারা হীন, তাহাদিগকে তিনি দয়া করিবেন, সমদশাপন্ন হইলে মৈত্রী স্থাপন করিবেন এবং শ্রেষ্ঠ হইলে তাঁহার নিকট বিনীত থাকিতে শিক্ষা করিবেন।

শৌচ অতীব প্রয়োজন। শৌচ দ্বিবিধ—মৃত্তিকা, জল প্রভৃতি দ্বারা বাহ্য শৌচ ও হৃদয় হইতে দম্ভ, অভিমান দূর করিয়া আভ্যন্তর শৌচ অনুষ্ঠান করিতে হয়।

তারপর স্বধর্ম্মাচরণ—উহাই তপস্যা। দেহ বা মনের উপর যে আঘাতই আসুক না কেন, তাহা সহিয়া যাইতে অভ্যাস করিবে। চিত্ত স্থির হইলে সহিবার শক্তি মিলে; আবার বৃথালাপ বর্জ্জন করিয়া মৌন অভ্যাস করিলে চিত্ত স্থির হয়।

স্বাধ্যায়সম্পন্ন হইবে, অর্থাৎ প্রতিদিন নিজ নিজ অধিকারানুযায়ী বেদ, উপনিষদ, ভক্তিশাস্ত্র প্রভৃতি কিছু না কিছু পাঠ করিবে। যাহা পাঠ করিবে, তাহা পালন করিবার চেষ্টা করিয়া চিত্ত হইতে সমস্ত কুটিলতা ময়লা মাটী দূর করিয়া তাহাকে ঋজু ও বলিষ্ঠ করিয়া তুলিবে।

যথাধিকার ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিবে। যাহারা সংসারাশ্রমে প্রবিষ্ট নহে, তাহাদিগের সংযমের তো কথাই নাই। গৃহস্থও প্রয়োজন হইলে মাসে একবার মাত্র স্বীয় স্ত্রীর ঋতু রক্ষা করিবে।

কাহারও অনিষ্ট চিন্তা করিবে না, কাহাকেও পীড়া দিবে না। শীত-গ্রীষ্ম, সুখ-দুঃখ—এগুলি জোড়ায় জোড়ায় চলে, ইহারা পরস্পরের আপেক্ষিক। ইহাদের বিকারে অভিভূত না হইয়া চিত্তকে সাম্যে রাখিতে চেষ্টা করিও—ইহাদের জন্য হর্ষ বা বিষাদের অধীন হইও না।

সকল স্থানে সকল সময়ে আত্মদৃষ্টি ও ঈশ্বর দৃষ্টি রাখিও অর্থাৎ নিজকে সর্ব্বদা সৎস্বরূপ, চিৎস্বরূপ ও আনন্দস্বরূপ ভাবনা করিও, এবং ভগবানকে নিয়ন্তা বলিয়া স্মরণে রাখিও। আর যে ভাব গ্রহণ করিবে, একান্তভাবে তাহারই অনুশীলন করিও।

ঘর-বাড়ী ধন-সম্পত্তির উপর যেন কোনও অভিমান না থাকে। সর্ব্বদা মনে করিও—, রাস্তায় কুড়াইয়া পাওয়া একটুকরা ন্যাকড়াই আমার পক্ষে যথেষ্ট। এই ভাবে, যাহা পাও তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকিও।

যে শাস্ত্রে ভগবানের কথা আছে, তাহাকে শ্রদ্ধা করিও, কিন্তু তাই বলিয়া অন্য শাস্ত্রের নিন্দা করিও না। মন, বাক্য ও শরীরকে শাসনে রাখিও,—প্রাণায়ামে মন শান্ত হইবে, মৌনে জিহ্বার নিগ্রহ হইবে এবং সঙ্কল্প ছাড়িলে কর্ম্মের নিগ্রহ হইবে। সর্ব্বদা সত্য কথা বলিবে। বাহিরে, ভিতরে নিজের প্রবৃত্তিগুলিকে সামলাইয়া চলিবে।

শ্রীহরির সকলই আশ্চর্য্য; তাঁহার আশ্চর্য্য জন্ম, কর্ম্ম, ও গুণের কথা শ্রবণ করিবে, ভক্তসমাজে কীর্ত্তন করিবে ও নির্জ্জনে ধ্যান করিবে। এইরূপে তাঁহার প্রতি চিত্ত আকৃষ্ট হইবে। তখন যাহা কিছু করিতেছ, তাহা তাঁহারই উদ্দেশে—এই ভাবের অনুশীলন করিবে। যজ্ঞ, দান, তপ, জপ, সদাচার ইত্যাদি যাহাই অনুষ্ঠান কর না কেন—সকলেরই লক্ষ্য তিনি। যাহাই তোমার ভাল লাগে—স্ত্রী-পুত্র, ঘর-বাড়ী, এমন কি নিজের প্রাণ পর্য্যন্ত সেবকভাবে তাঁহাকে সমর্পণ করিবে।

ভগবানকে আত্মা বলিয়া, প্রভু বলিয়া জানিয়া সর্ব্বস্ব তাঁহাকে সঁপিয়া দিয়াছেন, এমন নরোত্তমের অভাব জগতে এখনও হয় নাই। ভাগ্যগুণে যদি তাঁহাদের সঙ্গ লাভ করিতে পার, তবে তাঁহাদিগকে ভালবাসিও, প্রাণ ভরিয়া তাঁহাদের সেবা করিও। আর সেবার অধিকার তো আরও বিস্তৃত। সেবা শুধু মানুষকে কেন—স্থাবর, জঙ্গম, সকলের ভিতরেই ভগবান আছেন, এই বুদ্ধিতে সকলেরই সেবা করা উচিত। মানুষের মাঝে যাঁহারা স্বধর্মনিষ্ঠ ও পরম ভাগবত, তাঁহাদের সেবার তো কথাই নাই।

যখনই সাধু চরিত্রের নিজজন দুই চারিটী মিলিবে, তখনই পরস্পরের সহিত শ্রীভগবানের পুণ্যকীর্ত্তির আলোচনা করিবে। এই আলোচনা হইবে ভগবৎমাধুরী আস্বাদন করিবার জন্য—পাণ্ডিত্য ফলাইবার জন্য নয় বা বাদ-বিতণ্ডা করিবার জন্য নয়। আলোচনা এমনভাবে করিবে, যাহাতে পরস্পরের প্রতি অনুরাগ বৃদ্ধি হয়, মনে হয়, "আহা, আজকার দিনটী যে আনন্দে কাটিয়া গেল, এমন যেন প্রতিদিনই হয়।" আলোচনাতে অনুরাগ বাড়িবে, প্রাণের তুষ্টি হইবে, সংসারের সকল দুঃখ-গ্লানি মুছিয়া যাইবে, অন্তরাত্মা জুড়াইয়া যাইবে।

ভজনের পথ মোটামুটী বলা হইল। যাঁহারা এইভাবে জীবন কাটান, তাঁহাদের যে কি নিবিড় আনন্দ, তাহা ভাষায় প্রকাশ করিয়া বলা যায় না। শ্রীহরির গুণ স্মরণ করিয়া ও প্রিয়জনকে তাহা স্মরণ করাইয়া

চিত্তের সমস্ত কালিমা দূর হইয়া যায়—সাধন ভক্তি হইতে ক্রমে প্রেমভক্তিতে উত্তীর্ণ হইয়া সাধক আনন্দপুলকিত দিব্যতনুর অধিকারী হন।

তখন শ্রীহরির কথা ভাবিতে গিয়া কেহ কাঁদিয়া আকুল হন, কাহারও মুখমণ্ডল আনন্দজ্যোতিতে উজ্জ্বল হইয়া উঠে, কেহ বা সে আনন্দ হৃদয়ে ধারণ করিতে না পারিয়া হাসেন, নৃত্য করেন, নানা অলৌকিক কথা বলেন, শ্রীহরির লীলার অভিনয় করেন—আবার কেহ বা ভাবের গভীর লোকে প্রবেশ করিয়া পরমানন্দভরে চিরদিনের জন্ত মৌনী হইয়া যান।

ভাগবতধর্মের স্বরূপ ও ফল কীর্ত্তন করা হইল। এই ধর্ম আচরণ করিলে ভক্তি লাভ হয়; ভক্তি দ্বারা নারায়ণকে পাওয়া যায়। তাঁহাকে পাইলেই তবে মায়ার বন্ধন কাটিয়া যায়।

বিষ্ণুর মায়া ও সেই মায়াপাশ ছেদন করিবার উপায় বলিলাম। শ্রীভগবান্, ভাগবত ও ভক্তের জয় হউক।

সত্যের প্রকাশ

আমাদের জীবন যখন সহজ, তখনই বাস্তবিক তা সুন্দর। সে সৌন্দর্য্য শুধু কমনীয়তায় এলিয়ে পড়ে না, সে বজ্রের মত কঠিনও বটে। এমন ঘটনা তো রোজ কতই ঘটছে জীবনে—যার জন্য নিজকে সঙ্কুচিত রাখতে হচ্ছে। যেখানে সঙ্কোচ, সেইখানেই তো পাপ, সেইখানেই নিরানন্দ। আকাশে আলোর যে প্রকাশ, তা কোনও লজ্জার আবরণে ঢাকা পড়ে না; আমাদের চোখের উপর আবরণ থাকতে পারে, কিন্তু আলোর প্রকাশ তাতে বাধা পায় কি? আমাদের জীবনও এমনি আলোর মত স্বতঃস্ফূর্ত্ত, স্বতঃ আনন্দময় করে তুলতে হবে। নিজকে জগতের সামনে ধরতে যেন আমাদের কোনও সঙ্কোচ না থাকে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত জীবনে এই পরম লাভটুকু সঞ্চয় করতে না পারছি, ততক্ষণ পর্য্যন্ত বুঝব, আমরা কিছুর জন্যই তৈরী হতে পারিনি। যা লাভ করেছি, দেহমন প্রাণের প্রকাশভঙ্গীতে তা ফুটিয়ে তুলব, তার জন্য তো আমাদের বাধা দেবার অধিকার কারু নাই। অনধিকার চর্চ্চা জগতে খুবই হয়, তা মানি; কিন্তু ভীরুর মত তাকে মাথা পেতে স্বীকার করেই বা নেব কেন? সত্য কথা সহজ, সত্য কথা সুন্দর; সেই সত্যের প্রতি শ্রদ্ধা অচল রাখতে গিয়ে যদি মর্ম্মান্তিক নির্য্যাতনও সইতে হয়, তবুও পিছু হটলে চলবে না।

সত্য প্রকাশ করতে গেলে লাভালাভের বিচার ভুললে চলে না। সংসারী বুদ্ধি বলে, শ্যাম রাখি, কি কুল রাখি? কিন্তু সত্যবুদ্ধি বলবে, রাখলে একটাই রাখব—দোটানার মাঝে তো স্বস্তি নাই। এমনি করে একটা দিকের চরম দেখতে গিয়ে সংসারের হিসাবে যদি ক্ষতিও কিছু হয়, তবুও অন্তর্য্যামী তাঁর অক্ষয় ভাণ্ডার হতে সে ক্ষতি যে পূরণ করে দেবেন, এ কথা খুবই বিশ্বাস করি।

তার পর না হয় লাভালাভের কথাই ধরলাম। মনে কর, আমরা যেটাকে সত্য বলে প্রাণমনে জান্‌ছি, সেটাকে মুখ ফুটে বল্‌তে গেলে, আমাদের অপর দিক দিয়ে ক্ষতি হওয়ার খুবই সম্ভাবনা। সেই ক্ষতি হতে বাঁচবার জন্য নিজের প্রাণে সঙ্কোচ পুরে রাখলাম। কিন্তু কথা হচ্ছে, এমনি করে সব ক্ষেত্রেই ক্ষতির হাত হতে কেউ বেঁচেছে কি? কাণা হরিণ নদীর ধারে চরতে গিয়ে ডাঙ্গার দিকে ভাল চোখটা রেখেছিল—কিন্তু জলের দিক দিয়ে যে তার মরণবাণ আসতে পারে, সে খেয়াল তার হয়নি। আমাদেরও অনেক সময় ওই কাণা হরিণের মতই দশা হয়।

জীবনে নিছক্ শান্তি কেউ পায় না—পেলেও সেটা স্বাস্থ্যের লক্ষণ নয়। মহাপুরুষের প্রশান্ত মুখের দিকে তাকিয়ে সাধারণ মানুষ একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে ভাবে, আহা, কোনও রকমে যদি ওই শান্তিটুকু বাগিয়ে নিতে পারতাম। কিন্তু কত বড় ঝড়-বাদলের পর যে আলোকের ওই স্নিগ্ধ হাসিটুকু ফুটে উঠেছে, তার খবর যদি তারা রাখত! বাদলের পর জ্যোৎস্না বলেই না সেটা আরো মধুর।

সত্য যে পেয়েছি, তার একটা কঠিন পরীক্ষা তো চাই। জগতের এই নিরেট বস্তুপিণ্ডের গায়ে ঠুকে ঠুকে তার পরখ করে নিতে হবে। তা ছাড়া সত্য জিনিষটা এমন নিরীহ মোটেই নয় যে, মনের কোণে তাকে গুঁজে রেখে কেউ স্বস্তিতে নিঃশ্বাস ফেলবে। সে আসলেই চারদিকে একটা কোলাহল পড়ে যাবে—কেন না সে রাজা; তার নীতিকে সবাই যেমন শ্রদ্ধা করে, তেমনি পাপী তার দণ্ডকেও ভয় করে।

অথচ এ কথাও জানি, এই যে বস্তুটী নিয়ে জগতের সঙ্গে সাধকের এত বিরোধ বেধে যায়, তার মত প্রশান্ত, তার মত ব্যাপক আর কোথাও কিছু নাই। এই প্রশান্তির বুকেই জগতের যত অশান্তি ছট্‌ফটিয়ে মরে, এই ব্যাপকতার মাঝেই জগতের যত সঙ্কোচ আর ভয় কিল্‌বিল্ করতে থাকে। যেমন এই আকাশে কোন শব্দ নেই বলেই সে বিশ্বের সকল শব্দের উদ্ভবস্থল, তার কোন রূপ নেই বলেই, বিশ্বের সকল রূপ তারই মাঝে রেখাপাত করেছে।

এত বড় জিনিসটী নিজের ভিতরে পেলে বাস্তবিকই কারু সঙ্গে বিরোধ থাকতে পারে না। তবে বলেছি, বাইরে কোলাহল একটা থাকবেই। ওই তো মায়া। মায়ার মাঝে চলাফেরা কর, তার কোন অঙ্গই সুন্দর লাগবে না—তাকে বাইরে থেকে দেখ, তার মত সুন্দর আর নাই। তখন আগে যেটাকে কৃত্রিম বলে মনে হয়েছিল, সেইটাকেই সহজ বলে মনে হবে।

তবে এই সহজটুকু পাবার আগে লড়াই করতেই হবে। লড়াইকে যদি ভয় কর সহজকে পাবে না।

সম্বাদ ও মন্তব্য

আগামী ২৬শে অগ্রহায়ণ বুধবার অত্রত্য সারস্বত মঠের অন্তর্গত শ্রীগৌরাঙ্গ-সেবাশ্রমের ১৩শ বার্ষিক উৎসব অনুষ্ঠিত হইবে। আমরা সাধু, সন্ন্যাসী, ভক্তবৃন্দ, আর্য্যদর্পণের গ্রাহক, অনুগ্রাহক ও পাঠকগণকে উক্ত উৎসবে যোগদান করিয়া আনন্দ বর্দ্ধন করিবার জন্য সাদরে আহ্বান ও নিমন্ত্রণ করিতেছি।

আগামী পৌষ মাসের ১১ই, ১২ই, ১৩ই তারিখে বগুড়া—শ্রীগৌরাঙ্গসেবাশ্রমে ভক্ত-সম্মিলনীর ৯ম বার্ষিক অধিবেশন হইবে। আমরা আসাম-বঙ্গীয় সারস্বত মঠের শাখা-আশ্রম গুলির পরিচালক, পৃষ্ঠপোষক ও ভক্তগণকে সম্মেলনে যোগদান করিবার জন্য আবাহন করিতেছি। কাহাকেও পৃথক পত্র পাঠাইতে পারিব না। আপন আপন বিছানা সঙ্গে আনিবেন। অত্র মঠাধিষ্ঠাতা পরমারাধ্য শ্রীশ্রীপরমহংসদেব ঐ সময়ে বগুড়া শ্রীগৌরাঙ্গ সেবাশ্রমে অবস্থিতি করিবেন।

আরণ্যক

—*—

"যজ্ঞেন বাচঃ পদবীয়মায়ন্ তামন্ববিন্দন্ ঋষিষু প্রবিষ্টাম্ ॥"

—ঋগ্বেদ সংহিতা ১০।৭১।৩

ওগো প্রভু,

এত দিন ধরিয়া তো জীবনটাকে লইয়া কেবল ছিনিমিনি খেলাই খেলিতেছিলাম, মনুষ্য জীবনের যে গুরুতর দায়িত্বভার আমার উপর, দিয়াছিলে সে দিকে তো একবারও ফিরিয়া তাকাই নাই। মনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাসনা কামনাগুলিকেই একান্ত প্রীতির চক্ষে দেখিতাম, আর তাহাদের পাকে পাকে নিজকে কেবলই জড়াইতেছিলাম। আজ আমার সেই চিরাভ্যস্ত স্বপ্নঘোর দূর করিয়া—তন্দ্রালস চেতনাকে আহত করিয়া মনের কোণ হইতে চির-অবরুদ্ধ পুঞ্জীভূত অন্ধকার সরাইয়া দিয়াছ। তাই এখন এতদিনের অজ্ঞানাচ্ছন্ন ব্যর্থ জীবনের বেদনা তীব্রভাবে অন্তরকে দগ্ধ করিতেছে।

তুমি মঙ্গলময়! তোমার ইচ্ছা সত্য—তোমার আহ্বান সত্য। তাই আমার ভিতর এই নূতন প্রেরণা জাগাইয়া দিয়া তোমারই দিকে আকর্ষণ করিতেছ। কিন্তু বেশ বুঝিতেছি, এখনও সে মহামিলনের সময় হয় নাই। বোধ হয়—

—এখনও কত দীর্ঘরজনী
জাগিতে হইবে পল গণি গণি!

ক্ষাত্র শোণিতের উগ্রতেজ এখনও আমার শিরায় শিরায় প্রবাহিত হইয়া নিয়ত আমাকে চঞ্চল করিয়া তুলিতেছে—একদিকে তোমার আকর্ষণ আর একদিকে প্রবৃত্তির বিকর্ষণ—তাই ভিতরে ভিতরে নিয়ত যুদ্ধই চলিতেছে। ব্রহ্মণ্যদেবের বিমল জ্যোতিতে যে দিন হৃদয় মন উদ্ভাসিত হইয়া উঠিবে—ক্ষত্র-হৃদয়ের চাঞ্চল্য সাত্ত্বিকতার মাঝে প্রশান্তি লাভ করিবে, সেই দিনই বোধ হয় মিলনের বাধা অপসারিত হইবে। তোমার করুণার উপর নির্ভর করিয়া সেই শুভ মুহূর্ত্তেরই প্রতীক্ষায় রহিলাম।

—*—

প্রত্যেক জীবনেরই দুইটী ধারা রহিয়াছে। একটী এই কর্ম্মময় মনুষ্যজীবনে প্রকীর্ণ, আর একটী ভাবলোকের দিকে প্রসারিত। এই দুইটীকে তোমার আপাত-বিরুদ্ধ বলিয়া মনে হইবে, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নয়। এই দুইটীই পরস্পরাপেক্ষী। যেমন তোমার চোখ আর পা দুখানি। চোখের এমন সাধ্য নাই যে পায়ের সাহায্য ব্যতীত ঘুরিয়া ফিরিয়া জগতের এই বিচিত্র সৌন্দর্য্য উপভোগ করে। আবার পায়েরও এমন আস্ফালন করিবার ক্ষমতা নাই যে, সে চোখের সাহায্য ছাড়া নির্ব্বিঘ্নে চলিয়া বেড়াইবে।

এই দুইটী ধারার সামঞ্জস্যেই জীবন পরি-

পূর্ণ মহিমায় প্রোজ্জ্বল হইয়া উঠে। ভাবের উচ্ছ্বাস যদি তোমার ভিতর কেবল উন্মত্ত ভাবুকতারই সৃষ্টি করে, তবে তাহা তোমার সূক্ষ্ম আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি সম্পাদন করিয়া চিত্তকে একটা খণ্ড আনন্দের লালসায় মত্ত করিয়া তুলিবে। তাহার ফলে জীবনের ভার-কেন্দ্র একদিকে অস্বাভাবিক ঝুঁকিয়া পড়িয়া এই কর্ম্মক্ষম দেহলাভের সার্থকতা হইতে তোমাকে বঞ্চিত করিবে। আবার কর্ম্মও যদি ভাবহীন হয়, তবে তাহা তোমাকে কেবল উচ্ছৃঙ্খল ও স্বার্থপরতার পথে পরিচালিত করিয়া কর্ণধারহীন তরণীর মত সংসারসাগরে ঘূর্ণপাক খাওয়াইবে।

লাবণ্য যেমন দেহের সৌন্দর্য্যকে আরও প্রস্ফুট করিয়া তোলে। তেমনি ভাবও যখন কর্ম্মকে অবলম্বন করিয়া বিচিত্ররূপে আত্ম-প্রকাশ করিবে, তখন এই কর্ম্মময় সংসারে তোমার অবতীর্ণ হওয়া যথার্থ শ্রী লাভ করিবে—জীবনকে একটা অখণ্ড আনন্দময় সঙ্গীত বলিয়া বোধ হইবে। তখন এই কর্ম্মস্রোতে নিজকে ঢালিয়া দিয়া সুখেও যেমন আনন্দ পাইবে, দুঃখেও তেমনি অন্তরের আনন্দ অটুট থাকিবে।

—*—

জীবনের গৌরবময় আদর্শের উজ্জ্বল মূর্ত্তি মনের মাঝে দৃঢ়রূপে অঙ্কিত করিয়া লও। সংসারে অসত্যের মাঝে ক্ষুদ্রতার মাঝে ডুবিয়া থাকিলে অতৃপ্ত বুভুক্ষায় তোমার চিত্ত কেবলই পীড়া অনুভব করিবে।

স্বল্পমপ্যস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ।—মহান্ আদর্শের পথে যতটুকুই অগ্রসর হইতে থাকিবে, ততই তোমার স্বোপার্জ্জিত সংস্কারের মিথ্যাবন্ধন এক একটি করিয়া খসিয়া পড়িবে—জন্মভয়, মৃত্যুভয়, ত্রিতাপের ভয় তোমার কাছ হইতে দূর হইতে সুদূরে সরিয়া যাইবে!

*

সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব তুমি। তাই জগতের শ্রেষ্ঠ অধিকারও তোমাকেই আয়ত্ত করিতে হইবে—এই মর্ত্ত্য জগতে অমৃতের আবাহন করিয়া আনিতে হইবে। শান্তির আশায় তৃপ্তির অনুসন্ধানে হয়ত কত জন্ম বৃথা অপব্যয় করিয়াছ কিন্তু শান্তি পাও নাই, কেননা যাহাকে খোঁজা উচিত ছিল তোমার ভিতরে, ভুল করিয়া তাহাকে খুঁজিয়াছ বাহিরে—জগতের এই স্তূপীকৃত বাহ্য উপকরণের মাঝে। চিত্তের এই বাহির্ম্মুখীনতাই তোমার যত দুঃখ-অশান্তির মূল। আজ ইচ্ছা মাত্রই তাহাকে অন্তর্ম্মুখীন করিতে পারিতেছ না বলিয়া হতাশ হৃদয়ে মুহ্যমান হইয়া মনুষ্যত্বকে বিসর্জ্জন দিও না—কাপুরুষ সাজিয়া স্রষ্টার অপমান করিও না।

*

শক্তির অফুরন্ত উৎস তোমার ভিতরে। তুমি বীর! উঠো, জাগো—প্রাপ্যবরান্ নিবোধত। দূর করে দাও অন্তরের গ্লানি, মান-অভিমান, আর হিংসা-দ্বেষ-কুটিলতা। জীবনভরা ব্যর্থতার অর্ঘ সাজাইয়া শিশুর মত উদার উন্মুক্ত হৃদয়ে মহাপুরুষের চরণতলে শরণ লও, তিনি যে পরশমণি। তাঁর স্পর্শে তোমার চির-জন্মার্জ্জিত কলুষ-কালিমা মুহূর্ত্তে রূপান্তরিত হইয়া জীবন ধন্য হইবে—শান্তির সুস্নিগ্ধ ফল্গুধারা হৃদয়কে অভিষিক্ত করিবে, তখন তাঁর কৃপায় তোমার অন্তরে অমৃত প্রবাহ স্বতঃ উৎসারিত হইয়া উঠিবে।

ওঁ তৎ সৎ

আর্য্য-দর্পণ

(সনাতন ধর্ম্মের মুখপত্র)

১৬শ বর্ষ } পৌষ ৯ম সংখ্যা

অগ্নির্বিশ্বরূপঃ

—*—

[ঋগ্বেদ সংহিতা—২।১।১]

ত্বমগ্নে দ্যুভিস্ত্বমাশুশুক্ষণিঃ
ত্বমদ্ভ্যস্ত্বমশ্মনস্পরি।
ত্বং বনেভ্যস্তমোষধীভ্যঃ
ত্বং নৃণাং নৃপতে জায়সে শুচিঃ।

তবাগ্নে হোত্রং তব পোত্রমৃত্বিয়ং
তব নেষ্ট্রং ত্বমগ্নিদৃতায়তঃ।
তব প্রশাস্ত্রং ত্বমধ্বরীয়সি
ব্রহ্মা চাসি গৃহপতিশ্চ নো দমে।।

ত্বমগ্ন ইন্দ্রো বৃষভঃ সতামসি
ত্বং বিষ্ণুরুরুগায়ো নমস্যঃ।
ত্বং ব্রহ্মা রয়িবিদ্ ব্রহ্মণস্পতে
ত্বং বিধর্ত্তঃ সচসে পুরংধ্যা।।

ত্বমগ্নে রাজা বরুণো ধৃতব্রতঃ
ত্বং মিত্রো ভবসি দস্ম ঈড্যঃ।
ত্বমর্য্যমা সৎপতির্যস্য সংভুজং
ত্বমংশো বিদথে দেবভাজয়ুঃ ॥

দ্যুলোকভূষণ অগ্নি, দিকে দিকে তব দীপ্তি-লীলা—
জেগেছ সলিল হতে, উজলিয়া জাগ যজ্ঞশিলা ;
লভিয়া জনম বনে, ওষধীতে ঢাল তনুরুচি,
নরের নৃপতি তুমি, জনমিলে হয়ে চিরশুচি।

তুমিই ঋত্বিক অগ্নি, জানি যজ্ঞে তোমারেই হোতা,
তুমিই অগ্নিৎ পুনঃ, তুমি নেষ্টা, তুমি সেথা পোতা—
প্রশাস্তার কর্ম্ম তব, অধ্বর্য্যু যে তুমিই অধ্বরে—
যজ্ঞভূমে ব্রহ্মা তুমি, গৃহপতি আমাদের ঘরে।

তুমি অগ্নি ইন্দ্রদেব—সাধুজনে কাম্য ফলদাতা ;
তুমি বিষ্ণু—নমে বিশ্ব, নিত্য তব গাহে কীর্ত্তিগাথা।
ব্রহ্মা তুমি, বিশ্বলীলাসুচতুর বেদ-অধিপতি,
হৃদয়ে মিলালে সবে—হয়ে ধাতা নিখিলের গতি।

তুমিই বরুণ রাজা, বিশ্ব জুড়ি তোমার শাসন,
মিত্ররূপে ঢালো আশ—বিশ্বহৃদে নিয়েছ আসন।
সৎপতি অর্য্যমা তুমি, নিখিলের করেছ কল্যাণ,
অংশরূপে যজ্ঞভূমে লভিয়াছ দেবতার মান।

ক্রমিক সং
শ্রেণী সং
কলিকাতা

দাম্পত্য-জীবন

চসমার ভিতর দিয়ে আমরা দেখি বটে, কিন্তু তা বলে চসমা চোখের বোঝা নয়। চসমায় দৃষ্টি বাধা দেয় না, বরং সহায়তাই করে। চক্ষু আর দৃশ্যবস্তুর মাঝে ওটা পরদা নয়, বরং ওতেই দৃশ্য আরও উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। স্বামী-স্ত্রীর মাঝে সম্বন্ধটাও এই রকমই হওয়া উচিত। তাদের মাঝে একজন আর একজনের পক্ষে বাধা না হয়ে বা একজনকে দিয়ে আর একজনকে মুড়ে না রেখে পরস্পরের ভিতর দিয়ে জগৎটাকে দেখতে শেখা উচিত। স্বামী-স্ত্রীর মাঝে যদি অধ্যাত্মযোগ থাকে, বেদান্তবোধের উপর যদি তাদের সম্বন্ধের প্রতিষ্ঠা হয়, তবেই এমন দেখা সম্ভব হতে পারে। ব্যক্তিত্ববোধ, সংস্কার, পারিপার্শ্বিক, আচারব্যবহার, হৃদয়াবেগ, ইত্যাদি সকলকে জড়িয়ে কেবল আত্মাকে দেখতে শিখতে হবে—বেদান্ত ছাড়া তার আর কোনও উপায় নাই।

নিশ্বাস-প্রশ্বাস আমাদের এত কাছে, অথচ তাকে আমরা জানতেও পারছি না যেন;—স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের মাঝেও এমনি নৈকট্যবোধ থাকা প্রয়োজন, তারা বোঝা হবে কেন? একজন আর একজনের বুক চেপে বসবে কেন? দুজনাই মুক্ত। একজনের কাছে একজনের চিন্তা ভারস্বরূপ বলে মনে হবে না। আজকালকার দাম্পত্যজীবনে দেখি কি? স্বামী ভাবে, স্ত্রী তার আধ্যাত্মিক উন্নতির পক্ষে মহাবিঘ্ন। স্ত্রীরাও স্বামীকে একটা মহা জঞ্জাল আর ভার বলে ভাবতে সুরু করেছে।

ভারতবর্ষে স্ত্রীপুরুষে চোখে কাজল দেয়, দৃষ্টিশক্তি নাকি তাতে তীক্ষ্ণ হয়। কাজল চোখেই থাকে, কিন্তু তা বলে দেখা আটকায় না। চোখে কাজল যখন বাধ-বাধ ঠেকে, তখন বুঝতে হবে, হয়ত কোথাও গলদ আছে। তোমার পাকস্থলীর বোধ যখন জাগে, তখন বুঝতে হবে, নিশ্চয়ই পেটের কিছু গোলমাল আছে। এই হল আইন।

রামের পূর্ব্বাশ্রমে তাঁর স্ত্রী জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "আমার কথা মনে কর কি?" রাম উত্তর করলেন, "মনে করব কি? রাম কি কখনও কিছু মনে করেন? আমা হতে যদি পৃথক কিছু থাকে, তবেই মনে করা চলে। তোমার চোখ, নাক, হাতকে কি তুমি মনে করে রাখ?—কখনই না, কেননা তারা তোমার সঙ্গে এক। একজন যদি আর একজনের সঙ্গে মিলে মিশে একাকার হয়ে যায়, তবে আর মনে করবার কিছু থাকে না।" এই সমস্ত কথা বেশ তলিয়ে বুঝতে হবে।

বন্ধুর কাছ থেকে চিঠি পেলে আমাদের তা খুবই ভাল লাগে—একখানা চিঠি পেয়েই আমরা একেবারে মেতে যাই। চিঠিখানা এত ভাল লাগে বন্ধুকে ভাল লাগে বলেই। স্বামীস্ত্রীও তেমনি পরস্পরের কাছে যেন ভগবানের চিঠির মত। স্ত্রীর কাছে স্বামীর দেহ ভগবানের চিঠি। সে হিসাবে দেহটাকে সে আদরযত্ন করতে পারে বটে, কিন্তু তবুও স্ত্রীকে মনে করতে হবে, দেহটা

চিঠি বা ছবির মতই—আসল জিনিষ ওটা নয়। এমনি করে স্বামীর ভিতর দিয়ে স্ত্রীর ভগবদ্দর্শন করতে হবে। স্বামী স্ত্রীর কাছে পরমবস্তুর সঙ্কেত—ভগবানের আলেখ্য।

রাত্রের নির্জ্জনতায় যদি দেহের মিলন হয়, তবে দিনের সজনতায় আত্মার মিলন ঘটাতে হবে। রাত্রে দেহের মিলনে যদি আত্মার মিলনানুভূতি না এসে থাকে, তবে দিনে দেহের সংস্পর্শ হতে পৃথক থেকে সেই অনুভূতি আনবার জন্য চেষ্টা করতে হবে, রাত্রের ফাঁক দিনে পূরণ করে নিতে হবে। প্রতি আলিঙ্গনে স্ত্রীকে ভাবতে হবে, আমি পরমপুরুষকে হৃদয়ে ধারণ করছি। হে জ্যোতিঃস্বরূপ, এস, আমার বুকে এস! আমি জ্যোতির্ম্ময় পুরুষকে আলিঙ্গন করছি। সেই জ্যোতিকে তুমি সুখ বলতে পার, পরম শুদ্ধস্বরূপ বলতে পার, বিশ্বজগতের সঙ্গে মিলন বলতে পার। হে ব্রহ্মস্বরূপ, হে জ্ঞানস্বরূপ, এসো তুমি, তোমাকে আমার বাহুবন্ধনে বেঁধে নিই!—

এমন করে স্বামীর সম্পর্কিত সব বিষয়েই ভগবানকে ভাবনা করতে হবে। রাত্রে যদি এই অনুভূতি না পেয়ে থাক, তবে দিনে তার অনুশীলন করে বল সঞ্চয় কর। দাম্পত্য-জীবনের এই ঐক্যসাধনা খুব সহজেই করতে পার। শান্তস্বরূপ, শিবস্বরূপ, অদ্বৈতস্বরূপকে প্রেমের আলিঙ্গনে জড়িয়ে ধর—সমস্ত বিশ্বজগৎকে ভাব তোমার দেহ। এই ভাবটি সর্ব্বদা মনে স্থির রাখতে হবে। বেদান্ত যেমন বলছেন, দেহের মিলনের কথা মনের ত্রিসীমাতেও ঘেঁসতে দিও না, একটা দেহ যেন আর একটা দেহের কাছে বোঝা হয়ে না ওঠে তেমনি আবার এ কথাও বলছেন যে আধ্যাত্মিক মিলনে দিবানিশি ভোর হয়ে থাক। সর্ব্বদা এই ভাবনা কর যে বিশ্বের শক্তি, প্রেম, ছন্দ, সমস্তই আমার মাঝে—ব্রহ্মভাব আমার মাঝে। সোঽহং—আমি সেই। তোমার বিবাহ হয়েছে পরম পুরুষের সঙ্গে—তিনিই সত্য—তরুলতা, নদী, পর্ব্বত সর্ব্বত্রই তাঁকে দেখতে হবে—তিনি তোমারও স্বরূপ—তিনিই সব, তুমিই সব।

● ● ●

একটা গল্প বলি শোন।

এক দেশে এক রাজা ছিলেন, তাঁর বিদ্যা, বুদ্ধি, গুণের আর তুলনা ছিল না। কত বছর পার হয়ে গেল, কিন্তু রাজা বিয়ে করলেন না। প্রজাদের খুবই ইচ্ছা, রাজা বিয়ে করেন, নইলে সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হবে কে? প্রজারা উঠে পড়ে লাগল, রাজাকে একটী রাণী যোগাড় করে নিতেই হবে। রাজা অগত্যা রাজী হলেন, কিন্তু প্রজাদের সঙ্গে সর্ত্ত রইল, রাণী পছন্দ রাজা নিজেই করবেন। সে দেশে কারু খেয়ালমত চলবার অধিকার ছিল না—এমন কি প্রণয় ও পরিণয় ব্যাপারেও কারু স্বাতন্ত্র্য ছিল না। দেশাচার ছিল তাদের নিয়ন্তা। তাই রাজা সর্ত্ত করে নিলেন যে তাঁর ইচ্ছামত তিনি বিয়ে করবেন। প্রজারা দেখল, তারা যদি রাজার কথায় সম্মত না হয়, তবে চিরকাল রাজা কুমারই থেকে যাবেন। তাই রাজাকে তাঁর পছন্দমত বিয়ে করতেই তারা অনুমতি দিলে।

রাজা সভাসদদের হুকুম করলেন বিবাহোৎসবের সব আয়োজন-উদ্যোগ করতে। রাজ-রাজড়ার কাণ্ডে যেমন হয়ে থাকে, আয়োজন তেমনই হল। সৈন্যসামন্তেরা খুব ঘটা করে সেদিন সাজগোজ করল—আমীর ওমরাওরা জাঁক করে জুড়ি হাঁকিয়ে চল্লেন।

অর্দ্ধেক সৈন্য সামনে, অর্দ্ধেক পেছনে—রাজা চললেন তাদের মাঝে। রাজার হুকুম মত তারা চলছে—কোনও একটা রাস্তা ধরে নয়। ক্রমে তারা গভীর বনের ভিতর দিয়ে চলল। সবাই বলাবলি করতে লাগল, "রাজার মতলবখানা কি? রাজা কি বন জঙ্গল বিয়ে করবে, না পাহাড় বিয়ে করবে?" তারা অবাক হয়ে যেতে লাগল। চলতে চলতে শেষে বনের মাঝে এক কুঁড়েঘরের সামনে এসে তারা দাঁড়াল—কাছেই একটা হ্রদ, স্ফটিকের মত তার জল, হ্রদের তীরে স্বভাব সুন্দর ফলের বাগান—তার মাঝে একটা গাছের ডাল হতে একখানা খাটিয়া ঝুলছে, তাতে একটী বুড়ো মানুষ শুয়ে আছে। সৈন্য সামন্তেরা বলল, "রাজা কি এই বুড়োকে বিয়ে করবে নাকি?" অর্দ্ধেক সৈন্য পার হয়ে গেল, রাজার হাতী যখন এসে বুড়োর সামনে দাঁড়াল, রাজা তখন সবাইকে থামতে বললেন। তখন এক আশ্চর্য্য সুন্দরী কন্যা এসে সেই দোলাতে দোল দিতে লাগল। যে বুড়ো শুয়েছিলেন, তিনি তার পিতা।

রাজা রাজত্ব পাওয়ার পূর্ব্বে অনেকবার এই বনে এসেছেন। এই মেয়েটীকেও তিনি বহুবার দেখেছেন, প্রতিবারই তার সেবাতৎপরতা দেখে মুগ্ধ হয়েছেন। সে তার বাপকে নাওয়াতো, খাওয়াতো, প্রাণ ঢেলে তাঁর সেবা করত। গৃহস্থালীর ঘসামাজা, ধোয়াপোঁছার যত কাজ, সবই সে নিজে করত। কিন্তু যত খাটুনীই পড়ুক না কেন, তার মুখে আনন্দের হাসিটুকু লেগেই থাকত। তার স্বভাবটী পাখীর গানের মত আনন্দভরা ছিল। মেয়েটীর এই সদানন্দ ভাব দেখে রাজার তাকে খুব মনে ধরল। রাজা সঙ্কল্প করলেন, যদি কখনও বিয়ে করেন, তবে একেই করবেন।

এত সব লোকলস্কর দেখে মেয়েটী অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল। ওই যে লোকটী ঘোড়ায় চড়ে কতবার তাদের দুয়ারের সামনে দিয়ে গিয়েছেন, উনিই যে রাজা, এ কথা সে কখনও মনেও করেনি। সে তার বাপকে জিজ্ঞেস করল, "বাবা, এত সব লোকজন কিসের জন্য?" বাবা বললেন, "এক রাজা বর হয়ে চলেছে আর এক রাজার দেশে, রাজকন্যা বিয়ে করবে বলে।"

রাজা হাতী থেকে নেমে বৃদ্ধকে প্রণাম করলেন। বৃদ্ধ জিজ্ঞেস করলেন, "বাবা, কি চাও তুমি?" রাজার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল, তিনি বললেন, "আপনি আমাকে আপনার জামাই করুন।" শুনে বৃদ্ধের আনন্দ আর ধরে না। কিন্তু তবুও তিনি রাজাকে বললেন, "মহারাজ তোমার ভুল হয়েছে। ফকিরের মেয়েকে তুমি বিয়ে করবে? আমরা যে বড় গরীব, বাবা।" রাজা বললেন, "আপনার মেয়েকে আমি যেমন ভালবাসি, এমন জগতে কাউকে নয়।" বৃদ্ধ বললেন, "তাই যদি হয়, তবে এ মেয়েকে তোমায় দিলাম।"

বাবা ছিলেন বৈদান্তিক, মেয়েকেও তেমনি তিনি শিক্ষা দিয়েছিলেন। রাজাকে বললেন, "মহারাজ, আমার এমন কিছু নাই যে আমি মেয়েকে যৌতুক দিই—একমাত্র আশীর্ব্বাদই আমার সম্বল।" রাজা কনেকে সাজগোজ করবার জন্য অনেক দামী পোষাক দিলেন। মেয়ে সে সব পরল। তারপর যথারীতি বিয়ে হয়ে গেল। মেয়ে শ্বশুরবাড়ী যাবে—কিন্তু বিনা যৌতুকে নিতান্ত খালি হাতে সে গেল না। তবে কি যৌতুক সে নিয়ে গেল? রাজা তাকে যে অলঙ্কারের

কৌটা দিয়েছিলেন, তার একটীতে বাবার সঙ্গে থাকবার সময় সে যে ছেঁড়া ন্যাকড়া পরে থাকত, সেগুলি পুরে নিয়ে চলল। বুড়োর কাছে আর কেউ থাকল না—কেবল তাঁর সেবার জন্য রাজা একজন লোক রেখে গেলেন। রাজার কাছে তিনিও তার বেশী কিছু চাইলেন না।

রাজা তো রাণী নিয়ে এলেন। অমাত্যদের প্রথম প্রথম রাণীর উপর নজর বড় ভাল ছিল না, কেননা রাণী ছোট জাতের মেয়ে। তাদের মনে ছিল, রাজা নিদানপক্ষে তাদের ভাগ্নী বা ভাইঝিকে বিয়ে করবেন, কিন্তু শেষে কিনা এই ছোটলোকের মেয়েটা কোথা থেকে উড়ে এসে জুড়ে বসল। রাণীর উপর ঈর্ষ্যায় তারা ফেটে মরতে লাগল। কি করে ঐ মেয়ের পায়ে তারা মাথা লোটাবে? কিন্তু রাণী তাঁর মিষ্ট স্বভাবে আর মধুর ব্যবহারে ক্রমে সকলকে মুগ্ধ করে ফেললেন। কালে সবাই রাণীকে প্রাণ খুলে ভালবাসতে লাগল। রাণী সর্ব্বদাই স্থির, ধীর, শান্ত হয়ে থাকতেন—যাই ঘটুক না কেন, কিছুতেই তিনি মনের ধৈর্য্য হারাতেন না।

বছরখানেকের'পর রাণীর একটী মেয়ে হল। দিব্যি ফুটফুটে মেয়েটা! রাজারাণীর আনন্দ আর ধরে না। ক্রমে মেয়ে যখন তিন চার বছরের হল, তখন একদিন রাজা এসে বললেন, "রাণী, রাজ্যে তো বিদ্রোহ হবার উপক্রম, কি করি?" রাণী বিদ্রোহের কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। রাজা বললেন, "তোমাকে বিয়ে করবার সময় সবারই তোমার উপর হিংসা হয়েছিল। এখন আমাদের মেয়ে যে রাজ্য পাবে, এটা কারু সহ্য হচ্ছে না, কেননা মেয়ের মাতৃকুল তেমন সম্ভ্রান্ত নয়। তারা রাজবংশী ছেলেকে রাজা করতে চায়। তাদের ইচ্ছা, আমি উজীরের কোনও সন্তানকে পোষ্য গ্রহণ করি। কিন্তু তা হলে, এই মেয়ে যখন বড় হবে, তখন একটা গণ্ডগোল হবার খুবই সম্ভাবনা। যাতে রাজ্যের মঙ্গল হয়, তার জন্য কি করা উচিত, তা আমি অনেক ভেবেছি। ভেবে চিন্তে শেষকালে এই স্থির করেছি যে, এই মেয়েটা না থাকলে যখন সকল আপদ চুকে যায়, তখন রাজ্যের মঙ্গলের জন্য একে মেরে ফেলাই উচিত।"

রাণীর নাম ছিল কল্যাণী। কল্যাণী রাজার কথায় যে উত্তর দিলেন, তাতেই বুঝা যায়, স্বামীর প্রতি কর্ত্তব্য ও আচরণ সম্বন্ধে তাঁর ধারণা কত উচ্চ ছিল।

কল্যাণী বললেন, "মহারাজ, তুমি তো জান, তোমার সঙ্গে যখন এসেছি, তখন রাজ্যভোগ করব মনে করে আসিনি। আমার ইচ্ছা আমি তোমার ইচ্ছার সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছি। আমার ব্যক্তিত্ব বা স্বাতন্ত্র্য কিছুই নাই, সব আমি তোমাতেই বিসর্জ্জন দিয়েছি। তোমার সেবাতে আত্মনিয়োগ করতে, বা তোমার ইচ্ছার প্রতিকূল না হতে যতটুকু অহং এর প্রয়োজন, ততটুকু অহং আমি রেখে দিয়েছি মাত্র। এ মেয়ে মরুক, এ যদি তোমার ইচ্ছা হয়, তবে তাই হোক। প্রাণ থেকে কখনও এ মেয়েকে আমি আমার বলিনি।" তারপরে রাত দুপুরে রাজা মেয়েকে নিয়ে গেলেন, কিছুক্ষণ'পরে ফিরে এসে রাণীকে বললেন, মেয়েটাকে বধ করবার জন্য ঘাতকের হাতে দেওয়া হয়েছে। রাণী স্থির, প্রশান্ত—তেমনই হাসিমাখা তাঁর মুখখানা—যেন কিছুই হয়নি। এই তো বেদান্ত

তোমরাও এমনিভাবে বাইরের কোন ব্যাপারে বিচলিত না হতে শিখবে।

রাজা বললেন, এবার প্রজারা খুসী হবে। বছরখানেক পরে রাজার একটী ছেলে হল। ছেলেটিকে সবাই ভালবাসত। কিন্তু যখন সে পাঁচ ছয় বছরের হল, তখন রাজ্যে আবার একটা গণ্ডগোল হল। রাজা বললেন, সম্প্রতি যে অবস্থা দাঁড়িয়েছে, তাতে এ ছেলেটাকেও মেরে ফেলা উচিত। যদি ছেলে বেঁচে থাকে, তবে রাজ্যে অন্তর্যুদ্ধ হবার সম্ভাবনা, সুতরাং রাজ্যের মঙ্গলের জন্য এ ছেলেকেও মেরে ফেলতে হবে। রাণী পূর্ব্বের মতই হাসিমুখে বললেন, "দেশাত্মাই আমার আত্মা, আমার ব্যক্তিগত কিছুই নাই—আমি সূর্য্যের মত কেবল দিতেই জানি। সূর্য্যের মতই আমরা নিতে জানব না, আমরা জানব শুধু দিতে। এ জগতে যখন আমাদের আঁকড়ে ধরবার মত কিছুই নাই, কোনও বস্তুর প্রতিই যখন আমাদের কামনা নাই, তখন এমন কি ঘটতে পারে, যাতে আমাদের আনন্দ ক্ষুণ্ণ হবে? সূর্য্য সব সময় কেবল দিতেই থাকেন, তাই তিনি জগৎ আলো করে রয়েছেন।" তখন ছেলেটিকেও জল্লাদে নিয়ে গেল।

কয়েক বছর পরে রাজার তৃতীয় সন্তান জন্মালো। তিন চার বছরের হতে সেটিকেও জল্লাদের হাতে দেওয়া হল।

কিন্তু রাণী কি করে প্রাণ ধরে থাকতেন? যেদিন থেকে তিনি রাজবাড়ী এসেছেন, সেই দিন হতে রোজ একবার করে একটী নির্জন কক্ষে যেতেন। তাঁর বাপের বাড়ীর ছেঁড়া ন্যাকড়াগুলি সেখানে ছিল। তাঁর সেই ঘরে কারু ঢুকবার হুকুম ছিল না। সেখানে গিয়ে তাঁর রাণীর পোষাক ছেড়ে দিয়ে সেই ছেঁড়া ন্যাকড়াগুলো তিনি পরতেন, আর সোঽহং ভাবের অনুশীলন করতেন। এমনি করে ফকীরের মেয়ের সাজে সেজে তিনি তাঁর ব্রহ্মস্বরূপ উপলব্ধি করতেন। শেক্‌সপীয়র বলেছেন, রাজার মুকুট যার মাথায়, তার শুয়েও স্বস্তি নাই। রাণী অন্তরে অন্তরে জানতেন, তিনি এখনও সেই ফকীরেরই মেয়ে—বনের মাঝে হ্রদের তীরে পাখীর মত মনের আনন্দে যে গান গেয়ে বেড়াত। এখানে রাজার পুরীতে তিনি বন্দী হয়ে আছেন—এখানে স্বাধীনতা হতে তিনি বঞ্চিত। কিন্তু তাতেও তিনি অসুখী হননি, বাইরের বিষয়ে তিনি নিজকে জড়িত করেন নি। কোনও বস্তুর প্রতি তাঁর আসক্তি ছিল না—সর্ব্বদা বাইরের বিষয় হতে তিনি নিজকে বিবিক্ত রাখতেন। তিনি সর্ব্বদা ব্রহ্মভাবে তন্ময়। বাসনা-কামনা দূর করে ফেলেছেন বলে তিনি সদা পবিত্র—তাঁর দায়িত্ব নাই, কর্ত্তব্য নাই, কারু কাছে তিনি বাঁধা নন। তোমাদেরও এমনি হতে হবে। ধন-ঐশ্বর্য্যের মাঝে যখন তুমি এসে পড়বে, তখন একবার আয়োজন, প্রয়োজন, বাসনা-কামনার আবরণ ছিঁড়ে ফেলে মুক্তস্বভাবে দাঁড়িও দেখি। মুক্ত যে তুমি।

রাণী যতদিন রাজার বাড়ীতে ছিলেন, এমনি করে ততদিন তিনি আত্মরক্ষা করেছিলেন।

একদিন রাত্রে রাজা এসে রাণীকে বললেন, এমন করে ছেলেমেয়েগুলোকে প্রাণে মেরে কতদিন চলবে? তা ছাড়া পোষ্যপুত্র নেওয়াটাও তাঁর অভিপ্রেত নয়। তাই এ বিষয়ে ভেবে চিন্তে তিনি এই সিদ্ধান্ত করেছেন যে আবার তিনি বিয়ে করবেন, তাতে রাজ্যে শান্তি হবে। রাণী আনন্দের সঙ্গে তাতে সম্মত হলেন। তিনি তো রাজাকে

পেয়ে কখনও সুখী হননি—তাঁর সুখ বাইরে থেকে আসেনি, সে এসেছে তাঁর আত্মস্বরূপের মনন থেকে। স্বামী, পুত্র, পিতা—কিছুই তাঁকে সুখ দেয়নি, সুখ পেয়েছেন তিনি ভগবান হতে। রাণীর প্রশান্ত ও সদানন্দ ভাব দেখে রাজা অবাক হলেন। রাণীকে জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি কি করবে এখন?" রাণী বললেন, "তোমার ইচ্ছাই আমার ইচ্ছা—যা করতে বল।" রাজা বললেন, "আমি যদি আবার বিয়ে করি, আর তুমি এখানেই থাক, তবে গৃহের শান্তি নষ্ট হবে, কাজেই গৃহত্যাগ করাই তোমার পক্ষে শ্রেয়ঃ।" রাণী শুনেই রাণীর পোষাক ছেড়ে হাসিমুখে সেই ফকীরের ছেঁড়া ন্যাকড়া পরলেন, প'রে রাজবাড়ী হতে বেরিয়ে গেলেন। তাঁর সেই সদানন্দ মিষ্টি হাসিটি নিয়ে আবার তাঁর বাবার কাছে ফিরে গেলেন—তাঁর বাবাও মেয়েকে পেয়ে খুসী হলেন। রাজার যে চাকরটা এতদিন সেখানে ছিল, তাকে আবার রাজার কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হল।

একদিন রাজা বনে সেই কুটীরে গেলেন, রাণীকে প্রবোধ দেওয়া তাঁর উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু সেখানে গিয়ে রাণীর হাসিমাখা প্রফুল্ল মুখ দেখে বুঝলেন, তাঁকে প্রবোধ দেওয়ার কোনই প্রয়োজন নাই। রাজা জিজ্ঞেস করলেন, "নূতন রাণীকে বরণ করতে তুমি আসবে না?" রাণী তখনই রাজী হলেন। রাণী আবার রাজবাড়ীতে গিয়ে চারিদিক গুছিয়ে এমন সুন্দর করে বন্দোবস্ত করে দিলেন যে দেখে আমীর আর আমীরের ঘরণীরা একেবারে অবাক হয়ে গেল

বিয়ের পর নূতন রাণী সৈন্যসামন্ত আর সোনাদানার যৌতুক নিয়ে রাজবাড়ীতে এল। নূতন রাণী যেমন জাঁকজমকে এল, কল্যাণীও তেমনি তার যথাযোগ্য অভ্যর্থনা করলেন। অভ্যর্থনাতে কল্যাণীর সঙ্গে রাজবাড়ীর অন্যান্য মেয়েরাও যোগ দিল। কল্যাণী যখন নূতন রাণীকে দেখলেন, তখন তাকে স্নেহভরে জড়িয়ে ধরে মায়ের মত তার মুখচুম্বন করলেন। নূতন রাণীর রূপ দেখে পুরনারীরা যেমন বিস্মিত হল, তার চেয়ে তারা বিস্মিত হল কল্যাণীর স্বভাবের আশ্চর্য্য সৌন্দর্য্য দেখে।

নূতন রাণীর সঙ্গে তার ছোট ভাই দুটীও এসেছিল। সে দেশের নিয়ম অনুসারে রাজবাড়ীতে সেদিন একটা মস্ত ভোজ হবার কথা—তাতে আমীর-ওমরা ও তাদের পরিবারেরা সবাই থাবে। রাজ্যের সব বড় লোকদের সেদিন নিমন্ত্রণ। কল্যাণী হলেন সে ব্যাপারের কর্ত্রী। কল্যাণীর আনন্দময় প্রশান্ত মুখের দিকে তাকিয়ে সবারই মন গলে গেল, চোখে জল এল। এই ব্যাপার মিটে গেলেই তো আবার তাঁকে তাঁর ফকীর বাবার কাছে ফিরে যেতে হবে। কিন্তু খেতে খেতে তারা আবার দুঃখ শোক সব ভুলে গেল, কল্যাণীর কথা কারু মনে রইল না।

তারপর এল বিদায়ের পালা। কল্যাণী সকলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে রাজার কাছে এসে বললেন, "তবে আমি যাই? তোমার যখনই কোন প্রয়োজন পড়বে, তুমি আমাকে ডেকো, কোনও সঙ্কোচ করো না যেন।" এই দৃশ্য দেখে পুর নারীদের কোমল প্রাণ গলে গেল, তারা সবাই কাঁদতে লাগল। সবাই বলল, "তুমি তো ফকীরের মেয়ে নও, তুমি দেবতার মেয়ে।" এই বলে তারা নূতন রাণীকে সব কথা খুলে বলল।

কল্যাণী যে রাজ্যের মঙ্গলের জন্য তাঁর নিরপরাধ শিশুদের প্রাণদণ্ডের অনুমতি দিতে সঙ্কুচিত হননি, এ কথা শুনে নূতন রাণীও কাঁদতে লাগল। সে বল্ল, "তোমার ছেলে-মেয়েদের এমন করে হত্যা করা হয়েছে! আর তাদের রক্তস্রোত পার হয়ে আমি এই সিংহাসনের তলে এসে দাঁড়িয়েছি।"

তখন সবাই রাজার উপর দোষারোপ করতে লাগ্ল। রাজা মাথা হেঁট করে সব শুন্লেন, তার পর উঠে অমাত্য ও প্রজাদের সকলকে সম্বোধন করে বললেন, "আমার পাত্র মিত্র ও তাদের পরিবার সবাই এখানে উপস্থিত আছ। তোমরা সবাই কাঁদছ, কেবল কল্যাণীর চোখে জল নাই। আমি তোমাদের দোষ দিচ্ছি না—কেননা তোমরা আমার সন্তানের মত। আমারও চোখে জল এসেছে, কিন্তু এ দুঃখের অশ্রু নয়—এ অশ্রু আনন্দের। তোমাদেরও এই অশ্রু আনন্দের অশ্রু হোক্।" এই বলে কল্যাণীর দিকে ফিরে রাজা বল্লেন, "সতী, তুমিই ধন্য, সমস্ত রাজ্যে তুমিই সুখী।"

এই বলে রাজা অমাত্যদের কাছে সকল কথা খুলে বললেন। নূতন রাণী পাশের রাজ্যেরই রাজকন্যা, কিন্তু সে ও তার ভাইয়েরা রাজার নিজের সন্তান নয়; রাজা তাদের পালন করেছেন মাত্র। এই তিনটী পিতৃমাতৃহীন সন্তান দৈবাৎ রাজার হাতে এসে পড়ে। তাদের সুন্দর দেখে রাজার মায়া হয়—তিনি নিজের সন্তানের মত তাদের লালন-পালন করেন। এই তিনটি ছেলে-মেয়ে কল্যাণীরই তিন সন্তান। যে জল্লাদের হাতে তাদের দেওয়া হয়েছিল, সে প্রাণ ধরে তাদের মারতে পারেনি—পাশের রাজার রাজ্যে তাদের রেখে এসেছিল। জল্লাদের কাছে অমন সুন্দর ছেলে-মেয়ে দেখে রাজা তাদের সামান্য লোকের সন্তান বলে মনে করতে পারেননি—জল্লাদও সব কথা প্রকাশ হয়ে পড়বে ভয়ে কোনও পরিচয় দেয়নি। কিন্তু সে দেশের রাজা তাদের আপন ছেলে-মেয়ের মতই লালন-পালন করতে লাগলেন।

আমাদের রাজা এই সমস্ত কথা পরে জানতে পারেন। রাজা তো আর নিজের মেয়েকে বিয়ে করতে পারেন না। কাজেই কল্যাণীই আবার রাণী হলেন—তাঁর ছেলেরাই সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হল। এবার আর এ ব্যবস্থাতে কেউ আপত্তি করল না—বরং সবাই খুসীই হল। তোমরাও বুঝ্তে পারছ, ভগবানের কেমন সূক্ষ্ম হিসাব, তিনি কারু ঋণ রাখেন না—কড়ায় গণ্ডায় সবার পাওনা শোধ করে দেন।

প্রত্যেক বিবাহিতা নারীকেই প্রেমের জন্য এমনি করে আসক্তি বিসর্জন করতে হবে। স্বামীরও স্ত্রীর প্রতি এই কর্ত্তব্য। ভারতবর্ষে এমন স্ত্রীকে বলে পতিব্রতা, স্বামীকে বলে পত্নীব্রত। অর্থাৎ স্ত্রীকে স্বামীর মাঝে প্রাণ পেতে হবে, আবার স্বামীকেও স্ত্রীর মাঝে প্রাণ পেতে হবে। স্ত্রী স্বামীর মাঝে ভগবানকে প্রত্যক্ষ করবে। এই দৃষ্টি নিয়ে স্বামীকে সে দেহমন সমর্পণ করবে, আর স্বামীও স্ত্রীর মাঝে মহাশক্তিকে প্রত্যক্ষ করে তার প্রেমে আত্মহারা হবে। এর মাঝে কোনও স্বার্থ নাই, কোনও ব্যক্তিগত ভাব নাই। ভারতবর্ষে বিয়ে হয় উন্মুক্ত স্থলে, নদীর তীরে, নীল আকাশের তলে—সেখানে সুমন্দ বাতাস বইতে থাকে, মাথার উপর চাঁদের জ্যোৎস্না উছলে উঠে। এর ভাবার্থ এই, স্ত্রী পুরুষের হাত ধরেছে—পুরুষ আবার

স্ত্রীর হাতখানি ধরে উভয়ের হাতখানি ভগবানের দিকে বাড়িয়ে দিয়েছে। কল্যাণীর মাঝে যেমন কোনও আসক্তি ছিল না, প্রত্যেক স্ত্রীকেই তেমনি নিরাসক্ত হয়ে ভগবানের মাঝে আত্মসমর্পণ করতে হবে।

পুরুষকেও তাই করতে হবে। স্বামী যদি স্ত্রীর মাঝে আত্মহারা না হয়ে যায়, বা স্ত্রী যদি স্বামীতে আত্মসমর্পণ করতে না পারে, তবে দাম্পত্য জীবন কখনও সুখের হবে না। ব্যক্তিগত জীবনের বিসর্জ্জন হয়ে আধ্যাত্মিক মিলনের প্রতিষ্ঠা হলে তবেই প্রেমের সার্থকতা, জীবনের সিদ্ধি।*

* স্বামী রামতীর্থ

সেবক

সেবার মূলে কর্ম্ম, আর কর্ম্মের মূল হইল স্বভাব। স্বভাব কি—না স্বয়ের ভাব অর্থাৎ আপন ভাব। তোমার আপন বলিতে দুইটা আছে, একটাকে তুমি পাইয়া রহিয়াছ, আর একটাকে তুমি পাইতে চাহিতেছ। জন্মের পর যেদিন জ্ঞানের উন্মেষ হইল, সেদিন জগৎটাকে যেমন দেখিয়াছিলে, সেটা তোমার স্বভাবের দেখা, কেউ তোমাকে দেখিতে শিখায় নাই—স্বভাবের বশে চোখ মেলিয়াছ—দেখিয়াছ—আর অমনি তাহার একটা অর্থবোধ হইয়াছে। একেই বলি স্বভাবের দেখা;

যাহা দেখিয়াছ, তাহার অর্থের পরিধি বাড়িয়াছে বটে, কিন্তু তাহার স্বভাবটী বদলায় নাই। জগৎকে অনিত্য বল, চঞ্চল বল, তাতে আপত্তি নাই। কিন্তু এই চঞ্চলতা তোমার খুসীতেও হয় নাই, আমার খুসীতেও হয় নাই। চোখ মেলিয়াই দেখিয়াছি, ওটা চঞ্চল; তারপর সে চঞ্চলতার যত ব্যাপক অর্থই অনুধাবন করিতে চেষ্টা করিয়াছি, মূলের স্বভাবচঞ্চলতাটুকু কিন্তু কিছুতেই ছাড়িয়া যাইতে চাহে নাই। একটাকে চঞ্চল বলিয়া দূরে ঠেলিয়া আর একটাকে অচঞ্চল বলিয়া আঁকড়াইয়া ধরিতে গিয়াছি—ওমা, দুদিন পরে দেখি, তাও অচঞ্চল নয়। এমনি করিয়া অচঞ্চলের আলেয়া চোখের সামনে নাচিয়া বেড়াইয়াছে, দূর হইতে দূরান্তরে টানিয়া লইয়াছে, কিন্তু কোনও দিনই ধরা দেয় নাই—ধরিবার পিপাসারও নিবৃত্তি হয় নাই।

অনেক ছুটাছুটী করিয়া শেষে বুঝিলাম, দুটাই সত্য। আমার এক মন যে চঞ্চলের দিকে ব্যাকুল হইয়া ছুটিয়া যায়, সেও একটা সত্যকে লক্ষ্য করিয়া ছুটে; আবার আর একটা মন যে নিরালায় বসিয়া সুদূর অচঞ্চলের জন্য দিনরাত ঝুরিয়া মরে, সেও একটা

সত্য বস্তুর সন্ধানেই হুতাশ করিয়া ফিরিতেছে।

এখন দেখি বড় বিপদ্। এপারে ছায়া, ওপারে আলো—দুয়ে দুয়ের জন্য কাঁদিয়া মরিতেছে—মাঝখানে বিরহের নদী। এ দুয়ে মিলন ঘটাইবে কে? কোথায় বা সেতু, কোথায় বা তরণী?

এমনি করিয়া যখন দেখি, আমার উভয় সঙ্কট উপস্থিত, এপারের মায়াও কাটাইতে পারিতেছি না, ওপারের আকর্ষণও ছাড়াইতে পারিতেছি না—দুটাকেই যুগপৎ জড়াইয়া লইয়া এক অখণ্ড মহাসত্যের আভাস প্রাণে সুখস্বপ্নের মত জাগিয়া উঠিয়াছে, মিলনের জন্য চিত্ত হাহাকার করিয়া ফিরিতেছে—তখন দয়াল একদিন তরণী লইয়া তীরে ভিড়াইলেন। সে তরণী সেবার তরণী। সেইদিন বুঝিলাম, এপার হইতে ওপারে যাতায়াতের পথ আছে—সে পথ সহজের পথ, স্বভাবের পথ।

কেউ বলেন, জগৎটা মিথ্যা, ওটাকে পিছনে ফেলিয়া সত্য বস্তুর জন্য উধাও হইয়া ছোট। সে কথা কারু কাছে খাঁটী হইতে পারে। কিন্তু সেবার আস্বাদ যে পাইয়াছে, তাহার কাছে তো ছাড়িয়া যাইবার কিছু নাই। সে ছাড়িবে কি?—কোনটাকেই তো সে নিষ্প্রয়োজন মনে করে না—সে দেখে সবারই সঙ্গে মহতের যোগ। তোমার চক্ষে যাহা তুচ্ছ, অতএব হেয়, তার মাঝে সে দেখে কোন অলখ দেবতার চরণ-নখরের অরুণরাগ; সে হেলায় ফেলিয়া যাইবে কাহাকে?

সেবকের চোখে সবই সুন্দর—সবারই মাঝে সেই বিরাটেরই ছায়া। সে বিরাট না থাকিলে এই এত বড় জগৎটা দাঁড়াইত কিসের উপর? সে যদি একে ছাড়িয়া দূরে কোথাও থাকিবে, তবে এর মাঝে প্রাণের স্ফুরণ হয় কোথা হইতে—কোথা হইতে সঙ্গীত লাবণ্য, সৌন্দর্য্য বিকশিত হইয়া উঠে? আবার এ-ও বলি, শুধু এইটুকুতেই বা তার কতটুকু প্রকাশ? তার জ্যোতির একটী কণা ছুটিয়া আসিয়া পড়িয়াছে, আর তাই হইয়াছে জগতের বুকের হার, চোখের মণি! এই সহজ সৌন্দর্য্য হইতে তার অপরূপ সৌন্দর্য্যের আভাস পাইয়া চিত্ত এলাইয়া পড়ে, আবার সেই সৌন্দর্য্যের আভাস নয়নে মাখিয়া এই জগতের দিকে তাকাইলেও এর সার্থকতা যেন কোটীগুণ বাড়িয়া উঠে! তাই বলি বন্ধু, পারাপারের রসিক নাবিক তুমি, অকূলে যে কূল আজ মিলাইলে, তাহা হইতে আর যেন দূরে ঠেলিয়া ফেলিয়া যাইও না দেবতা!

কি করিয়া তাহাকে পাইবে, তুমি সেই ভাবনাই ভাবিতেছ, ভাই? কেন, তাহাকে পাওয়ার আর ভাবনা কি? সে তো তোমার অজানা অচেনা জন নয়, সে যে তোমার প্রাণের প্রাণ। তাহাকে পাইবার জন্য উৎকট সাধনা কিছুই করিতে হইবে না; যেমন করিয়া সংসারে চলিতেছ, তেমন করিয়াই চল, কেবল ভাবনার মোড়টী একটু ফিরাইয়া রাখ। তুমি না বলিতেছ তাহাকে চাই-ই—সেই ভাবনায় তুমি আকুল! তবে আর কি? তোমার নিত্যকর্ম্মের সঙ্গে তার ভাবনাটুকু জুড়িয়া দাও না। তবেই যে অসাধনে তাহাকে পাইবে।

এই কথাটাই না তিনি শ্রীমুখে বলিতেছেন—তুমি চল-ফির, খাও-দাও, যাগযজ্ঞ, তপ-দান যাই কর, এমন কি এই যে নিঃশ্বাস প্রশ্বাস ফেলিতেছ, তার মাঝেও আমাকেই স্মরণ কর,

আমাতেই সব সমর্পণ কর। এই তো সহজ উপদেশ। যেমন জগৎ চলিতেছে, তেমনটী চলুক, কেবল এক জায়গায় একটা পাঠ বদলাইয়া লইতে হইবে—যেখানে ছিলাম আমি, সেখানে থাকিবে তুমি। স্বভাবে সব হইতেছে—সে-ও তোমারই লীলা—অভিমান যত দিন ছিল, ততদিন তাঁহাকে রোধ করিবার চেষ্টা করিয়াছি, এখন রোধ করিবার সামর্থ্যও নাই, প্রবৃত্তিও নাই—এখন কেবল তোমার স্রোতে গা ঢালিয়া দিয়া ভাসিয়া যাওয়া।

আর আশ্চর্য্যও এই, যেদিন হইতে সংসারাভিনয়ে আমার মুখের রাজার পাঠ তুমি কাড়িয়া লইয়াছ, সেই দিন হইতে স্বভাবও শোধরাইয়া গিয়াছে। যে বিদ্রোহী স্বভাব আমার শাসন তুচ্ছ করিয়া প্রমত্ত হইয়া ফিরিয়াছে সে আজ আশ্চর্য্য রকম শান্ত হইয়া গেল কি করিয়া? সে বুঝিয়াছে, এইবার আসল রাজার পরোয়ানা আসিয়াছে—নকলের চোখরাঙানী উপেক্ষা করা চলে, কিন্তু আসলকে ঠেকায় কে?

গোড়ায় গলদ রাখিয়া যোগই কর, জপই কর, আর তপই কর—সবই মিছা। "আমি নই—তিনি"—এই হইল সার কথা। এই কথা বারবার করিয়া জপ কর—মনে না ধরিলেও জপ কর—এই কথা দিয়া নিজকে নিজে সম্মোহিত করিয়া ফেল—জপিতে জপিতে এক দিন মনে ধরিয়া যাইবেই। সেদিন আর তোমাকে পায় কে?

শুধু "তুমি" বল—আর সহজ পথ ধরিয়া চল। যা কিছু করি, বলি, চলি—সব তুমি। শক্তি দিয়াছ—তুমিই—তোমার জন্যই দিয়াছ; তাকেই বলি সেবা। আমার কর্ম্ম যেদিন তুমি প্রসন্ন হইয়া গ্রহণ করিলে, সেই দিনই কর্ম্ম সার্থক হইল, স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিলাম—এবার তোমার পায়ে বোঝা ফেলিয়া দিয়াই খালাস! কর্ম্মের বোঝা যদি তোমার পায়ে সঁপিলাম, তবেই কর্ম্ম হইল সেবা—আর তুমিও আসিয়া বুকের বোঝা খালাস করিয়া বুক জুড়িয়া বসিলে।

প্রকৃতির বৈচিত্র্য আছে জগতে, তা থাকুক; কিন্তু সে বৈচিত্র্য ভোগ করিবার জন্য একজনই থাকিবে। আর বাস্তবিক সব জায়গাতেই একজনই আছে—কি অভিমানের নাটে, কি ব্রহ্মাণ্ডের পাটে। এই যে একজন, সে হইবে রাজার রাজা, জ্যোতির জ্যোতিঃ, তার আলোতে জগতের আলোও আলো হইয়া উঠিবে। যেখানে কাঁচা আমি, সেখানেই এইটুকু হয় না। রাজার অভিমান, কর্ত্তার অভিমান তোমার আমার মাঝেও আছে বটে, কিন্তু সে তো নিরালম্ব নয়। বাহির হইতে যোগান আসিতেছে, তবে সে আমির বড়াই চলিতেছে। সে আমি দেখে, শোনে, ভাবে; কিন্তু তাহাকে দেখায় কে, শোনায় কে, ভাবায় কে? কে চক্ষুর চক্ষু, শ্রোত্রের শ্রোত্র, মনের মন?

সে আমার কাঁচা আমি নয় বলিয়াই আমির অভিমান দূর করিয়া নিজকে ফাঁকা করিতে চাই। এই জন্যই তো সেবা। সেবাতে আত্মসমর্পণ—অহংএর নিরসন। তাতে জগৎ আছে, প্রকৃতির বৈচিত্র্য আছে, রূপ রস গন্ধ সবই আছে—নাই কেবল আমি। হে জ্যোতির্ম্ময়, তুমি সকলকেই আলো করিয়া রহিয়াছ, কিন্তু অভিমানের কুহেলিকায় তাহা বুঝিতে পারি নাই। অভিমান সরাইয়া দিলাম, তোমার আলো সাক্ষাৎভাবে সকল

জগৎ উজল করিয়া তুলিল, আমির পরকলার ভিতর দিয়া তাহাকে ফুটিতে হইল না। এর পরেও যে একটু আমি থাকিয়া যায়, সেটুকু তোমারই উপভোগের জন্য—ওইটুকুতেই সেবা চলে, আবার আমারও চিদানন্দ স্বরূপের প্রতিষ্ঠা হয়। এই হইল সেবার পরিণতি।

এই সেবা করিব কাহাকে?—জগন্নাথকে। তাঁহাকে যে দেখিতে পাই না, তবে সেবা করিব কি করিয়া? সেবাতে যে সকল ইন্দ্রিয়ের সার্থকতা হইবে। আচ্ছা, না-ই দেখিলাম; তিনি সতীর ধ্যানের পতি, এই কুলটা চোখ তাঁহাকে দেখিবে, সাক্ষাৎ ভাবে দেখিবে, এমন কি শুদ্ধির গৌরব তাহার আছে? তাই সহজ ভাবে তাঁহাকে দেখা হয় না: কিন্তু তিনি দয়াল; আমি তাঁহাকে ছাড়িয়া গেলেও তিনি যে ছাড়িয়া যান নাই, তাহার প্রমাণ রাখিয়া গিয়াছেন আমার মনের মাঝে। সবটুকু না হউক, মন দিয়া তাঁহার বিভূতির কণার কণাটুকুও তো কল্পনা করিতে পারি। তাহাই আমার পক্ষে যথেষ্ট; সেই কৃপার লেশটুকু আমার সেবক জীবনের সম্বল। ওইটুকু ধরিয়া আমার আত্মবিতরণের পালা আরম্ভ হউক। আমি গিয়া তিনি, যতটুকু প্রকাশ হইবেন, ততই এই মাটীর দেহ, মাটীর মন, মাটীর ইন্দ্রিয় সার্থক হইবে। তখন এই চোখেই তাঁহাকে দেখিতে পাইব, এই কানেই শুনিতে পাইব—জগতের রূপ না বদলাইলেও তাহার অর্থ সেদিন বদলাইয়া যাইবে। সেবা তখন সার্থক হইবে, আত্মসমর্পণে আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ হইবে।

বাস্তবিক সেবার এই দুইটী দিক—আত্মসমর্পণ ও আত্মপ্রতিষ্ঠা। সেবাতে আমি তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিতে চাই—আমার পথ আত্মসমর্পণ; আবার তিনি যে আমাকে জড়াইয়া রহিয়াছেন—এও তো তাঁর সেবা। আমার মাঝে তাঁহাকে পূরিয়া দিয়া তিনি আমার সেবা করিতেছেন—আত্মপ্রতিষ্ঠা দ্বারা। আমি আছি কি নাই, বুঝিতে পারি না—তুমি যে আছ, সেই কথাই মনে প্রাণে পুলকশিহরণে বাজিয়া উঠিতেছে—আমার সেই বোধের মূলে তুমি-আমি অনাদি মিলনে জড়াইয়া রহিয়াছি।

সাহিত্য-পরিষৎ
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং

বেদান্ত-সার

[চতুর্থ খণ্ড—বিবৃতি—সাধনবিচার]

ষট্‌ক সম্পত্তি—শম ও দম

বিবেক ও বৈরাগ্য এই দুইটী সাধনের কথা বলা হইয়াছে। এখন তৃতীয় সাধন ষট্‌ক সম্পত্তির কথা বলা হইবে। ষট্‌কসম্পত্তি বলিতে বুঝি—দম, শম, উপরতি, তিতিক্ষা, সমাধি ও শ্রদ্ধা। মূলে দমের পূর্ব্বে শমের স্থান নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। টীকাকার রামতীর্থ বলেন, শম মনের নিগ্রহ; মন যে বাহিরের দিকে ছড়াইয়া পড়ে, ইহাই তাহার দোষ; তাহার এই বহির্ম্মুখী বৃত্তিকে রোধ করা হইল শম। কিন্তু মন বাহিরের দিকে ছড়াইবার সময় বহিরিন্দ্রিয়সমূহকে আশ্রয় করিয়াই ছড়াইবে। কাজেই দেখা যাইতেছে, মনকে নিগৃহীত করিতে হইলে তৎপূর্ব্বে বাহ্যেন্দ্রিয় নিগ্রহ প্রয়োজন। বাহ্যেন্দ্রিয় নিগ্রহকেই বলে দম। সুতরাং অর্থ ধরিয়া যদি বিচার করা যায়, তবে শমের পূর্ব্বে দমের পাঠ হওয়া উচিত। এ বিষয়ে মীমাংসাশাস্ত্রের প্রমাণও রহিয়াছে। মীমাংসকেরা বলেন, পাঠের ক্রম হইতে অর্থের ক্রমের প্রতিপত্তি অধিক। উদাহরণস্বরূপ বলা হয়, বেদ বিধান দিতেছেন "অগ্নিহোত্রং জুহোতি, ওদনং পচতি"—অগ্নিহোত্র যজ্ঞ করিবে, তণ্ডুল পাক করিবে। তণ্ডুল পাক হোমের জন্যই। শ্রুতিতে যেরূপ ক্রিয়ার পাঠ নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে, সেরূপ ধরিলে আগে হোম করিতে হয়, পরে তণ্ডুল পাক। কিন্তু তণ্ডুল হইল হোমের উপকরণ, সুতরাং তাহার পাকই তো আগে প্রয়োজন। এই জন্য এখানে প্রয়োজন বুঝিয়া শ্রুতির পাঠ-নির্দ্দিষ্ট ক্রম উল্লঙ্ঘন করিয়া অর্থের ক্রম গ্রহণ করিতে হইবে। মীমাংসাশাস্ত্রের এই নজীর অন্যত্রও দেখান হয়। এইরূপ নজীরের নাম অগ্নিহোত্রযবাগূপাক ন্যায়।

ষট্‌কসম্পত্তির প্রথম হইল দম। বহিরিন্দ্রিয়নিগ্রহ সমস্ত সাধনারই গোড়া। ইন্দ্রিয়সংযম ও মনের একাগ্রতা না জন্মিলে বেদান্তপ্রতিপাদ্য তত্ত্ব বুঝিবার চেষ্টা পণ্ডশ্রম মাত্র। শুধু অক্ষরার্থ বোধ হইলেই তো হইবে না, বেদান্তকে জীবনে ফলাইয়া তুলিতে হইবে। ভেদদর্শন আমাদের স্বভাব, আমাদের সমস্ত সংস্কারই তাহার অনুকূল। এই সমস্ত সংস্কার জাল কাটাইয়া একদর্শন বা সম্যকদর্শনের অধিকার লাভ একদিনের চেষ্টায় হইবার নয়। এইজন্য নিজকে সব দিক দিয়া বাঁধিতে হয়, জীবনের প্রতি মুহূর্ত্তে নিজকে সংযত

সহিত পরিচালনা করিতে হয়। ষট্‌কসম্পত্তিতে আমরা সেই শিক্ষাই পাই। দম বা বাহিরিন্দ্রিয়নিগ্রহ হইল সে শিক্ষার ভিত্তি।

ইন্দ্রিয় বিষয়সমূহ আহরণ করিয়া মনের কাছে আনিয়া দেয়। মন তাহাদের সঙ্গে সুখদুঃখের রসায়ন যোগ করিয়া তাহাদিগকে ভোগ করে এবং ভোগে তৃষ্ণার বৃদ্ধি হওয়াতে নিত্য নূতন ভোগের জন্য লালায়িত হইয়া উঠে। ইহাকেই বলি মনের বহির্ম্মুখী প্রবৃত্তি। ইন্দ্রিয় যদি মনের খোরাক কমাইয়া দিতে পারে, তবেই এই প্রবৃত্তি নিগৃহীত হইতে পারে। তাই রামতীর্থ বলিয়াছেন, দম হইতেই শমের সাধনা সহজ হইয়া থাকে। ইন্দ্রিয়ের আহার কমাও, কমাইয়া মনকে জোর করিয়া বিষয় হইতে অন্তর্ম্মুখে আকর্ষণ কর—ক্রমে উহা স্থির হইয়া আসিবে।

মনকে কি সমস্ত বিষয় হইতেই নিগৃহীত করিতে হইবে? ইন্দ্রিয়ারাম গীতবাদ্যাদি শ্রবণ হইতে মনকে ফিরাইয়া আনা উচিত বুঝি, কিন্তু সমস্ত শ্রবণব্যাপার হইতেই তো তাহাকে নিগৃহীত করা উচিত হইবে না। বেদান্ততত্ত্ব অধিগত করিতে হইলে শ্রীগুরুর মুখ হইতে তাহা শ্রবণ করাও যে জ্ঞানানুকূল সাধন। সুতরাং নিগ্রহ বলিলে বুঝিতে হইবে, যে মনোব্যাপার আমাদের লক্ষ্যের প্রতিকূল, তাহারই নিগ্রহ প্রয়োজন। শ্রীগুরুর সেবা ভিন্ন তাঁহার কৃপা আকর্ষণ করিবার সামর্থ্য হইবে না। সুতরাং সেবার অনুকূল মন ও ইন্দ্রিয়ব্যাপারকে নিগৃহীত করিলে তো চলিবে না। সর্ব্বত্রই লক্ষ্যের অনুকূল সাধন হওয়া চাই।

উপরতি

তারপর উপরতি। উপরতির দুইটী লক্ষণ আছে। প্রথমটী এই—ইন্দ্রিয় ও মনকে বিষয় হইতে দম শম দ্বারা নিগৃহীত করিলেও পূর্ব্বসংস্কারবশতঃ আবার তাহারা বিষয়াভিমুখে ছুটিয়া যাইতে পারে। উপসংহৃত ইন্দ্রিয় ও মনকে স্থির করিয়া নিজের মাঝে ধরিয়া রাখাই হইল উপরতি। তাৎপর্য্য এই, শম হইতে উপরতি আরও আভ্যন্তরীণ ব্যাপার। দম ও শম বিষয়নিবৃত্তি দ্বারা ইন্দ্রিয় ও মনের বহিশ্চেষ্টা নিরুদ্ধ করিবে, আর উপরতি অন্তশ্চেষ্টাকেও নিরুদ্ধ করিবে।

কিন্তু উপরতির এই লক্ষণ লইয়া একটু আপত্তি উপস্থিত হইতে পারে। এই লক্ষণটী শম ও দমের লক্ষণের সহিত সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়ে, কেননা এই তিনটীরই লক্ষণে বহির্ম্মুখে প্রবৃত্ত ইন্দ্রিয়ব্যাপার নিরোধের কথা আসিয়া পড়ে। এইজন্য অনেকে উপরতির একটা অসঙ্কীর্ণ লক্ষণ করিতে চাহেন, সেটী এই—বিহিত কর্ম্মসমূহের বিধি অনুসারে ত্যাগই উপরতি অর্থাৎ উপরতি অর্থে কর্ম্মসন্ন্যাস।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাম্যভেদে কর্ম্ম ত্রিবিধ। তন্মধ্যে কাম্যকর্ম্ম করা না করা আমাদের ইচ্ছাধীন। কিন্তু নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্ম্ম অবশ্যকর্ত্তব্য। এই হইল কর্ম্মাধিকার। কিন্তু জ্ঞানাধিকারে কর্ম্মের প্রামাণ্য থাকে না। তখন আবার শ্রুতি ও স্মৃতি অবশ্যকর্ত্তব্য কর্ম্মসমূহ ত্যাগ করিবার বিধিও দিয়াছেন। শ্রুতি বলিতেছেন "তদেকে প্রাজাপত্যামেবেষ্টিং কুর্ব্বন্তি"—অধিকারী হইলে কেহ কেহ প্রাজাপত্য যাগও করিবে। প্রাজাপত্য যাগের বিশেষত্ব স্মৃতি বুঝাইয়া বলিতেছেন—

প্রাজাপত্যং নিরূপোষ্টিং সর্ববেদসদক্ষিণম্।
আত্মন্যগ্নীন্ সমারোপ্য ব্রাহ্মণঃ প্রব্রজেদ্ গৃহাৎ

—বিরক্ত গৃহী প্রজাপতি দেবতার উদ্দেশ্যে যজ্ঞ করিয়া সর্বস্ব দক্ষিণাস্বরূপে বিলাইয়া দিবেন। তারপর গৃহে আহিত অগ্নিসমূহকে আত্মাতে আহিত করিয়া গৃহ হইতে প্রব্রজন করিবেন অর্থাৎ বানপ্রস্থাশ্রম অবলম্বন করিবেন। এই ব্যাপারই হইল বিহিত কর্মসমূহের বিধি অনুসারে ত্যাগ।

আত্মজ্ঞানের পক্ষে শম-দম যেমন অন্তরঙ্গ বলিয়া অবশ্য অনুষ্ঠেয়, সন্ন্যাসও সেইরূপ। এ বিষয়ে নিম্নে শ্রুতি স্মৃতির কয়েকটী প্রমাণ উদ্ধৃত হইল।

শ্রুতির প্রমাণ—

(ক) "ন কর্মণা ন প্রজয়া ধনেন, ত্যাগেনৈকে অমৃতত্বমানশুঃ"—মানুষ অমর হইল কিসে? কর্ম করিয়া নয়, পুত্রোৎপাদন করিয়া নয়, ধন সঞ্চয় করিয়া নয়; একমাত্র ত্যাগ দ্বারাই ধীর ব্যক্তিরা অমৃতত্ব লাভ করিয়াছেন। [মহানারায়ণোপনিষৎ ১০,৫]

(খ) "বেদান্তবিজ্ঞানসুনিশ্চিতার্থাঃ
সন্ন্যাসযোগাদ্ যতয়ঃ শুদ্ধসত্ত্বাঃ।"

—ব্রহ্মজ্ঞান কাহারা লাভ করিয়া থাকেন? যাঁহারা সংযমী, শুদ্ধসত্ত্ব, বেদান্তশাস্ত্র অধিগত করিয়া যাঁহারা সুনিশ্চিতরূপে সমস্ত তত্ত্ব জানিয়াছেন, সন্ন্যাসযোগে তাঁহারাই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়া থাকেন। [মুণ্ডক ৩, ২, ৬]

(গ) "এতমেব প্রব্রাজিনো লোকমীপ্সন্তঃ প্রব্রজন্তি"—যাঁহারা গৃহত্যাগ করিয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন, তাঁহারা এই ব্রহ্মলোক পাইবেন বলিয়াই প্রব্রাজী হইয়া থাকেন। [বৃহদারণ্যক ৪, ৪, ২৫]

(ঘ) "পুত্রৈষণায়াশ্চ বিত্তৈষণায়াশ্চ লোকৈষণায়াশ্চ ব্যুত্থায়াথ ভিক্ষাচর্যাং চরন্তি"—জগতে আসিয়া মানুষ তিনটী জিনিষ খোঁজে, সে চায় পুত্র, সে চায় বিত্ত, আর সে চায় স্বর্গাদি সুখময় লোক। এই তিনটী এষণাতে সে বাঁধা। সুকৃতিবশতঃ যদি কাহারও বিবেক বৈরাগ্য হইয়া সে বাঁধন কাটিয়া যায়, তবে সে পুত্রকামনা, বিত্তকামনা, স্বর্গকামনা ছাড়িয়া, সমস্ত ছাড়িয়া ভিক্ষাচর্যামাত্র অবলম্বন করিয়া থাকে। [বৃহদারণ্যক ৪, ৪, ২৫]

(ঙ) "তানি বা এতান্যবরাণি তপাংসি ন্যাস এবেত্যরেচয়ৎ"—আর আর সমস্ত তপস্যারই স্থান নীচে—একমাত্র সন্ন্যাসই সকল তপস্যার শ্রেষ্ঠ। [মহানারায়ণ ২১, ২]

স্মৃতির প্রমাণ—

(ক) নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধিং পরমাং সন্ন্যাসেনাধিগচ্ছতি"—যাঁহার কোনও বিষয়ে আসক্তিও নাই, কামনাও নাই, যিনি আত্মজয়ী, তিনি সন্ন্যাসদ্বারা পরমা নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধি লাভ করিয়া থাকেন এবং সেই সিদ্ধি হইতে ব্রহ্ম লাভ করিয়া থাকেন। [গীতা ১৮, ৪৯-৫০]

(খ) "ত্বম্পদার্থবিচারায় সন্ন্যাসঃ সর্বকর্মণাম্"—তত্ত্বমসি মহাবাক্যের ত্বম্ পদের অর্থ বিচার করিতে হইলে সমস্ত কর্মের সন্ন্যাস প্রয়োজন, নতুবা কর্মাসক্ত বুদ্ধিতে আত্মতত্ত্ব প্রতিভাত হইবে না। [উপদেশ সাহস্রী ১৮, ১২২]

(গ) "অর্থস্য মূলং নিকৃতিঃ ক্ষমা চ
কামস্য রূপং বপুর্বয়শ্চ।
ধর্মস্য যাগাদি দয়া দমশ্চ
মোক্ষস্য সর্বোপরমঃ ক্রিয়াণাঃ॥"

—চতুর্বর্গ জীবমাত্রেরই কাম্য। তন্মধ্যে পরপরিভব ও ক্ষমা এই উভয়ই অর্থের মূল; রূপ

স্বাস্থ্য ও যৌবন হইল কামের মূল ; যাগযজ্ঞ, ইন্দ্রিয়সংযম ও দয়াদাক্ষিণ্য ধর্ম্মের মূল ; আর সমস্ত কর্ম্ম হইতে বিরত হওয়া (=সন্ন্যাস) মোক্ষের মূল। [সংক্ষেপশারীরক, ৩, ৩৬৬]

(খ) "প্রবৃত্তিলক্ষণো যোগো
জ্ঞানং সন্ন্যাসলক্ষণম্।
তস্মাজ্‌ জ্ঞানং পুরস্কৃত্য
সন্ন্যসেদিহ বুদ্ধিমান্॥

—কর্ম্মযোগ প্রবৃত্তির আশ্রিত, জ্ঞান সন্ন্যাসের আশ্রিত। অতএব যাঁহারা বুদ্ধিমান্, তাঁহারা জ্ঞানকেই মুখ্য স্থান দিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিবেন। [মহাভারত ১৪, ৪৩, ১১৯৫]

এ বিষয়ে যেমন শ্রুতিস্মৃতির প্রমাণ দেওয়া গেল, সেইরূপ যুক্তির প্রমাণও দেওয়া যায়। কোনও একটা উদ্দেশ্য লইয়া মানুষ যদি কাজ করিতে যায়, তবে যাহা তাহার উদ্দেশ সিদ্ধির পক্ষে উপযোগী অথচ অবিরোধী, তাহাই সে গ্রহণ করে, এবং যাহা তাহার বিপরীত, তাহা ত্যাগ করিয়া থাকে। ব্রহ্ম এবং আত্মার স্বরূপ নির্ণয় করিয়া জ্ঞানলাভ করা যাহার উদ্দেশ্য, সেই বেদান্ত বিচার করিয়া থাকে। বেদান্ত বিচারের পক্ষে কর্ম্মের তো কোনও উপযোগিতাই নাই, কেননা কর্ম্ম ছাড়াও বেদান্তবিচার চলিতে পারে। আবার কর্ম্ম যে বেদান্ত বিচারের অবিরোধী এমন কথাও বলা চলে না। কেননা কর্ম্মের আবিলতায় চিত্ত বিক্ষিপ্ত হইলে তাহা দ্বারা বেদান্তের অর্থ নির্ণয় করা সম্ভবপর হয় না। সুতরাং কর্ম্মকে বিচারের বিরোধীই বলিতে হইবে। যিনি আত্মজিজ্ঞাসু, তিনি আত্মবিচার ও ব্রহ্মবিচার দ্বারা "আমিই, ব্রহ্ম" —এই প্রকার জ্ঞান লাভ করিতে যত্ন করিয়া থাকেন। এক্ষণে ব্রহ্মে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় প্রভৃতি ভেদ নাই, কর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্বের কোনও অভিমান নাই। অথচ কর্ম্ম করিতে হইলে অধিকারানুযায়ী করিতে হইবে। ইহাতে কর্ত্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্বের অভিমান তো থাকিবেই, তাহা ছাড়া নিজের মাঝেও আমি ব্রাহ্মণ, আমি ক্ষত্রিয় ইত্যাদি ভেদজ্ঞাপক ভাবের অধ্যাস না করিয়া কিরূপে কর্ম্ম করা যাইতে পারে? সুতরাং ইহা হইতেই প্রমাণিত হয় যে, আত্মজিজ্ঞাসুর পক্ষে কর্ম্মসন্ন্যাস অবশ্য প্রয়োজন।

এইরূপে শ্রুতি, স্মৃতি ও যুক্তি—এই তিন উপায়েই সন্ন্যাসকে আত্মজ্ঞানের অন্তরঙ্গ বলিয়া প্রমাণিত করা হইল। বেদান্ত জিজ্ঞাসার অধিকারী হইতে হইলে সন্ন্যাসী হইতে হইবে, ইহাই উপরতি-সম্পত্তির তাৎপর্য্য।

তিতিক্ষা

তার পর তিতিক্ষা। শীতোষ্ণ, মানাপমান, লাভালাভ, হর্ষশোক—এইগুলি পরস্পরের আপেক্ষিক। ইহাদের একটা দ্বারা নিজকে অভিভূত হইতে দিলে অপরটির আক্রমণবেগও সহ্য করিতে হইবে। সুতরাং ইহাতে চিত্তের চাঞ্চল্য অবশ্যম্ভাবী। এইজন্য বেদান্তাধিকারীকে শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ্ববেগের মাঝে অবিচলিত থাকিতে চেষ্টা করিতে হইবে। দ্বন্দ্বে অবিচলিত থাকাকেই বলে তিতিক্ষা।

সমাধি ও শ্রদ্ধা

যখন উপরি-উক্ত সাধনদ্বারা চিত্ত নিগৃহীত হইবে, তখন তাহাকে শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনে একাগ্র করিতে হইবে। ইহাকেই বলে সমাধি। সমাধি যে কেবল শ্রবণাদি মুখ্য বিষয়ে প্রবৃত্ত হইতে পারে, তাহা নহে; শ্রবণাদি ব্যাপারের অনুকূল বিষয়েও চিত্ত সমাহিত করা যাইতে পারে। রামতীর্থ

অনুকূল ব্যাপারের দৃষ্টান্ত দিতেছেন—গুরুসেবা, পুস্তক সম্পাদন, পুস্তক রক্ষা ইত্যাদি। বেশ আরামে থাকা যাইতে পারে, এমন অন্নপান ও দ্রব্যাদি সংগ্রহও তো শ্রবণাদি ব্যাপারের অনুকূল বলিয়া কেহ মনে করিতে পারে। কিন্তু এ বিষয়ে শ্রুতির কঠোর শাসন রহিয়াছে—"দণ্ডমাচ্ছাদনং কৌপীনং পরিগ্রহেচ্ছেষং বিসৃজেৎ।" সুতরাং সুখে থাকিব বলিয়া উপকরণ সংগ্রহ করা, মঠাদি প্রতিষ্ঠা করা, যেখানে-সেখানে প্রতিগ্রহ করা—ইত্যাদি কিছুতেই চিত্ত সমাহিত হইতে দেওয়া কর্ত্তব্য নহে।

গুরু বা বেদান্ত যে উপদেশ দিবেন, তাহাতে বুদ্ধিকে নিশ্চলা করিয়া তাহার ধারণা করাকে বলে শ্রদ্ধা। শ্রদ্ধা যে জ্ঞানের মূল, ইহা ভগবান্ গীতাতেও বলিয়াছেন—"শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ।"

শ্রীনন্দ

নন্দের প্রস্তাবে সকলেই আনন্দের সহিত সম্মত হইল। নন্দের এই সঙ্গীদিগের নাম আমরা জানি না, কিন্তু তাহাদিগের পুণ্য-কাহিনী আমাদের অজ্ঞাত নহে। নন্দ যতদিন স্বগ্রামে ছিলেন, ততদিন ইহারা তাঁহার সহচররূপে কাছে কাছে থাকিয়া সকলপ্রকারে সাহায্য করিয়াছে। এই সঙ্গীদিগকে পাইয়া নন্দের চিত্ত আশাতীতরূপে উৎফুল্ল হইয়া গিয়াছিল। ইহাদিগকে লইয়া সর্ব্বদা তিনি ঈশ্বরীয় কথা কহিতেন, ভগবৎসেবায় উদ্বুদ্ধ করিতেন, জীবনের নশ্বরত্ব বুঝাইয়া দিয়া তাহাদিগকে সচেতন করিতেন।

নিকটেই তিরুপুঙ্কুর গ্রাম। সেখানকার শিবমন্দির সে অঞ্চলে বিখ্যাত। নন্দ প্রভুর কাজ করিয়া বড় একটা অবসর পাইতেন না, কিন্তু যখনই হাতে কাজ না থাকিত, তখনই সঙ্গীদিগকে লইয়া চুপি চুপি তিরুপুঙ্কুর মন্দিরে চলিয়া যাইতেন। সেখানে বিগ্রহের দর্শন পাইতেন না বটে, কিন্তু তবুও গায়ে বিভূতি মাখিয়া গাল-বাদ্য করিয়া, উচ্চৈঃস্বরে মহাদেবের নাম গান করিয়া প্রেমানন্দে তাঁহারা গ্রাম প্রদক্ষিণ করিয়া বেড়াইতেন। নন্দের মনে ক্ষণে ক্ষণে নূতন ভাবের লহর খেলিয়া যাইত, তাহারই উচ্ছ্বাসে সঙ্গীদিগের নামগানে উৎসাহ ও আনন্দের অবধি ছিল না।

এদিকে সকলের সমবেত চেষ্টায় যখন যথেষ্ট পরিমাণ চর্ম্ম সংগৃহীত ও পরিষ্কৃত হইয়াছে, তখন একদিন নন্দ সেগুলি ও কিছু নারিকেল লইয়া তিরুপুঙ্কুর মন্দিরে গেলেন। তাঁহার আবাল্যসঙ্গীরাও সঙ্গে সঙ্গে চলিল। মন্দিরের কাছে গিয়া অপরকে দিয়া তিনি পুরোহিতের কাছে তাঁহাদের পাঠাইয়া দিলেন এবং একবার শ্রীবিগ্রহ দর্শন করিবার অনুমতি পাইবার জন্য সানির্ব্বন্ধ অনুরোধ জানাইলেন। বোধহয় বিধি সেদিন সুপ্রসন্ন ছিলেন,

তাই কি ভাবিয়া মন্দিরের প্রধান পুরোহিত নন্দের প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। নন্দ বিগ্রহ দেখিতে পাইবেন, কিন্তু অঙ্গনে প্রবেশ করিয়া নয়, অদূরে মন্দিরের চত্বরের বাহিরে যে নিশান রহিয়াছে, সেই নিশানের খুঁটীর আড়াল হইতে তিনি বিগ্রহ দর্শন করিতে পাইবেন।

এই কথা শুনিয়া নন্দ তো আনন্দে আত্মহারা। তিনি বিগ্রহ দর্শনে অধিকার পাইবেন?—বাগদত্তা কন্যা যেমন গৃহকর্ম্মের মাঝে মাঝেও ভাবী প্রিয়তমের মুখখানি কল্পনা করিয়া সেই সুখে বিভোর হইয়া থাকে, জাগ্রতে যে মুখের কল্পনা প্রতি কর্ম্মে আনন্দের বেগ সঞ্চারিত করিয়া জীবনকে সুখস্বপ্নে আবিষ্ট করিয়া রাখে, আবার স্বপ্নের নিরালায় যে মুখখানি কল্পনায় আরও স্পষ্ট হইয়া উঠিয়া আসন্ন মিলনের আশায় প্রাণকে অধীর করিয়া তোলে—তেমনি আশায় কল্পনায় নন্দের এতদিন কাটিয়াছে। আজ কি তবে তাঁহার প্রিয়তম সদয় হইলেন—এতদিনের বিরহদগ্ধ প্রাণের তৃষ্ণা আজ মিটিবে কি?

তখন আরতি আরম্ভ হইতে অধিক বিলম্ব নাই। মন্দিরের একজন পরিচারক নন্দ ও তাঁহার সঙ্গীদিগকে নির্দ্দিষ্ট স্থানে লইয়া গেল। সেখান হইতে বিগ্রহ ভাল করিয়া দেখা যায় না, লিঙ্গমূর্ত্তির সম্মুখে যে বৃষের প্রকাণ্ড প্রস্তর মূর্ত্তি রহিয়াছে, তাহাতে বিগ্রহ আড়াল হইয়া রহিয়াছে। নন্দ সমস্তটা দেখিতে পাইলেন না, কিন্তু যাহা দেখিলেন, তাহাতেই বিস্মিত, পুলকিত, স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন,—তাঁহার আর বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিবার ক্ষমতা রহিল না।

কার মাঝে কি আছে, বাহির দেখিয়া লোকে তাহা ধরিতে পারি না, কিন্তু অন্তর্যামী তো সকলেরই ভিতরের খবর জানেন। মন্দির প্রাঙ্গনে আজ যত ভক্তের সমাবেশ হইয়াছে, ইহাদের মানুষ নন্দের মত কে? তোমরা তাঁহাকে নীচ ভাবিয়া মন্দির হইতে দূরে রাখিয়াছ, কিন্তু ভগবানের করুণা হইতে ভক্তকে কে দূরে রাখিতে পারে? আত্মহারা নন্দ মন্দিরের ঐশ্বর্য্য দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছেন, ততোধিক মুগ্ধ হইয়াছেন সেখানকার গম্ভীরভাবে। ভক্তির আভা সকলের মুখেই এক অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য আনিয়া দিয়াছে—চারিদিক হইতে সুস্বরে স্তোত্রের লহরী উঠিয়াছে, সমতালে গম্ভীর ধ্বনিতে আরতির বাদ্য বাজিতেছে, আর পুরোহিতের হস্তে ধূপের পুণ্যগন্ধ ভক্তের নিঃশেষ আত্মনিবেদনের প্রতীক হইয়া সৌরভে চারিদিক আমোদিত করিয়া তুলিয়াছে। নন্দ ভক্তিবিহ্বল হৃদয়ে দেবতার চরণে আত্মদানের মহিমা প্রত্যক্ষ করিলেন। তারপর পঞ্চপ্রদীপের আরতি আরম্ভ হইল। দীপশিখা প্রদীপ্ত প্রাণের শিখার মতই কাঁপিয়া কাঁপিয়া দেবতাকে নীরাজিত করিয়া চরণপ্রান্তে নিথর হইয়া রহিল। মুগ্ধ বিস্ময়ে নন্দ তাহাও দেখিলেন। কিন্তু ভক্তের মহিমা দেখিয়া তাঁহার প্রাণের পিপাসা আরও বাড়িয়া উঠিল। ভক্তের আত্মনিবেদন, ভক্তের প্রাণের দীপ্তি—সবই সুন্দর, সবই দেখিয়া তিনি আপনাকে কৃতার্থ মনে করিতেছেন, কিন্তু যাহাকে দেখিবার জন্য তাঁর এত প্রাণান্তিক আকুলতা, কই সে দেবতা কোথায়, কাছে ডাকিয়াও যে তিনি আড়াল হইয়া রহিলেন!

নন্দের আকুল প্রার্থনা ভগবানের বুকে বাজিল। ভগবান্ ভক্তের মান বাড়াইয়া তাঁহারই মহিমা প্রকাশ করেন। প্রেমে অঘটন ঘটিয়া থাকে, জড় চক্ষু তাহা দেখিলেও

বিশ্বাস করিতে চাহে না। আরতির সময় সেদিন এমনই একটা ঘটনা ঘটিল। সকলে সবিস্ময়ে দেখিল, লিঙ্গমূর্ত্তির সম্মুখে যে প্রস্তরের বৃষ ছিল, আপনা হইতেই তাহা ধীরে ধীরে একপাশে সরিয়া গেল। নন্দের সম্মুখে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য ফুটিয়া উঠিল—তাঁহার সম্মুখে একি সাকার ও নিরাকারের, অপূর্ব্ব সমন্বয়—একি জ্যোতির্ঘন শুদ্ধ প্রকাশ! নন্দ আর দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিলেন না, ভাবের আতিশয্যে তাঁহার মর্ম্মগ্রন্থিগুলি যেন টুটিয়া যাইতে লাগিল, তিনি অবশ হইয়া মাটীতে লুটাইয়া পড়িলেন। অতি প্রবল কম্পনের আবেগে সমস্ত শরীর নিস্পন্দ হইয়া গিয়াছে—মুখে কথা নাই, কেবল দুই চক্ষু বহিয়া অবিরল ধারা পড়িতেছে।

আরতি কখন শেষ হইয়া গিয়াছে, কিন্তু নন্দের আর বাহ্যজ্ঞান নাই। ক্রমে তাঁহার চারিদিকে লোক জুটিয়া গেল। সকলেই আজ দেবমন্দিরের অলৌকিক ঘটনা দর্শন করিয়াছে, মহাদেবের জ্যোতিঃ-শিখা যে তাঁহার প্রিয়তম ভক্তের ললাট স্পর্শ করিয়াছে, ইহা সকলেই দেখিয়াছে। এমন ভক্তকে দেখিবার জন্য সকলেরই প্রবল আগ্রহ। ভগবান্ স্বয়ং নন্দকে সেদিন যে মান দিয়াছিলেন, মানুষ তাহার অবমান করে নাই—আজ পর্য্যন্তও তিরুপুন্নুরের বৃষমূর্ত্তি তেমনই শিবলিঙ্গের একপাশে—অন্যান্য মন্দিরের মত সম্মুখে নয়।

বহুক্ষণ পরে নন্দ বাহ্য জগতে ফিরিয়া আসিলেন। চক্ষু মেলিতেই দেখেন, বহু ব্রাহ্মণ দর্শক তাঁহাকে ঘিরিয়া রহিয়াছেন। নন্দ বিনয়ের অবতার, ব্রাহ্মণদিগকে দেখিবামাত্রই ভূলুণ্ঠিত হইয়া তাঁহাদিগকে প্রণাম করিলেন। তারপর সঙ্গীদিগকে লইয়া আবার গ্রাম প্রদক্ষিণ করিতে চলিলেন। যাইতে যাইতে শুনিলেন, এক জায়গায় এক ব্রাহ্মণ সমবেত শ্রোতৃগণের নিকট চিদম্বরে মহাদেবের মহিমা ব্যাখ্যা করিতেছেন। নন্দ দূরে দাঁড়াইয়া আগ্রহের সহিত তাহা শুনিতে লাগিলেন।

দাক্ষিণাত্যের পঞ্চতত্ত্বরূপী মহাদেবের যে পাঁচটী মন্দির রহিয়াছে, চিদম্বরম্ তাহারই অন্যতম। এখানে মহাদেবকে আকাশরূপে পূজা করা হয়। এই আকাশ স্থূল জগতের আকাশ নহে—ইহা চিদম্বরম্ অর্থাৎ চিদাকাশ। নিগুণ তত্ত্বকে কিছু দিয়াই প্রকাশ করা যায় না সুতরাং তাঁহার উদ্দেশে মন্দির গড়িলেও তাঁহার তত্ত্ব প্রকাশিত হয় না। তথাপি মানুষ যে বিরাট অনুভূতি লাভ করে, অপরকে তাহার অংশ দিবার জন্য প্রতীকের ভিতর দিয়া তাহাকে যথাসাধ্য প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিয়া থাকে। এই জন্য সাধকের হিতার্থে ব্রহ্মের রূপকল্পনা হইয়া থাকে।

চিদম্বরমের মন্দিরে মহাদেব যে চিদাকাশ স্বরূপ, নির্লেপ, নির্গুণ—এই তত্ত্বটী অতি নিপুণভাবে প্রকাশ করা হইয়াছে। মন্দিরের মধ্যভাগে একটী সুবর্ণখচিত মণ্ডপ—তাহার নাম চিৎসভা। এই সভার পুরোদেশে "নটরাজ" মহাদেবের মূর্ত্তি। তারপরে যে বিগ্রহহীন শূন্য স্থানটুকু রহিয়াছে, তাহাকে বলা হয়—"রহস্য।" মণ্ডপের মাঝে এইরূপ মূর্ত্তি ও অমূর্ত্তির সমাবেশ ও তাহাদের এইরূপ নামকরণ অর্থপূর্ণ বটে।

আমরা একেবারেই নির্গুণ তত্ত্বে পৌঁছাইতে পারি না,—সগুণকে ধরিয়া অদ্বয় ব্যক্তি

য়ের আশ্রয় করিয়া আমাদের নির্গুণকে সঙ্কেতিত করিতে হয়। তাই ব্রহ্মসূত্রকার "অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা" করিয়া ব্রহ্মের লক্ষণ বলিতে যাইয়া বলিলেন, "জন্মাদ্যস্য যতঃ" অর্থাৎ যাঁহা হইতে এই পরিদৃশ্যমান জগতের জন্ম, স্থিতি ও লয় হইতেছে, তিনিই ব্রহ্ম। এই চিদাম্বরম্ মন্দিরেও ঠিক এই তত্ত্বটীর সঙ্কেত রহিয়াছে। মন্দিরে প্রবেশ করিয়াই দেখিব, চিৎসভার সম্মুখে নটরাজ সৃষ্টি স্থিতি সংহার-লীলায় কুশল নৃত্যশীল চরণযুগলকে চঞ্চল করিয়া অপরূপ ভঙ্গিমায় বিরাজ করিতেছেন। এই নটরাজ মূর্ত্তির সম্বন্ধে আমাদের সবিশেষ বলিবার নাই—উহার প্রতিকৃতি আজকাল অনেকেই দেখিয়াছেন এবং জগতের শ্রেষ্ঠ, গুণীরা শতমুখে উহার প্রশংসা করিয়াছেন।

পরিদৃশ্যমান জগতে যাহা দেখিতেছি, তাহার কিছুই স্থির নহে। জগৎ অবিরাম চলিতেছে বলিয়াই ইহার নাম "জগৎ।" গতিই জগতের স্বভাব। কিন্তু এই গতি কাহার চরণ-বিন্যাসে অর্থময় হইয়াছে, তাহা ভাবিয়া দেখিতে হইবে। পঞ্চভূতের অধিকারে, মন বুদ্ধির অধিকারে—প্রকৃতির সর্ব্বত্রই গতির লীলা দেখিতে পাইতেছি। সমগ্রভাবে এই গতিকে গ্রহণ করিলে বুঝিতে পারি, এ গতি তো বিশৃঙ্খল আবর্ত্তন মাত্র নহে—এর মাঝেও যে ছন্দ আছে। ছন্দোযুক্ত গতিকেই বলি নৃত্য। বিশ্বনাট্যমঞ্চে যে ছন্দোবদ্ধ গতির অভিনয়, সে কোন্ সুচতুর নটের লীলা-বিলাস? ভারতবর্ষের দার্শনিক ঋষি কবি সমগ্র বিশ্বের চঞ্চলতাকে এক মহানন্দের ছন্দে বাঁধিয়া এক চিরনৃত্যশীল দেবতার লীলাময় চরণবিন্যাসের সহিত অন্বিত করিয়াছেন।

চঞ্চলকে যাহারা ধরিয়া রাখিতে চায়, তাহারা স্বার্থমনোরথ হইয়া বলে জগৎ দুঃখময়। তাহাদের কাছে জগৎ দুঃখময় হইতে পারে, কেননা তাহারা সমগ্রকে দেখিতে পায় না; আপন আপন ক্ষুদ্র স্বার্থের অনুকূলে জগতের একটী ক্ষুদ্র অংশকে তাহারা প্রাণপণে আঁকড়িয়া ধরিতে চায়, কিন্তু যখন ধরিয়া রাখিতে পারে না, তখনই আর্ত্তনাদ করিয়া বলে: জগৎ দুঃখময়। কিন্তু যিনি সম্যক্‌দৃষ্টি লাভ করিয়াছেন, বহুর মাঝে একেকে উপলব্ধি করিতে শিখিয়াছেন, তিনি দেখেন, জগতের সর্ব্বত্র আনন্দ, তাহার চঞ্চলতার মূল সত্যই হইল আনন্দের আবেগ-স্পন্দন। তাই তাঁহার চোখে বিশ্বজগৎ ভাঙ্গিতেছে গড়িতেছে—না সেই চিরচঞ্চল নটশেখরের পুলকিত চরণপাতে অপরূপ ছন্দতালে নৃত্যের বিলাস চলিয়াছে। গ্রহমণ্ডলের ভীষণ আবর্ত্তন হইতে বসন্তমারুতে তরুপল্লবের মৃদু আন্দোলন পর্য্যন্ত সমস্তই নটরাজের নৃত্যবিলাস। সৃষ্টির আবেগে, স্থিতির বৈচিত্র্যে, প্রলয়ের ঘূর্ণাবর্ত্তে—সর্ব্বত্রই সেই নটরাজের নর্ত্তনমহিমা। জগতের মাঝে নিরানন্দ কোথায়?—সৃষ্টিতে, স্থিতিতে, প্রলয়ে—সুখে, দুঃখে, জীবনে, মরণে, আশায়, নিরাশায়—সব ঠাঁই আমার নর্ত্তনসুন্দর নটরাজ নাচিতেছেন—কখনও বা রুদ্রতাণ্ডবে, কখনও বা মৃদুমধুর লাস্যবিলাসে! যিনি তাঁহার নৃত্যরত চরণযুগলকে বিশ্বের মর্ম্মস্থলে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন—বিশ্বরাজের চিৎসভায় তাঁহার আসন মিলিয়াছে, বিশ্বনৃত্যের অন্তরালে যে পরম রহস্য রহিয়াছে, তাহা প্রত্যক্ষ করিবার অধিকার তিনি পাইয়াছেন।

ব্রাহ্মণের মুখে চিদম্বরমের মহিমা-ব্যাখ্যান শুনিয়া নন্দের মনে অপরূপ ভাবান্তর উপস্থিত

হইল। ব্রাহ্মণ যে তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিলেন, তাহার অক্ষরার্থের সহিত তাঁহার পরিচয় হউক বা না হউক, তাঁহার হৃদয় তাহার মর্ম্মগ্রহণ করিয়াছে—নটরাজের নাম শুনিয়াই পুলকাবেশে তাঁহার চিত্ত এলাইয়া পড়িয়াছে। চিদম্বরম্—নটরাজ—এই দুইটী নামের সোণার কাঠি ছোঁয়াইয়া কে যেন তাঁহার ঘুমন্ত প্রাণকে জাগাইয়া দিয়াছে—জাগিয়া উঠিয়া শতজন্মের অনুরাগের আকর্ষণ মনে পড়িয়া গিয়াছে—আর তো তিনি স্থির থাকিতে পারেন না। চিদম্বরমে নটরাজকে দেখিতেই হইবে, তাঁহার পরম রহস্যে অবগাহন করিতেই হইবে—তাঁহার সমগ্র চিত্ত একাগ্র হইয়া শুধু এই কথাই ভাবিতে লাগিল।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং

ভাব ও কাজ

কাজ আর ভাব এই দুইটী লইয়া আমাদের বড় গোল লাগে। আমরা যদি কাজ করিতে যাই, তবে হয়তো ভাব পাই না, আবার যদি ভাব করিতে যাই, তবে হয় তো কাজ হয় না। অথচ দুইটীই আমাদের প্রয়োজন—কেননা ইহাদের একটী হইল জীবনের বহিরঙ্গ, আর একটী অন্তরঙ্গ। যে কোনও কাজই আমরা করি না কেন, একটা না একটা ভাব তাহার পেছনে আছেই; আবার চিত্তে যে ভাবই জাগুক না কেন, একটা না একটা কাজের ভিতর দিয়া তাহা ফুটিয়া উঠিবেই। এই জন্যই আমরা কাজ দেখিয়া ভাবের অনুমান করি—মানুষের ভিতরে কি আছে, তাহা সাধারণ দৃষ্টিতে বুঝিতে পারি না বলিয়া কাজ দেখিয়া একটা আন্দাজ করিয়া লই। সিদ্ধ দৃষ্টি কিন্তু ভাব দেখিয়া তাহার কার্য্যপরিণাম নিশ্চয় করে, তাই তাহার বিচারে কোনও গোল হয় না, কিন্তু আমাদের কাজ দেখিয়া ভাবের আন্দাজ করিতে যাওয়ায় সংসারে নিত্য কত গোলযোগের সৃষ্টি হইতেছে।

ভাব আর কাজ যদি এমনই অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়াইয়া থাকে, তবে গোল লাগিবার সম্ভাবনা কোথায়?—কথা হইতেছে, এই দুইটার মাঝেও তো আদর্শের বিভিন্নতা আছে। যে কোনও ভাবকেই আমরা বড় বলি না, যে কোনও কাজকেও না। বড় ছোটর বিচার যেখানে, সেইখানেই তো গোল হইবে। বড় ছোট যেখানে রহিয়াছে, সেইখানের চলাচলের একটা পথ রহিয়াছে—সেটা হইল মানুষের সদর রাস্তা, সেখানে চলিতে গেলে অপরের সঙ্গে বাধে। আর বড় ছোটর বিচার যেখানে সাঙ্গ হইয়া গিয়াছে, সেই হইল লক্ষ্য—সেখানে আসিয়া সবাই নিশ্চল।

ভাব আর কাজ দুইই যদি ছোট হয় তবে কোনও গোল নাই—দিব্যি তোমার সংসার চলিয়া যাইবে। অবশ্য এক জায়গায় আসিয়া ঠেকিতেই হইবে, সে পৃথক কথা।

কিন্তু চলিবার সময় আর কোনও ঠোকাঠুকি হইবে না। সংসারে শতকরা সাড়ে নিরানব্বই জন লোক সামান্য ভাব আর সামান্য কাজ নিয়া দিন গুজরাণ করিতেছে। তাহাদের সংসার কি অচল হইয়া রহিয়াছে? সাংসারিক দুঃখ কষ্টের কথা বলিও না—সে কথা ধরিতেছি না, কেননা ভাব আর কাজের বিচার সংসারের দুঃখকষ্ট দিয়া হয় না, সে হয় নিজকে দিয়া। যাহারা সামান্যভাবে থাকিয়া জীবনটা কাটাইয়া দিতেছে, তাহাদের জিজ্ঞাসা করিয়া দেখ, পরের দায়ে দুঃখকষ্টের কথা অনেকেই বলিবে, কিন্তু নিজের দায়ের একটি কথাও কেহ বলিবে না। সংসারে দুঃখ পাই, কষ্ট পাই—তার জন্য দায়ী কে?—না আমি ছাড়া সবাই। আর সবার চেয়ে বেশী দায়ী ভগবান। ছোট ভাব আর ছোট কাজে আমার যে কোনও গলদ আছে, যার জন্য দুঃখকষ্টের দায়িত্বটা আমারই বহন করা উচিত—এ কথা কেহই সহজে স্বীকার করিতে চাহিবে না। তাই বলিতেছিলাম, ভাব আর কাজের যদি ওজন ঠিক হয়, তবে তাহারা ছোট হইলেও আমাদের ভিতরে ভিতরে কোনও অভাব বা অপূর্ণতার ভাব জাগায় না।

তবে বলিয়াছি, ছোটকে নিয়া চিরদিন এমন ভাবে চলা যায় না। কেন বলিতেছি। ছোট ভাব আর ছোট কাজ ততদিন নিরাপত্তিতে চলে, যতদিন আমার কর্তৃত্বের অভিমানটি ঠিক থাকে। কর্তা যদি তাল সামলাইয়া যাইতে পারেন, তবেই তো আর তাঁর কাজে কোথাও গোল দেখিতে পাইবেন না—এখন তিনি ছোট কর্তাই হন না কেন। কিন্তু কর্তার উপরেও তো কর্তা আছেন। ছোট কর্তার ভাবে আর কাজে কোনও বিরোধ না থাকিতে পারে, কিন্তু কর্তায় কর্তায় যে বিরোধ বনাইয়া উঠিবেই—তখন তো আর স্বস্তিটুকু থাকিবে না।

আজ হোক, কাল হোক, জন্মজন্মান্তরে হোক, বড় কর্তার কাছে ছোট কর্তার তলব একদিন হইবেই। সেইজন্যই তো ভাবনা। ছোট কর্তার যতদিন এই কথাটা মনে থাকে না, ততদিন পর্য্যন্ত তার লম্ফঝম্পের আর সীমা থাকে না। কিন্তু কোনও ইঙ্গিতে যদি হিসাব তলবের কথাটা একবার মনে পড়িয়া যায়, তবেই সর্ব্বনাশ!—আর তো তখন দম্ভ করিয়া বেড়ানো চলে না। তখনও অভ্যাস অনুযায়ী কর্তৃত্ব করিয়া যাই বটে, কিন্তু কর্তৃত্বের সেই আরামটুকু আর থাকে না—কেবল তখন ভয়, কখন বা পেয়াদা আসে! এক একবার মনেও হয়, আমি যে ভাবে কাজ করিতেছি, তা বুঝি বড় কর্তার মনের মত হইল না। এই ভাবিয়া আঁচে আন্দাজে তাঁর মনের মত ভাবটি কল্পনা করিয়া সেই অনুযায়ী কাজ করিতে যাই, কিন্তু এক দৃষ্টি খাটো, তাতে আবার যেটুকু শক্তি ছিল, তাও অভিমানের ঝাঁঝে ঝাঁঝিয়া রাখিয়াছি—তাই তখন ভাবে আর কাজে একটা বিষম তাল পাকাইয়া যায়। হয়ত ভাবটা ধরিয়াছি বড়, কিন্তু অভিমানের বর্ম্ম ভেদ করিয়া সেটা আর মর্মে প্রবেশ করিবার সুযোগ পাইল না—কাজেই তার অনুপাতে কাজটা হইয়া গেল ছোট। নয়ত বড় কর্তার মন পাইবার জন্য কাজের পত্তন করিয়াছি বড় করিয়া, কিন্তু তাহাকে ঠেলিয়া নিবার উপযোগী রসদ যোগাড় হয় নাই। হিসাব তলবের ভাবনা যাদের মনে জাগিয়াছে, তাদের মাঝে ভাব আর কাজে

এইরূপ একটা তালগোল পাকাইয়া যায়। এ সঙ্কট হইতে বাঁচিব কি করিয়া?

দেখিতেছি, ভাব আর কাজের যে বিরোধ, সেটা আসলে কিন্তু বস্তুর বিরোধ নয়, কর্ত্তার বিরোধ। অর্থাৎ যেমন ভাব, তেমন কাজ যে হইবে, এ তো স্বভাবের কথা, অতি সুন্দর কথা। জগতে কি সবাই ভাল না সবাই মন্দ? সব কাজই কি পাপ, না সব কাজই পুণ্য? কই, পশুপক্ষীর পাপ-পুণ্যের বিচার তো কেহ করে না, তাহাদের ভাব আর কাজে যে তাহাদের মাঝে কোনও খটকা লাগে, এমন কথা তো কেহ বলে না? তবে মানুষের বেলায় এত ভাল, মন্দ, পাপ, পুণ্যের বিচার আসে কেন?—না মানুষের মূলে যে অভিমান রহিয়াছে। সে যে শুধু ভাবে আর করে, তা তো নয়—এই ভাব আর কাজ যে তার নিজস্ব একটা বিশেষত্ব, এ কথা সে বেশ বুঝে। এই তো অভিমান। যেখানে অভিমান, সেইখানেই গণ্ডী; আর যেখানে গণ্ডী, সেইখানেই বিরোধ। প্রকৃতির মাঝে অভিমান নাই, গণ্ডী নাই, বিরোধ নাই—সবটা জুড়িয়া সেখানে একটা সত্য। তাই সেখানে সবই স্বভাবে সুন্দর; সুন্দরের মাঝে তো পাপ-পুণ্য, ভালমন্দের বিচার নাই। প্রকৃতির উলটা পিঠেও এমনি একটা বিরাট স্বভাব রহিয়াছে—সেটা সমষ্টি জড়ের স্বভাব নয়, জড়ের অধিষ্ঠাতা চৈতন্যের স্বভাব। সেখানেও বিরোধ নাই, গণ্ডী নাই—সবই সুন্দর। আর এই দুয়ের মাঝখানে হইল আমার আমিত্ব। জিনিষটা মোটেই খাঁটী নয়—ওটা দোআশলা। তাই তার কোনও কুলে ঠাই হয় না। আমার মাঝে প্রকৃতির যে অংশটুকু ছিল, তাহাকে দিয়াছি পুরুষের অভিমান, অর্থাৎ দাঁড়কাকের পুচ্ছে ময়ূরের পালক গুঁজিয়া দিয়াছি। তাতে দাঁড়কাকটারও গতি হইল না—ময়ূরের পালকগুলিও বরবাদ হইল। অথচ বিরোধটা পুরা মাত্রাতেই থাকিয়া গেল।

অভিমান চূর্ণ করিয়া দাও, বিরোধ থাকিবে না। কর্ত্তার আবার প্রয়োজন কি? একজন ছাড়া দুইজন কর্ত্তা হইলেই বিরোধ অবধারিত। অথচ ওই যে একজন সবার মাথার উপরে রহিয়াছেন, তাঁহাকে পদচ্যুত করিবার সাধ্য তো কাহারও হইবে না, তবে আর কি?—কর্ত্তৃত্বের ভার তাঁহার উপরই ছাড়িয়া দাও—বল "প্রভু, তোমার ইচ্ছার জয় হোক—আমার ইচ্ছা নাই, কামনা নাই—আমি শুধু নিমিত্ত—তুমিই সব।" এই ভাবে প্রপন্ন হও, ভাব আর কাজে গোল থাকিবে না।

অভিভাষণ

—❋—

[বগুড়া ভক্তসম্মিলনীর ৯ম অধিবেশনে অভ্যর্থনা সমিতির সম্পাদক দ্বারা পঠিত]

—❋—

আজ এই পুণ্য মুহূর্ত্তে পরমারাধ্য শ্রীশ্রীগুরু-মহারাজের শ্রীপাদপদ্মে সভক্তি প্রণতিপুরঃসর আমার প্রেমাস্পদ ধর্ম্মভ্রাতৃগণকে সাদর প্রেমসম্ভাষণ জ্ঞাপন করিতেছি এবং শ্রীশ্রী-গুরুদেবের বগুড়াস্থ ভক্ত ও শিষ্যমণ্ডলীর পক্ষ হইতে তাঁহাদিগকে সাদর অভ্যর্থনা করিতেছি।

আজ আমরা বগুড়াপ্রবাসী ও বগুড়াবাসী শ্রীশ্রীঠাকুরের ভক্ত ও শিষ্যগণ নিজদিগকে ধন্য ও কৃতার্থ মনে করিতেছি। আজ এই বগুড়ায় আমাদের চিরবাঞ্ছিত তাঁহার পার্ষদগণ লইয়া তিনি যে মহিমময় শোভার বিস্তার করিয়াছেন, তাহাতে আমরা স্বর্গসুখ অনুভব করিতেছি এবং আমাদের অতীতের কর্ম্ম, ভবিষ্যতের আশা এবং বর্ত্তমান জীবনকে ধন্য জ্ঞান করিতেছি।

১০২২ সনের ১১ই পৌষ এবং ১৯১৬ খৃষ্টাব্দের ২৭শে ডিসেম্বর (অগ্রকার তারিখে) সোমবার ভক্তসম্মিলনীর প্রথম অধিবেশন আসাম-বঙ্গীয় সারস্বত মঠের কেন্দ্রস্থল পুণ্য-স্থান কোকিলামুখে অনুষ্ঠিত হয়। সে আজ সুদীর্ঘ আট বছরের কথা। গত বৎসর ভাওয়াল সারস্বত আশ্রমে অষ্টম বার্ষিক অধিবেশন ভিন্ন পূর্ব্ববর্ত্তী যে কয়টী অধিবেশন হইয়াছে, তাহাতে সকল গুরুভ্রাতৃগণ সমান ভাবে যোগদান করিতে পারেন নাই। কিন্তু ভগবানের কি অপার করুণা, গত বৎসর এই সম্মিলনী যেরূপ সার্থকতার সূচনা করিয়াছে—ভ্রাতৃগণের মধ্যে যেরূপ ভাবের স্রোত প্রবাহিত করিয়াছে, তাহা ভাষায় প্রকাশ করা অসম্ভব, তাহা ভাবুকের ভাবরাজ্যে অনুভববেদ্য। এই সম্মিলনীর গত অধিবেশনে নিম্নলিখিত কয়েকটী উদ্দেশ্যের বিষয় বিশেষ ভাবে উল্লিখিত এবং আলোচিত হইয়াছিল, যথা—

১। আদর্শ গৃহস্থজীবন

২। সঙ্ঘশক্তির প্রতিষ্ঠা

৩। ভাব বিনিময়

প্রথমোক্ত আদর্শ জীবন গঠনকল্পে ভ্রাতৃগণ কোথায় কে কি ভাবে কি কার্য্য অনুষ্ঠান করিয়াছেন এবং তাহাতে কি ফল লাভ করিয়াছেন, তাহা এই অধিবেশনে বিশেষ ভাবে আলোচনা করিয়া একটী সুনির্দ্দিষ্ট পন্থা অবলম্বন করা আবশ্যক। আমরা বগুড়ায় এতৎকল্পে কিছু কিছু চেষ্টা করিয়াছি। অপ্রতিহত ভাবে যাহাতে নবপ্রেরিত ভাবরাশি গৃহের সকলের প্রাণে প্রবাহিত হয়, জীবনে ভজন-সাধন যে একটী অবশ্য করণীয় কার্য্য, তাহা সর্ব্বদা সকলের প্রাণে জাগরূক থাকে এবং গৃহের সকলেই পরস্পরের প্রতি প্রীতিভাবাপন্ন ও উচ্ছৃঙ্খলারহিত হয়, এতৎকল্পে সকালে ও সন্ধ্যায় স্ত্রীপুত্রকন্যাগণ সহ গুরুপ্রণাম, স্তোত্রপাঠ, সংকীর্ত্তন এবং গুরুজনকে প্রণাম—এই কয়েকটী কার্য্য অনুষ্ঠিত হয়। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য নিয়মশৃঙ্খলারও

ব্যবস্থা আছে। এইরূপ নিয়মে গৃহে বসিয়া সন্তানসন্ততিগণ লইয়া ভগবৎনামগুণগান করিয়া যে কি অনির্ব্বচনীয় আনন্দ লাভ হয়, তাহা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না।

সঙ্ঘশক্তি লাভ কল্পে আমরা সাপ্তাহিক ও মাসিক অধিবেশনের প্রবর্ত্তন করিয়াছি। এই সকল অধিবেশন এক এক দিন এক এক গুরু ভ্রাতার গৃহে অনুষ্ঠিত হয়। যাহাতে ভাওয়াল আশ্রমের অধিবেশনে প্রচারিত ভাবরাশি সংসারের ঘাত প্রতিঘাতে শুকাইয়া না যায়, তজ্জন্য চেষ্টা করা হয় এবং নিজ নিজ পরিবার মধ্যে ভ্রাতৃগণ কে কিরূপ অগ্রসর হন বা কে কিরূপ অসুবিধা বোধ করেন, তাহা বিশদভাবে আলোচিত হয়। সঙ্ঘশক্তি সংগঠনের পরিপন্থী কোন ভাব কাহারও মধ্যে উপস্থিত হইলে তাহা দূর করিবার ব্যবস্থা করা হয়। পরস্পরের মধ্যে ভ্রাতৃভাব যাহাতে অক্ষুণ্ণ থাকে, শ্রীগুরু-চরণে যাহাতে সুদৃঢ় বিশ্বাস এবং নির্ভরতার উদয় হয়, প্রাণ যাহাতে বিষয়বন্ধন ছিন্ন করিয়া ত্যাগ বৈরাগ্যের দিকে প্রধাবিত হয়, তৎপক্ষে বিশেষ চেষ্টা করা হয়। শ্রীশ্রী-ঠাকুরের কতকগুলি পত্র সংগ্রহ করা হই-য়াছে—তাহা পাঠ এবং আলোচনা করা হয় এবং আর্য্যদর্পণের একটী প্রবন্ধ পাঠ করা হয়। এই সকল অধিবেশনে গুরু-ভ্রাতৃগণ ভিন্ন অন্য কেহ যোগদান করেন না। এই কার্য্যে আশানুরূপ ফল লাভ না হইলেও যাহা লাভ হইয়াছে, তাহাতে আমরা ভবিষ্যতে আরও উৎসাহ এবং উদ্যমের সহিত কার্য্য করিতে পারিলে যে আমাদের শ্রম সার্থক হইবে, সে সম্বন্ধে আমরা নিঃসন্দেহ হইয়াছি। এই এক বৎসর মধ্যে বহু অদ্ভুত ঘটনা সংঘটিত হইয়াছে! তাহাতে আমরা শ্রীগুরুর অপার করুণার, অহেতুক কৃপার প্রকাশ দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছি। যদি আমাদের অক্লান্তকর্ম্মী প্রাণোপম সন্ন্যাসিপ্রবর গুরুভ্রাতা শ্রীমৎ স্বরূপানন্দজী বিষম ব্যাধিগ্রস্ত না হই-তেন, তবে মনে হয় আমাদের আরব্ধ কার্য্য আরও বিস্তৃতভাবে অনুষ্ঠিত হইত এবং সকলেই তাহাতে আশানুরূপ ফললাভ করিতে পারিতাম।

জগতে যতপ্রকার মহৎ ও বৃহৎ কার্য্য অনুষ্ঠিত হইয়াছে, তাহা আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, সবই সঙ্ঘশক্তির উপর প্রতি-ষ্ঠিত। দ্বাদশ জন মাত্র সঙ্গী লইয়া ভগ-বান খৃষ্টদেব জগতে আত্মপ্রকাশ করিয়া-ছিলেন। কিন্তু পরবর্ত্তী কালে সেই খৃষ্ট-ভক্তগণ সঙ্ঘবদ্ধ হওয়ায় খৃষ্টধর্ম্ম আজ কি বিশালতায় পরিপুষ্টি লাভ করিয়াছে। হজরত মহম্মদ তাঁহার মতাবলম্বী মুষ্টিমেয় সঙ্গী লইয়া মক্কা হইতে মদিনায় পলাইয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন, কিন্তু কেবলমাত্র সঙ্ঘশক্তির প্রভাবে জগতে ইসলামধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা করি-য়াছিলেন। বেশীদূর কেন, আমাদের ভার-তের শ্রেষ্ঠ রত্ন ভগবান বুদ্ধদেবের প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম সমস্ত পৃথিবীতে কিরূপভাবে সঙ্ঘবদ্ধ শক্তি প্রভাবে বিস্তার লাভ করিয়াছিল, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। এই সঙ্ঘ-শক্তির মূল মন্ত্র একপ্রাণতা;—পরস্পরের মধ্যে হিংসা বা দ্বেষভাব ভুলিয়া একই উদ্দেশে সমবেতভাবে আত্মনিয়োগ করিতে পারিলেই সঙ্ঘশক্তির উন্মেষ হয়। আমাদের পরম সৌভাগ্য যে আমরা এমন এক বিশাল মহীরুহের শীতল ছায়ায় সকলে মিলিত হইয়া বিশ্রাম লাভ করিবার মহান্ সুযোগ লাভ করিয়াছি। জগজ্জীবের জন্য তিনি যে অমৃত-ভাণ্ড বহন করিয়া আনিয়াছেন, তাহা

সকলের মধ্যে আমরা বিতরণ করিতে চাই। আমরা চাই তাঁহার কার্য্যে নিজকে উদ্বুদ্ধ করিতে; আমরা চাই তাঁহাতে নিজকে আহুতি দিতে। তাঁর সংসারে তাঁর সেবক রূপে তাঁরি গুণগান করিয়া তাঁর কাজ করিয়া যাইতে চাই। তবেই না আদর্শ জীবন, তবেই না তাঁর মহিমময় নামের প্রচার। যদি সত্যধর্ম্মের বিজয়তূর্যনিনাদে দিঙ্মণ্ডল মুখরিত করিতে চাও, ভাই সব, সকলে এক মনে এক প্রাণে তাঁর প্রাণে প্রাণ মিশাও, সঙ্ঘবদ্ধ হও এবং তাঁর মহৎ উদ্দেশ্য হৃদয়ঙ্গম কর।

জগতে সকলেই মানুষ চায়। ধর্ম্মজগতে, নৈতিক ক্ষেত্রে, সকল স্থানেই খাঁটী মানুষের আবশ্যকতা দেখা যায়, কিন্তু তেমন মানুষ গড়ার ব্যবস্থা ত কাউকে করিতে দেখি না। বাস্তবিক ভারতের উন্নতি করিতে হইলে, দেশের দশের দৈন্য ঘুচাইতে হইলে আদর্শ গৃহস্থ গঠন করিতে হইবে। তবে আদর্শ গৃহীর ঘরে আদর্শ পুরুষ আবির্ভূত হইবেন। সাধারণ প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তারকল্পে আদর্শ গৃহস্থগঠনই মুখ্য কার্য্য। ভিত্তি সুদৃঢ় না হইলে গঠনকার্য্য কখনই সুসম্পন্ন হইতে পারে না এবং হইলেও তাহা অনতিকালমধ্যে ভাঙ্গিয়া পড়িয়া যায়। কাজেই গার্হস্থ্যজীবনের সুপ্রতিষ্ঠাই আমাদের প্রধান ও প্রথম লক্ষ্য হওয়া উচিত এবং সকলপ্রকার সংহত শক্তি ইহারই প্রচার ও প্রতিষ্ঠাকল্পে নিয়োগ করা অত্যাবশ্যক।

পরস্পর ভাববিনিময় আমাদের আত্মরক্ষার প্রধান সহায়। সংসারে নানাবিধ আবিলতায় আমরা জর্জ্জরিত। চিত্ত কামকামনায় মুগ্ধ থাকায় সর্ব্বদা সশঙ্ক ও সন্দিগ্ধ। কাজেই এইরূপ বিপদসঙ্কুল অবস্থায় উত্তাল সংসারসাগরে জীবনতরী ভাসাইতে হইলে ভক্তিবিশ্বাস ও একনিষ্ঠা আশ্রয় করিয়া গুরুকৃপাবাতাসে ভবনদী পাড়ি দিবার ব্যবস্থা করা ভিন্ন গত্যন্তর নাই।

সময় সংক্ষেপ জন্য এ সকল বিষয়ে আর বেশী কিছু বলিতে চাই না। এক্ষণে আমাদের এই আশ্রম সম্পর্কে দুওটী কথা বলিয়া এ ক্ষুদ্র প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

বগুড়া সহরের মাড়োয়ারী বাবু দ্বারকানাথ মরাটা প্রদত্ত এই বাগানবাড়ীতে গত ১৩২৬ সনের ঝুলনপূর্ণিমার দিনে শ্রীশ্রীগুরুমহারাজের শুভ জন্মতিথিতে এই আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং প্রতিষ্ঠাকার্য্য শ্রীশ্রীঠাকুর স্বয়ং সম্পন্ন করিয়াছেন।

আশ্রমের তদানীন্তন সেবক অক্লান্তকর্ম্মী শ্রীমৎ কামাখ্যা ব্রহ্মচারী ও অন্যান্য সেবকগণের সেবাসৌকর্য্যে ইহার প্রতি সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষিত হয় এবং হিন্দুমুসলমাননির্ব্বিশেষে ইহার সাহায্য করিতে প্রস্তুত হইলে আমরা একটী রোগিনিবাস প্রস্তুত করিতে মনস্থ করি এবং তদনুযায়ী সাধারণের সাহায্যে এই ৭০ ফুট দীর্ঘ ও ৯ ফুট প্রস্থ একতালা গৃহখানি প্রস্তুত হয়। ইহার জন্য মোট প্রায় ৬৫০০ টাকা ব্যয়িত হয়। কিন্তু কার্য্যাবশেষে কিছু টাকা কম পড়ায় লোন আফিস হইতে ৪৫০ টাকা ঋণ করিয়া কতক বাজার দেনা শোধ করা হয়। ছোট ঘরখানি আমার একটী আত্মীয় নিজব্যয়ে প্রস্তুত করিয়া দিতে স্বীকৃত হন এবং ২০০ টাকা দেন। কিন্তু দৈবদুর্ব্বিপাকে পড়িয়া তিনি সমস্ত অর্থ দিতে সক্ষম হন নাই। এক্ষণে এই ক্ষুদ্র ঘরখানির শেষ ঋণ পরিশোধ এবং আশ্রমের পূর্ব্বদিকের স্থানটী ক্রয়ের ব্যবস্থা করা আব-

শুরু হইয়াছে, কিন্তু অর্থাভাবে হইয়া উঠিতেছে না। প্রায় ২০০০ টাকা হইলেই আপাততঃ এই কার্য্যগুলি শেষ হইতে পারে। আমাদের শ্রদ্ধেয় সতীর্থ শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ মহাশয় আশ্রমের উন্নতি ও প্রসারকল্পে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। আমরা আশা করি—শ্রীগুরুর কৃপায় তাঁহার এ শুভ চেষ্টা ফলবতী হইবে।

পরিশেষে আমার গুরু ভ্রাতৃগণের নিকট নিবেদন এই যে, আমরা তাঁহাদের সম্যক আদর যত্ন ও আহারাদির আশানুরূপ সুব্যবস্থা করিয়া উঠিতে পারি নাই। এবং যাহা করিয়াছি তাহাতেও নানাবিধ ত্রুটি থাকার সম্ভাবনা—তাঁহারা যেন নিজ সোদর জ্ঞানে আমাদের এই সকল ত্রুটি মার্জ্জনা করেন।

শ্রীগুরুচরণে এই প্রার্থনা তিনি দয়া করিয়া আমাদিগকে কর্ত্তব্যনিষ্ঠ করুন এবং আমরা যেন সর্ব্বতোভাবে তাঁহার মনোমত হইয়া তাঁহার মনোমত কার্য্য অনুষ্ঠান করিয়া আমাদের দুর্লভ মানবজন্ম ধন্য করি।

চৈতন্যং শাশ্বতং শান্তং ব্যোমাতীতং নিরঞ্জনং।
বিন্দুনাদ কলাতীতং তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥

আরণ্যক

"যজ্ঞেন বাচঃ পদবীয়মায়ন্ তামন্ববিন্দন ঋষিষু প্রবিষ্টাম্ ॥"

—ঋগ্বেদ সংহিতা ১০।৭১।৩

একটা কিছু ইচ্ছা করেই তার সফলতা চাও, একবার ভাব না যে তোমার ইচ্ছা সত্য কিনা, অর্থাৎ সৎস্বরূপের ইচ্ছার সঙ্গে তোমার ইচ্ছার যোগ আছে কিনা। অবশ্য তোমার অসৎ ইচ্ছার মূলেও তাঁরই সৎ ইচ্ছা বর্ত্তমান, কিন্তু তুমি তো তা দেখতে পাও না, কেননা তুমি যে ফল চাও। আবার, ইচ্ছা করেছ, অথচ ফল পাওনি—বার বার এমনি হলেই অবিশ্বাস আসে, ইচ্ছার মেরুদণ্ড ভেঙ্গে যায়। হয়ত মনে হয়, যাঁর ইচ্ছায় হবার, তাঁর ইচ্ছাতেই হবে, আমার ইচ্ছার আর কতটুকু জোর? অবশ্য এ কথাটা মন্দের বেলাতেই মনে হয়; অর্থাৎ আপন ইচ্ছাতে অনেকখানি মন্দ করে ফেলেছি, এখন যদি কেউ শোধরাতে বলে, তবেই ওজোর দেখাব যে আমার ইচ্ছার আর জোর কতটুকু? অনেক বাজে ইচ্ছা করে ঠকে ঠকে শেষকালে অমন একটা অবসাদ আসে। এ সমস্তের প্রতীকার শুধু সত্য ইচ্ছার সঙ্গে নিজের ইচ্ছার যোগ রাখা। ইচ্ছা যেন একটা লেভারের মত, তার জোরে চাড়ে ভারী জিনিষটাও তোলা যায়। এমন একটা প্রচণ্ড শক্তি তোমার মাঝে থাকতে তাকে বদখেয়ালেই বা লাগাবে কেন, ছেড়েই বা দেবে কেন? তাকে সত্যের দিকে খাটাও—তা হলে নিজের মাঝেও কেমন বীর্য্য অনুভব করবে, স্ফূর্ত্তি পাবে, তেমনি তাঁর

বিরাট ইচ্ছার স্বরূপ জেনেও নির্ভয় হবে।

—*—

তাঁর ইচ্ছা, সকলকে সত্যের দিকে নিয়ে যাওয়া, আনন্দের মাঝে টেনে আনা। সত্য কি?—না যার নড়চড় হয় না। আনন্দ কি, তা সবাই নিজেই বুঝতে পারি। সত্য বুঝতে প্রথমতঃ যুক্তি-বিচার প্রয়োজন হয়, কিন্তু আনন্দ বুঝা সোজা—অনুভূতিতে তা সহজেই প্রকাশ হয়। অবশ্য সুখ কখনও আনন্দের ছদ্মবেশে ভোলাতে পারে। কিন্তু আনন্দেরও পরখ আছে। সত্য সুখই আনন্দ—এইটুকু যাচাই করে বুঝে নিতে হবে। এইবার সত্য দিয়ে, আনন্দ দিয়ে তাঁর ইচ্ছার স্বরূপ বুঝতে হবে। তাঁর ইচ্ছা হয়ত বুঝতে পারছি না, প্রতিনিধিস্বরূপ আমার ইচ্ছার কাছ থেকেই কাজের হুকুম নিলাম। এইখানে একটু বিচার করতে হবে—এই যে কাজ করতে চলেছি—এতে কোনও নিত্য বস্তু বা নিত্য সুখলাভের পক্ষে সহায়তা হবে কিনা। আবার জানতে হবে, সে নিত্য বস্তু বা নিত্যসুখ জগৎনিরপেক্ষ, অথচ আমার অন্তরঙ্গ। যদি দেখি, আমার ইচ্ছার হুকুম তামিল করলে শুধু বাইরের একটা অনিত্য প্রয়োজন মাত্র সিদ্ধ হবে, আমার মাঝে কলাকাঙ্ক্ষাহীন সত্য বা আনন্দের স্ফূর্তি হবে না, তবে বুঝব, এ কাজ তাঁর ইচ্ছার সঙ্গে যোগ রেখে চলছে না—এ কাজ মায়িক, পারমার্থিক নয়।

—*—

দুঃখও যেমন পরীক্ষা, সুখও তেমনি তাঁর পরীক্ষা। তাঁর লীলায় দেহ, মন, প্রাণের সৃষ্টি হয়েছে, কিন্তু এই লীলার পেছনে লীলাময়কেও যে প্রত্যক্ষ করতে হবে—শুধু এদের নিয়ে পড়ে থাকলে তো চলবে না। তাই তিনি দেহ দিয়ে তার সঙ্গে জরাব্যাধির দুঃখ দিয়েছেন, মনের উপর কত দুঃখ-অশান্তির বোঝা চাপিয়ে রেখেছেন, প্রাণের মাঝে হতাশা, অবসাদ পুরে দিয়েছেন। এরা সবাই যেন বলছে, শুধু দেহ মন-প্রাণের আরাম নিয়ে থেকো না—ওই নিয়ে ভুলে যেও না—এ সবের ভরসার চেয়ে তাঁর ভরসা বেশী করো! তাই দেখ না, তোমার কেমন নিটোল স্বাস্থ্য অতর্কিত জরাব্যাধির আক্রমণে বিকল হয়ে যায়, মনের কত সঙ্কল্প বিকল্প নৈরাশ্যের বেদনায় ম্লান হয়ে যায়, প্রাণের অফুরন্ত উৎসাহ হঠাৎ অবসাদের খাদে নেমে আসে। অর্থাৎ এগুলিকে চাইলে তোমার চলবে না—যে জন্য এ সব তিনি দিয়েছেন, তাই বুঝে তারই অনুকূলে তাদের গ্রহণ করতে হবে, আর সবার উপর চাইতে হবে তাঁকেই। প্রতি কাজে তাঁর সেবার সার্থকতা লাভ করব বলে এই দেহ—প্রতি চিন্তায় তাঁর লীলার পরিচয় পাব বলে এই মন, তাঁর বিরাট রূপ বুক ভরে পাব বলে এই প্রাণ। যখনই এ কথা ভুলে যাব, তখনই দুঃখের অঙ্কুশ মাথায় মেরে তিনি ঠিক পথে নিয়ে আসবেন। এই জন্যই প্রত্যেক সুখের পেছনে তিনি কাঁটা দিয়ে রেখেছেন। ব্যানচাল হতে পারি, কিন্তু বেশী দূর হওয়ার উপায় নাই, কাঁটার খোঁচা খেয়ে আবার ফিরে আসতে হবে। আর এই দেহ মনপ্রাণ যদি আমার হয়, তবেই তার ক্ষতিতে আমার দুঃখ। আর এ তাঁর হলে কামনা কোথায়, দুঃখ কোথায়?

*

আগুনের দাহিকা শক্তি যে একটা কঠোর সত্য, কাঠ যদি তা অস্বীকার করে, তবে হাসিই পায়। ভিজে কাঠ আগুনে ফেলে

দিলে তা দপ্ করে জ্বলে ওঠে না বটে, কিন্তু আগুনের ক্রিয়া হতে এক মুহূর্ত্তও বিলম্ব হয় না। আগুনের স্পর্শ পেলেই তার ভিতরের জল ধোঁয়া হয়ে, চুঁইয়ে বেরিয়ে যাবেই। ভিজা কাঠে আগে তবু জল দেখা যায়নি, এখন আগুনে পড়তেই তা দেখা দিয়েছে। ও তো কুলক্ষণ নয়, আগুনের আঁচ যে লেগেছে, ও তারই লক্ষণ। সাধুর সঙ্গ করে, সাধু হতে গেলেও অমনি হয়। অসাধুতার রস না মরলে তো সাধুতার আগুন ধরে না। তাই রস চোঁয়ান দেখে বা ধোঁয়া দেখে হতাশ হয়ো না। যত ধোঁয়া হবে তত হাওয়া কর—আগুনের জোর হোক। তার পর একবার ভিতর পর্য্যন্ত শুকিয়ে গেলে সব আগুন হয়ে যাবে। সাধুর ছোঁয়াচ এমনি ভয়ানক জিনিষ—যদি লেগে থাকতে পার, তবে আগাগোড়া তোমাকে আগুন না করে সে ছাড়বে না। আগুনের মত সাধুও সকলকে তাঁর সমান করে নিতে চান, নইলে তাঁর স্ফূর্ত্তি হয় না।

*

নিজকে যা ভাববে, তাই হবে। ভাবনা একটা সত্য শক্তি। যাঁর ইচ্ছায় জগৎ হয়েছে, আমি হয়েছি, তাঁর ইচ্ছার একটি কণা তো আমার মাঝেও আছে। সেই ইচ্ছার বেগেই না আমার জীবন চলছে। সুতরাং আমার জীবনকেও বা তুচ্ছ বলব কেন? তাই আমাকে যদি আমি চিৎস্বরূপে পেতে ইচ্ছা করি, তবে সে ইচ্ছার সাফল্য হবেই। তারই নাম সাধনা। বহিঃশক্তি আমাকে নিপীড়িত করে রেখেছে, আমি স্বেচ্ছায় তাকে নিপীড়ন করতে দিয়েছি বলে। বহুদিনের অভ্যাসে আমার নিপীড়িত হবার ইচ্ছাটাই প্রবল হয়ে দাঁড়িয়েছে, তাই নিপীড়নের হাত হতে বাঁচবার আমি কোনও পথ দেখতে পাচ্ছি না—আর হতাশ হয়ে বহিঃশক্তির হাতে সব ছেড়ে দিয়ে বসে আছি। কিন্তু এখনও যদি আমার ইচ্ছার একটু মোড় ফিরিয়ে দিই, তবে দেখি, যে পাহাড় অটল বলে মনে করেছিলাম, তাও টলতে আরম্ভ করেছে। অতি মন্দও যদি এক শুভ মুহূর্ত্তে মনে করে, আমি ভাল হব, তবে অন্ততঃ সেই মুহূর্ত্তের জন্যও তার মাঝে পুণ্যের বাতাস বইতে থাকে। তারপর আবার সে মন্দ হতে পারে, কিন্তু তার মুহূর্ত্তের জন্য ভাল হওয়াতেও অন্ততঃ এইটুকু প্রমাণ হল যে, যা হয়ে গিয়েছে, তাকে অচল-অটল মনে করবার কোনও কারণ নাই—আমার ইচ্ছার চাড় থাকলে হিমাচলও চলে। এটা কি কম ভরসার কথা? পাপের বোঝা ভারী হয়েছে বলে ভয় কেন ভাই? পুণ্যময়ের নাম নাও—একবার নাম নিতেই তোমায় দশবারের বোঝা হাল্কা হয়ে যাবে—তার পর নাম নিতে নিতে সব বোঝা সোজা হয়ে যাবে।

সম্বাদ ও মন্তব্য

পূজ্যপাদ শ্রীমৎ পরমহংসদেব বিগত ১৭ই পৌষ মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। সম্প্রতি তিনি কিছুদিন মঠেই অবস্থান করিবেন।

—*—

গত ১১ই পৌষ বৃহস্পতিবার হইতে ১৩ই পৌষ শনিবার পর্য্যন্ত দিবসত্রয় বগুড়া শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ সেবাশ্রমে ভক্তসম্মিলনীর নবম বার্ষিক অধিবেশন মহাসমারোহে হইয়া গিয়াছে। সারস্বত মঠাধিষ্ঠাতা শ্রীমৎ পরমহংসদেব স্বয়ং অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন। বাঙ্গালার সমস্ত অঞ্চল হইতে বহু সংখ্যক শিষ্য-ভক্ত সমবেত হইয়াছিলেন। স্থানীয় ভক্তগণ অভ্যাগত ভক্তবৃন্দের যথেষ্ট অভ্যর্থনা ও সমাদর করিয়াছিলেন। প্রথম দিবস অভ্যর্থনা সমিতির সম্পাদকের বক্তৃতান্তে ভক্তসম্মিলনীর উদ্দেশ্যের বিষয় আলোচনা হয়, এবং পরিশেষে কলিকাতা শ্রীশ্রীজয়গুরু সেবাসঙ্ঘের ভক্তগণ কর্ত্তৃক শ্রীশ্রীঠাকুর মহারাজের স্তোত্র, সঙ্গীত গীত হইয়াছিল। দ্বিতীয় দিবস শ্রীশ্রীঠাকুর মহারাজ সমবেত গুরুভাই গণের পরিচয় করাইয়া দেন। পরে পরস্পরের মধ্যে ভাব বিনিময় এবং গৃহস্থাশ্রম প্রতিষ্ঠা ও বর্ণাশ্রম ধর্ম্মসম্বন্ধে আলোচনা হইয়া সভা ভঙ্গ হয়। তৃতীয় দিবস সমবেত ভক্তগণ ও বগুড়ার সাধারণ ভদ্রলোক লইয়া স্থানীয় একজন উকীলের সভাপতিত্বে এক সভা হয়। উক্ত সভায় শ্রীশ্রীঠাকুর মহারাজ ধর্ম্ম প্রচার এবং সৎশিক্ষা প্রচার-কল্পে ঋষি-বিদ্যালয় স্থাপন যে তাঁহার মুখ্য উদ্দেশ্য, তাহা বুঝাইয়া দেন।

হাকিম, উকীল, ডাক্তার, শিক্ষক, কেরাণী প্রভৃতি সর্ব্বশ্রেণীর লোকই উক্ত সম্মিলনীতে যোগদান করিয়াছিলেন। বঙ্গের সকল অঞ্চল হইতে ভক্তের সমাগম হইলেও, কুমিল্লা ও সন্দীপের কোনও ভক্ত সম্মিলনীতে না আসায় এবং উত্তর বঙ্গের কোন কোন প্রবাসী শিষ্য ভক্ত নিকটে থাকিয়াও যোগদান না করায় দুঃখের কারণ হইয়াছিল।

—*—

আসাম-বঙ্গীয় সারস্বত মঠের অন্তর্গত শ্রীগৌরাঙ্গসেবাশ্রমে এবং অন্যান্য শাখাশ্রম গুলিতে গত বৎসর মোট ৯৬৫৮।১৭॥ ব্যয় হইয়াছে। তন্মধ্যে সাধারণ হইতে প্রাপ্ত ৩৫৪৫/১৫ এবং আশ্রমের আয় ৭০৭৷৷৵০ বাকী ৫৪০৫৷৷/২॥ মঠের পক্ষ হইতে প্রদত্ত হইয়াছে। বগুড়া সেবাশ্রমে ও কাশী মঠ-মন্দিরে মঠের পক্ষ হইতে কিছু দিতে হয় নাই। কাশী গম্ভীরার ও গারোহিল যোগাশ্রমের সেবকগণকে স্থানীয় লোক আহার্য্য দিয়া থাকেন। নিম্নে বার্ষিক ব্যয়ের বিবরণ প্রদত্ত হইল।

শ্রীগৌরাঙ্গসেবাশ্রমের

মোট ব্যয় — ৫৬৫৬৷৷৶১৫

(তন্মধ্যে সাধারণ হইতে প্রাপ্ত ৪৮।/০)

১	খোরাকী মোট	১২৪২৷৷৶১৫
	আশ্রমবিভাগে	১২১০৸৶৫
	অতিথি ও অভ্যাগতের জন্য	৩২৸
২	পরিধেয় ও শীতবস্ত্রে মোট	২৯২৷৷১৫
	আশ্রমবিভাগে	২৯২৷৷১৬
	বাহিরের দরিদ্রগণের জন্য	—

৩ সেবাবিভাগে মোট ১৬৯৸০

ঔষধপথ্যাদি ও আসবাব ১৬৮৸

বাহিরের রোগিগণের জন্ত

বিপন্নকে সাহায্য ১৲

৪ শিক্ষাবিভাগে ১৮৫৷৶১০

৫ গৃহনির্ম্মাণ ও সংস্কারাদিতে ৬৬৯৶১৫

৬ সেবকগণের সেবা ও ভিক্ষার্থ

যাতায়াত খরচ ২২/১০

৭ উৎসবাদিতে ২৫১৸৶০

৮ দুর্ভিক্ষাদিতে সাহায্য —০

৯ তৈজস পত্রাদিতে ১৩২৸/০

১০ ছাপাখরচ ও ষ্ট্যাম্পাদিতে ৩৫৷/০

১৩ জমিজমা ২৬৫৪৷৵০

ঢাকা সারস্বত

আশ্রমে ব্যয় — ১৩৬৩৷৷১০

(সাধারণ হইতে প্রাপ্ত ১৮৪৪৸)

ময়নামতী আশ্রমে— ২৭৪৷০

(সাধারণ হইতে প্রাপ্ত ৬৷৶)

কাশী গম্ভীরাতে — ৯৩৷৭৷৷

বগুড়া সেবাশ্রমে — ১৩৭১৵০

(সাধারণ হইতে প্রাপ্ত ১৮৫৷/১৫)

৺কাশীধামের

মাতৃমন্দিরে -- ৬৯৭৷/১১

(সাধারণ হইতে প্রাপ্ত ৬৬০৲)

গারোহিল যোগাশ্রমে—

(খরচ স্থানীয় লোক দিয়াছেন)

মোট ব্যয় ৯৩৩৮৷-৭৷৷

সাধারণ হইতে প্রাপ্ত ৩৫৪৫/১৫

আশ্রমসমূহের আয় ৭০৭৷৷৶০

মঠের পক্ষ হইতে প্রদত্ত ৫৪০৫৷৷/২৷৷

—•—

মঠাধিষ্ঠাতা শ্রীমৎ পরমহংসদেবের জন্ত পুরীধামে ৬০০০৲ টাকায় একটী বাড়ী কিনিবার কথা হইয়াছে। উক্ত বাটী ক্রয় করিয়া বাসোপযোগী করিয়া লইতে ৮০০০৲ টাকা পড়িবে। যাঁহারা এতদর্থে সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত ছিলেন কিম্বা যাঁহারা সাহায্য করিতে ইচ্ছুক, তাঁহারা সত্বর সাহায্য প্রেরণ করিবেন।

—•—

প্রেসের কোন অংশ ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় এবারকার পত্রিকাপ্রকাশে বিলম্ব হইল। আগামী মাসের পত্রিকাও কিঞ্চিৎ বিলম্বে বাহির হইবে। পত্রিকার অপ্রাপ্তি পরবর্ত্তী মাসে জানাইলেও যথারীতি প্রতীকারের চেষ্টা করা যাইবে।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং
কলিকাতা।

ওঁ তৎ সৎ

আর্য্য-দর্পণ

(সনাতন ধর্ম্মের মুখপত্র)

১৩শ বর্ষ } মাঘ ১০ম সংখ্যা

অগ্নির্বিশ্বরূপঃ

—※—

[ঋগ্বেদ সংহিতা—২।১।১]

ত্বমগ্নে পিতরমিষ্টিভির্নরঃ

ত্বাং ভ্রাত্রায় শম্যা তনূরুচম্।

ত্বং পুত্রো ভবসি যস্তে বিধৎ

ত্বং সখা সুশেবঃ পাস্যাধৃষঃ॥

ত্বমগ্নে ঋভুরাকে নমস্যঃ

ত্বং বাজস্য ক্ষুমতো রায় ঈশিষে।

ত্বং বিভাস্যনু দক্ষি দাবনে

ত্বং বিশিক্ষুরসি যজ্ঞমাতনিঃ॥

ত্বমগ্নে অদিতির্দেব দাশুষে

ত্বং হোত্রা ভারতী বর্দ্ধসে গিরা।

ত্বমিলা শতহিমাসি দক্ষসে

ত্বং বৃত্রহা বসুপতে সরস্বতী॥

ঋমংগ্র সুক্ত ৩৩০

তব স্পার্হে বর্ণে আসংদৃশি শ্রিয়ঃ
ত্বং বাজঃ প্রতরণো বৃহন্নসি
ত্বং রয়ির্ব্বহুলো বিশ্বতস্পৃথুঃ ॥

পিতা তুমি, যজমান যজ্ঞভাগে করেছে তর্পণ,
ভ্রাতা তুমি, লভি তৃপ্তি তনুরুচি করেছ অর্পণ;
তোমারে যে সেবিয়াছে, তুমি তার হয়েছ তনয়—
সখা তুমি শুভকামী, রক্ষ দূর করি অরিভয়।

ঋভু তুমি বৈশ্বানর, সবাকার লহ নমস্কার,
আছে ঋদ্ধি তব ঠাঁই—উপচিত আছে অন্নভার।
উজল তোমার ভাতি, দীপ্ত জ্বালা ছেদে অন্ধকার,
চিত্র তব শক্তিলীলা, যজ্ঞফল করিছ বিস্তার!

তুমিই অদিতি, অগ্নি, যজমান দিয়াছে আরতি—
স্তুতি-গানে আবাহনি' জাগায়েছে তোমারে, ভারতী!
তুমি ইলা, লভিয়াছ শতবার হেমন্তের নতি,
বৃত্রঘাতী, সরস্বতী, ভক্তসাথী,—তুমি বসুপতি।

হব্য পুষ্ট তুমি অগ্নি, সর্ব্বোত্তম কর অন্নদান,
আঁখি-শোভা শ্রী তোমার কেড়ে নেয় সবার পরাণ—
সুমহান্ তুমি দেব, তুমি ঋদ্ধি, তুমি কর্ণধার,
জগৎ-কল্যাণ তুমি, বিশ্বরূপ, অনন্ত-অপার।

যোগসূত্রবৃত্তি

কৈবল্যপাদ

এই পর্য্যন্ত যাহা বলা হইল, তাহাতে বুঝা যায় জ্ঞান বিষয়ের প্রকাশক, অতএব তাহা গ্রহণ-স্বভাব; আবার বিষয় জ্ঞানের প্রকাশ্য, অতএব তাহা গ্রাহ্য-স্বভাব। যদি তাহাই হয়, তবে জ্ঞানে যুগপৎ সমস্ত বিষয়ের গ্রহণ বা স্মরণ হয় না কেন? —চিত্ত অর্থের উপরাগের অপেক্ষা রাখে বলিয়া বস্তু জ্ঞাত এবং অজ্ঞাত উভয় কোটীতেই প্রবিষ্ট হয়। ইহার তাৎপর্য্য এই—সমস্ত পদার্থই বিদ্যমানবৎ প্রতীয়মান হইতে হইলে সামগ্রীর অপেক্ষা করে। বিষয়ের উপরাগ ও আকার সমর্পণই হইল সামগ্রী। যেমন "নীল" এই বিষয়ের জ্ঞান হইবে। ইন্দ্রিয়প্রণালী আশ্রয় করিয়া নীল বিষয়টী যদি চিত্তের নিকট তাহার আকার সমর্পণ করে, তবে সেই আকারসমর্পণ বা বিষয়ের উপরাগ জ্ঞানোৎপত্তির সহকারী কারণরূপে গণ্য হইবে। যে বিষয় চিত্ত হইতে ব্যতিরিক্ত বা পৃথক, অসম্বদ্ধ বলিয়া তাহা চিত্তের গ্রাহ্য হইতে পারে না। এই জন্য যে বিষয় স্বগত জ্ঞানের স্বরূপকে উপরঞ্জিত করে, জ্ঞান সেই বিষয়কেই ব্যবহারের যোগ্য করিয়া তোলে। তখন লৌকিক ভাষায় বলা হয়—এই বিষয়টী জানা গেল। যে বিষয় জ্ঞানের কাছে তাহার আকারটী ধরিয়া দেয় না সে বিষয়কে কখনও জ্ঞাত বলিয়া ব্যবহার করা চলে না। আবার স্মৃতির বেলায় দেখি, পূর্ব্বে একটী বিষয় অনুভূত হইয়াছে, তারপর তাহার সদৃশ একটী বিষয় উপস্থিত হইয়া যদি পূর্ব্বসংস্কারকে উদ্বুদ্ধ করিয়া অভিনব সদৃশ জ্ঞানোৎপত্তির সহকারী কারণ হয়, তবে পূর্ব্বোক্ত বিষয়ের স্মৃতি উৎপন্ন হইয়াছে বলিতে হইবে। সুতরাং সর্ব্বত্র জ্ঞান বা সর্ব্বত্র স্মৃতি—কোনটাই ব্যুত্থিত চিত্তের পক্ষে সম্ভবপর নয়।

কেহ বলিতে পারে, যদি তাই হয়, তবে প্রমাতা পুরুষ যখন নীলের জ্ঞান জন্মাইতেছেন, তখন তিনি পীতের জ্ঞান জন্মাইতেছেন না, সুতরাং বিষয় দ্বারা বিশিষ্ট হওয়ায় তিনি সকল সময় একরূপে থাকেন না। গ্রহীতৃরূপে তিনি যখন বিষয়ের আকার গ্রহণ করিতেছেন, তখন বিষয়ের পরিণামে তাঁহারও পরিণাম হয় না কি?—না, তা হয় না। পূর্ব্বেই সাধনপাদে বলা হইয়াছে, প্রমাণ বিপর্য্যয় প্রভৃতি ব্যবহারিক দশায় জ্ঞানের প্রণালী-সমূহ চিত্তেরই বৃত্তি বা তরঙ্গ। পুরুষ সেই চিত্তেরও প্রভু বা গ্রহীতা, অতএব চিত্তবৃত্তিসমূহ সর্ব্বকালেই তাঁহার জ্ঞেয়। পুরুষ জ্ঞেয় হইতে ব্যতিরিক্ত জ্ঞান বা চিৎস্বরূপ; সুতরাং তাঁহার পরিণাম সম্ভব নয়, কেননা পরিণাম হইলে জ্ঞেয় অচিতেরই হইবে, জ্ঞাতা চিতের নয়। যদি চিদ্রূপ পুরুষ পরিণামী হন, তবে তাঁহার কালে কালে স্বরূপের বিচ্যুতি ঘটিবে, সুতরাং চিত্তবৃত্তিকে

তাঁহার সদাকাল জ্ঞেয় বলা চলিবে না। কিন্তু চিত্তবৃত্তি যে তাঁহার জ্ঞেয় না হইয়া কখনই আত্মলাভ করিতে পারে না, তাহা আমাদের অনুভবসিদ্ধ। অতএব পুরুষের কখনও পরিণাম সম্ভবে না। পুরুষ চিদ্রূপে সমস্ত প্রত্যয়ের অধিষ্ঠাতা হইয়া ব্যবস্থিত রহিয়াছেন। চিত্ত যাহার পরিণাম, সেই বিশুদ্ধ সত্ত্বও তাঁহার অন্তরঙ্গরূপে অবস্থিত। এখন, চিত্ত যে বিষয় দ্বারা উপরক্ত হয়, সেই বিষয়ের উপরই চিচ্ছায়া সংক্রামিত হইয়া তাহাকে প্রভাসিত করিয়া থাকে। এই চিচ্ছায়ার সংক্রমণ সর্ব্বদাই হইতেছে। সুতরাং পুরুষেরও চিরন্তন জ্ঞাতৃত্ব অব্যাহত থাকায়, তাঁহার পরিণামিত্ব আশঙ্কার কোনও কারণ নাই। (১৭)

কিন্তু এখানেও একটী কথা উঠিতে পারে। চিত্ত বিশুদ্ধ সত্ত্বের পরিণামস্বরূপ। সুতরাং সত্ত্বের উৎকর্ষ থাকাতে প্রকাশকের ধর্ম্মও তাহাতে রহিয়াছে। যদি তাই হয়, তবে চিত্ত নিজকেও প্রকাশ করে, বিষয়কেও প্রকাশ করে, এইরূপ মীমাংসা করিলেই তো ব্যবহার চলিতে পারে। তবে আর পৃথক এক গ্রহীতা স্বীকার করার প্রয়োজন কি?—কিন্তু চিত্ত তো স্বাভাসক বা স্বপ্রকাশক হইতে পারে না, কেননা উহা যে পুরুষের দৃশ্য। যাহা দৃশ্য, তাহা দ্রষ্টারই জ্ঞানের বিষয়—যেমন আমাদের নিত্যদৃষ্ট ঘট-পট ইত্যাদি। চিত্ত দৃশ্য হইলে আর স্বপ্রকাশ হইবে কি করিয়া? (১৮)

পূর্ব্বসূত্রে চিত্ত যে স্বপ্রকাশ নয়, তাহা এইরূপ অনুমানবলে সাধিত হইয়াছিল—"চিত্ত স্বপ্রকাশ নহে, যেহেতু তাহা দৃশ্য।" সূত্রকারের এই অনুমিতির বিরুদ্ধে কেহ আপত্তি করিতে পারেন, এই অনুমিতিতে সাধ্য অস্বপ্রকাশত্ব এবং তাহার হেতু দৃশ্যত্ব। কিন্তু যাহা দৃশ্য, তাহাই তো প্রকারান্তরে অস্বপ্রকাশ অর্থাৎ নিজে নিজকে প্রকাশিত করিতে না পারিলে অন্যদ্বারা প্রকাশিত হইতে হয়, তাহাই অন্যের দৃশ্যত্ব।—সুতরাং উপরি উক্ত অনুমিতিতে সাধ্য হইতে হেতুর কোনও বিশেষ না থাকায় অনুমিতিকে প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করা যায় না।

আর এক আপত্তি হইতে পারে যে, চিত্তের দৃশ্যত্বই তো অসিদ্ধ। কিরূপে তাহা বলিতেছি। যাহা হিতকর, তাহা গ্রহণ করিবে এবং যাহা অহিতকর, তাহা পরিত্যাগ করিবে—ইহা জীবমাত্রেরই স্বভাব। এই গ্রহণ বর্জ্জন ব্যাপার পুরুষের যে বুদ্ধির আশ্রিত, তাহা বুদ্ধি-সংবেদ্য অর্থাৎ কি গ্রহণ করিতে হইবে বা কি ছাড়িতে হইবে, তাহা চিত্তই বলিয়া দেয়। তাহা ছাড়া, "আমি ক্রুদ্ধ", "আমি ভীত", "অমুক বিষয়ে আমার অনুরাগ আছে"—এইরূপ যে সংবিৎ, তাহাও তো বুদ্ধি না জানাইয়া দিলে উপায় নাই। সুতরাং বুদ্ধি বা চিত্তকে দৃশ্য বলি কি করিয়া?

এইরূপ আপত্তি খণ্ডন করিবার অভিপ্রায়ে, সূত্রকার বলিতেছেন, এক সময়েই স্বরূপ ও বিষয় উভয়ের অবধারণ সম্ভবপর হয় না বলিয়াই চিত্তকে স্বপ্রকাশ বলিয়া স্বীকার করা যায় না। বিষয়ের জ্ঞান কিরূপে হয়?—আমরা একটী বিষয়কে ইদং বা ইত্যাকার জানিয়া তাহাকে ব্যবহারের যোগ্যরূপে গ্রহণ করি অথবা তাহাকে সুখ কিম্বা দুঃখের হেতুরূপে গ্রহণ করি। বুদ্ধির জ্ঞান কিরূপে হয়?—আমরা তাহাকে অহং প্রত্যয়ের আশ্রয়ে সুখরূপে বা দুঃখরূপে ব্যবহার যোগ্য বলিয়া গ্রহণ করি। যে কোনও বিষয়

প্রত্যক্ষ করিবার কালে এইরূপে ইদং ও অহং, এই দুইটী প্রত্যয়-ব্যাপার পরস্পরের বিরুদ্ধ বলিয়া যুগপৎ তাহাদের ধারণা হওয়া সম্ভব নহে। চিত্ত একটি সময়ে বিষয়ের রূপকে এবং স্বরূপকে ধারণা করিতে পারে না। যে দুইটী ব্যাপার উল্লিখিত হইল, তাহার ফলও দুইটী—একটী ইদং-প্রত্যয়, অপরটী অহং-প্রত্যয়। চিত্ত দুইটীকে যুগপৎ গ্রহণ করিতে পারে না, সে কেবল বহির্মুখে প্রবৃত্ত হইয়া অর্থনিষ্ঠ ফলটীকে মাত্র জানাইয়া দিতে পারে; এই জন্য তাহাদ্বারা কেবল বিষয়েরই জ্ঞান হইতে পারে, নিজকে প্রকাশ করা চলে না। অর্থাৎ বিষয় জানিবার সময় আমরা কেবল বিষয়কেই জানিতে পারি, অহংকে জানি না। তাহাকে জানিতে হইলে আবার তাহাকেই বিষয়রূপে উপস্থাপিত করিতে হইবে। তাহা হইলে আর চিত্তের স্বপ্রকাশকত্ব থাকে কোথায়? (১৯)

আচ্ছা, বুদ্ধি নিজকে নিজে গ্রহণ করিতে যদি না ও পারে, তবুও অপর বুদ্ধি তাহাকে গ্রহণ করিতে তো পারে।—ইহার উত্তরে সূত্রকার বলিতেছেন, বিষয়বুদ্ধিকে যদি অপর বুদ্ধি প্রকাশ করে, তবে সে বুদ্ধিও নিজে অপ্রকাশ থাকিয়া কিরূপে অপর বুদ্ধিকে প্রকাশ করিবে, এই আশঙ্কায় তাহারও প্রকাশক অপর বুদ্ধির কল্পনা করিতে হয়। এইরূপে তর্কের আর কোথায়ও বিশ্রাম হয় না বলিয়া অনবস্থা দোষ জন্মে। ইহাতে সমগ্র জীবনেও একটী বিষয়ের প্রতীতি হওয়া সম্ভবপর নহে। যদি প্রতীতিরই প্রকাশ না হইল, তবে বিষয়ের প্রতীতি হইবে কি করিয়া? অন্ধকার দিয়া কি অন্ধকারকে আলোকিত করা যায়?

তাহা ছাড়া, এইরূপে বুদ্ধির অনবস্থা হইলে স্মৃতিসঙ্করও উৎপন্ন হইবে। মনে কর, রূপ কিম্বা রসের বোধ হইল। সেই বুদ্ধির গ্রাহক অনন্ত বুদ্ধিও উৎপন্ন হইল। ইহাদের প্রত্যেকের সংস্কার থাকিবে। সেই সংস্কার সহায়ে যুগপৎ বহু স্মৃতি উদ্বোধিত হইল। এক্ষণে, বুদ্ধির কোনও শেষ পাওয়া যায় নাই, অতএব বুদ্ধি অবিশিষ্ট ও অনিশ্চিত। এদিকে বহু বুদ্ধির স্মৃতি যুগপৎ উৎপন্ন হইয়াছে। এরূপস্থলে কোন্ বিষয়ে কে স্মৃতি উৎপন্ন হইল, তাহার কোনও নিশ্চয় হয় না, কেননা মূলে বুদ্ধিও নিশ্চিত হইবার অবকাশ পায় নাই। সুতরাং স্মৃতির সংকর অনিবার্য্য অর্থাৎ কোনটী রূপস্মৃতি, কোনটী বা রসস্মৃতি, তাহা জানা যাইবে না, কেননা অনিশ্চিত বুদ্ধির স্মৃতিও অনিশ্চিত হইবে। (২০)

বুদ্ধি যদি স্বপ্রকাশ না হয়, অপর বুদ্ধি দ্বারাও যদি তাহাকে না জানা যায়, তাহা হইলে বিষয়জ্ঞানরূপ ব্যবহার কিরূপে সম্পন্ন হয়?—পুরুষ চিদ্রূপ বা চিতিশক্তিস্বরূপ। এই চিতি শক্তি অপ্রতিসংক্রমা অর্থাৎ তাহার অন্যত্র গতি হয় না, অপরের সঙ্গে মিশ্রণ হয় না। অন্যান্য ভাব আশ্রয় করিয়া গুণসমূহের যেমন পরিণাম হয় এবং সেই পরিণামকালে অঙ্গগুণ যেমন অঙ্গিগুণে সংক্রামিত হইয়া যেন তদাকারকারিত হইয়া যায়; কিম্বা পরমাণুসমূহ যেমন ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করিয়া বিষয়কে রূপ দেয়—চিতিশক্তিতে সেরূপ গতি নাই। উহা সর্ব্বদাই একরূপে স্বপ্রতিষ্ঠ হইয়া রহিয়াছে, এইরূপই আমাদের সিদ্ধান্ত। বুদ্ধি যখন এই চিতিশক্তির সন্নিহিত হয়, তখন তদাকারকারিত হইয়া উহাও চেতনবৎ প্রতীয়মান হয়। চিৎশক্তি যখন বুদ্ধিবৃত্তিদ্বারা আক্রান্ত হইয়া বুদ্ধিবৃত্তি-বিশিষ্টরূপে জাত হয়, তখন বুদ্ধির নিজেরও জ্ঞান হয়। (২১)

এইরূপে চিৎশক্তি দ্বারা আভাসিত চিত্ত সর্ব্ববিষয় গ্রহণসামর্থ্যহেতু সকল প্রকার ব্যবহার নির্ব্বাহ করিতে সক্ষম হয়। তাই সূত্রকার বলিতেছেন—পুরুষ দ্রষ্টা। তাঁহার নিকট থাকিয়া তাঁহার রূপ গ্রহণ করিয়া চিত্ত যখন দৃশ্যোপরক্ত হয় অর্থাৎ বিষয়াকার পরিণাম গ্রহণ করে, তখন সেই চিত্তেরই সর্ব্বপ্রকার বিষয় গ্রহণ করিবার সামর্থ্য জন্মে। যেমন নির্ম্মল স্ফটিকনির্ম্মিত দর্পণই প্রতিবিম্ব গ্রহণে সমর্থ, সেইরূপ রজঃ ও তমোগুণদ্বারা অনভিভূত শুদ্ধ সত্ত্বই চিচ্ছায়া গ্রহণ করিতে পারে, অশুদ্ধ বলিয়া রজস্তমঃ তাহা পারে না। রজঃ ও তমঃকে অভিভূত করিয়া এই সত্ত্ব তাহাদের অঙ্গিরূপে নিশ্চল দীপশিখার মত সর্ব্বদাই একরূপ পরিণাম গ্রহণ করিয়া ও চিৎছায়া গ্রহণ করিবার সামর্থ্য লইয়া, মোক্ষপ্রাপ্তির পূর্ব্বপর্য্যন্ত বর্ত্তমান থাকে। যেমন অয়স্কান্ত মণির কাছে থাকিলে লৌহের গতিশক্তি আবির্ভূত হয়, সেইরূপ অভিব্যঙ্গ্য সত্ত্বেরও চিদ্রূপ পুরুষের সান্নিধ্যবশতঃ চৈতন্য অভিব্যক্ত হয়। সুতরাং যোগদর্শনে দ্বিবিধ চিৎশক্তি স্বীকার করা হইয়াছে—নিত্যোদিতা এবং অভিব্যঙ্গ্যা। পুরুষই নিত্যোদিতা চিৎশক্তি। সত্ত্বগুণের সাক্ষাৎ চৈতন্য নাই, তাহার চৈতন্য অভিব্যঙ্গ্যা, পুরুষের সন্নিধানে থাকিয়া তাহাতে চৈতন্য অভিব্যক্ত হইয়া থাকে। শুদ্ধ সত্ত্বই অভিব্যঙ্গ্যা চিৎশক্তি। পুরুষের অত্যন্ত নিকটে বলিয়া উহা তাঁহার অন্তরঙ্গ ও ভোগ্য হইয়া থাকে।

সাংখ্যেরা শান্তব্রহ্মবাদী। পরমাত্মা শান্তস্বরূপ, এই হইল তাঁহাদের চরম তত্ত্ব; তবে সুখ দুঃখের ভোক্তা কে?—তাহা এই অভিব্যঙ্গ্যা চিৎশক্তি; কর্ম্মের অনুরূপ তাহার অভিব্যক্তি হইয়া থাকে; পরমাত্মা তাহার অধিষ্ঠাতামাত্র। আমাদের মাঝে এই যে প্রতিক্ষণ সুখ দুঃখ ও মোহরূপে ত্রিগুণের অবিশুদ্ধ পরিণাম ঘটিতেছে, ইহার কারণ, কখনও কোনও গুণ অঙ্গী বা প্রধানরূপে উদ্রিক্ত হয় এবং অন্যান্য গুণ তখন চাপা থাকে—ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। এই ত্রিগুণ পরিণাম পূর্ব্বোক্ত কর্ম্মানুরূপ শুদ্ধসত্ত্বকে আকার সমর্পণ করিয়া আমাদের জ্ঞানগোচর হইয়া থাকে।

তাহা হইলে ব্যাপারটা দাঁড়াইতেছে এই—চিত্তমূলে যে সত্ত্ব, তাহা শুদ্ধস্বভাব, আমরা তাহাকেই আদি বলিয়া ধরিয়া লইলাম। এই আদি সত্ত্বে একদিক দিয়া চিৎ-ছায়া প্রতিফলিত হইতেছে, আবার অপর এক দিক দিয়া যে মলিন চিত্তসত্ত্ব বিষয়াকার ধারণ করিয়াছে, সে আসিয়া ইহার কাছেই নিজের বিষয়াকারটী সঁপিয়া দিতেছে। চিৎছায়া পড়িয়াছে বলিয়া এই চিত্ত চেতনের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছে, অথচ ইহার বাস্তব চেতনা নাই। এইরূপে আদিশুদ্ধ চিত্তসত্ত্বই সুখদুঃখ ভোগের অনুভব করিয়া থাকে। পুরুষ বাস্তবিক ভোক্তা নন। কিন্তু এই আদি চিত্তসত্ত্বের এই ভোগ তাঁহার অতি সন্নিধানেই ঘটিয়া থাকে। এই জন্য ইহা যে কাহার ভোগ্য সেই বিবেকজ্ঞান সহজে হয় না বলিয়া ইহা পুরুষেরই ভোগ্য বলিয়া উল্লিখিত হইয়া থাকে। এই ব্যাপারই লক্ষ্য করিয়াই কেহ কহিয়াছেন, "সত্ত্বের যে বিষয়-তাপন, তাহা পুরুষেরই বলিয়া উপচরিত হয়।" প্রতিবিম্বের দৃষ্টান্ত দিয়াও কেহ এই তত্ত্ব বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। প্রতিবিম্বে, যাহার প্রতিবিম্ব তাহারই ছায়ার উদ্ভব হয়। তেমনি সত্ত্বে পুরুষ

নিষ্ঠ চিচ্ছায়ার সদৃশ চৈতন্যের যে অভিব্যক্তি হয়, তাহাকেই বলে প্রতিসংক্রান্তি।

কেহ কেহ আপত্তি করিতে পারেন যে, একটা বস্তু যদি নির্ম্মল অর্থাৎ সুস্পষ্ট হয়, এবং তাহার পরিণাম যদি অবশ্যম্ভাবী হয় অর্থাৎ তাহা যদি পরিচ্ছিন্ন হয়, তবেই অপর একটা নির্ম্মল বস্তুতে তাহার প্রতিবিম্ব পড়িতে পারে —যেমন আয়নাতে মুখের প্রতিবিম্ব পড়ে। কিন্তু বিচার্য্যস্থলে পুরুষ হইলেন অতি নির্ম্মল অতএব ব্যাপক এবং পরিণামবর্জ্জিত; আর সেই অত্যন্ত নির্ম্মল পুরুষ হইতে চিত্তসত্ত্ব অপেক্ষাকৃত অনির্ম্মল। সুতরাং প্রতিবিম্বের কথা এখানে হইতেই পারে না।

আমরা বলি, প্রতিবিম্ব পড়ার যথার্থ তত্ত্ব যে জানে না, সেই এরূপ কথা বলিবে। আমরা প্রতিবিম্ব পড়া কাহাকে বলি ?— চিত্তসত্ত্বে যে চিৎশক্তি অভিব্যঙ্গ্য আকারে প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে, পুরুষের সান্নিধ্য বশতঃ তাহার অভিব্যক্তি হওয়াকেই বলি প্রতিবিম্ব। পুরুষে যে রূপে চিৎশক্তি নিত্যানুগতা রহিয়াছে, তাহার ছায়াও তেমনই পড়ে।

অত্যন্ত নির্ম্মল পুরুষ কি করিয়া অনির্ম্মল সত্ত্বে প্রতিসংক্রান্ত হয়, এই যে আপত্তি করা হইয়াছিল, তাহাও একান্তভাবে সত্য নহে। কেননা আমরা প্রত্যক্ষই দেখিতে পাই, সূর্য্য যেরূপ নির্ম্মল, জল সেরূপ নির্ম্মল নয়; তবে জলে সূর্য্যের ছায়া পড়ে কি করিয়া ? আপত্তি হইয়াছিল, যাহা অবচ্ছিন্ন নহে, তাহা প্রতিবিম্বিত হইতে পারে না। কিন্তু আকাশও তো অতিব্যাপক; তবে ক্ষুদ্র দর্পণে ব্যাপক আকাশের প্রতিবিম্ব পড়ে কি করিয়া ?— এইরূপ বিচার করিয়া দেখিলে প্রতিবিম্ব দর্শনের মাঝে আর কোনও গোল থাকে না।

আর একটা আপত্তি হইতে পারে। বলা হইয়াছে যে, চিত্তসত্ত্ব শুদ্ধসত্ত্বেরই পরিণাম; পুরুষের অতিসন্নিধিবশতঃ তাহাতে চিৎশক্তি অভিব্যক্ত হয় এবং বাহ্যবিষয়ের আকার তাহাতে প্রতিসংক্রান্ত হয়। এই ব্যাপারই পুরুষের সুখদুঃখভোগ বলিয়া ধরিয়া লওয়া হয়।— তোমার কথাগুলিই আমরা মানিনা। প্রথমতঃ এই যাহাকে চিত্তসত্ত্ব বলিতেছ, প্রকৃতির যদি পরিণাম না ঘটে, তবে কি করিয়া তাহার উৎপত্তি হইবে ? আর প্রকৃতিরই বা পরিণাম হইবে কেন ? যদি বল, প্রকৃতি পুরুষের বিষয় ভোগ সম্পাদন করিবে; সুতরাং পুরুষার্থ সম্পাদন তাহার কর্ত্তব্য বলিয়া তাহার পরিণাম হওয়া উচিত। কিন্তু এ কথাও তো মানা চলে না, কারণ পুরুষার্থ সম্পাদনরূপ কর্ত্তব্যই যে তাহার দাঁড়াইতে পারে না। কেননা, পুরুষার্থ সম্পাদন আমার কর্ত্তব্য, এইরূপ একটা সঙ্কল্প হইলে তবে না কর্ত্তব্য নিরূপিত হইবে। প্রথমতঃ প্রকৃতি জড়, সুতরাং তাহার সঙ্কল্প বা অধ্যবসায় হইবে কোথা হইতে ? দ্বিতীয়তঃ, যদি তাহার অধ্যবসায় স্বীকার করি, তবে তাহাকে জড় বলিতে পারি না।—সুতরাং প্রকৃতির পরিণাম না হইলে যখন চিত্তসত্ত্বের উদ্ভব হইবে না, তখন সেই চিত্তসত্ত্বকে ধরিয়া কো কিছুই দাঁড় করান যাইতে পারে না।

ইহার উত্তরে আমরা বলি, অনুলোম ও প্রতিলোমক্রমে পরিণাম ঘটিবার পূর্ব্বে প্রকৃতির মাঝে দুইটী সহজ শক্তি রহিয়াছে — তাহাকেই বলি পুরুষার্থসম্পাদনের যোগ্যতা। প্রকৃতি অচেতন হইলেও তাহার এ শক্তি স্বাভাবিক। প্রকৃতি যে মহত্তত্ত্ব হইতে আরম্ভ করিয়া মহাভূত পর্য্যন্ত বহির্মুখে বিকাশ

হয়, তাহাকে বলি অনুলোম পরিণাম; আবার প্রত্যেক কার্য্য স্বীয় কারণে অনুপ্রবেশ করিয়া ক্রমে যে অস্মিতা পর্য্যন্ত পৌঁছায়, তাহাকে বলে প্রতিলোম পরিণাম। পুরুষের ভোগ সমাপ্ত হইয়া গেলে প্রকৃতির এই সহজ শক্তি দুইটী ক্ষীণ হইয়া যায়; তখন প্রকৃতির প্রয়োজন শেষ হইয়া যাওয়াতে আর তাহার পরিণাম হয় না। প্রকৃতির পুরুষার্থ-কর্ত্তব্যতাকে যদি এই ভাবে দেখ, তবে তাহাকে জড় বলিয়া স্বীকার করিলেও তো কোনও গোল হয় না।

আপত্তি হইতে পারে, প্রকৃতির যদি এইরূপ ক্ষয়োন্মুখ স্বাভাবিক শক্তিই থাকে, তবে মোক্ষকামীদিগের মোক্ষের জন্য আর চেষ্টা যত্ন করার প্রয়োজন কি? কেননা স্বাভাবিক শক্তিবশেই তো পুরুষের ভোগ সম্পাদন করিয়া প্রকৃতি কৃতার্থা হইলে আর পরিণাম গ্রহণ করিবে না। আর মোক্ষলাভের জন্য যদি চেষ্টা-যত্নেরও প্রয়োজন না থাকে, তবে মোক্ষোপদেশক শাস্ত্রেরই বা কি প্রয়োজন? তাহা হইলে আবার যোগসূত্র উপদেশ দেওয়াই বা কেন?

ইহার উত্তরে আমরা বলি, প্রকৃতি আর পুরুষের মাঝে যে ভোগ্যভোক্তৃ সম্বন্ধ রহিয়াছে, তাহা অনাদি। এই সম্বন্ধ আশ্রয় করিয়া প্রকৃতিতে যখন চেতনার অভিব্যক্তি হয় (কিরূপে হয়, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে), তখন তাহার কর্তৃত্বাভিমান উৎপন্ন হইয়া থাকে। সেই অভিমানবশতঃ ব্যক্তচৈতন্যা প্রকৃতির দুঃখানুভব হয়; তাহার সঙ্গে সঙ্গেই কি করিলে চিরদিনের জন্য আমার এই দুঃখের নিবৃত্তি হয়"—এইপ্রকার অধ্যবসায়ও জন্মে। সুতরাং যে শাস্ত্র এই দুঃখনিবৃত্তির উপায় বলিয়া দিতে পারে, প্রকৃতি তাহার অপেক্ষা রাখে বই কি? প্রকৃতি হইতে পরিণামপ্রাপ্ত কর্ম্মানুরূপ চিত্তসত্ত্বই শাস্ত্রের উপদেশের পাত্র।

অন্যান্য দর্শনেও ঠিক এইরূপ অবিদ্যাস্বভাব জীবকেই শাস্ত্রাধিকারী বলিয়া নিরূপণ করা হইয়াছে। সে-ই মোক্ষের জন্য চেষ্টা করে। তবে মোক্ষলাভের সহায়ক কিছু চাই। শাস্ত্রোপদেশই সেই সহায়। এই সহায়ের উপর নির্ভর করিয়া অবিদ্যাস্বভাব ব্যক্তি প্রযত্নদ্বারা মোক্ষরূপ ফল লাভ করিয়া থাকে। উপযুক্ত আয়োজন না হইলে কোনও কাজই হইবার নয়। মোক্ষরূপ কার্য্য প্রকৃতির প্রতিলোম পরিণাম হইতে উৎপন্ন হয়; কিন্তু তাহারও আয়োজন চাই। প্রমাণবলে স্থির হইয়াছে, শাস্ত্রোপদেশই ইহার উপযুক্ত আয়োজন। অন্য উপায়ে মোক্ষ হইবার নয়। সুতরাং শাস্ত্রোপদেশ ছাড়া কি করিয়া মোক্ষ লাভ হইবে?

তাহা হইলে মোটের উপর আমাদের এই সিদ্ধান্ত হইল যে, চিত্তসত্ত্বে চিচ্ছায়ার অভিব্যক্তি হইলে এবং বিষয়ের উপরাগ তাহাতে সংক্রামিত হইল সে বিষয়জ্ঞানদ্বারা এই লোকযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। ভ্রান্তবুদ্ধিরা মনে করে, চিত্ত স্বপ্রকাশ কিম্বা এই জগৎ চিন্ময়; কিন্তু তাহারা যদি চিত্তকে এই দিক হইতে দেখে, তবে তাহাদের ভ্রম দূর হইয়া যায়। (২২)

সন্তানের শিক্ষা

সন্তানের বাপ মা অনেকেই হয়, কিন্তু বাপ মা হওয়ার দায়িত্ব কতটুকু, তা সকলে বুঝে না। সন্তান চায় সকলেই, এমন কি দশ বছরে মেয়ের বিয়ে হয়ে বার বছরে যদি তার ছেলে না হয়, তা হলে প্রবীণা গৃহিণীরা বংশলোপের আশঙ্কায় দশদিক অন্ধকার দেখেন;—কিন্তু সন্তান যে চাই কেন, তা তো কেউ তলিয়ে দেখে না। অনেক কামনাই জীবের স্বাভাবিক—পিতামাতার পক্ষে সন্তান কামনাও তাই। কিন্তু প্রত্যেক স্বাভাবিক কামনার প্রেরণার সঙ্গে যে কর্ত্তব্যটুকু জড়িত রয়েছে, তা যদি চোখে না পড়ে, তা হলে কামনার দুঃখটাই কেবল কপালে ঘটে, ভোগের সুখটুকু আর মেলে না। গৃহী সন্তানকামনা ছাড়তে পারে না, ছাড়তেও কেউ বলে না—কিন্তু কামনার ভিতর দিয়েও যে ভগবান আমাদের উন্নতির পথে আকর্ষণ করছেন, সেটুকু না বুঝে কেবল দায়িত্বহীন কামনা করে গেলেই তো আমরা শান্তি পাব না। শাস্ত্র পুত্রোৎপাদন ধর্ম্ম বলেছেন এবং এই ধর্ম্মে প্রত্যবায় না ঘটে, তার জন্য পুন্নাম নরকের বিভীষিকাও দেখিয়েছেন। শাস্ত্রকারের ভাষায় ধর্ম্ম যদি দিব্য প্রেরণা সম্ভূত ও অভ্যুদয়ের নিদান হয়, তবে তার সম্পর্কিত কর্ত্তব্যও অত্যন্ত গুরুতর হয়ে উঠে। স্বভাবের বশে যে কোনও কামনাই আমাদের মনে আসে না কেন, তাকে যদি ধর্ম্ম আখ্যা দিই, তবে তার আনুষঙ্গিক কর্ত্তব্যগুলির কথা যেন আমরা ভুলে না যাই।

সন্তান পিতামাতার কাছে এক মহানন্দময় দায়িত্ব স্বরূপ। পিতামাতার শুধু ধারণ আর পোষণের দায়িত্বই নয়, শিক্ষার দায়িত্বও তাদেরই। অতি নিঃসহায় একটী জীব ভগবান তাঁদের হাতে তুলে দিয়েছেন—তার মাঝে ভগবানের শুভেচ্ছার বীজ নিহিত রয়েছে—স্নেহে, কল্যাণে তাকে অঙ্কুরিত করে তুলবার জন্য। আমরা বড় হয়ে এখন বুঝেছি, মনুষ্যত্ব, দেবত্ব, ঈশ্বরত্ব, ব্রহ্মত্ব লাভ করা আমাদের লক্ষ্য। আজ বড় হওয়ার পরেই যে এই লক্ষ্য দাঁড়িয়েছে, তা তো নয়, আমার জন্মের সঙ্গে সঙ্গে এই লক্ষ্য নিয়েই আমি জন্মেছিলাম। আমি তখন তা বুঝতে পারি নি, কাজেই সেই মতে চলতে পারিনি; কিন্তু আমার পিতামাতাকে তো ভগবান আমার হয়ে বুঝবার ভার দিয়েছিলেন। প্রত্যেক পিতামাতা যদি নিজের জীবনের সঙ্গে তুলনা করে সন্তানের কথা এই ভাবে ভাবেন, তবে সন্তানের প্রতি তাঁদের কর্ত্তব্য কত বেড়ে যায়। অতি শৈশব হতে, এমন কি গর্ভস্থ ভ্রূণের অবস্থায়—চাই কি তারও পূর্ব্বে গর্ভাধানের সময় হতে মনুষ্যজীবনের চরম লক্ষ্যের কথা স্মরণ করে একটা মনুষ্যজীবনের পত্তন করতে হলে পিতামাতাকে কত উচ্চভূমিতে অবস্থান করতে হয়, তা সকলেরই চিন্তার বিষয়।

যা অপরের মাঝে অপরিস্ফুট রয়েছে, আমাদের পরিস্ফুট বৃত্তির সহায়ে তাকে ফুটিয়ে তোলাকেই না আমরা বলি শিক্ষা। আমরা অপরের মাঝে কোন জিনিষটা ফুটিয়ে তুলতে চাই—আমাদের মাঝেই বা কোন জিনিষটা

ফুটে উঠলে আমরা নিজকে সার্থক মনে করি? ধর্মভাব, সত্যভাব আমাদের মাঝে ফুটুক, এই আমরা চাই। একথা সকলে বোঝে না—আধ্যাত্মিকতার সঙ্গে জীবনের আর সকল উদ্দেশ্যেরই বিরোধ আছে, এটা অধিকাংশ লোকেরই ধারণা। কিন্তু এ ধারণা একেবারেই ভুল। আত্মা সর্ব্বব্যাপী; সুতরাং যে যতই বলি না কেন, তাঁকে ছেড়ে আমরা যেমন কিছুই করতে পারি না, তেমনি তাঁর অনুশীলনের সঙ্গে জগতের কোনও কর্ত্তব্যের বিরোধ হতে পারে, এও সম্ভব নয়। আধ্যাত্মিক থেকেও সংসার করা যায়, ধন উপার্জ্জন করা যায়, রাজ্য পরিচালনা করা চলে—বরং আধ্যাত্মিকতার বলে সুশৃঙ্খলায় ও নিরাপদে এগুলো করা চলে। তবে দেখি কেন, সংসারে মানুষ জীবনটাকে দুই ভাগ ক'রে এক ভাগ সংসারের জন্য, আর এক ভাগ ধর্ম্মের জন্য রাখতে চায়—সংসারে থেকে ভগবান মিলে না, এমন কথাই বা বলে কেন?

এর একমাত্র কারণ হচ্ছে শিক্ষার অভাব কিম্বা কুশিক্ষা। সাধারণ লোকের কাছে আধ্যাত্মিক চর্চ্চাটা এত কঠিন কসরত বলে মনে হয় কেন?—কারণ যে সময়ে যা করা উচিত ছিল, তা করবার শিক্ষা তারা পায়নি বলে। আজ অধ্যাত্ম জগতে প্রবেশ করতে গিয়ে অত বাধার সঙ্গে লড়াই করতে হচ্ছে, কিন্তু এতগুলো বাধাকে কেন স্তূপাকার হতে দেওয়া হল? এর পূর্ব্বে কি এদিকে তাকাবার কারু ফুরসৎ হয়নি? এখন না হয় সাংসারিক দায়িত্বে দুদিকের তাল সামলানো কঠিন হয়ে পড়ে, কিন্তু ছেলেবেলায় সংসারের দায়িত্ব ছিল না, তখন কেন ভবিষ্য জীবনযুদ্ধের উপযোগী রসদ সঞ্চয় করে রাখা হল না? শিশু এ কথাটা ভাবতে না পারলেও শিশুর পিতামাতার একথাটা ভাবা উচিত ছিল।

শৈশবের অবসরকালে, চিত্ত যখন ননীর মত কোমল, ভালবাসার ক্ষমতা যখন অফুরন্ত, সেই সময় যদি পিতামাতা আপ্রাণ চেষ্টায় সদ্ভাবের বীজ বপন করে দেন, তবে সকলেরই কর্ম্মজীবন সুখের হতে পারে—সংসারে থেকেও ভগবান লাভের একটা সুরাহা হতে পারে। ধর্ম্মশিক্ষার এমন অখণ্ড অবসর পরে আর কখনও মিলবে না। আর গোড়ায় এই শিক্ষা নিয়ে মানুষ হতে পারলে ভবিষ্যতের কোন সঙ্কটেই পর্য্যুদস্ত হবার আশঙ্কা থাকে না।

সন্তান সম্বন্ধে মায়ের চেয়ে পিতার চিন্তা ও কর্ত্তব্যবুদ্ধি বেশী দেখা যায়। ভবিষ্যতে ছেলের অন্নসংস্থান করবার জন্য পিতা যতটা ব্যস্ত হন, তার অধ্যাত্মজীবনের পাথেয় সঞ্চয়ে তাঁকে ততটা মনোযোগী দেখা যায় না। এই অবিবেচনার ফল পিতাপুত্র উভয়কেই ভোগ করতে হয়।

বাবা মা ছেলেকে ভালবাসতে জানেন, কিন্তু কেন যে ভালবাসেন, তা বুঝেন না। এই অন্ধের মত ভালবাসাতেই তো সর্ব্বনাশ হয়। অজ্ঞানে ভালবাসায় সকল কর্ত্তব্যবুদ্ধি লোপ পেয়ে যায়—ও তো ভালবাসা নয়, ও হচ্ছে রাক্ষসী মায়া। ভালবেসে আমার সুখ, তাই আমি ভালবাসি। আমার সুখ তো সংস্কার অনুযায়ী—তা কল্যাণ, কি অকল্যাণ তা বুঝব না, যতদিন পর্য্যন্ত নিজকে না জানব। আমি যদি মনে করি, খেয়েদেয়েই সুখ, তাহলে আমার ছেলেকেও খাইয়ে দাইয়েই সুখী করতে চেষ্টা করব, আর বলব, আমি তাকে ভালবাসি বলেই তার সুখ

চাই। কিন্তু অজ্ঞানের ভালবাসাকেই কি সত্য ভালবাসা বলব? তাই বলছিলাম, শুধু ভালবাসতে পারলেই হয় না—নিজকে জেনে ভালবাসতে পারলে, তবে সে ভালবাসায় অপরের কল্যাণ হবে।

সন্তানের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী হতে হলে পিতা মাতাকে নিজের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী হতে হবে। যার ভিতর যা নাই, অপরকে সে তা দিতে পারে না। আধ্যাত্মিক ভাবে নিজে প্রতিষ্ঠিত না থাকলে অপরের মাঝে তা সঞ্চারিত করা যায় না। তাই সন্তানকে যথার্থ মানুষ করে তুলতে হলে পিতামাতাকেও আগে খাঁটি মানুষ হতে হবে। শুধু সন্তান কামনা করলেই হবে না—সন্তানের জন্য তপস্যা করতে হবে। যে তোমার ঘরে আসবে, সে তো তুচ্ছ কেউ নয়। ব্রহ্মবীজ অন্তরে নিয়ে তোমার কোলে যে ফুটে উঠবে, তাকে কি দিয়ে তুমি সেবা করবে, কোন পরিচর্য্যায় তাকে তৃপ্ত করবে? সন্তানের মাঝে নারায়ণকে প্রত্যক্ষ কর, তোমার প্রাণের সমস্ত চেষ্টা, যত্ন, শ্রদ্ধা তাঁকে সমর্পণ কর—তোমার পবিত্র, অতন্দ্রিত সেবায় তাঁকে জাগিয়ে তোল—তবেই না কুলং পবিত্রং বসুধা কৃতার্থা হবে। আর তা না করে হেলায় অশ্রদ্ধায় যদি আজ নারায়ণকে ফিরিয়ে দাও, তবে তোমার সেবায় ত্রুটির যে নিদারুণ অভিশাপ, তা ইহ পরলোকে বজ্রের মত তোমাকে দগ্ধ করবে। তোমার অবিবেচনায় অবহেলায় একটা জীবন পণ্ড হয়ে গেল—এ অপরাধের শাস্তি কত গুরুতর, তা জান কি? তোমার সেবায় এই সন্তানের ভিতরে কি না ফুটত, তোমার আকুল আকাঙ্ক্ষায় এ কি না হতে পারত? অথচ এই ফুটিয়ে তুলবার সুযোগ তোমারই সব চেয়ে বেশী—কেননা ভালবাসার পরশমণি যে তোমার মাঝে রয়েছে। ভগবান জীবস্বভাবের ভালবাসাটুকু তোমার মাঝে ঢেলে দিয়ে আর এই একটি অস্ফুটন্ত জীব তোমার হাতে দিয়ে, যে মহাকর্ত্তব্যের সূচনা করে দিয়াছেন, সেই কর্ত্তব্যের পথে হে পিতৰ্নিবোধ, হে জননি জাগৃহি।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং
কলিকাতা।

সারস্বত-মঠ দর্শনে

বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ভারতের পূর্ব্বাকাশে জাতীয় জীবনের নবপ্রভাতে যে অভিনব সূর্য্যের উদয় হইয়াছিল, আজ তাহার উজ্জ্বল আলোকসম্পাতে সমস্ত উত্তরপূর্ব্ব ভারতবর্ষ মহিমামণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছে।

যুগযুগান্তর পূর্ব্বে কোন স্মরণাতীত কালে প্রাচ্যের বিজয়দুন্দুভি প্রতীচ্যের বক্ষভেদ করিয়া জ্ঞানগরিমায় বাজিয়া উঠিয়াছিল, বিধাতার অলঙ্ঘ্য নিয়মে প্রতীচ্যের মহিমায় প্রাচ্য আবার মুগ্ধ হইয়া পড়িল। প্রতীচ্যের অপ্রতিহত শক্তির প্রভাবে প্রাচ্যের অস্তিত্ব বিলুপ্তবৎ হইয়া পড়িল, বিজয়লক্ষ্মীর চঞ্চল সিংহাসন প্রাচ্য ত্যাগ করিয়া প্রতীচ্যে প্রতিষ্ঠিত হইল। কিন্তু কালচক্রের পুনরাবর্ত্তে প্রাচ্যের ভাগ্যে শুভদিন আসিয়াছে। আবার প্রাচ্য মহামহিমায় আপন প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করিবে। পৃথিবী ব্যাপিয়া তাহার সাড়া পড়িয়াছে, নবজাগরণের শুভলক্ষণসমূহে দিগ্-দিগন্ত উদ্ভাসিত হইয়াছে।

নব উষার ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে কত শত মহাপুরুষগণের গুরুগম্ভীর উদ্বোধনমন্ত্রে নিদ্রিত ভারতবাসী জাগিয়াছিল, আজ প্রভাতের পুণ্যালোকে কর্ম্মক্ষেত্রের সুপ্রশস্ত পথ তাহাদের নয়নসমক্ষে বিস্তৃত হইয়া রহিয়াছে। নিদ্রোত্থানের সে ডাকাডাকি সে কলরব আর নাই, নবপ্রবুদ্ধের নিঃশব্দ কর্ম্মচেষ্টা তাহার স্থান অধিকার করিয়াছে। তাই আজ ভারতের বিভিন্ন কেন্দ্রে শত শত মহাপুরুষ পাহাড়-পর্ব্বতের নিভৃত নিলয় পরিত্যাগ করিয়া জনসমাজের মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন, আর্য্যজাতির পুনরভ্যুত্থানের প্রচেষ্টা-কল্পে শত শত আশ্রম বা মঠ প্রতিষ্ঠিত হইয়া নীরব কর্ম্মীর কর্ম্মপ্রেরণা জাগাইয়া তুলিয়াছে।

এই শুভ নবযুগের শুভ নব কর্ম্মচেষ্টায় যে মহান্ কেন্দ্র হইতে বিপুল শক্তি বিচ্ছুরিত হইয়া সমস্ত উত্তরপূর্ব্ব ভারতবর্ষ আক্রান্ত করিয়াছে, সেই সারস্বত মঠ বঙ্গবাসীর অতুল কীর্ত্তি। আশার আশ্বাসবাণী বলিতেছে, নূতন জগতের নূতন রাজ্যে বাঙ্গালীর স্থান শীর্ষদেশে। অদূর ভবিষ্যতে বাঙ্গালীর গৃহে গৃহে যোগী ব্রহ্মচারী আদর্শ গৃহস্থ, নির্ভীক জিতেন্দ্রিয় পূর্ণশিক্ষিত যুবক আর ত্যাগী জ্ঞানগরিষ্ঠ বৃদ্ধের মহাসম্মিলনী প্রতিষ্ঠা করাই সারস্বত মঠের উদ্দেশ্য। এই মঠ আসাম প্রদেশীয় শিবসাগর জেলার পুণ্যভূমি কোকিলামুখে প্রতিষ্ঠিত। সমস্ত আসাম ও বঙ্গদেশ ইহার ক্ষেত্র। নেতা—পরিব্রাজকাচার্য্য পরমহংস শ্রীমৎ স্বামী নিগমানন্দ সরস্বতী।

তন্ত্র, যোগ, ভক্তি ও জ্ঞানের সাধনায় সিদ্ধিলাভের পর গারোহিল যোগাশ্রমের স্বভাবসুন্দর রমণীয় স্থানে অবস্থান কালে এই মহাপুরুষ যে সময়ে জগদ্গুরুর আদেশে গুরুরূপে প্রকাশিত হইলেন, ঠিক সেই সময়ে গবর্ণমেণ্ট বঙ্গভঙ্গের আদেশ প্রচার করিলেন। সরকার বাহাদুরের এই আদেশের বিরুদ্ধে সমস্ত বঙ্গদেশে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হইল। দেখিতে দেখিতে আন্দোলন এমন আকার ধারণ করিল যে তেমন আন্দোলন কেহ কখনো দেখে নাই, কেহ কল্পনায় আনিতে পারে নাই। যেন এক ঐন্দ্রজালিকের

অঙ্গুলী সঙ্কেতে দেশময় আগুন ছড়াইয়া পড়িল। কেহ ভাবিবার অবসর পাইল না, বুঝিবার সুযোগ পাইল না, কেমন করিয়া মাতিয়া উঠিল কেহই বুঝিল না। নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে, পথে ঘাটে, হাটে বাজারে, মাঠে ময়দানে স্বদেশী সভার ধুম পড়িয়া গেল—বক্তৃতার আগুন ছুটিল, বিলাতী কাপড় দগ্ধ হইল, লবণের নৌকা ডুবিল, চিনির বাজার বন্ধ হইল—হিন্দু মুসলমান ক্ষেপিয়া উঠিল। সহসা যেন কেমন হইয়া উঠিল—থিয়েটারে যাত্রায়, পাঁচালী ও তবজায় উৎসবে ও মজলিসে স্বদেশী সঙ্গীতের ফোয়ারা ছুটিল—কবির কবিতায় ও ভাঁটের ছড়ায়, বক্তৃতায় ও কথকতায় স্বদেশী ভাবের জোয়ার আসিল, ধর্ম্মের বিকৃত ব্যাখ্যায় অধর্ম্মের জয়ডঙ্কা বাজিয়া উঠিল—দেশের মাথা খারাপ হইল।

তারপর স্বদেশীর সঙ্গে স্বরাজের সুর উঠিল, দেশময় স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠিল। কিন্তু ত্যাগসংযমের অভাবে সে আকাঙ্ক্ষা উচ্ছৃঙ্খলতায় পরিণত হইল—সে বিকট উন্মাদনায় লোকের জীবন ও ধনসম্পত্তি বিপদসঙ্কুল হইল—দেশের অন্তরে অন্তরে কাতর ক্রন্দন ও হাহাকার উত্থিত হইল। কুশিক্ষা ও কুঅভ্যাসে জীবন পরিচালনার ফলে দেশের লোক বুঝিতে পারিল না যে স্বাধীনতা যথেচ্ছচারিতা নহে, উহা ত্যাগ ও সংযমের পূর্ণ পরিপুষ্ট মিলন। দেশের প্রাণে ইহা জাগিল না যে স্বাধীনতা হিংসা বিদ্বেষের উপরে প্রতিষ্ঠিত নহে, পরন্তু আত্মবোধ ও সমদৃষ্টির উপরে প্রতিষ্ঠিত। স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষায় রাজবিধি উল্লঙ্ঘিত হইতে পারে বটে, কিন্তু সে উল্লঙ্ঘন বিদ্রোহাত্মক কর্ম্ম-তাণ্ডব নয়, তাহা সত্যানুরাগমূলক আত্মবিসর্জ্জন, সংযম তাহার শক্তি, বিশ্বপ্রেম তাহার ফল। মানুষ ইহা বুঝিল না,—তাহারা ভুলিয়া গেল যে প্রকৃত স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষায় বিশ্বমানব জাগিয়া উঠিবে, ধর্ম্ম ও ন্যায়ের অব্যাহত স্রোত প্রবাহিত হইবে। সুতরাং স্বাধীনতার নামে অধর্ম্মপ্রণোদিত উচ্ছৃঙ্খলতার আগুন দেশময় জ্বলিয়া উঠিল, থধুপের মত ক্ষণিক গর্জ্জনে উহা আকাশে উঠিয়া পরক্ষণেই শত খণ্ডে বিকীর্ণ হইয়া পড়িল।

যোগাশ্রমের নিভৃত কন্দরে বসিয়া শান্ত সমাহিত নিগমানন্দদেব দেশের এই ভীষণ অবস্থা প্রথমাবধি লক্ষ্য করিতেছিলেন। দেশব্যাপী এই বিরাট আন্দোলনের অভূতপূর্ব্ব শক্তিলীলায় তাঁহার প্রাণে সাড়া পড়িল। তিনি ক্রমশঃ বঙ্গদেশের মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং সত্যধর্ম্মপ্রচার উদ্দেশ্যে সমস্ত ধর্ম্মশাস্ত্রের সারসংগ্রহ পূর্ব্বক তাঁহার সর্ব্বতোমুখী-সাধনসিদ্ধ প্রজ্ঞালোক-মণ্ডিত যোগী গুরু, জ্ঞানী গুরু, তান্ত্রিক গুরু ও প্রেমিক গুরু নামক চারিখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করিলেন। দুর্ভিক্ষপীড়িত বুভুক্ষিত নরনারীর সম্মুখে অন্নসম্ভারের ন্যায় এই গ্রন্থ কয়খানি দেশের সঙ্কটার্ত্ত জনসমাজের আকাঙ্ক্ষাকুল প্রাণে নব আশার সঞ্চার করিল। এই ভীষণ বিপ্লবের সময়ে যাহাদের সাত্ত্বিকবুদ্ধি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছিল, তাহারা যেন অকূল জলধির নিরাশ্রয় সঙ্কটাবর্ত্তে একখানি তরণীর আশ্রয় পাইল। দলে দলে দেশবাসীরা এই মহাপুরুষের নিকটে উপস্থিত হইতে লাগিল, তাঁহার অমৃতোপম উপদেশ এবং সনাতন ধর্ম্মের জটিল ও নিগূঢ় তত্ত্বের বিজ্ঞানসম্মত অপূর্ব্ব ব্যাখ্যায় পরিতৃপ্তি লাভ

করিল, বিনা আড়ম্বরে নিঃশব্দে ধীরগতিতে দেশের গৃহে গৃহে গ্রন্থ কয়খানি প্রচারিত হইতে লাগিল। কত শত মুমুক্ষুর কাতর প্রাণ সাধনপিপাসায় মহাপুরুষের চরণতলে লুটিয়া পড়িল, ভবব্যাধি হইতে মুক্তি কামনায় নিরাবিল শান্তি আনন্দের আকাঙ্ক্ষায় কত পথভ্রষ্ট দুঃখ জর্জ্জরিত হতাশ হৃদয় কৃপার ভিখারী হইয়া প্রপন্ন হইল, রাজশক্তির প্রচণ্ড আঘাতে প্রপীড়িত কত বিভ্রান্ত কর্ম্মীর বিক্ষিপ্ত চিত্ত বিমূঢ় অবসাদে তাঁহার শরণ প্রার্থনা করিল। শ্রীমৎ নিগমানন্দদেব তাহাদিগকে অভয় প্রদান করিয়া সস্নেহে গ্রহণ করিলেন। কিন্তু তাঁহার প্রাণে এক নূতন ভাবনার উদয় হইল।

মহাপুরুষ দেখিলেন, ভাবের প্রবল বন্যায় দেশবাসীর বিশেষতঃ শিক্ষিত সম্প্রদায়ের এবং উচ্চশ্রেণীর হিন্দুজাতির হৃদয় পরিপ্লুত হইয়া থাকিলেও ত্যাগসংযমপূত সুশিক্ষার অভাবে তাহাদের দেহমন একেবারে অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িয়াছে। জন্মজন্মান্তরাগত সংস্কারের ফলে বিশেষ বিশেষ ঘটনাচক্রে উচ্চভাবের ক্ষণিক স্ফুরণ হইয়া সুবুদ্ধির উদয় হইলেও শৈশবাবধি ব্রহ্মচর্য্যে প্রতিষ্ঠিত সুশিক্ষার অভাবে দেশের কর্ম্মশক্তি পঙ্গু হইয়া রহিয়াছে, তদুপরি পাশ্চাত্য মোহমদিরার প্রবল মাদকতায় দেশের গৃহস্থজীবন বিকৃত ও বিপর্য্যস্ত হইয়াছে। যে মহিমময় ভিত্তির উপরে আর্য্যজাতির গৌরবপ্রাসাদ প্রতিষ্ঠিত ছিল, তাহা ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছে, সুতরাং সেই ভিত্তি দৃঢ়রূপে পুনর্গঠিত না হইলে জাতির অভ্যুত্থান অসম্ভব। মহাপুরুষ প্রাণে প্রাণে এই সত্য উপলব্ধি করিলেন এবং বঙ্গদেশের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের প্রতিষ্ঠিত জাতীয় শিক্ষাপরিষদের দুর্দ্দশা দর্শন করিয়া আর্য্যঋষিগণের অনুমোদিত সৎশিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিবার জন্য উদগ্রীব হইলেন।

গৃহস্থজীবন লইয়াই সমাজ। গৃহস্থের উন্নতি অবনতিতেই সমাজের উন্নতি এবং অবনতি, জাতির উত্থান ও পতন। সুতরাং আদর্শ গৃহস্থজীবন প্রতিষ্ঠিত হইলেই একটা সঙ্ঘবদ্ধ বিরাট্ জাতির প্রতিষ্ঠা হইবে। জাতীয় উন্নতি বলিতে যিনি যাহাই বুঝুন না কেন, রুচি অনুসারে এই উন্নতির আদর্শ শিল্পবিজ্ঞানসম্ভূত ঐশ্বর্য্যপ্রভুত্বব্যঞ্জক স্বাধীনতা হউক, আর শমদমাদি সাধনসম্পন্ন ব্রহ্মবিৎ সংসার বিরাগীর স্বারাজ্যসিদ্ধিই হউক, জাতিগত সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি বলিতে গৃহস্থজীবনের সর্ব্বতোমুখী উন্নতি বুঝিতে হইবে। আদর্শ অনুযায়ী মনুষ্যত্বের বিকাশ এই গৃহস্থজীবনেই ঘটিবে এবং তাহাতেই জাতিগত অভ্যুত্থান সম্ভব হইবে। এই আদর্শ গৃহস্থজীবন প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে দেশের বালকবালিকাগণের সৎশিক্ষার প্রয়োজন। এমন শিক্ষায় তাহাদিগকে শিক্ষিত করিতে হইবে যাহাতে তাহারা অদূর ভবিষ্যতে আদর্শ গৃহস্থ হইতে পারে। বর্ত্তমান শিক্ষাপদ্ধতি দ্বারা তাহা হইতেছে না, ইহা দেশের চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রই লক্ষ্য করিতেছেন; অথচ ঐরূপ সৎশিক্ষার সর্ব্বাঙ্গসুন্দর প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাও তাঁহাদের দ্বারা সম্ভবপর হইতেছে না। শ্রীমৎ নিগমানন্দ দেখিলেন, এই মোহগ্রস্ত সর্ব্বস্বহারা জাতির শিক্ষাপদ্ধতি পাশ্চাত্যের অনুকরণে পরিচালিত হইলে কিছুতেই উন্নতি সম্ভবপর নয়, সুতরাং প্রাচীন ভারতের আর্য্যঋষিগণ প্রবর্ত্তিত চতুরাশ্রমপদ্ধতি অনুসারে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিবার জন্য স্বরচিত গ্রন্থ কয়খানির

বিক্রয়লব্ধ অর্থ তদুদ্দেশ্যে ব্যয় করিতে মনস্থ করিলেন।

প্রাচীন কালে গৃহস্থের সন্তান বিদ্যারম্ভের বয়ঃক্রমে গুরুগৃহে প্রেরিত হইত। তথায় সর্ব্বতোভাবে গুরুর অধীনে থাকিয়া দীর্ঘকাল ব্রহ্মচর্য্যব্রত প্রতিপালন পূর্ব্বক সমস্ত শাস্ত্রপাঠ শেষ হইলে পুনরায় গৃহে ফিরিয়া আসিত এবং বিবাহগৃহীতা সহধর্ম্মিণীর সহিত গার্হস্থ্যধর্ম্মে যত্নপর হইত। ত্যাগ, সংযম ও তপস্যার ভিত্তির উপরে ছাত্রজীবন গঠিত হইত এবং বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে স্বাধ্যায় ও ঈশ্বরপ্রণিধানের ক্রমিক উন্নতি বিধানে জীবন অমৃতময় হইয়া উঠিত। অটুট বীর্য্যবান্ তপোনিষ্ঠ সংযমী যুবক সংসারাশ্রমে প্রবিষ্ট হইয়া সর্ব্বপ্রকার সফলতার গৌরবে প্রতিষ্ঠিত হইত এবং তাহাদের সন্তানসন্ততিগণও আবার সেই পথে চালিত হইয়া মরজগতে অমরকীর্ত্তি লাভ করিয়া ধন্য হইত। জগৎকল্যাণকামী নিগমানন্দদেব এই শিক্ষার প্রবর্ত্তনে সচেষ্ট হইলেন এবং স্বকীয় আশ্রমভুক্ত কারণা সেবাশ্রম ও শিক্ষায়তন প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য ভূমি সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইলেন। বঙ্গদেশের দুর্ভাগ্য, এ দেশে তাঁহার উদ্দেশ্যানুরূপ যথোপযুক্ত ভূমি সংগৃহীত হইল না। কাজেই মহাপুরুষ সুদূর আসামপ্রদেশীয় শিবসাগর জেলার কোকিলামুখ নামক স্থানে সরকার বাহাদুরের নিকট হইতে বিস্তৃত ভূভাগ বন্দোবস্ত লইয়া মঠ স্থাপন করিলেন। স্বয়ং শঙ্করমঠের সরস্বতীসম্প্রদায়ভুক্ত বলিয়া মঠের নাম সারস্বত মঠ রাখিলেন এবং ইহাকে শঙ্কর মঠের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইলেন।

যোরহাট সহর হইতে প্রায় ছয় মাইল দূরে বিস্তীর্ণ মাঠের মধ্যে মঠ। মঠের তিন দিকে ২।১ মাইলের মধ্যে লোকের বসতি নাই। একদিকে মাইলখানিক দূরে মিরি নামক স্বভাবসরল পার্ব্বত্যজাতির অধ্যুষিত একখানি ছোট গ্রাম। গ্রামখানির নিকট দিয়া মরিয়ানি হইতে যোরহাট হইয়া লাইট রেলওয়ে লাইন ব্রহ্মপুত্রতীরে কোকিলামুখ ষ্টিমার ষ্টেশন পর্য্যন্ত গিয়াছে। এই রেলওয়ে লাইন হইতে মঠের বিশাল গৈরিক পতাকা উড্ডীয়মান দেখা যায়। উত্তরদিকে পর্ব্বতরাজ হিমালয়, পূর্ব্বে উদয়গিরি এবং দক্ষিণে নাগাপর্ব্বত পশ্চিমদিকেও কিছুদূর পর্য্যন্ত আসিয়া কালো মেঘের মত ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া আছে। আকাশে মেঘ না থাকিলে হিমালয়ের তুষারশৃঙ্গ ও দিগন্তে প্রসারিত পর্ব্বতমালার বিরাট গম্ভীর ছবি প্রাণমন বিমোহিত করে। মঠের পার্শ্বদেশ দিয়া পার্ব্বত্য নদীর ক্ষুদ্র একটী খাল প্রবাহিত রহিয়াছে। রেলওয়ে লাইন হইতে একটী অল্পপ্রশস্ত কাঁচা রাস্তা আঁকিয়া বাঁকিয়া মঠ পর্য্যন্ত পঁহুছিয়াছে। প্রবেশপথের দুই পার্শ্বে নাগেশ্বর ফুলের নাতিদীর্ঘ বৃক্ষরাজি সমোচ্চভাবে শ্রেণীবদ্ধ রক্ষকগণের ন্যায় দণ্ডায়মান। আম, কাঁঠাল, কলা, লিচু, জাম, নারিকেল, পেঁপে, জামরুল, পেয়ারা ও আনারস প্রভৃতি বহুপ্রকার ফলের বাগানে সমস্ত ভূভাগ ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে। পূর্ব্বদিকে পুকুর, পুকুরের পাহাড়িতে দুই সারি সুদৃশ্য ও সুগন্ধি পুষ্পবৃক্ষের মধ্য দিয়া ক্ষুদ্র একটী ভ্রমণপথ। মঠের প্রবেশপথ ও পুকুরের মধ্যবর্ত্তী ভূমিতে এবং দক্ষিণপার্শ্বে তরিতরকারী শাকসব্জী ইত্যাদির বিস্তীর্ণ কৃষিক্ষেত্র, তাহার নিকটেই প্রকাণ্ড গোশালা। পুকুরের ঈশান কোণে রমণীয় বিল্ববৃক্ষের কুঞ্জমধ্যে শিবালয় ও যোগসাধনার কুটীর।

পশ্চিমদিকে অসংখ্য গন্ধপুষ্পে সুশোভিত সুবিন্যস্ত পুষ্পবৃক্ষের সুরম্য কাননের মধ্য দিয়া পথ চলিয়া গিয়াছে। সম্মুখে শান্তিআশ্রম, নিগমাগম পাঠাগার এবং দাতব্য ঔষধালয়, বামদিকে ব্রহ্মচারিনিবাস, তাহার উত্তরোত্তর দক্ষিণে যোগমায়াযন্ত্র নামক আর্য্যদর্পণ মাসিক পত্রিকার মুদ্রণ কার্য্যালয়, তাঁতশালা, নানা-বৃক্ষচ্ছায়াস্নিগ্ধ ঋষিবিদ্যালয়ের প্রকাণ্ড শিক্ষা-ক্ষেত্র, সেবকাদিগের কুটীর ও অতিথিশালা। শান্তিআশ্রমগৃহ পার হইয়া চতুষ্কোণ আঙ্গিনার উত্তরের ভিটায় মঠের আসন গৃহ, পশ্চিমে ব্রহ্মচারী ও সেবকগণের পাকশালা এবং দক্ষিণে ভাণ্ডার গৃহ। আসন গৃহের উত্তর পশ্চিম কোণে নাতিদূরে মনোরম পঞ্চবটী অপূর্ব্ব স্নিগ্ধগাম্ভীর্য্যে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। সমস্ত মঠায়তনের বায়ুমণ্ডল সুগন্ধি কুসুম, তুলসী, বিল্বপত্র, ধূপ ও অগুরুর মনোহর গন্ধে আমোদিত সর্ব্বত্র একটা ঘনীভূতভাবপ্রবাহিত মহাশক্তির অনুভূতি—সর্ব্বত্র শান্ত গম্ভীর নিস্তব্ধতা—সর্ব্বত্রই মনের উপরে একটা বিরাট অন্তরাভিমুখী অপ্রতিহত প্রেরণা।

প্রাচীন ইতিহাস পুরাণ ও কাব্যগ্রন্থাদিতে তপোবনের বর্ণনা পাঠ করিলে কল্পনাবলে মানসপটে যে চিত্রের উদয় হয়, এই সারস্বত মঠে আসিলে তদনুরূপ চিত্র প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইবেন। তেজোদীপ্ত ব্রহ্মচারী বালকগণের সেই সহাস্য প্রফুল্ল বদন, সেই কায়মনোবাক্যে কঠোর কর্ত্তব্য নিষ্ঠা, সেই গোচারণ, হলচালন, সেই ত্রিসন্ধ্যা সন্ধ্যাবন্দনা, সেই পুষ্পচয়ন, সেই শাস্ত্র অধ্যয়ন, সেই তপস্যা আর যম নিয়ম, সব সেই প্রাচীন তপোবনের অক্ষুণ্ণ চিত্র—সে যেন সংসার কোলাহলের বহু ঊর্দ্ধে বহু দূরে যুগ-যুগান্তরের সিদ্ধঋষিমুনি সেবিত হিংসাদ্বেষবর্জ্জিত পবিত্র শান্ত নিভৃত প্রদেশে বাস—সে এক অদ্ভুত দৃশ্য; অদ্ভুত উদ্বোধন-সঙ্গীতের মূর্ত্তিমতী রচনা।

শ্রীমৎ নিগমানন্দদেব মঠ প্রতিষ্ঠা করিয়া ধীরগতিতে দৃঢ়তার সহিত অভীষ্টকার্য্যে মনোনিবেশ করিলেন। যে সকল অক্লান্তকর্ম্মী নৈষ্ঠিক সন্ন্যাসী শিষ্যের সাহায্যে ভীষণ অরণ্য পরিষ্কৃত হইয়া মর্ত্ত্যের নন্দনকানন প্রতিষ্ঠিত হইল, তাঁহাদের কয়েকজন তীর্থভ্রমণে ও শ্রীধাম পরিক্রমণে বহির্গত হইলেন, কয়েকজন উজ্জয়িনী অবধি বশিষ্ঠাশ্রম পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ উচ্চভূমির স্থানে স্থানে প্রতিষ্ঠিত হইয়া সাধনভজন ও সমাধি অভ্যাসে নিযুক্ত রহিলেন, কয়েকজন সেবাশ্রম ও ঋষিগণের অনুমোদিত শিক্ষায়তন প্রতিষ্ঠার উদ্যোগে ব্রতী হইলেন। এদিকে ১৩২১ সনে হরিদ্বারধামে মহাকুম্ভসম্মিলনী ক্ষেত্রে জগদ্গুরু নিগমানন্দ ও ভারতের বিভিন্ন স্থানের প্রখ্যাতনামা সন্ন্যাসী সদ্গুরু এক শত আট জন মহাপুরুষ এক যোগে সত্যযুগের আভাস ঘোষণা করিয়া ঝাণ্ডা প্রোথিত করিলেন, সঙ্গে সঙ্গে সারস্বত মঠের উদ্দেশ্যানুরূপ কার্য্য আরম্ভ হইয়া গেল।

আর্য্যঋষিগণের অনুমোদিত শিক্ষাপদ্ধতির প্রবর্ত্তনকল্পে প্রতিষ্ঠিত বলিয়া বিদ্যালয় ঋষি-বিদ্যালয় নামে অভিহিত হইয়াছে। এই বিদ্যালয়ে সংস্কৃত ভাষার ব্যাকরণ, কাব্য, সাহিত্য, দর্শন ও পুরাণশাস্ত্রাদি এবং বঙ্গভাষার ব্যাকরণ, কাব্য ও ধর্ম্মনীত্যাদি পূর্ণভাবে শিক্ষা দেওয়া হয়। এতদ্ভিন্ন আংশিকভাবে রাজভাষা ইংরেজী, ভূগোল, ইতিহাস, বিজ্ঞান ও অঙ্কশাস্ত্রও শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। পরিশেষে পৃথিবীর যাবতীয় দর্শনশাস্ত্রের তুলনামূলক শিক্ষায় পুস্তকধৃত

বিদ্যার অনুশীলন পরিসমাপ্ত হয়। কিন্তু ঋষিবিদ্যালয়ের মূল শিক্ষা মনুষ্যত্বের বিকাশে। ত্যাগ, সংযম ও নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য্য ইহার ভিত্তি, স্বাবলম্বন ইহার শক্তি।

ঋষিবিদ্যালয়ের শিক্ষিত ছাত্র এক একটী পূর্ণ মানব। নিশাবসানে ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে জাগরিত হইয়া আরতি, স্তোত্র ও কীর্ত্তনাদি অন্তে শৌচশুদ্ধির পরে ব্রহ্মচারী বালকগণ সন্ধ্যাদি নিত্যকর্ম্মে মনোনিবেশ করে। তৎপর যে যাহার নির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্যকার্য্যে নিযুক্ত হয়। কার্য্য বুঝিয়া ২।৩ জনে এক একটী দল গঠন করিয়া পালা অনুসারে নিজেরাই নিজেদের সর্ব্বপ্রকার কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। পাকশালা পরিষ্কার করা, পাকপাত্র ও ভোজনপাত্রাদি মাজাঘসা, কাঠকাটা, বাটনা বাটা, কোটনা কোটা, জলটানা, রন্ধন ও পরিবেশন করা ইত্যাদি আহার নির্ব্বাহের সর্ব্বপ্রকার কার্য্য নিজেরাই সম্পন্ন করে এবং এ বিষয়ে বর্ণাশ্রমধর্ম্মানুমোদিত বিধি-নিষেধ সর্ব্বতোভাবে প্রতিপালিত হয়। ইহার পর আর্য্যদর্পণ পত্রিকার যাবতীয় কার্য্য ইহাদেরই করিতে হয়। ইহারা নিজেরাই প্রিণ্টার, নিজেরাই কম্পোজিটার, নিজেরাই বাইণ্ডার ও নিজেরাই প্রবন্ধলেখক। দরজীর কাজ ও তাঁতির কাজও ইহারা নিজেরাই করিয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন ধান্যাদি সংগ্রহের জন্য হলচালন ও গোচারণ, শাকসব্জী তরিতরকারী উৎপাদন, ফুল ও ফলের বাগান পরিষ্করণ ও রক্ষণাবেক্ষণ, গৃহনির্ম্মাণ ও ভগ্নগৃহাদির পুনঃসংস্করণ ইত্যাদি সমস্ত কার্য্য ইহারা নিজেরাই পূর্ণ উদ্যম ও আনন্দের সহিত সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করে। ইহার উপর অধ্যয়ন ও অধ্যাপন, নিষ্ঠার সহিত ব্রহ্মচর্য্য ব্রত পরিপালন, অতিথিসৎকার এবং রোগীর শুশ্রূষা চিকিৎসা প্রভৃতি কর্ত্তব্য রহিয়াছে। সহজ হউক, কি কঠিন হউক, কোন কার্য্যের জন্যই ইহাদের চাকরমজুরের প্রয়োজন নাই, কোন কাজের জন্যই ইহারা পরমুখাপেক্ষী হইতে প্রস্তুত নহে। ইহাদের অদ্ভুত কর্ত্তব্যজ্ঞান দেখিলে চমৎকৃত হইতে হয়। কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার জন্য ডাকিবার, খুঁজিবার, তাড়াহুড়া করিবার কেহ ন'ই, কেহ তাহার অপেক্ষাও রাখে না, যে যাহার নির্দ্দিষ্ট কার্য্যে যথাসময়ে লাগিয়া যায়। বিচারবিতণ্ডাশূন্য গভীর মনোযোগের সহিত নিঃশব্দে যে যাহার কার্য্যে ব্রতী হয়। কোন সময়ে কচিৎ কোন কার্য্যে কাহারো অবহেলা হইলে তজ্জন্য নিজেরাই নিজেদের শাস্তি মাথা পাতিয়া গ্রহণ করে। সুখদুঃখে জয়পরাজয়ে সর্ব্বাবস্থায় সকল সময়ে কায়মনোবাক্যে সত্যের গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিয়া চলা ইহাদের অভ্যাস, প্রাণব্যত্যয়েও সে অভ্যাস অতিক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা নাই, সঙ্কল্পের এমনি দৃঢ়তা।

সন্ধ্যারতি ও কীর্ত্তনের পর দৈহিক শক্তি পরিচালনার অপূর্ব্ব ব্যবস্থা। মণ্ডলাকারে বালকগণ হরিবোল হরিবোল রবে আনন্দে করতাল দিয়া নাচিতে থাকে, মধ্যস্থলে আদিষ্ট বালকগণ দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়, তাহাদের বিপুল উৎসাহ এবং অক্লান্ত চেষ্টার আনন্দময় দৃশ্য দর্শনে প্রাণ বিমোহিত হয়, তারকব্রহ্মহারনামের অদ্ভুত শক্তিসঞ্চার অপূর্ব্ব কৌশলে বিহিত দেখিয়া অবাক্ হইতে হয়। মধ্যাহ্নে পাঠচ্ছেদের অবসরসময়ে শিক্ষাক্ষেত্রের ছায়াস্নিগ্ধ প্রাঙ্গণে ক্রীড়ারত বালকগণের প্রাণোন্মাদী সঙ্গীত, সেই ধন্য হরি ধন্য হরি রব অমৃতধারায় দিগ্দিগন্ত প্লাবিত করিয়া সপ্তমসুরে ধ্বনিত হয়, বুঝিবা পাষাণও

তাহাতে বিগলিত হয়, পাষণ্ডেরও হৃদয় কৃতজ্ঞতায় ভরিয়া উঠে।

মঠের বাৎসরিক উৎসবাদি ভিন্ন শুদ্ধ স্বাবলম্বন শিক্ষার উদ্দেশ্যে বালকগণ নির্দ্দিষ্ট অবকাশ কালে স্বতন্ত্রভাবে উৎসব আমোদ প্রমোদাদি করিবার সুযোগ পায়। এই সকল ব্যাপারে পূজার ফর্দ্দ করা ও আহার্য্য দ্রব্যের তায়দাদ ধরা, অস্থায়ী গৃহনির্ম্মাণ করা, প্রতিমা গঠন করা, উৎসবের আঙ্গিনা সংস্কার ও হাটবাজার করা এবং সংযম উপবাস ও পৌরাহিত্য সমস্ত কার্য্য বালকেরা নিজেরাই করে। এক কথায় খেলাচ্ছলেও বালকেরা কামার, কুমার, সুতার, মালী, পুরোহিত ও যজমান-সকলের কর্ত্তব্যই নিজেরা হাতে কলমে সহজভাবে শিক্ষা করে আর বিমল আনন্দে ভরপুর হইয়া উঠে।

এখানকার শিক্ষাদান ও শিক্ষাগ্রহণ উভয়েই যেন নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের মত সহজ, যেন আয়াসের লেশমাত্র নাই, একটুমাত্রও জবরদস্তি নাই। জীবনের একটা সত্য আদর্শ ইহাদের মনে মনে এমন সুস্পষ্ট মূর্ত্তিতে অধিষ্ঠিত রহিয়াছে যে কর্ত্তব্যমাত্রই ইহাদের কাছে অন্তরের অবগুণ্ঠনবতী প্রেরণার মত অনুভূত হয়, তীব্র কঠোরতায় উহা প্রাণের মধ্যে বিদ্রোহ উপস্থিত করে না। এখানকার শিক্ষা ও শাসন, আদেশ ও প্রতিপালন, শিক্ষকের দিক্ দিয়া যেমন অন্তরের গভীর অনুভূতি হইতে নির্গত হয়, শিক্ষিতের কাছেও তেমন নিজেরই বিচারবুদ্ধির ফল বলিয়া মনে হয়। নিরর্থক আড়ম্বর ও কপট গাম্ভীর্য্যের বাহ্যচটক এখানে ফাঁপিয়া উঠে নাই, অন্তরে, বাহিরে নিরঞ্জন সত্যের মহিমা সহজ ও সরলভাবে এখানে ফুটিয়া উঠিয়াছে—এখানকার শিক্ষা অনাকাঙ্ক্ষিতের রাহাজানি নয়, ইহা প্রাণ হইতে প্রাণের সঞ্জীবন, ইহা অন্তর্নিহিত শাশ্বত সত্যের স্বাভাবিক বিকাশ।

সাত হইতে দশ বৎসর মধ্যে বালকের বয়স হইলে ঋষি-বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিতে পারে। প্রবিষ্ট হইবার পর হইতে শিক্ষার শেষ পর্য্যন্ত কোন কারণেই বালক বিদ্যালয়ের সংস্রব ত্যাগ করিতে পারে না। এই বিদ্যালয়ে দুই শ্রেণীর ছাত্র আছে। এক শ্রেণীর ছাত্রের ব্যয়ভার মঠ হইতে বহন করা হয়। ইহারা জীবনের জন্যই মঠে আসিয়াছে, গৃহে ফিরিয়া যাইবার সঙ্কল্প ইহাদের নাই। আর এক শ্রেণীর ছাত্রের ব্যয় জনপ্রতি মাসিক দশটাকা হিসাবে অভিভাবকগণ দিয়া থাকেন, ইহারা শিক্ষা পরিসমাপ্তির পরে গৃহে ফিরিয়া যাইবে।

কোকিলামুখে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা হইবার পরে শ্রীমৎ নিগমানন্দদেব বঙ্গদেশের প্রতি মনোনিবেশ করিলেন। বঙ্গদেশের পাঁচটী বিভাগের জন্য পাঁচটী শাখা আশ্রম ও সঙ্গে ঋষিবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিতে ইচ্ছুক হইলেন কিছুকাল মধ্যেই তাঁহার শুভ ইচ্ছা পূর্ণ হইবার পথে আসিয়াছে। চট্টগ্রাম বিভাগে ত্রিপুরা জেলার ময়নামতী, ঢাকা বিভাগে ঢাকা জেলার ভাওয়াল পরগণার কালনা, রাজসাহী বিভাগে বগুড়া, প্রেসিডেন্সী বিভাগে চব্বিশপরগণার হালিসহর এবং বর্দ্ধমান বিভাগে মেদিনীপুর জেলার খড়কুসুমা এই পাঁচটী স্থানে পাঁচটী বিভাগীয় আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কোকিলমুখ মঠ হইতে প্রেরিত শিক্ষকগণ দ্বারা এই সকল আশ্রমে যথাসম্ভব শীঘ্র ঋষি-বিদ্যালয় খোলা হইবে। ভবিষ্যতে প্রতি জেলায় ও প্রতি মহকুমায় ঐরূপ শাখা

আশ্রম ও ঋষিবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিবার সঙ্কল্পও মঠের রহিয়াছে।

এই সকল শাখা আশ্রম ভিন্ন সারস্বত মঠের অধীনে আসামের ভজুপাথার সেবাশ্রম, গারোহিল যোগাশ্রম, কাশীধামে মাতৃমন্দির ও নিগমানন্দগম্ভীরা এবং পুরীধামে সারস্বত কুটীর প্রভৃতি শাখা আশ্রম রহিয়াছে। শ্রীমৎ নিগমানন্দদেব সমস্ত উত্তরপূর্ব্ব ভারতবর্ষ আপনার কর্ম্মক্ষেত্র করিয়া ফেলিয়াছেন। জগতের শুভদিন আসিয়াছে। বঙ্গবাসি! উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত।

আমি শিক্ষাবিভাগেই কার্য্য করিয়া আসিতেছি। অনেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান দেখিয়াছি এবং কাগজে পড়িয়াছি। গত গ্রীষ্মের বন্ধে সারস্বত মঠ দেখিয়া যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি, এই প্রবন্ধে তাহারই কিঞ্চিৎ ব্যক্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছি মাত্র। দেশবাসীকে সারস্বত মঠ এবং তাহার কার্য্যপ্রণালী দেখিবার জন্য অনুরোধ করিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিলাম।*

* পাকুটীয়া হাইস্কুলের গণিত-শিক্ষক শ্রীযুক্ত যোগেশ্বর গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের লিখিত।

প্রেমের রূপ ও শক্তি

অজ্ঞানই মোহ। অজ্ঞানান্ধ হইয়া সংস্কারবশে জগতে আমরা কত কাজই করিয়া যাইতেছি। কেন করিতেছি, তাহা জানি না। জানি না বলিয়াই কর্ম্ম আমাদের পক্ষে বন্ধনস্বরূপ। না জানিলে যদি বন্ধনে জড়িত হইতে হয়, তবে মুক্তির একমাত্র উপায়ই হইল জানা— ইহা ধ্রুব এবং স্বতঃসিদ্ধ।

না জাগিলে যেমন মানুষ "আমি ঘুমাইয়াছি" এরূপ অনুভব করিতে পারে না, মোহ বা অজ্ঞানকেও তেমনি জ্ঞান না হইলে চিনিতে পারা যায় না।

পরিদৃশ্যমান জগৎকে আমরা দুইটী ভাগে বিভক্ত করিতে পারি। এক আমি অর্থাৎ আত্মা—অপর আমি ছাড়া সব, অথবা অনাত্মা। এই ভেদকল্পনাই হইল অজ্ঞান। এই ভেদকল্পনা যেখানে দূরীভূত হইয়াছে— বিশ্বময় আমি ব্যাপ্ত ইহা অনুভূত হইয়াছে, সেখানেই জ্ঞানের বিকাশ।

আমি বিরাট্, মহান্—ক্ষুদ্র ও সঙ্কীর্ণ সকলই আমাতে লয় পাইয়াছে—এইরূপ অনুভব করার নাম হইল জ্ঞান। আর জগতের প্রতি অণুপরমাণুতে তিনি আছেন, এইরূপ অনুভব করার নাম প্রেম। এই দুই উপায়েই ভেদজ্ঞান অর্থাৎ মোহ দূর হইতে পারে।

প্রেম দ্বারা সমগ্র জগৎ ব্যাপ্ত। এ বিশ্বের প্রতি অণু পরমাণুতে প্রেমময় আনন্দরূপে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া রহিয়াছেন। তাই ভালবাসা

সকলের স্বভাব। যে ক্ষুদ্র, সে ক্ষুদ্রকে ভালবাসে—যে বৃহৎ, সে বৃহৎকে ভালবাসে। যে যাহার সমধর্ম্মী, তাহার সহিতই তাহার প্রাণের ঐক্য ঘটে।

যাহার সহিত মন মিলিবে, শুধু তাহাকেই ভালবাসিব—ইহাই তো সঙ্কীর্ণতা। যথার্থ ভালবাসার এমন একটি উদার ভাব রহিয়াছে, যে ভাব সর্ব্বব্যাপী—যে ভাবে অনুষিক্ত হইলে ক্ষুদ্র-বৃহত্তের বিভিন্নতা প্রেমকে সঙ্কুচিত করিতে পারে না। সচরাচর দেখি, যাহার সঙ্গে যাহার দেহের, মনের, প্রাণের যতটুকু সাম্য থাকে, ততটুকু লইয়াই সে তাহার ভালবাসার জন। কিন্তু বিশেষ একটী অবস্থা কিম্বা বিশেষ একটী কারণ লইয়া যে ভালবাসা, সে তো কখনও স্থায়ী নয়—কেননা অবস্থার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে তজ্জনিত আনুষঙ্গিক ভাবেরও পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী। এইরূপ ভালবাসার নামই মোহ। আর, বিশেষ কোন কারণ না লইয়া অহেতুক যে ভালবাসা, তাহাই হইল উদার প্রেম। এই প্রেমে চিত্তের একবার বিকাশ ঘটিলে ক্ষুদ্র আধারের মাঝে তখন আর নিজকে ধরিয়া রাখা যায় না। ক্ষুদ্র আমিত্ব তখন শুধু একের মাঝে আবদ্ধ না থাকিয়া অনেকের মাঝে ছড়াইয়া পড়ে। চক্ষু মেলিলে যেমন দৃশ্য বস্তুর সমস্তকেই নির্ব্বাধরূপে দেখিতে পাওয়া যায়; তেমনি প্রেমে মোহের বিনাশ হইলে জগতের সকলের উপরে প্রেমিকের উদার দৃষ্টি সমানভাবে ছড়াইয়া পড়ে। দর্শন স্পর্শন প্রভৃতি ইন্দ্রিয় ব্যাপার যেমন সহজ, প্রেমও তেমনি সহজরূপেই ফুটিয়া উঠে।

লৌকিক মমতার মূলেও সেই অলৌকিক প্রেম; কিন্তু তাহাকে ধরা চাই—বুঝা চাই। যেমন ধর, সন্তানবাৎসল্য। সন্তানের প্রতি মায়ের যে ভালবাসা, তাহাও সেই প্রেম হইতেই জাত বটে, কিন্তু বিচার করিলে বুঝিব, তাহা এতই সঙ্কীর্ণ যে, শুধু দৈহিক একটা আকর্ষণমাত্রেই তাহার উৎপত্তি ও পর্য্যবসান। সন্তান জন্মিলেই জননীর অন্তরে মাতৃত্বের বিকাশ হয়, প্রেম জাগে। কিন্তু যে সন্তানকে আশ্রয় করিয়া এই প্রেমের উৎপত্তি হইল, তাহাকে ছাড়িয়া অন্যত্রও যে সেই প্রেম ছড়াইয়া পড়িতে পারে, এটুকু তখন মায়ের মনে স্থান পায় না কেন? তাহার কারণ, মা তখন এ ভালবাসার কারণ অনুসন্ধান করেন না। কারণ অনুসন্ধান করিলে দেহজ ও জৈব আকর্ষণের মোহ কাটিয়া যায়—মায়ের চিত্ত খুলিয়া যায়। তখন সেই ভালবাসা সর্ব্বত্র সমানভাবে ছড়াইয়া পড়ে—জননী তখন জগজ্জননী। ভালবাসার উৎপত্তি হইল ক্ষুদ্র আধারে বটে, কিন্তু মোহের অন্ধকার কাটিয়া যাওয়ায় ক্ষুদ্র তখন বৃহত্তের মাঝে আপনাকে সম্পৃটিত অনুভব করিয়া প্রকৃত তৃপ্তি ও নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ লাভ করিল।

এমনি লীলা সর্ব্বত্রই। মানুষের ক্ষুদ্র আধারে যতটুকু ভালবাসা তিনি দিয়াছেন, ততটুকু লইয়াই সে মজিয়া থাকে; তাই ভালবাসিয়া মানুষ দুঃখ পায়, কখনও সুখ পায়;—কিন্তু প্রকৃত আনন্দ, যাহাতে সুখ-দুঃখের ভেদ থাকে না, তাহা সে পায় না। এই আধার-আধেয়ের অসামঞ্জস্যই মোহ। আধারের গণ্ডী যদি ভাঙ্গিয়া দেওয়া যায়, তবে ওই সঙ্কীর্ণ ভালবাসাই সার্ব্বজনীন ভালবাসায় পরিণত হয়। আধেয় বস্তু তো একই—কিন্তু আধারের বিভিন্নতা লইয়াই

আমাদের মাঝে যত গোল। কাজেই প্রেম লাভ করিতে হইলে আধারের সঙ্কীর্ণতা হইতেই আমাদের চিত্তকে আগে মুক্ত করিতে হইবে। সর্ব্বাবগাহী উদার আকাশের ন্যায়, জগতের যেখানে যত অভাব রহিয়াছে, তাহা পূর্ণ করিয়া প্রেম নিত্য বিরাজিত—আধেয়ের সঙ্কোচ দূর হইলে ইহা আমরা প্রত্যক্ষ অনুভব করিতে পারিব এবং এই অনুভূতিতেই জীবন ধন্য হইবে।

প্রেমের অর্থই হইল—আমিত্বের প্রসার করা—ব্যষ্টি হইতে সমষ্টির দিকে অগ্রসর হওয়া। নিজকে আমরা সকলেই ভালবাসি। শুধু নিজকে যতক্ষণ ভালবাসি, ততক্ষণ আমার আমিত্ব আমাতেই আবদ্ধ থাকে;—তারপর আবার অপর একজনকে ভালবাসিলে আমার আমিত্ব আরও কিছুদূর ব্যাপ্ত হয়—আমার চিত্ত তখন একজনকে ছাড়িয়া দুইজনের মাঝে ছড়াইয়া পড়ে। এমনি করিয়া ভালবাসা ক্রমশঃ যতই অনেকের মাঝে ব্যাপ্ত হয়, ততই আমিত্বের প্রসার ঘটে—চিত্ত সঙ্কীর্ণতা হইতে ঔদার্য্যে পরিণতি লাভ করে;—অবশেষে ক্ষুদ্র আমিত্ব বিশ্বজনীন আমিত্বে মিলাইয়া যায়—চিত্তের মলিনতা দূর হইয়া যায়—তখন নিজের প্রাণ দিয়া সকলের প্রাণ বুঝা যায়।

মানুষের শক্তি ক্ষুদ্র ও সঙ্কীর্ণ; বাহিরের কোন একটা নিমিত্ত লইয়া তাহার স্ফুরণ। এই ক্ষুদ্র শক্তিকেই জগদ্ব্যাপ্ত করা যায়—যদি বাহিরের নিমিত্তের বন্ধনকে আমরা শিথিল করি। প্রথম চেষ্টায় হয়ত বিরাট ধারণা হইল না, তখন কোন নিমিত্তকে অবলম্বন করিয়াই শক্তিবিকাশের চেষ্টা করিলাম। কিন্তু সে সময়েও মনে যেন এই লক্ষ্য সুদৃঢ় থাকে যে, আমি নিমিত্তের অতীত হইব। এইরূপ লক্ষ্য ও চেষ্টা লইয়া শক্তির অনুশীলন করিতে করিতে শেষে এমনি হইবে—তখন পূর্ব্বতন নিমিত্তকেই রসের আশ্রয়রূপে জগন্ময় ব্যাপ্ত দেখিতে পাইব। হয়ত যাঁহাকে অবলম্বন করিয়া আমার নির্ম্মোহ ভালবাসার উৎপত্তি হইয়াছিল—জগতের প্রতি বস্তুর মাঝে তখন তাঁহাকেই প্রত্যক্ষ করিব। একজনকে যদি প্রকৃত আপনার বলিয়া হৃদয়ে ধরিতে পারি—তবে দেখিব, জগতের সকলেই আমার আপনার। এইরূপেই ক্ষুদ্র শক্তি বৃহৎ হয়—ক্ষুদ্র মানবহৃদয়ে বিশ্বাত্মবোধ জাগে।

জ্ঞানে হউক, প্রেমে হউক, সকল জায়গাতেই চরম লক্ষ্য হইল—নিজকে হারাইতে হইবে। আমার 'আমি'কে মহান্ বলিয়া জানিতে পারিলে নিজের প্রতি যেমন আর দৃষ্টি থাকে না, বিশিষ্ট আকর্ষণ থাকে না;—তেমনি অণু হইতে অণু হইয়া সকলের মাঝে আমি গূঢ়রূপে প্রবিষ্ট রহিয়াছি, এইরূপ অনুভব করিতে পারিলেও আর আত্ম পর বলিয়া জ্ঞান থাকে না। আত্মহারা হইতে হইবে—একদিকে সবই আমি, আবার অপরদিকে আমি কিছুই নয়—সাধনায় এইরূপ অনুভব করিতে হইবে—তবেই মানুষের মুক্তি।

সমালোচন

এদেশে দেখি, যখনই কোনও একটা আন্দোলন বেশ পাকা হয়ে ওঠে, তখনি সাম্প্রদায়িক ভাব এসে নেতার ব্যক্তিগত চরিত্রের মাঝে কোথায় কি খুঁত আছে তাই বের করবার জন্য উঠে পড়ে লেগে যায়। এমনি করে কুঁড়িতেই কত ফুল পোকায় কাটে। স্বামী বিবেকানন্দ যে সমস্ত নির্ভীক সত্য ও স্বাস্থ্যকর নীতি প্রচার করতে চেয়েছিলেন, তাঁর খাওয়া-শোওয়ার বিচারগুলিকে বড় করে ধরে এদেশের লোক সেগুলিকে অর্থাৎ তাঁর শিক্ষাকে দূরে ঠেলে রেখেছে। কাশীর স্বামী কৃষ্ণানন্দকেও তেমনি একটা অপ্রিয় ব্যাপার নিয়ে হৈ চৈ করে লোকের চোখে খাটো করবার চেষ্টা করা হয়েছে, যদিও সবাই জানে, যে দোষ তাঁর ঘাড়ে চাপান হয়েছে, সে দোষে তিনি দোষী নন।

এদেশের সাধারণ ধর্ম্ম সম্প্রদায় ও ধর্ম্ম-মহোৎসব সাম্মিলনীগুলিকেও তেমনি একঘরে করবার চেষ্টা হচ্ছে। কেন?—না, যারা ও পথের প্রথিক বা নেতা, তাদের ব্যক্তিগত চরিত্রে নাকি কি কি খুঁত আছে! গাধার পিঠ থেকে পড়ে গেলাম বলে গাধাওয়ালার পিঠে লাঠি ভাঙ্গা—এ এক অদ্ভুত যুক্তি বটে।

সেদিন রাম দেখেন এক গয়লার ছেলে এক বাড়ীতে বোতলে করে দুধ নিয়ে যাচ্ছে। দৈবাৎ তার হাত থেকে একটা বোতল ফসকে পড়ে ভেঙ্গে গেল। অমনি সে রেগে মেগে বাকী বোতল কটাও রাস্তায় ছুঁড়ে দিল আর কি!

মানুষের পরস্পরের সঙ্গে ব্যবহারটাও ঠিক এই রকম। যদি বা কোনও বন্ধুর স্বভাবে বিশেষ একটা খুঁত চোখে পড়ল, অমনি তার সদ্গুণগুলোকে পর্য্যন্ত মন থেকে ঝেড়ে ফেলবার জন্য আমাদের যেন খুন চেপে যায়।

উদকবিজ্ঞানে সমষ্টি চাপ আর গড়ে-চাপ পড়ার কথা পড়েছিলাম। যে কোনও বস্তুর উপর সমষ্টি চাপের পরিমাণ অনন্ত হতে পারে, অথচ কাটাকুটি করে গড়ে তার ওপর মোটেই কোনও চাপ না পড়তেও পারে। এই ভারতবর্ষেও এত শক্তির ক্রিয়া চলছে, কিন্তু গড়ে গিয়ে কিছুই দাঁড়াচ্ছে না—কেননা সব শক্তিই পরস্পর বিরোধী। পরস্পর ঠেলাঠেলি করতে থাকলে আর এগুবে কে? এ কথা ভাবলে দুঃখ হয় না কি? এর কারণই বা কি? এর কারণ আর কিছুই না—কেবল এক সম্প্রদায় প্রাণপণে চেষ্টা করে, কি করে তার প্রতিবেশীর একটা গলদ বের করবে। এতে আর মিলবার কোনও পথ থাকে না। আর এই যে পরদোষাবিষ্করণে অখণ্ড মনোযোগ, যার ভিত্তি হচ্ছে সংশয়—সেটা প্রতিকূল শক্তিরূপে ক্রিয়া ক'রে অশান্তির নিমিত্তগুলি টেনে বের করে। এই যে বলে, চোর চোর বলতে সাধুও চোর হয়—এ একেবারে খাঁটি কথা।

কিন্তু সকলের সঙ্গে সমভূমিতে দাঁড়াবার কোনও সুযোগও কি আমরা পেতে পারি না? আমাদের প্রতিবেশীদের মাঝে কি প্রশংসাযোগ্য কিছুই নাই? ভারতের বিভিন্ন

সম্প্রদায়ের মাঝে কি একতার কোনও বন্ধনই নাই? শুদ্ধাচারের দোহাই দিয়ে আমরা যে আপন গরজে ভগবানের গোয়েন্দা বিভাগের টিকটিকি সেজে লোকের ঘরের খুঁতই কেবল খুঁজে বেড়াই—এ কোন অধিকারের বলে? যার অন্দরের ব্যবহারকে আমরা মন্দ সাব্যস্ত করছি, তার সদরের ব্যবহারে যে দেশের কতটা উপকার হচ্ছে, তা একবার হিসাব করে দেখবার অবসর হয় না কি? মানুষ ঘরে বসে কি করে না করে, তা সেই জানে, আর জানেন তার অন্তর্যামী। আমরা কে, যে তার হাঁড়িতে কাঠি দিতে যাই? যে শক্তিটুকুর অপব্যয় করে পরের দোষ খুঁজে বেড়াই, সেইটুকু দিয়ে নিজের আদর্শ নির্মল রেখে চলতে শেখাটাই বেশী প্রয়োজন নয় কি? বাইরে থেকে চাপ দিলেই কি মানুষের নীতিজ্ঞান একরত্তিও বাড়বে মনে করেছ? না, কেউ যদি গতানুগতিক ভাবে কেবল রফা করে, পরের মুখের দুটা ভাল কথার কাঙ্গাল হয়ে চলে, তবে তার চলাকেই ভাল বলবে তুমি? ওকে তো শুদ্ধাচার বলব না, ওকে বলব দুর্বলতা।

কাঁটা আছে বলে কেউ গোলাপকে অনাদর করে না। ময়রা হয়ত নিজে ভুষী খেয়ে থাকে, তা বলে তার তৈরী মিঠাইমণ্ডা তুমি খাবে না নাকি? মানুষের মাঝে যা ঢোকে, তাতে সে অশুচি হয় না, যা তার ভিতর থেকে বেরিয়ে আসে, তাতেই সে অপবিত্র। স্বামী বিবেকানন্দ এ খেতেন, ও খেতেন—আচ্ছা, খেতেনই বা, তার হয়েছে কি? যতক্ষণ পর্য্যন্ত তাঁর ভিতর থেকে সৎকথা, সাধুকথা বেরিয়ে আসছে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত তাঁর ভিতর কি ঢুকছে, তার খবরদারী আমরা করব না। মানুষের শিক্ষা বা উপদেশ গ্রহণ করব শিক্ষার গুণ বুঝে, শিক্ষকের স্বভাবের তুলনায় তো তার ভালমন্দের বিচার হবে না। জ্যামিতির সত্যের সঙ্গে ইউক্লিডের স্বভাবের কি সম্পর্ক রয়েছে? চিত্রকর কুৎসিৎ বলে কি তার আঁকা সুন্দর ছবিখানার দিকে চেয়ে দেখব না? সার্ ফ্রান্সিস্ বেকন ঘুষখোর ছিলেন, তা বলে কি তাঁর ন্যায়শাস্ত্র পড়ব না? এই বিংশ শতাব্দীতে আর চোখ বুজে থাকা চলে না, এখন ভালমন্দের বিবেকজ্ঞান নিয়ে চলতে হবে, প্রচারের সঙ্গে প্রচারককে ঘুলিয়ে দিলে চলবে না। পুকুরের পাঁকে জন্মেছে বলে কি পদ্ম দেবপূজায় লাগছে না?

ভারতবর্ষের দারিদ্র্যের একটা কারণ হচ্ছে, আবর্জ্জনা দিয়েও যে কত কাজ হতে পারে, তার হিসাব না করা। মরা গরুর হাড় আমরা ছোঁব না, রাবিশ বলে সব তাতেই নাকে কাপড় দিয়ে পাশ কাটিয়ে যাব—কেবল নাকসিঁটকানো আধ্যাত্মিকতার গুমোর করব। অথচ এই সব জঞ্জাল-আবর্জ্জনাগুলো কাজে খাটিয়ে ইউরোপ আর আমেরিকা ধনী হচ্ছে। পচা সার থেকে কি ফুলের বাগান ফুলে সুন্দর হয় না? ওই যে কালো কয়লা আর তার বিশ্রী ধোঁয়া, তা থেকে যে শক্তির আবির্ভাব হয়, তা দিয়ে ইউরোপ আমেরিকায় কত লোহার কারখানা চলছে, কে তার হিসাব রাখে!

শ্রীরামচন্দ্র বড় কিসে? না তিনি বনের বানর দিয়ে সেনাদল গড়েছিলেন। সাধু আর শান্তশিষ্ট লোকের সঙ্গে বনিবনাও করে কে না থাকতে পারে, বল! কিন্তু বড় বলব তাঁকে, যাঁর উদার সহানুভূতি আর মাতৃকল্প

হৃদয়ের উদার আবেষ্টনের মাঝে পাপী-তাপীর পর্য্যন্ত স্থান হয়েছে।

ভ্রান্ত নীতিবাদী পরের দোষ দেখলে মূর্চ্ছা যান, তাই প্রতিবেশীর ব্যক্তিগত আচার-বিচারের বিরুদ্ধে "যুদ্ধং দেহি" বলে তিনি আসরে নেমে পড়েন। কিন্তু তার এ চেষ্টা যেন স্রোতের উপর থেকে ফেনা সরিয়ে দেওয়ার মত; আসল ব্যাপারটার কাছেও সে ঘেঁষতে পারে না—নদীর তলাটা যে অসমান, আর তাইতে যে স্রোত আটকে ফেনা হচ্ছে, সেটা তার খেয়ালে আসে না।

তুমি কে বাপু, যে কোমর বেঁধে পতিত উদ্ধার করতে ছুটেছ? নিজকে উদ্ধার করেছ কি তুমি? জান, জান্ বাঁচাতে হলে জান্ দিতে হয়? সবহারার দলে গিয়ে ভিড়তে পারবে কি?—তাহলে ওঠো, জগৎকে মুক্তি দেবার অধিকার তোমার হয়েছে।

বুদ্ধদেব পতিতার ঘরে আতিথ্য গ্রহণ করেছিলেন। যে মহাপুরুষ বলেছিলেন, "প্রথম ঢেলা ছুঁড়বে কে?"—তিনি মেরী মড্‌লেনের সঙ্গ করতে কুণ্ঠা বোধ করেননি, অথচ এই মেরীকে অনিন্দিতা বলা চলত না। হায়রে ভুয়ো মানের বড়াই। যে দেশে কেবল একজন আর একজনের দোষই খুঁজে বেড়াচ্ছে, সেখানে প্রেমের মিলন হবে কোথা থেকে? জীবনকে সার্থক করবার একমাত্র সংকেতই হচ্ছে, হৃদয়কে মাতৃহৃদয়ের মত প্রশস্ত করা—ছেলে ছোটই হোক আর বড়ই হোক, মায়ের কাছে সবাই সুন্দর। ভগবানের দৃষ্টি নিয়ে জগতের দিকে তাকানো—এই হল যথার্থ শিক্ষা।

প্রত্যেককেই জীবনের সবগুলি স্তর পার হয়ে ত হবে। যেমন এই স্থূল দেহের শৈশব, কৈশোর যৌবন ইত্যাদি স্তর রয়েছে, তেমনি নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জীবনেও শৈশব কৈশোর রয়েছে, তারও প্রয়োজন আছে—এমন কি তা না হলে চলে না। যাদের বল পাপী, আমার কাছে তারা অধ্যাত্ম জগতের শিশু—শিশুর মাঝে কি তার একটা নিজস্ব সৌন্দর্য্য নাই? যাদের তোমরা বলছ পতিত,—আমি বলি তারা ওঠেই নি এখনো, পড়বে কি করে? তারা ইস্কুলে নূতন ভর্ত্তি হয়েছে মাত্র—যেমন তোমরাও একদিন হয়েছিলে।

কেউ কেউ বিশ্বপ্রেম নিয়ে খুব চলায় অথচ তাদের দৃষ্টি থাকে লোকের খুঁতগুলোর ওপর। এই অসামঞ্জস্যের সমর্থন করতে তারা বলে, পাপকে ঘৃণা করেও পাপীকে ভালবাসা যায়। তাই, যতক্ষণ পর্য্যন্ত একটা কিছু কুৎসিৎ বলে মনে হবে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত কিছুতেই তো তাকে ভালবাসতে পারবে না। ভালবাসাই মানে সুন্দর দেখা।

অন্ধকারের সঙ্গে লড়াই করলে তা টেঁকে না। আঁধার ঘরে গিয়ে চারদিক থেকে ঢিল ছোঁড়, লাঠি দিয়ে যত খুসী ঠেঙাও, কাচ ভাঙ, টেবিল ওলটাও, কালীর দোয়াত ফেল, প্রাণ ভয়ে অন্ধকারের বাপান্ত কর, কিন্তু অন্ধকার ঘুচবে কি? আলো আন—আঁধার কোথাও থাকবে না। তেমনি কেবল খুঁত ধরে, গাল দিয়ে, সমালোচনা করে তুমি কাউকে শোধরাতে পারবে না। শুধু না না করলে চলে না, হাঁ ও করতে হয়। আশায়, আনন্দে, উৎসাহে, প্রেমে পূর্ণ হয়ে সংশোধনের ভার নিতে হবে। নর্দ্দামার সকল কাদা যদি রাস্তার ওঠান হয়, তাকে কাদার উদ্ধার বলবে কি?—কখনই না। তেমনি কেবল অপরের দোষ ধরতে পারলেই সব হয় না। শান্তি

ও প্রেমের স্রোত বয়ে যাক, দেখবে সকল কাদা ধুয়ে গেছে। একবার আকবর বাদশা একটা রেখা টেনে বীরবলকে বললেন—"এই রেখাটাকে খাটো করে দিতে হবে, কিন্তু তার কোনও প্রান্ত মুছতে পারবে না।" বীরবল অমনি তার সমান্তরালে বাদশার চেয়েও আর একটা বড় রেখা টানলেন, বাদশার রেখা আপনিই ছোট হয়ে গেল। তাই তো হয়। বড় রেখা টানাই হচ্ছে বুদ্ধিমানের কাজ। বাইরে থেকে মানুষকে তুমি যে অনুভূতি দিতে চাও, সেটা তার ভিতর থেকে যদি জাগিয়ে দিতে পার, তবে তাই হলো আসল সমালোচনা—যেমন বীরবল ভিতরে ভিতরে বাদশাকে বুঝিয়ে দিলেন যে তাঁর রেখাটা ছোট। যত খুঁতখুঁতির আসল কথাটা হচ্ছে, "পদ্মটা কেন বট গাছ হলো না।" আমরা দুটার মাঝেই সৌন্দর্য্য দেখতে শিখব। মন্দের পিছনে ঘেউ ঘেউ করো না—ততক্ষণ বসে ভালর গুণগান কর। জীবনের আঙুর নিঙড়ে আনন্দ মদিরা পান করতে হবে আমাদের।

ভাই সমালোচক, তোমাকে আমি ভালবাসি; কিন্তু তুমি যার সমালোচনা করছ, তাকেও আমি তেমনি ভালবাসি, তেমনি শ্রদ্ধা করি।*

---

* স্বামী রামতীর্থ

শ্রীনন্দ

—*—

নামের সম্মোহনী শক্তি কিছু আছেই। নটরাজের নাম শুনিয়া অবধি নন্দ যেন কেমন হইয়া গেলেন—তাঁহার ইচ্ছা হইতে লাগিল এখনি ছুটিয়া চিদম্বরমে চলিয়া যান। তখন রাত্রি গভীর হইয়া আসিয়াছে, সঙ্গীরা বলিল, "এত রাত্রে কি আর চিদাম্বরমে গিয়া মন্দিরের দ্বার খোলা পাইবে? তা ছাড়া, তোমার মনিব রহিয়াছেন, যাইতে হইলে তাঁহার নিকট হইতে ছুটী না লইয়া কি করিয়া যাইবে?"

সঙ্গীদের কথা নন্দের নিকট যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে হইল। অবশ্য চিদম্বরমে পৌঁছিতে যে অনেক রাত্রি হইয়া যাইবে, মন্দিরের দুয়ার বন্ধ হইয়া যাইবে, এ কথা শুনিয়া নন্দ বিচলিত হইলেন না। তাঁহার মন যে এখানে মোটেই তিষ্টিতে চাহিতেছে না—তিনি যে এখনি ছুটিয়া যাইতে পারিলে বাঁচেন। না হয় একটা রাত মন্দিরের প্রাঙ্গণেই প্রিয়তমের ধ্যানে কাটিয়া যাইবে—প্রভাত হইলে তো তাঁহার বাঞ্ছিতের দেখা মিলিবে। কিন্তু আসল বাধা হইতেছে, দাসত্বের বন্ধন। যাইব বলিলেই তো তিনি যাইতে পারেন না—তিনি যে পরের দাস।

ভক্তির সঙ্গে চিত্তে শক্তি জাগে, কিন্তু সে শক্তি উচ্ছৃঙ্খলতা নয়, ঔদ্ধত্য নয়। শক্তির

অভিমান থাকিলেই উচ্ছৃঙ্খলতায় তাহা প্রকাশ পায়। আবার ক্ষুদ্র আধারে যদি বৃহৎ বস্তুর সমাবেশ হয়, তবেই অভিমানের সৃষ্টি হয়। সচরাচর দেখিতে পাই, ভালর দোহাই দিয়া মন্দ করিতে মানুষ কসুর করে না—ভজনের অধিকার মিলিলেই যেন মানুষ অবিনয়ের পরোয়ানা পাইয়া বসে। যেহেতু আমি ভগবানের ভজনা করিব, অতএব আর সকলে তফাৎ যাও, নহিলে বিপদ্ আছে—এমন একটা আত্মম্ভরিতার ভাব অনেকের মাঝেই প্রকাশ পায়। ভজনের প্রতিকূলতাকে ইহারা ঠেলাইয়া-গুঁতাইয়া দূর করিতে চায়। কিন্তু চিত্তে যদি খাঁটী ভাব জাগে, তবে উহা ননীর মত নরম হইয়া যাইবে। যাঁহাকে ভজিব, তাঁহাকে না বুঝিলে, তাঁহাতে মন না মজিলে কি ভজনা করা চলে? বৃহৎ বস্তুকে ভজনা করিবার আনন্দও এত বৃহৎ যে জগতের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাধা তাহার কাছে দাঁড়াইতেই পারে না—আনন্দের, ভাবের আবেগে তাহারা সত্যকার কোনও বাধা বলিয়া মনে হয় না। মন তন্ময় হইলে মনে হয়, সবই তো তিনি—তাঁহার কাছে যাইবার পথে যে বাধা, তাহাও তো তিনিই রাখিয়া দিয়াছেন; বাধা দিয়া কর্ত্তব্যের পথকে তিনি আরও বন্ধুর করিয়া তুলিয়াছেন, কিন্তু তা বলিয়া মনের আড়াল তো হইয়া যান নাই। সংসার আমার মাথার উপরে, আত্মজনের গ্লানি, লোকের নিন্দা আমার অঙ্গের ভূষণ—কিন্তু এতগুলি জঞ্জাল জমিয়াছে বলিয়া ঝগড়া করিব কাহার সঙ্গে? ঝগড়া করিতে হইলে, জঞ্জাল জমাইয়া যে অমন আড়াল হইয়া রহিয়াছে, তাহার সঙ্গেই তো করিব! সে যে সহজে পাওয়ার ধন নয়, তাই তো তাহার প্রেম এত মধুর—মিলনের চেয়ে বিরহে আরও মধু।

নন্দ দৈন্যের অবতার। তাঁর আমিকে তিনি অমন নিষ্কিঞ্চন করিয়া ফেলিয়াছেন বলিয়াই এত বড় একটা বৃহৎ বস্তুর আকর্ষণ তাঁহার মাঝে অমন প্রবল হইয়া দেখা দিয়াছে, অথচ ঔদ্ধত্যে অবিনয়ে কোথাও তাহার মর্য্যাদা লঙ্ঘিত হয় নাই। নন্দ ভাবিলেন, "ঠিক তো। প্রভু আমাকে যে অবস্থায় রাখিয়াছেন, সেই অবস্থার মান রাখিয়া তো আমার চলিতে হইবে। আমার স্বেচ্ছায় আমি ব্রাহ্মণের দাস হই নাই, ব্রাহ্মণের স্বেচ্ছাতেও তিনি আমার প্রভু হন নাই—সুতরাং ভগবানের দোহাই দিয়া প্রভু ভৃত্য সম্বন্ধের অমর্য্যাদা করিব কি করিয়া? আমি বেড়া ভাঙ্গিয়া পলাইতে চাই না—আমি চাই ডিঙ্গাইয়া যাইতে। আমার প্রভুকে প্রসন্ন করিয়া, তাঁহার নিকট হইতে ছুটি লইয়া তবেই আমার নটরাজ দর্শনে যাওয়া উচিত।" এই ভাবিয়া নন্দ আপাততঃ চিদাম্বরম্ যাওয়া স্থগিত রাখিলেন।

কিন্তু নন্দের মন পড়িয়া রহিল সেই চিদাম্বরমে। মনিবের কাছে কথাটা বলি বলি করিয়াও তিনি বলিবার সুযোগ পাইতেছেন না। প্রতিদিনই ভাবেন, আজ বলিয়া কহিয়া ঠিক করিয়া রাখিব, কাল যাত্রা করিব। কিন্তু প্রতিদিনই অভাবনীয়রূপে এমন একটা কাজ আসিয়া পড়ে যে আর কিছু বলা হয় না। এমন করিয়া বহুদিন কাটিয়া গেল, পিপাসিত নন্দের প্রাণের পিপাসা মিটিল না। সঙ্গীদের নিকট প্রতিদিনই বলেন, কাল চিদাম্বরম্ যাইব, অথচ যাইতে পারেন না—তাই পরিহাস করিয়া

তাহারা [তাহার] নাম রাখিল—তিরুনপাই-পোয়ান, অর্থাৎ কালকার যাত্রী।

এদিকে পারিয়া সমাজে নন্দকে লইয়া বড় গোল বাধিল। পারিয়ারা ভক্তির ধার ধারে না, দেবতার চেয়ে তাহাদের কাছে উপদেবতার মান বেশী। যার যেমন শ্রদ্ধা, সে তার দেবতাকে তেমনই মনে করে। কুসংস্কার ও কদাচারে আচ্ছন্ন পারিয়া ভগবানের সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্যের আস্বাদ পাইবে কোথায়? উপদেবতার ক্রোধশান্তিই তাহাদের একমাত্র পূজাবিধি; সে উপদেবতার আকৃতি-প্রকৃতি যেমন ভীষণরূপে কল্পিত হইয়াছে, তাহার পূজার ব্যবস্থাও তেমনি ভীষণ ও নিষ্ঠুর-রুধির-কর্দ্দম ছাড়া তাহাদের দেবতা তুষ্ট হইবার নয়। নিষ্ঠুর ভাবে জীবহত্যা করিয়া, রক্তরঞ্জিত দেহে বিকট চীৎকার ও উল্লম্ফন, কর্ণবধিরকারী বাদ্যরোল, উন্মত্ত আস্ফালন—এ ছাড়া কি দেবতার পূজা হইতে পারে?

এ হেন সমাজে নন্দের মাঝে যখন ভাবান্তর উপস্থিত হইল, তখন পারিয়া সমাজপতিরা চিন্তিত হইয়া পড়িল।—নন্দ আর আগের সে নন্দ নাই। ছোটবেলা হইতেই সে একটু ব্রাহ্মণ ঘেঁষা ছিল বটে, কিন্তু ইদানীন্তন যেন তাহার একটু বাড়াবাড়ি দেখা যাইতেছে। সামাজিক উৎসবে তো সে যোগ দেয়ই না, অধিকন্তু দেবতার বিধিবিহিত পূজারও প্রতিবন্ধকতা করিতে ত্রুটী করে না। সে গাঁয়ে ছাই মাখিয়া "হর হর" বলিয়া গালবাদ্য করে, কখনও হাসে, কখনও কাঁদে, ব্রাহ্মণের ঠাকুর দেখিবার জন্য ব্রাহ্মণপাড়ায় ছুটিয়া যায়। তারপর আজকাল সে বাড়ীতে বড় একটা থাকে না, প্রায়ই গাছতলায় বসিয়া চোখ বুজিয়া থাকে, কখনও বা মূর্চ্ছিত অবস্থায় সঙ্গীরা তাহাকে কুড়াইয়া আনে। আবার তাহার সঙ্গে আরও কতকগুলি পারিয়া ছেলে জুটিয়া ছেলেটার মাথা খারাপ করিয়া তুলিয়াছে। নন্দের রোগ ইহাদের মাঝেও সংক্রামিত হইবার উপক্রম হইয়াছে। অবস্থা যখন এইরূপ সঙ্কটাপন্ন, তখন কি সমাজপতিদের আর চুপ করিয়া বসিয়া থাকা উচিত? নিশ্চয়ই নন্দ দেবতাদের কাছে কি অপরাধ করিয়াছে, তাই তাঁহারা তাহার কাঁধে চাপিয়াছেন। শীঘ্রই ইহার একটা প্রতীকার না করিলে আর চলিতেছে না।

সমাজপতিরা উদ্বিগ্ন চিত্তে এইরূপ কল্পনা জল্পনা করিতেছে—এমন সময় একদিন নন্দকে একটা গাছতলায় মূর্চ্ছিত অবস্থায় পাওয়া গেল। সবাই ভাবিল, আর দেরী করিলে চলিবে না। শীঘ্রই পূজা দিয়া দেবতাদের শান্ত করিতে হইবে। তাহারা নন্দকে এ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি হাসিয়াই তাহাদের কথা উড়াইয়া দিলেন, বলিলেন "আমার আবার কি হইয়াছে? আজ আমার প্রাণের দেবতার সন্ধান পাইয়াছি, তাহাকে ভজনা করিব না?" নন্দের তাচ্ছীল্য ভাবে সকলের জেদ আরও বাড়িয়া গেল। নিশ্চয়ই নন্দের ঘাড়ে কিছু চাপিয়াছে। তাহার কথাই তো তার প্রমাণ। অতএব রোগী যদি ঔষধ না খাইতে চায়, তবে উত্তম বৈদ্যের মত তাহার বুকে হাঁটু দিয়াও ঔষধ গিলাইয়া দিতে হইবে।

মহাসমারোহে নন্দের ভূত ছাড়াইবার আয়োজন হইতে লাগিল। বিরণ, ইরুলন, কাট্টেরি, বেরিয়ন, নন্দী, চামুণ্ডী, নল্লকরুপণ, পেট্টান্নন, পবড়াই—আরও কত এমনি অদ্ভুত নামের ও তদপেক্ষা অদ্ভুতাকারের দেবতাদের মূর্ত্তি গড়া হইল—অসংখ্য ছাগল, ভেড়া, মুরগী

যোগাড় করা হইল। তারপর পূজার দিন সকাল বেলায় গ্রাম শুদ্ধ সকলে আসিয়া পূজা-মণ্ডপে সমবেত হইল। সকলে নন্দকে ধরা-ধরি করিয়া মাঝখানে আনিয়া জোর করিয়া তাঁহাকে ধরিয়া রাখিল। তারপর যথারীতি বলিদান, তাণ্ডব নৃত্য ও উৎকট বাদ্যভাণ্ড সহকারে দেবতাদের পূজা শেষ হইলে পুরোহিতের উপর দেবতার আবেশ হইল। আবিষ্ট পুরোহিত বলিল, হাটের পথে তেঁতুল গাছে যে ভূত রহিয়াছে, সে নন্দকে পাইয়া বসিয়াছে, তাই নন্দ পাগলের মত ব্যবহার করে। অতএব ভূতশান্তির জন্য আরও বিরাটভাবে আয়োজন করিতে হইবে। সকলে একবাক্যে উচ্চৈঃস্বরে পুরোহিতের কথা সমর্থন করিল।

তারপর অবিরাম বিকট চীৎকার, নৃত্য-গীত ও প্রাণিহত্যা চলিতে লাগিল। নন্দ আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তাঁহাকে উপলক্ষ্য করিয়া একি ভূতের কীর্ত্তন আরম্ভ হইয়া গিয়াছে? প্রেমময় নটরাজকে তিনি ভালবাসিয়াছেন, সেই অপরাধে ইহারা এতগুলি জীবের প্রাণনাশ করিবে? নন্দ কাতর কণ্ঠে তাহাদিগকে প্রাণিহত্যা হইতে বিরত হইতে বলিতে লাগিলেন—ভূতপ্রেত পিশাচের পূজা ছাড়িয়া নটরাজকে ভজনা করিতে অনুনয় করিতে লাগিলেন, কিন্তু সেই উন্মত্ত কোলাহলের মাঝে তাঁহার ক্ষীণকণ্ঠের চীৎকার কোথায় মিলাইয়া গেল। বরং নন্দের আর্ত্তি দেখিয়া, ঔষধ ধরিয়াছে মনে করিয়া সকলে আরও উৎসাহের সহিত দেবতার প্রসাদনে মাতিয়া গেল। অবশেষে আর থাকিতে না পারিয়া নন্দ সেখান হইতে ছুটিয়া পলাইলেন। তখন পূজারীরা পূজায় নিজেরাই এত মত্ত হইয়া পড়িয়াছে যে, আর কাহারও দিকে তাকাইবার তাহাদের অবসর নাই। কাজেই নন্দ পলাইয়া বাঁচিলেন, আর এদিকে তাঁহার ভূতশান্তির উৎসব পূর্ণমাত্রায় চলিতে লাগিল।

সমাজের কথা ভাবিয়া নন্দ মর্ম্মাহত হইয়া পড়িলেন। কাতর প্রাণে বলিতে লাগিলেন, "হে নটরাজ, তোমাকে না বুঝিয়া ইহারা মোহে মজিয়া রহিয়াছে, প্রভু তুমি কৃপা করিয়া ইহাদিগকে উদ্ধার কর—তোমার সেবায় যে কি মাধুর্য্য, তাহা ইহাদের বুঝাইয়া দাও।" বলিতে বলিতে তাঁহার চক্ষু অশ্রুভারাক্রান্ত হইয়া আসিল, উচ্ছ্বাসে কণ্ঠরোধ হইয়া গেল, যত জন্মের সঞ্চিত আবেগরাশি যেন বুক ঠেলিয়া উঠিতে লাগিল। নন্দ ভাবিলেন, "আর নয়। আজ কাল করিয়া কতদিন পার হইয়া গেল, তবুও আমার নটরাজের কাছে আমি যাইতে পারিলাম না! আজ তো সমাজের দৈন্য-দুর্দ্দশার চরম প্রত্যক্ষ করিলাম।" এমন সমাজে জন্মিয়া যখন আমার তাঁহার প্রতি মতি জন্মিয়াছে, তখন তাঁহার আহ্বানকে উপেক্ষা করা আমার উচিত হয় না। ক'দিনের জন্য জীবন? আজ যখন মনে আবেগ আসিয়াছে, তখন এই আবেগের মুখেই যাহা করিবার তাহা করিয়া ফেলি। কাল যদি এই উৎসাহটুকু প্রাণে না আসে?"

এই ভাবিয়া নন্দ ধীরে ধীরে তাহার ব্রাহ্মণ প্রভুর নিকট উপস্থিত হইলেন। ব্রাহ্মণ শুনিয়াছিলেন, তাঁহার পারিয়া নফর নাকি বড় ভক্ত হইয়াছে। কিন্তু নন্দের কাজে-কর্ম্মে এতদিন কোনও ত্রুটী পান নাই বলিয়া তিনি এ সম্বন্ধে বিশেষ কোনও কৌতূহল প্রকাশ বা অনুসন্ধান করেন নাই। আজ নন্দ যখন দীপ্ত মুখে আনত নয়নে

তাঁহার সম্মুখে আসিয়া করযোড়ে দাঁড়াইলেন, তখন তিনি একটু বিস্মিত ও একটু চকিত হইলেন। সেই কুৎসিত পারিয়া নন্দের চোখে-মুখে যে এমন অপূর্ব্ব শ্রী ফুটিয়া উঠিবে, তাহা তিনি কল্পনাও করিতে পারেন নাই। দেখিয়া ব্রাহ্মণ মুগ্ধ হইলেন বটে, কিন্তু মুহূর্ত্তের মধ্যেই তাঁহার আভিজাত্যের অভিমান আসিয়া প্রাণকে আবার কঠিন করিয়া তুলিল। তিনি গম্ভীর স্বরে নন্দকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "নন্দ, তুমি কি চাও?"

নন্দ করুণ কণ্ঠে জলভরা চোখে বলিলেন, "প্রভু, আমাকে ছুটী দিন!"

"কিসের ছুটী?"

"আমি চিদাম্বরমে যাইব!"

ব্রাহ্মণ উচ্চ হাস্য করিয়া বলিলেন, "সে কি! তুমি চিদাম্বরমে যাইবে? কালে কালে এ সব হইতে চলিল কি? হাঁরে নন্দ, তুই চিদাম্বরমে গাইয়া কি করিবি?"

"প্রভু, চিদাম্বরমে যাইয়া একবার নটরাজ মহাদেবকে দর্শন করিয়া আসিব!"

ব্রাহ্মণ হাসিয়া লুটাইয়া পড়িলেন, বলিলেন, "দেখিতেছি, কে তোর মাথা খারাপ করিয়া দিয়াছে। এই সেদিন তিরুপুঙ্কুরের শিবালয়ে যাইয়া চলাইয়া আসিয়াছিস, একবার আমাকে জিজ্ঞাসাও করিস নাই—সেই হইতে তোর বুঝি বড় বাড়াবাড়ি সুরু হইয়াছে! আরে অভাগা, যজ্ঞের ঘি কি কুকুরের ভোগে লাগে? তোর কর্ম্ম হইতেছে লাঙ্গলের খুঁটা ধরা। তোর মতিচ্ছন্ন ঘটিয়াছে, তাই বামুনের ঠাকুর-দেবতা ঘাঁটাইতে চাহিতেছিস্। যা, মাঠের কাজে যা। ফের যদি অমন বায়না ধরিবি, তাহা হইলে মজা টের পাইবি।"

ব্রাহ্মণের কথা শুনিয়া নন্দের বুক ভাঙ্গিয়া গেল। অবশ্য তিনি যে সহজেই অনুমতি পাইবেন, এমন আশা কখনও করেন নাই, তবুও প্রত্যাশিত অমঙ্গল ব্যাপারও যখন সম্মুখে আসিয়া পড়ে, তখন তাহার আঘাত সহ্য করা কঠিন হইয়া পড়ে। নন্দের তখন প্রাণ যায় যায়। বাধা পাইয়া তাঁহার চিত্ত আরও দুর্দ্দম হইয়া উঠিল। "হে নটরাজ, এ কি পরীক্ষায় তুমি ফেলিলে? অনুরাগের অমৃত-আস্বাদ একবার যদি দিয়াছিলে প্রভু, তবে আবার কেন তাহাতে অমন করিয়া বাদ সাধিতেছ? আমি কি তোমার পরীক্ষার যোগ্য? আমার কি বিদ্যা আছে, না বুদ্ধি আছে, না কুলের গৌরব আছে? তোমাকে পাইবার কোনও যোগ্যতাই তো আমার নাই—আছে কেবল তোমার কৃপার ভরসা! আমি তো তোমাকে ধরিতে যাই নাই—তুমি না আপনা হইতে আমাকে ধরা দিতে আসিয়াছিলে। তবে আজ আবার খেলা সাঙ্গ না হইতে কোথায় লুকাইলে প্রভু!—আর আমার সহ্য হয় না—প্রাণ যায় প্রভু—একবার দেখা দাও—শুধু দূর হইতে, একবার চাহিয়া দেখিব—শুধু একটী বারের দেখা—আর কিছু না—"

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং
কলিকাতা।

আরণ্যক

"যজ্ঞেন বাচঃ পদবীয়মায়ন্ তামন্ববিন্দন্ ঋষিষু প্রবিষ্টাম্॥"

—ঋগ্বেদ সংহিতা ১০।৭১।৩

যাহারা কর্ম্মী, তাহাদেরও অবসাদ আসে। কাজ করিতে করিতে হঠাৎ একদিন আর কাজ করিতে মন সরে না, সকল উৎসাহ আনন্দ যেন কোথায় উড়িয়া যায়। এই অবসাদের মূলেও আছে অভিমান, কি কামনা। মতলব লইয়া কাজ করিতে গেলেই বিপদ। স্বভাবে চায় একটা, তুমি চাও আর একটা; এমন অবস্থায় অশান্তির সৃষ্টি না হইয়া যায় না। যদি বিপক্ষের বাধা প্রবল হয়, তবেই আর কাজ কর্ম্মের উৎসাহ থাকে না—এমন কি সে বাধা ভালর জন্য, কি মন্দের জন্য, তাহাও বিচার করিবার প্রবৃত্তি থাকে না। মনের মাঝে তখন কেবল ধোঁয়া—ধোঁয়াতে চোখ আঁধা হইয়া গেলে আর পথ দেখাইবে কে? কাজেই কাজই বা করিবে কে? এমনি করিয়া মতলববাজীতে কাজ পণ্ড হইয়া যায়। আবার অভিমানেও সব নষ্ট হইতে পারে। হয়ত তোমার মাঝে নিজের মতলব কিছুই নাই, অপরের মতলব লইয়াই কাজ করিতেছ; কিন্তু কাজ করিতে করিতে কাজের ভূত তোমার ঘাড়ে চাপিয়া বসিল, রোখ হইয়া গেল, এইটা এইরূপ হওয়াই চাই। কাজের ফল তুমি চাও না—এই অভিমানটুকু হয়ত মনে আছে, কাজেই জেদের মাত্রাটা একটু বেশীই হইল। এদিকে কাজের ফল না চাহিলেও তার বাহাদুরীটুকু কিন্তু ষোল আনাই চাও। যদি এমন সময় দৈবগতিকে কাজটা তোমার নির্দ্দেশমত না হইয়া উঠে, তবে তোমার বাহাদুরীটুকুও তলাইয়া যাইবার সম্ভাবনা। এমন অবস্থাতে মানুষ আর চোখে-মুখে পথ দেখিতে পায় না। কাজের বাধায় অভিমানে বাধা পড়ে। অভিমানই কাজ করাইয়া আসিতেছিল, তাহাকে আঘাত করিলে আর কাজ হইবে কোথা হইতে?—কাজেই তখন কর্ম্মীরও অবসাদ আসে। অতএব বলি, সাধু সাবধান—অসক্ত থাকিয়া "সততং কার্য্যং কর্ম্ম সমাচর" কেননা, "কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে।"

ভোর বেলা চুপ করিয়া থাকিও, সন্ধ্যাবেলায় চুপ করিয়া থাকিও—সারারাত্রি নিঃস্তব্ধ হইয়া থাকিও—কিন্তু দিনের আলোতে যেন চুপ করিয়া বসিয়া থাকিও না। আকাশে আলোর প্রথম স্পন্দনের সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত প্রকৃতি স্পন্দিত হইয়া উঠে—সেই স্পন্দনে একটা দিন আবর্ত্তিত হয়। তোমার মাঝে একটু স্বাতন্ত্র্য থাকিলেও তুমি তো প্রকৃতি ছাড়া নও। তাই সমস্তটা দিন কর্ম্মের ছন্দে তোমাকে স্পন্দিত হইতে হইবে। দিনে বিশ্রামের সময় নাই, আরামের সময় নাই—সবিতৃদেবের অনন্ত ভাণ্ডার হইতে অফুরন্ত শক্তির স্রোত, আনন্দের স্রোত, জ্যোতিঃর স্রোত জগৎকে প্লাবিত করিয়া

চলিয়াছে—সেই তেজ, সেই শক্তি, সেই আনন্দ অঞ্জলি অঞ্জলি পান করিয়া বীর্য্যশালী হও, বলিষ্ঠ হও, নিরলস কর্ম্মী হও। কর্ম্মী হও, কিন্তু মুখর হইও না—তাহা হইলে, দিনের তাৎপর্য্য ধরিতে পারিবে না, শক্তির ধারণা হইবে না। এই যে আলোক আসিয়া চোখে পড়িতেছে, গায়ে পড়িতেছে, কোন জড়বুদ্ধির জড় দৃষ্টি দিয়া ইহাকে জড় বলিয়া উপেক্ষা করিবে? এই তো ব্রহ্মতেজ—সাক্ষাৎ প্রাণস্বরূপ, বীর্য্যস্বরূপ। দেহের প্রতি লোমকূপ দিয়া এই আনন্দময় তেজ শোষণ করিয়া লওসৌরকম্পারণে নিখিল বিশ্বে যেমন কর্ম্মের চেতনা জাগিয়াছে—তোমার মাঝেও তেমনি চৈতন্যের স্ফুরণ করিতে হইবে। অতএব—উদীধ্বং—জীব অসুর্ন আগাৎ—অপ প্রাগাৎ তমঃ—ওঠ, ঊর্দ্ধমুখে নিজকে প্রেরণ কর—ওই যে আমাদের জীবন্ত কর্ম্মপ্রণোদক দেবতা আসিয়াছেন—অন্ধকার কোথায় পলাইয়া গিয়াছে!

—*—

নিজের ভাবনা নিয়া থাকিও না—জগতের কথাও একটু ভাবিও। অনেকে মনে করে, জগতের উপকার একটা কর্ত্তব্য হইলেও তাহার জন্য প্রচুর আয়োজনের প্রয়োজন, সে আয়োজন যখন তাহাদের নাই, কাজেই জগৎ সম্বন্ধে ভাবনা-চিন্তার প্রয়োজনও নাই। কিন্তু জগতের উপকার বাস্তবিক কে কতটুকু করিতে পারে, তাহার হিসাব না-ই লইলাম! জগৎ সম্বন্ধে ভাবনা-চিন্তায় জগতের কোনও উপকার হউক না হউক, যে ভাবে, তাহার যে উপকার হয়, এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। তুমি সাক্ষাৎভাবে কাহারও কিছু করিতে পার না, কিন্তু সকলের কল্যাণ-কামনা করিতে তো তোমার কোন বাধা নাই। যে অপরের কল্যাণ কামনা করে, সে-ও সে কল্যাণের ভাগী হয়, কেননা নিজে কল্যাণময় না হইয়া অপরের কল্যাণ কামনা করা সম্ভবপর হয় না। সুতরাং কল্যাণ কামনা যে করে, তাহার লাভ আছেই। যাহার কল্যাণ কামনা করা হয়, তাহারও উহাতেই উপকার হয়। বিশ্বনাথ নিয়ত এই জগতের কল্যাণ কামনা করিতেছেন, কল্যাণের দিকে আমাদিগকে আকর্ষণ করিতেছেন, সুতরাং আমাদের কল্যাণ অবশ্যম্ভাবী। আমরা সকলেই কল্যাণময় হইব, এই তাঁহার অভিপ্রায়। যদি অপরের কল্যাণ কামনা করিয়া নিজেরও কল্যাণ প্রকাশিত করি, তবে বিশ্বনাথের অভিপ্রায়ও প্রকাশিত হইবে। এই তো জগতের সত্য উপকার—নিত্য উপকার।

—*—

শ্রীগুরুর স্বরূপ কি, তাহা জানিতে পারি নাই, তাই বলি, তাঁহাকে ধারণা করিব কি করিয়া? অন্বয়মুখে তাঁহাকে ধরিতে না পারিলেও ব্যতিরেকমুখে তাঁহার মহিমা তো বুঝিতে পারি। তাঁহাকে না বুঝিলেও আমাকে আমি বুঝি। যেখানে আমার যত ন্যূনতা দেখিব, সেখানেই তাঁহার পূর্ণতার মনন করিব। আমি যদি ক্ষুদ্র, তবে তিনি বিরাট্। এই ভাবের অন্যথা হইতে পারে না, কেননা তাঁহার সহিত আমার যে বৈষম্য, তাহাই তো আমাকে তাঁহার স্বরূপ ধারণা করিতে দেয় না। সুতরাং আমা হইবে বিপরীত ভাবনা করিয়া আমিত্বের নিরসন করিব ও তাঁহার প্রতিষ্ঠা করিব। অতি অধমেরও উপায় আছে; অধম বলিয়া

নিজকে যে বুঝিতে পারিয়াছে, উত্তমের ধারণা, উত্তমের সাধনা তাহার পক্ষে অসম্ভব নয়।

—০—

তাঁর দান যেটুকু পাইয়াছ, তাঁর এই অতি প্রিয় জগতের সেবায় তাহা নিঃশেষে উৎসর্গ করিয়া দিবে। এই সেবক ভাব লাভের যোগ্যতা অর্জন করিতে হইবে। অনেক মিথ্যা সংস্কার আসিয়া এ পথে বাধা দিবে—তোমার অজ্ঞাতে মান সম্ভ্রমের সুখস্পৃহাও হয়ত তোমার অন্তরে উদ্রিক্ত হইয়া তোমাকে চালিত করিতে চেষ্টা করিবে। কিন্তু সাবধান! নিজের উপরে তীক্ষ্ণ লক্ষ্য রাখিবে। কোনরূপ অভিমান আসিয়া চিত্তকে যেন দোষদুষ্ট করিয়া না তোলে।

এই ভাব গাঢ় করিবার জন্য প্রথম অবস্থায় সমাজের দূষিত আবহাওয়ার স্পর্শ হইতে দূরে সরিয়া স্বভাবসুন্দর নির্জ্জন স্থানে বা স্বধর্ম্মীদের আশ্রয়ে কিছুকাল অবস্থান করিও। স্বপ্রেপবের মত খানিকটা নিজের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়া—নিজকে সমাহিত করিয়া আত্মশক্তির সার মর্ম্ম খুঁজিও। অর্থাৎ কাজের পিছনে মূল যে ভাব রহিয়াছে, তাহারই একটি জাগ্রত অনুভূতি হৃদয়ে আবাহন করিও। এই সাধনার ফলে তোমার অন্তরের ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনীটী যেদিন বিশ্বমহাপারাবারের সঙ্গে যুক্ত হইবে, সেদিনই নিজকে নিঃশেষে দান করিয়া জগতের কল্যাণে নিয়োজিত করিবার সামর্থ্য জন্মিবে—যথার্থ সেবকজীবন লাভ হইবে।

অন্নবস্ত্র দিয়া সেবা—সেবার বহিরঙ্গ। এই সেবা দ্বারা কোনদিন মানুষের অভাব মিটিবে না—যথার্থ তৃপ্তি লাভ হইবে না। নিজকে যতই ব্যাপক হইতে ব্যাপকতরভাবে উপলব্ধি করিতে শিখিবে, ততই তোমার সেবার পরিসর ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে। তখন তোমার সেবা মানুষের এই বস্তুজগতের অভাব মিটাইতে যাইবে না বা গেলেও সেখানেই পর্য্যবসিত হইবে না। সেবা তখন অন্ধকার জীবনকে চির জ্যোতির্ম্ময় পথে চলিতে সাহায্য করিবে, দীনতা ঘুচাইয়া মানবের অন্তরে বিশ্বরাজের আসন জাগাইয়া দিবে—তিনি আর "আমি"র মাঝে যে ভেদের যবনিকা পড়িয়াছে, তাহাই অপসারিত করিয়া সত্যের সন্ধান দিবে।

এই তো সেবা—ইহাই জগতে যথার্থ কল্যাণ বহন করিয়া আনে। সবার সেরা সেবক হইয়াছেন ভগবান স্বয়ং, এই ভগবানে তুমিও যখন আত্মসম্পূর্তি লাভ করিবে, তোমার সেবা তখনই চরম স্ফূর্ত্তি পাইবে।

সম্বাদ ও মন্তব্য

আশ্রম-সম্বাদ

আশ্রমাধিষ্ঠাতা শ্রীমৎ পরমহংসদেব ফাল্গুনের শেষে উত্তরবঙ্গ পরিভ্রমণে বহির্গত হইবেন। চৈত্রের শেষভাগে তাঁহার কলিকাতা অঞ্চলে থাকিবার সম্ভাবনা।

গ্রাহকগণের প্রতি

ফাল্গুনের পত্রিকা চৈত্রের প্রথম সপ্তাহান্তে প্রকাশিত হইবে।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং

উ ৮৫ সং
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং

সুবর্ণ

(সনাতন ধর্ম্মের মুখপত্র)

১৬শ বর্ষ } ফাল্গুন { ১১শ সংখ্যা

শূর ইন্দ্রঃ

[ঋগ্বেদ সংহিতা—২।১১।১]

শ্রুধী হবমিন্দ্র মা রিষণ্যঃ
স্যাম তে দাবনে বসূনাম্।
ইমা হি ত্বামূর্জো বর্দ্ধয়ন্তি
বসূয়বঃ সিন্ধবো ন ক্ষরন্তঃ॥

সৃজো মহীরিন্দ্র যা অপিন্বঃ
পরিষ্ঠিতা অহিনা শূর পূর্ব্বীঃ।
অমর্ত্ত্যং চিদ্দাসং মন্যমানম্
অবাভিনদুক্থৈর্বাবৃধানঃ॥

উক্থেষ্বিন্নু শূর যেষু চাকন্
স্তোমেষ্বিন্দ্র রুদ্রিয়েষু চ।
তুভ্যেদেতা যা সুমন্দসানঃ
প্র বায়বে সিস্রতে ন শুভ্রাঃ॥

শুক্রং নু তে শুষ্মং বর্ধয়ন্তঃ
শুক্রং বজ্রং বাহ্বোর্দধানাঃ।
শুক্রস্ত্বমিন্দ্র বাবৃধানো অস্মে
দাসীর্বিশঃ সূর্য্যেণ সহ্যাঃ॥

শোন এ আহ্বান, ইন্দ্র—ভক্তে নাহি করো পরিভব,
তব ঋদ্ধি-দানে যেন হই ভাগী, হে দেব বাসব!—
বীর্য্যভরা হব্য এই—সিন্ধু হেন ক্ষরে তোমা পানে—
বাড়ায় তোমার তেজ, মহাসিদ্ধি দেয় যজমানে।

মহা সে সলিলরাশি—শৌর্য্যবলে বাড়ালে যাহারে;
অহির কবল হতে আজি মুক্ত করেছ তাহারে।
দস্যু সে যে—তবু চাহে অমৃতের পেতে অধিকার,
স্তুতিমন্ত্রে আপ্যায়িত তুমি, ইন্দ্র, নাশ দর্প তার।

ভক্তমুখে উক্থগাথা শুনিবারে চাহ নিতি নিতি;
শূর তুমি—রুদ্র-স্তোমে তাই তব বাড়ে বুঝি প্রীতি।
আনন্দের ছন্দে গাঁথা গাথা ইন্দ্রে করিবে তর্পণ—
বায়ুসম দেবতায় হর্ষভরে তাই আজি করিনু অর্পণ।

শোভমান বীর্য্য তব—তারে আজি বাড়ানু বিশেষ,
আরো শোভে বজ্র ওই—বাহুদ্বয়ে করিনু নিবেশ;
শোভমান ইন্দ্র তুমি—শৌর্য্য তব কর সুপ্রকাশ,
সূর্য্য সম দীপ্ত অস্ত্র দাসজনে করুক বিনাশ।

শ্রীনন্দ

—※—

প্রত্যাখ্যাত হইয়া নন্দ গৃহে ফিরিয়া আসিলেন, কিন্তু তবুও আশা করিতে ছাড়িলেন না। তাঁহার ভক্তি এখন এমন তন্ময়তা লাভ করিয়াছে যে তাঁহার অভীষ্ট দেবতার অভিপ্রায় হইতে পৃথক্ করিয়া কোনও ব্যাপারেরই তাৎপর্য্য গ্রহণ করা আর তাঁহার পক্ষে সম্ভব হয় না। এই যে ব্রাহ্মণের নিষ্ঠুর প্রত্যাখ্যান, ইহার মাঝেও তিনি তাঁহার প্রেমময়ের সঙ্কেত দেখিতে পাইলেন—দেখিয়া উদ্বুদ্ধ হইলেন। ব্রাহ্মণকে তিনি তাঁহার ভক্তিপথের কণ্টক বলিয়া মনে করিতে পারিলেন না, তিনি ভাবিলেন, "আমিই আমার পথের কাঁটা। চিত্ত শুদ্ধ না হইলে কেহ তাঁহার দর্শন পায় না। আমার কি চিত্ত এতই শুদ্ধ হইয়াছে যে আমি তাঁহাকে দেখিতে পাইব? যে চিত্ত অনুক্ষণ তাঁহাতেই না মজিয়া থাকে, তাহাকে শুদ্ধ বলিব কি করিয়া? মুহূর্ত্তের জন্যও যদি চিত্ত তাঁহার ধ্যান হইতে বিচ্যুত হইয়া সংসারের সম্পর্কে আসে, তবেই কলুষ-কালিমা তাহাকে কলঙ্কিত করিয়া ফেলে। মুহূর্ত্তের অপরাধের জন্য যে কত দীর্ঘকাল-ব্যাপী প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে, তাহা কে জানে? আমি তো জোর করিয়া বলিতে পারিব না যে আমি সম্পূর্ণভাবে পরিশুদ্ধ হইয়াছি; হইলে নিশ্চয়ই প্রভু আমাকে তাঁহার চরণতলে টানিয়া লইতেন। অতএব সকলই আমার দোষ, ব্রাহ্মণেরও নয়, দৈবেরও নয়। আবার প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া দেখি, তাঁহাকে পাইবার যোগ্য হইতে পারি কিনা।"

চিত্ত হইতে যখন কপটভাব দূর হইয়া যায়, তখন এমনি সরল ভাবে নিজের দোষ দেখিবার ক্ষমতা জন্মে। নন্দের কথাগুলি কেবল বাহ্য বিনয় নয়, উহা তাঁহার অন্তরের স্থির প্রতীত। বাস্তবিক যে ব্যাপার আমার সঙ্গে জড়িত, তাহার মাঝে কোনও ব্যতিক্রম ঘটিলে, তাহার জন্য আমাকে দায়ী না করিয়া আর কাহাকে করিব? হইতে পারে, উহাতে অপরেরও দোষের ভাগ রহিয়াছে, কিন্তু সে বিচার করিবার অধিকার আমার আছে কি? আমার আমিত্ব সেদিন সম্পূর্ণরূপে মুছিয়া যাইবে, অভিমানী অহংকে যেদিন ঠিক অপর দশজনের সামিল করিয়া নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে দেখিতে শিখিব, সেইদিনই আমার দোষের সঙ্গে পরের দোষের হিসাবটাও খতাইয়া দেখিবার অধিকার জন্মিবে। কিন্তু যতক্ষণ পর্য্যন্ত নিজের উপর মমতা রহিয়াছে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত দোষের ভাগ হইতে রেহাই দিয়া তাহাকে প্রশ্রয় দিলে চলিবে না।

কঠোর সংযমের সহিত কিছু দিন নিজকে পরিচালিত করিয়া নন্দ আবার ব্রাহ্মণের নিকট চিদাম্বরমে যাইবার অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। কিন্তু এবারও তাঁহাকে পূর্ব্বের মত গালি খাইয়া ফিরিতে হইল। বাধা পাইয়া নন্দের চেষ্টা ও ব্যাকুলতা আরও বাড়িয়া গেল। নিজকে যোগ্য করিবার জন্য কি করিবেন, তাহাই ভাবিয়া তাঁহার প্রাণ আকুলি-বিকুলি করিতে লাগিল। ইষ্ট-ভাবনা

হইতে যাহাতে মুহূর্ত্তের জন্যও তাঁহাকে বিরত না থাকিতে হয়, সেজন্য নিজের উপর অতি সতর্ক প্রহরা রাখিলেন। এইরূপ একাগ্র নিষ্ঠার ফলে তাঁহার চিত্ত লক্ষ্য বস্তুতে তন্ময়তা লাভ করিল। নন্দের চোখে সমস্ত জগৎ নটরাজের বাস্তবিলাসের রঙ্গভূমিরূপে ভাসিয়া উঠিল। মেঘের খেলায়, পবনদোলায়, নদীর ছন্দে পাখীর গানে—সব ঠাঁই তাঁর নটরাজ। কোথাও তাঁহার উৎক্ষিপ্ত দক্ষিণ চরণে সৃষ্টির প্রেরণা, কোথাও বা দৃঢ়বিন্যস্ত বাম চরণে প্রলয়ের সূচনা। সৃষ্টি ও প্রলয়ের আবর্ত্তনে যে গতির উদ্ভব হইয়াছে, নন্দ দেখিলেন, তাহাই বিশ্বস্থিতির প্রাণ। এই বিশ্বের সৃষ্টি নৃত্যে, স্থিতি নৃত্যে—নৃত্যে তাহার অবসান। নটরাজের নৃত্যাবেগের পুলকাবেগ সহ্য করিতে না পারিয়া অটল অচল পর্য্যন্ত তাহার প্রতি অণুতে অণুতে নিয়ত দুর্নিবার স্পন্দনে শিহরিয়া উঠিতেছে। মাটির বুকে সে স্পন্দন, স্রোতস্বিনীর জলোচ্ছাসে সে স্পন্দন—মানুষের হৃদয়ের তালে তালে প্রতি রক্তকণিকায় সে স্পন্দন—কত অগণিত চিন্তার অশরীরী বাণী লইয়া সে স্পন্দন শূন্য ব্যোমতলকে চকিত করিয়া তুলিয়াছে। নন্দ সব দেখিলেন—দেখিয়া পাগল হইলেন।

কিন্তু নন্দের ভাবগতিক দেখিয়া পাড়িয়া সমাজ শঙ্কিত হইয়া উঠিল। একবার তাঁহার পাগলামী সারাইবার জন্য তাহারা যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিল; তবে তাহার ফল কি হইয়াছিল, তাহা আমাদের অবিদিত নহে। কিন্তু তা বলিয়া কি সমাজ নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে? সদ্ভাবে যদি কাজ না হয়, তবে জবরদস্তি করিয়াই দেখিতে হইবে। তাই সকলে যুক্তি করিয়া নন্দকে পাগল বলিয়া বাঁধিয়া রাখিল।

কিন্তু নন্দের তাহাতে ভাবান্তর উপস্থিত হইল না। এবার তিনি রসের আস্বাদন পাইয়াছেন, এবার আর তাঁহাকে বঞ্চিত করে কে? বন্ধনদশায় নন্দ ভাবিতে লাগিলেন, "হে লীলাময়, আর কত দূর—আর কত দিন! জানি, তোমার সঙ্গ করিবার ভাগ্য সহজে মিলে না—কত জন্মের তপস্যায় সকল কলুষ ক্ষালন হ'লে, তবে লোকে তোমার আভাস জানিতে পারে। এ জগতে আমি তোমার হীনতম সেবক, হীনতম ভৃত্য—আমার পরীক্ষা যে কঠোর হইবে, তাহার আর বিচিত্র কি? তুমি মঙ্গলময়, আমার কিসে ভাল হইবে, তাহা আমার চেয়ে তুমি বেশী বোঝ। হিতাকাঙ্ক্ষী পিতা ছেলে বায়না ধরিলেই শোনেন না—প্রয়োজন হইলে তাড়না করিয়া তাহার চপলতা দূর করেন। ক্ষণিক ভাবের উচ্ছাসে আমি মাতিয়া গিয়াছিলাম, ভাবিয়াছিলাম কুসুমাস্তৃত পথে তোমার মন্দিরে যাত্রা করিব, কিন্তু দুঃখের কণ্টক পায়ে দলিয়া যে তোমার পথে চলিতে হয়, তাহা তো জানিতাম না। আঘাত করিয়া তুমি আমার আবদার ঘুচাইয়াছ, চোখের জলে মনের কলুষ ক্ষালন করিয়াছ—দুঃখের শ্রেষ্ঠ ও চরম শিক্ষায় আমাকে দীক্ষিত করিয়াছ।—হে প্রভু, হে প্রিয়তম, তোমার আমার নমস্কার।

"সংসার আমাকে বাঁধিয়াছে—তোমার নিকট হইতে আজ আমি বহুদূরে। কিন্তু তবুও আমার মন এ কোন্ নিগূঢ় আনন্দে পরিপ্লুত হইয়া উঠিতেছে। এত দূরে থাকিয়াও তো তোমাকে দূর বলিয়া মনে হইতেছে না—মনে হইতেছে, এই যে তুমি আমার

ক্রমিক সং
শ্রেণী সং

নিকটে—অতি নিকটে—আমার নির্য্যাতকের রূপে; বেদনার দাহে আমার প্রেমকে উদ্বুদ্ধ করিতে আসিয়াছ তুমি! হে প্রভু, আমি তোমার বিদ্রোহী সেবক, তোমার অভিপ্রায়ের কাছে আত্মসমর্পণ করিতে শিখি নাই, আমার প্রাণের উত্তেজনাকেই তোমার ইঙ্গিত বলিয়া নিজকে প্রবঞ্চিত করিয়াছি। নটরাজ, আমার সে মোহ আজ কাটিয়া গিয়াছে—স্পর্শে তোমাকে পাইয়াছি. ফুলের জন্ম আর আমি কাঙ্গাল নই। মাথা পাতিয়া দিলাম—দণ্ড, পুরস্কার, যাহা খুসী তুমি দাও—আমি আর একটা কথাও কহিব না—তোমার ইচ্ছার প্রতিকূলে একটা নিঃশ্বাসও আর বহিতে দিব না!—জয় শিব শম্ভো, জয় মম নর্ত্তনসুন্দর নটরাজ!"

নন্দ স্তব্ধ হইয়া রহিলেন। তাঁহার ক্ষুধা-তৃষ্ণার তাড়না নাই, চক্ষে নিদ্রা নাই, কণ্ঠে শব্দ নাই—তদগত প্রাণে কিসের ধ্যানে তিনি বিভোর। নিশ্চল প্রস্তরপ্রতিমার মত তিনি বসিয়া রহিয়াছেন—দিনরাত্র কোথায় দিয়া কাটিয়া যাইতেছে—কে আসিতেছে, কে যাইতেছে—কিছুর খবরই তিনি রাখেন না।

এদিকে ধান কাটার সময় আসিয়া পড়িয়াছে। নন্দকে বাঁধিয়া রাখার পক্ষে যাহারা বিশেষ উদ্যোগী ছিল, তাহারা সকলেই নন্দের সেই ব্রাহ্মণ প্রভুর চাকর। কাজে-কর্ম্মে নন্দের মত কেহ ছিল না, অথচ তাহারই মতিচ্ছন্ন ঘটিতে দেখিয়া কতকটা ঈর্ষ্যায়, কতকটা প্রতিহিংসাগ্রহণলালসায় তাহারা নন্দের প্রতিকূলতাচরণ করিতে অগ্রসর হইয়াছিল। কিন্তু তাহাদের চিকিৎসায় নন্দের রোগ তো সারিলই না, অধিকন্তু যে নন্দ আগে পাগলামীর মাঝেও নড়িয়া-চড়িয়া একটু আধটু কাজকর্ম করিয়া বেড়াইত, সে যে সহসা এমন জড়বৎ হইয়া গেল, তাহা দেখিয়া সকলেই ভয় পাইয়া গেল। এ দিকে ক্ষেতের ধান নষ্ট হইয়া যাইবার উপক্রম—নন্দ নহিলে তাহাদের কাজকর্ম চলিবে না। অথচ তাহারা যে নন্দের এমন দুর্দ্দশা করিয়াছে, এখন প্রভুর নিকট কি বলিয়া কৈফিয়ৎ দিবে?

ইতিমধ্যে ব্রাহ্মণ একদিন মাঠে গিয়া ক্ষেতের অবস্থা দেখিয়া আসিলেন। ফসল নষ্ট হইয়া যাইতেছে, অথচ চাকরেরা কেহ কাজ করিতেছে না দেখিয়া ব্রাহ্মণ সকলকে ডাকাইলেন। সকলেই আসিল, কেবল নন্দ আসিতে পারিলেন না, কেননা তখনও পারিয়ারা তাঁহাকে বাঁধিয়া রাখিয়াছে। ব্রাহ্মণ ক্রুদ্ধ হইয়া ধানকাটা না হওয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। সকলেই নন্দের কথা বলিল, নন্দকে লইয়া তাহারা ব্যস্ত ছিল, কাজেই এ দিকে সময়মত আসিতে পারে নাই। ব্রাহ্মণ তখন অধিকতর ক্রুদ্ধ হইয়া সকলকে বিদায় দিয়া নন্দকেই বিশেষ করিয়া ডাকিয়া পাঠাইলেন। পারিয়ারা তাড়াতাড়ি গিয়া নন্দের বন্ধন মোচন করিয়া দিল।

নন্দ ব্রাহ্মণের আহ্বান শুনিয়া ধীরে ধীরে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া নতমস্তকে করযোড়ে সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। ব্রাহ্মণ পূর্ব্বে নন্দের ভক্তিবিনম্র মুখশ্রী দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন, এবার তাঁহার অপূর্ব্ব শ্রী দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। এ নন্দ তো আর সেই পারিয়া নন্দ নয়—এ যেন ভস্মাচ্ছাদিত আগুনের মত, অথবা যেন কোন্ দেবতা যেন

লোকে নামিয়া আসিয়াছে! মানুষের মুখে যে অমন আকর্ষণী শক্তি থাকিতে পারে, যাহাতে একবার মুখপানে তাকাইলে আর চোখ ফিরাইতে পারা যায় না, তাহা ব্রাহ্মণ এই প্রথম দেখিলেন। বুঝিলেন, তাঁহার নন্দ যে এতদিন ধরিয়া পাগলামী করিয়াছে, তাহা সে স্ববশে থাকিয়া করে নাই, ভাণ করিয়া করে নাই—নিশ্চয়ই তাহার উপর কোনও দেবতার আবেশ হইয়াছে। তাই নন্দকে দেখিয়া তাঁহার ক্রোধ দূর হইয়া গেল, তিনি ধীরে ধীরে স্নেহকোমল কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, "নন্দ, কেমন আছিস্? তুই নাকি পাগল হইয়া গিয়াছিলি?"

নন্দ ইহার আর কি উত্তর দিবেন? তিনি পাগল নয় তো কি? জগৎশুদ্ধ লোক এক ভাবে চলে; তাহারা খায় দায়, কাজকর্ম করে, কেহ বা দিনান্তে একবার ভগবানের নামটাও নেয়। কিন্তু নন্দ তো তাহাদের মত অত নিশ্চিন্ত হইয়া চলিতে পারেন না। তাঁহার কাছে, ভগবানকে দেখা হইল আগের কথা, খাওয়া-দাওয়া কাজকর্ম হইল পরের কথা। সুতরাং জগৎশুদ্ধ লোক যে ভাবে চলে, তিনি যদি তাহার বিপরীত আচরণ করেন, তবে হয় তিনিই পাগল, না হয় জগৎটাই পাগল। কিন্তু তিনি হইলেন একা, জগৎকে পাগল ঠাওরাইবার অধিকার তাঁহার নাই; অতএব জগৎশুদ্ধ লোক তাঁহাকেই তো পাগল বলিবে।

ব্রাহ্মণের কথা শুনিয়া নন্দ আর কোনও উত্তর করিতে পারিলেন না, এই কোমল কণ্ঠের একটী কুশলপ্রশ্ন শুনিয়া কেন যেন তাঁহার প্রাণ চঞ্চল হইয়া উঠিল, অশ্রুবেগ কণ্ঠ ঠেলিয়া উঠিতে লাগিল, ভাবিলেন, "হায় নটরাজ, এতদিন পরে তোমার দাসের কুশল জিজ্ঞাসা করিবার অবসর হইল কি? আমি পাগল হইয়াছি নাকি, তাহা তুমিই তো আমার চেয়ে ভাল জান প্রভু। তোমার মাঝে পাগল হইতেই তো চাহিয়াছিলাম, কিন্তু হইতে পারিলাম কই? এখনো তো আমার মমত্ববোধ দূর হইল না, অভিমানের বিনাশ হইল না—আমি পাগল হইলাম কি করিয়া? হে নটরাজ, আর কবে—আর কবে তোমার দাসকে দর্শন দিবে? নিরালায় বসিয়া তোমাকে পাইয়াছি মনে করিয়া সুখী হইয়াছিলাম, কিন্তু লোকের মাঝে আসিয়া যে আবার তোমাকে ভুলিয়া যাইতেছি। বিজনে যে মূর্ত্তি স্পষ্ট হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছিল, সজনে তাহা যে ছায়ার মত মিলাইয়া যাইতেছে! হে বিশ্বরাজ, এ আবার তোমার কোন্ লীলা? তুমি নাচিতেছ, নাচাইতেছ, —দীর্ঘ জনম ধরিয়া তোমার নৃত্যাবেগে আবর্ত্তিত হইয়া চলিয়াছি, তোমার প্রলয়-নৃত্যের মাঝে কবে আমার সকল নৃত্যের অবসান হইবে, নটরাজ?"

ভাবিতে ভাবিতে নন্দের দুই চক্ষু জলে পুরিয়া উঠিল, আর হৃদয়াবেগ সহ্য করিতে না পারিয়া নন্দ দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। নন্দকে কাঁদিতে দেখিয়া ব্রাহ্মণের হৃদয় মমতায় গলিয়া গেল, তিনি সস্নেহে আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "নন্দ, কি হইয়াছে তোর, কাঁদিস্ কেন?"

করুণস্বরে নন্দ বলিলেন, "প্রভু, আমি চিদাম্বরমে যাইব, আমাকে অনুমতি দিন্।"

এবার আর নন্দের প্রার্থনা শুনিয়া ব্রাহ্মণ

রাগ করিলেন না, কিন্তু তাঁহার আর্থিক ক্ষতির কথা ভাবিয়া স্বচ্ছন্দচিত্তে অনুমতিও দিতে পারিলেন না। ব্রাহ্মণ বুঝিলেন, নন্দকে তিনি ঠেকাইয়া রাখিতে পারিবেন না। সে যদি তাঁহার অনুমতির অপেক্ষা না রাখিয়া পলাইয়া যাইত, তবে জোর-জবরদস্তি করিয়া তিনি তাহার একটা প্রতীকার করিতে পারিতেন। কিন্তু এ যে তাঁহার অনুমতির অপেক্ষা করিতেছে, অথচ বাধা পাইয়াও আপন সঙ্কল্প ছাড়িতেছে না—ইহার নির্ব্বন্ধকে আঁটিয়া উঠিবার ক্ষমতা তাঁহার কোথায়?

বুঝাইয়া বলিলে নন্দ যদি তাহার আগ্রহ ছাড়িয়া দেয়; এই ভাবিয়া ব্রাহ্মণ তাহাকে বলিলেন, "নন্দ, তুমি যে চিদাম্বরমে যাইবার সঙ্কল্প করিয়াছ, এ অতি উত্তম কথা। আমার তাহাতে কোনও আপত্তিই ছিল না, কেননা তোমার, মুখ চোখ দেখিয়া আমি বুঝিতে পারিতেছি, তোমার মাঝে যথার্থই ভক্তির সঞ্চার হইয়াছে। সুতরাং নটরাজ নিশ্চয়ই তোমাকে কৃপা করিবেন। আমিও তাঁহার এক অধম সন্তান, তাঁহার ইচ্ছার বশেই পরিচালিত হইতেছি—তাঁহার ভক্তকে তাঁহার দর্শন হইতে বঞ্চিত করিব, এমন স্পর্দ্ধা আমার নাই। কিন্তু এতদিন তো আমি তোমার ভরণ পোষণ করিয়া আসিয়াছি—সেইটুকু বিবেচনা করিয়াও কি আমার দিকে তোমার চাহিয়া দেখিতে হয় না? আমার ক্ষেতের ফসল নষ্ট হইয়া গেল, সবাই জানে, তুমি ছাড়া আমার কাজ কেহ গুছাইয়া উঠিতে পারিবে না। এমন সময় তুমি যদি আমার কাছে আবদার জুড়িয়া দাও, তবে কি করিয়া আমি স্থির থাকিতে পারি? কাজেই আমার ধান কাটার আগে তোমাকে আমি ছাড়িয়া দিতে পারি না। তুমি আমার ধানটা কাটিয়া দাও, আমি কথা দিতেছি, ধান কাটা শেষ হইলে আমি তোমাকে চিদাম্বরমে যাইবার ছুটী দিব।"

* * * *

ব্রাহ্মণের এতটুকু অনুগ্রহও নন্দের কাছে আশাতীত বলিয়া মনে হইল। অবশ্য তিনি জানেন, ব্রাহ্মণের জমী নিতান্ত অল্প নয়, ধান কাটা, সারা হইতে বহু বিলম্ব হইবে। তবুও তিনি যে একটা বন্ধন হইতে প্রভু-ভৃত্য সম্বন্ধের দায়িত্ব হইতে মুক্ত হইবার ভরসা পাইলেন, ইহাতেই তিনি স্বস্তি অনুভব করিলেন। তিনি ভাবিলেন, "এ-ও সেই নটরাজেরই কৃপা—যেমন তিনি জাল পাতিয়াছিলেন, তেমনই আবার তাহা গুটাইয়া লইবারও আয়োজন করিতেছেন। হে ইচ্ছাময়, তোমার ইচ্ছারই জয় হোক!"

নন্দ উৎসাহের সহিত কাজে লাগিয়া গেলেন। নন্দের উৎসাহ দেখিয়া সহকর্ম্মীরা ভাবিল, বুঝি তাহার পাগলামী সারিয়া গিয়াছে। নন্দ নিঃশব্দে, একমনে কাজ করিয়া যাইতে লাগিলেন, তাঁহার কাস্তের সম্মুখে ধানের গোছা যেন আপনা হইতেই লুইয়া পড়িতে লাগিল। এমনি করিয়া সারাদিন কাজ হইল—ইহার মাঝে নন্দ কাহারও সঙ্গে একটী কথাও বলিলেন না। তিনি যে কি ভাবিতেছিলেন, তাহা তাঁহার সঙ্গীরা কিছুই আন্দাজ করিতে পারিল না। কিন্তু তাঁহার ব্যাপার দেখিয়া তাহারা একটু আশ্চর্য্য হইল। সন্ধ্যার সময় সকলে ঘরে ফিরিবার কালে নন্দকে সঙ্গে লইবার জন্য ডাকিয়া গেল, কিন্তু তখনও তিনি একমনে

কাজই করিয়া চলিয়াছেন, সঙ্গীদিগের ডাক তাঁহার কাণে পৌঁছিল না। কয়েকবার ডাকিয়া নন্দের কোনও সাড়া না পাইয়া তাহারা ভাবিল, "নন্দকে বুঝি আবার ভূতে পাইয়াছে, হয়তো সারারাত এই মাঠেই পড়িয়া থাকিবে, কে উহার সঙ্গে থাকিয়া প্রাণ হারাইতে যাইবে ?" এই ভাবিয়া তাহারা যে যাহার ঘরে চলিয়া গেল—যাইবার সময় ব্রাহ্মণকে একবার নন্দের খবরটা দিয়া যাইতেও ভুলিল না। নন্দের প্রতি ব্রাহ্মণের একটা অকারণ স্নেহ জন্মিয়াছিল, তাই খবর শুনিয়া তিনি একটু চিন্তিত হইলেন। কিন্তু নন্দের উপর দেবতার আবেশ আছে এই, বিশ্বাসে কোনও ব্যবস্থা করাও নিষ্প্রয়োজন মনে করিলেন।

এদিকে নন্দ মাঠে ধান কাটিতেছেন। তিনি জানেন, জমীর ফসল কাটা হইলেই তিনি ছুটী পাইবেন। যখন কাজে লাগিয়াছেন, তখন তাঁহার মনে কেবল এই একটি কথাই জাগিতেছিল—"মাঠের ফসল কাটিলেই আমার ছুটী। তারপর আমার নটরাজের দর্শন পাইব।" এই কথাটি জপমালার মত তাঁহার মনে বারবার আবর্ত্তিত হইতে লাগিল, আর তাঁহার সমস্ত হৃদয় যেন একাগ্র হইয়া সেই দীর্ঘায়ত শস্যক্ষেত্র উত্তীর্ণ হইয়া চিদাম্বরমে নটরাজ বিগ্রহের পদতলে লুটাইয়া পড়িল।

কখন সন্ধ্যা হইয়াছে, সঙ্গীরা ডাকিয়া ডাকিয়া কখন চলিয়া গিয়াছে, নন্দ তাহার কিছুই জানেন না। তিনি কেবল ভাবিতেছেন, "এই ক্ষেত পার হইলেই ছুটী"—আর অন্তশ্চক্ষে নটরাজের নর্ত্তনমহিমা দেখিয়া তাঁহার সমস্ত শরীরে বিদ্যুৎপ্রবাহ ছুটিয়া যাইতেছে। ক্রমে সন্ধ্যার অন্ধকার ঘোর হইয়া আসিল, আকাশে অসংখ্য নক্ষত্র ফুটিয়া উঠিল, কিন্তু নন্দের সে দিকে ভ্রূক্ষেপও নাই। অন্ধকারের মাঝে আলো দেখাইয়া কে যে তাঁহার আগে আগে চলিয়াছে, তাহার দিকে তাঁহার দৃষ্টি নাই—তিনি কেবল একমনে ধান কাটিতে কাটিতে আগাইয়া যাইতেছেন—আর ভাবিতেছেন এই মাঠ পার হইলেই আমার ছুটী।"

ক্রমে রাত্রি গভীর হইয়া আসিল। দূরে আধনূর গ্রাম খানি সুপ্তির কোলে ঢলিয়া পড়িয়াছে—সমস্ত প্রকৃতি শান্ত, নিথর—ঝিল্লীর রব ছাড়া আর কিছু শোনা যায় না—কেবল মাঝে মাঝে দূর হইতে গ্রাম্য কুক্কুরের চীৎকারধ্বনি ক্ষীণ হইয়া বাতাসে ভাসিয়া আসিতেছে।—সে সময় যদি কেহ ব্রাহ্মণের কৃষিক্ষেত্রে যাইত, তবে আশ্চর্য্য হইয়া যাইত। সে দেখিত, সমস্ত ক্ষেত্র এক স্নিগ্ধ জ্যোতিতে আলোকিত হইয়া উঠিয়াছে—সেই জ্যোতিঃর কেন্দ্রস্থলে একটিমাত্র মানুষ কাস্তে দিয়া ধান কাটিয়া চলিয়াছে। কিন্তু আশ্চর্য্য এই, মানুষের এক গোছা ধান কাটিতেই তাহার চারিদিকে শত শত ধানের গোছা কাটিয়া মাটিতে স্তূপ হইয়া পড়িতেছে। কে যে কাটিতেছে, তাহা দেখা যাইতেছে না। নন্দের কিন্তু সে সমস্ত দিকে লক্ষ্য নাই—তিনি একাগ্রচিত্তে কেবল কাটিয়া চলিয়াছেন আর ভাবিতেছেন, "এই মাঠ পার হইলেই আমার ছুটী।"

পরদিন সকালে ব্রাহ্মণ শঙ্কাকুল চিত্তে নন্দের খোঁজে মাঠে আসিলেন, অন্যান্য পারিয়ারাও কৌতুহলী হইয়া তাঁহার সঙ্গে আসিল। কিন্তু মাঠে আসিয়া যাহা দেখিল, তাহাতে সকলে আশ্চর্য্য হইয়া গেল।

যোগসূত্রবৃত্তি

——*——

কৈবল্যপাদ

বলিতে পার, এইরূপ চিত্ত হইতেই যদি লোকযাত্রা নির্ব্বাহ হয়, তবে আর একজন দ্রষ্টা স্বীকার করি কোন প্রমাণে ?—সূত্রকার সেই দ্রষ্টার প্রমাণ দিতে গিয়া বলিতেছেন, "চিত্ত অসংখ্য বাসনা দ্বারা বিচিত্র হইলেও সংহত্যকারি বলিয়া তাহা পরার্থ।"

ইহার তাৎপর্য্য এই, চিত্ত অসংখ্য বাসনা বশতঃ বিচিত্র অর্থাৎ ক্ষণে ক্ষণে নানারূপ ; কিন্তু তথাপি তাহার স্বাতন্ত্র্য নাই—সে পরার্থ অর্থাৎ তাহার প্রবৃত্তি পরের জন্যই। ভোক্তা তাহার প্রভু, সে ভোক্তারই ভোগ ও মুক্তি-রূপ প্রয়োজন সাধন করিয়া থাকে।

চিত্ত পরার্থ কেন ?—কারণ সে সংহত হইয়া অর্থাৎ বিশ্লিষ্ট অংশসমূহের সাম্মিলনে প্রয়োজন সাধনে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। বহু অংশের সংঘাতে যে ব্যাপার প্রবর্ত্তমান দেখিব, তাহাকেই পরার্থ বলিব। আমাদের লোক-ব্যবহারের সমস্ত কার্য্যই এইরূপ বহু বিশ্লিষ্ট অংশের সমবায়ে নিষ্পন্ন। চিত্তের বেলাতেও দেখি তাই। সত্ত্ব রজঃ ও তমোগুণই চিত্ত পরিণাম প্রাপ্ত হইয়া থাকে ; কিন্তু ইহারা কেহই স্বতন্ত্র নহে, তিনটিতে মিলিয়া একটি কার্য্য উপস্থিত করে। স্বতন্ত্র নহে বলিয়াই ইহাদিগকে পরার্থ বলিব অর্থাৎ অপর কাহা-কেও উপলক্ষ্য করিয়া তবে তাহারা মিলিত হইতে পারে, নতুবা স্বতন্ত্র থাকিলে মিলিত হইবার প্রয়োজন কোথায় ?

চিত্ত পরার্থ, কিন্তু সেই পর কে ?—পুরুষ। একটা আপত্তি হইতে পারে, শয়ন-ভোজনাদি লৌকিক কার্য্যকেও পরার্থক্রিয়া দৃষ্টান্তরূপে উপস্থিত করা হইয়া থাকে ; তখন পর হয় শরীরী জীব। সুতরাং সেই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া এখানেও শরীরী পর স্বীকার করিতে হয়। অর্থাৎ চিত্ত সংহত্যকারি—এই হেতুতে তাহাকে পরার্থ বলিয়া অনুমান করিতেছ। এক্ষণে পরের বাস্তবতা অনু-সন্ধান করিতে যাইয়া লৌকিক ব্যবহারের দৃষ্টান্তে শরীরী জীবকেও তো পর বলিতে পার। তখন তো আর আমাদের অভি-প্রায়ানুযায়ী অসংহত পর পাই না—কেননা শরীরও অসংহত নয়। সুতরাং হেতুবলে আমরা যাহা সিদ্ধ করিতে চাহিয়াছিলাম, তাহার বিপরীত বস্তুই সিদ্ধ হওয়াতে এই হেতুকে অভীষ্টের বাধক বলিয়া স্বীকার করিতে হয়।

ইহার উত্তরে এই বলা যায়, এই অনু-মানটী যেরূপে উপস্থাপিত করা হইয়াছে, তাহাতে সাধারণভাবে সমস্ত পরার্থের সহিতই হেতুর ব্যাপ্তিসম্বন্ধ ঘটে বটে, কিন্তু তথাপি বিশেষ পর্য্যালোচনা করিয়া সত্ত্বাদি হইতে বিলক্ষণ ধর্ম্মীর অনুসন্ধান করিতে গেলে সত্ত্ব-বিলক্ষণ ভোক্তাকেই পর বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতে হয়। যেমন, "এই পর্ব্বত বহ্নিমান্‌,

ধূম তাহার হেতু"—এইরূপ সাধারণভাবে অনুমান হইতে পারে। এখন উক্ত পর্ব্বত যদি চন্দনবন দ্বারা আচ্ছাদিত থাকিত, তাহা হইলে তাহার ধূমও অন্যান্য ধূম হইতে বিলক্ষণ হইত। এই বিলক্ষণ ধূম হইতে অনুমিত বহ্নিও অন্যান্য বহ্নি হইতে বিলক্ষণ চন্দনজাত বহ্নি বলিয়াই প্রতীয়মান হইত। সেইরূপ সাধারণভাবে সংহত বস্তুমাত্রেরই পরার্থত্ব অনুমানসিদ্ধ হইলেও শরীরাদি হইতে বিলক্ষণ চিত্তস্বরূপ ভোগ্যকে যখন পরার্থ বলিয়া অনুমানবলে সিদ্ধ করা হয়, তখন পর বলিতে উপরি-উক্ত ভোগ্যের ভোক্তা চিন্মাত্ররূপ অসংহত পুরুষই উপস্থাপিত হন।

পুরুষের পরত্ব কি, না তাঁহার সর্ব্বোৎকৃষ্টত্ব। এই পরত্বের ক্রম আছে। যেমন তমোগুণাশ্রিত বিষয় হইতে শরীর প্রকৃষ্ট অতএব পর, কেননা তাহা প্রকাশ সহায় ইন্দ্রিয়ের আশ্রয়স্বরূপ। আবার শরীর হইতে ইন্দ্রিয় প্রকৃষ্ট, ইন্দ্রিয় হইতে প্রকাশরূপ চিত্ত সত্ত্ব প্রকৃষ্ট। চিত্তসত্ত্বেরও যাহা প্রকাশক, প্রকাশ্য চিত্ত হইতে যাহা বিলক্ষণ, তাহা চিদ্রূপ। তাহার সংহতত্ব নাই, সুতরাং তাহাই চরম পর। (২৩)

এইরূপে পুরুষের প্রমাণ নির্ণীত হইল। এক্ষণে যোগশাস্ত্রের ফলস্বরূপ কৈবল্যের কথা বলা হইবে।

সত্ত্ব ও পুরুষ যে পৃথক, ইহা নিরূপিত হইয়াছে। আমি চিত্ত হইতে ভিন্ন, এই প্রকার অনুভব সহায়ে যিনি সত্ত্ব ও পুরুষের পার্থক্য অনুধাবন করিতে পারেন, তাঁহার চিত্তের স্বরূপজ্ঞান হইয়া থাকে। তখন, চিত্তে যে আত্মভাবের ভাবনা করা হইত, তাহা নিবৃত্ত হয়—চিত্তই ভোক্তা, [illegible] জ্ঞাতা, এইরূপ অভিমান আর থাকে না। (২৪)

তখন কি হয়?—"চিত্ত তখন বিবেকনিম্ন ও কৈবল্যপ্রাগ্‌ভার হইয়া থাকে।" পূর্ব্বে চিত্ত অজ্ঞানাচ্ছন্ন থাকায় নিম্নগামী ও বহির্মুখ ছিল, বিষয়ের উপভোগেই তাহা প্রমত্ত থাকিত; কিন্তু সত্ত্ব-পুরুষের বিশেষদর্শন হইলে চিত্ত বিবেকের পথে, অন্তর্মুখে ঝুঁকিয়া পড়ে এবং কৈবল্যে তাহার প্রযত্ন ও সিদ্ধি হয়। (২৫)

চিত্ত যখন এইরূপে বিবেকবাহী হয়, তখন তাহার নিকটে অবশ্য বিঘ্নও উপস্থিত হয়। উহাদের হেতু জানিলে ত্যাগেরও উপায় হইতে পারে। সমাধিস্থিতির সময়ও মাঝে মাঝে পূর্ব্বানুভূত ব্যুত্থান-সংস্কার হইতে উৎপন্ন, আমি আমার ইত্যাকার ব্যুত্থানজ্ঞান, সংস্কার ক্ষয় হইতে হইতেও আসিয়া উপস্থিত হয়। ইহাদিগকে দূর করিতে হইলে একেবারে অন্তঃকরণের উচ্ছেদ করিতে হইবে। (২৬)

কি করিয়া এই হান সম্ভব, তাহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। অবিদ্যা প্রভৃতি ক্লেশহানের উপায় পূর্ব্বে যেরূপ উক্ত হইয়াছে, সেই উপায়েই সংস্কার সমূহেরও হান করা কর্ত্তব্য। বীজ অগ্নিদগ্ধ হইলে যেমন অঙ্কুর উৎপাদন করে না, সেইরূপ জ্ঞানাগ্নি দ্বারা সংস্কার সমূহকে এমন করিয়া দগ্ধ করিতে হইবে, যাহাতে আর তাহারা চিত্তভূমিতে অঙ্কুরিত হইতে না পারে। (২৭)

চিত্তবৃত্তি নিরুদ্ধ হইলে আর যখন কোনও বিচ্ছিন্ন প্রত্যয়ের উদয় হয় না, তখন

যোগীর সমাধি স্থিরীভূত হইয়া থাকে। এক্ষণে কি করিয়া এই সমাধির উৎকর্ষ সাধন করা যাইতে পারে, তাহাই চিন্তনীয়। সূত্রকার তাহার উপায় বলিতেছেন—"প্রসংখ্যানেও যিনি ফলাকাঙ্ক্ষাহীন, বিবেকখ্যাতি সর্ব্বপ্রকারে প্রকর্ষ লাভ করাতে তাঁহার ধর্ম্মমেঘ নামে সমাধি আবির্ভূত হয়।" ইহার তাৎপর্য্য এই—তত্ত্বসমূহ ক্রমানুসারী পর পর বিন্যস্ত রহিয়াছে। তাহাদের স্বরূপ পরস্পর বিলক্ষণ বা ভিন্ন। যিনি স্বয়ং নির্ব্বিকার থাকিয়া তত্ত্বসমূহের এই ভেদ বুঝিতে পারেন, তাঁহার প্রসংখ্যান বা বিবেকখ্যাতি উৎপন্ন হইয়াছে বুঝিতে হইবে। কিন্তু এই অবস্থাতেও যিনি নিজের জন্য কোনও প্রকার ফলের আকাঙ্ক্ষা করেন না, তাঁহার সর্ব্ববিষয় হইতে বিরক্তি উৎপন্ন হওয়াতে আর কোনও প্রত্যয় বা খণ্ডজ্ঞান উৎপন্ন হয় না, এই প্রকারে তাঁহার বিবেকজ্ঞান চরম উৎকর্ষ লাভ করে। এইরূপে তাঁহার ধর্ম্মমেঘ নামে সমাধি উৎপন্ন হইয়া থাকে। শুক্ল কিম্বা কৃষ্ণ নয়, এইরূপ প্রকৃষ্ট ধর্ম্মই (৭ম সূত্র তুলনীয়) পরম পুরুষার্থের সাধক। যাহা এবম্প্রকার উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম মেহন বা সেচন করিতে পারে, তাহাকে ধর্ম্মমেঘ বলা হয়। ইহাতে প্রমাণ হইল, অশুক্লকৃষ্ণ প্রকৃষ্ট ধর্ম্মই জ্ঞানের হেতু। (২৮)

এই ধর্ম্মমেঘ সমাধি হইতে কি হয়?—না অবিদ্যা হইতে অভিনিবেশ পর্য্যন্ত যাবতীয় ক্লেশ ও শুক্লাদি ত্রিবিধ কর্ম্ম নিবৃত্ত হইয়া থাকে। জ্ঞানের উদয় হওয়াতে যথাক্রমে পূর্ব্ব পূর্ব্ব কারণের নিবৃত্তি

ক্লেশ ও কর্ম্মের নিবৃত্তি হইলে কি হয়?—ক্লেশই ছিল চিত্তের আবরণ, উহাদের দ্বারাই চিত্ত মলিন হইয়া ছিল। জ্ঞান যখন এই আবরণ ও মালিন্য হইতে মুক্ত হয়, তখন তাহা শরৎকালের আকাশের মত নির্ম্মল ও আনন্ত্যের বাচক হইয়া থাকে। তাহার তুলনায় জ্ঞেয় বিষয় অতি অল্প বলিয়াই প্রতিভাত হইয়া থাকে। অর্থাৎ যোগী তখন অক্লেশেই সমস্ত জ্ঞেয় বিষয় জানিতে পারেন। (৩০)

তাহার ফলেই বা কি হয়?—তখন যোগীর পক্ষে গুণসমূহ কৃতার্থ হইয়া থাকে, অর্থাৎ পুরুষের ভোগ ও অপবর্গরূপ প্রয়োজন সিদ্ধ করিবার জন্য সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের মাঝে প্রকৃতির প্রেরণায় যে প্রযত্ন আবির্ভূত হইয়াছিল, তাহা নিষ্পন্ন ও পরিসমাপ্ত হইয়া থাকে। সঙ্গে সঙ্গে গুণসমূহের পরিণামক্রমও সমাপ্ত হয়। পুরুষার্থ সিদ্ধ না হওয়া পর্য্যন্ত গুণসমূহ যে অঙ্গাঙ্গিভাব আশ্রয় করিয়া অনুলোম ও প্রতিলোমক্রমে (২২শ সূত্র দ্রষ্টব্য) অবস্থান করে, তাহাই হইল গুণের পরিণাম। ক্রমের কথা পরসূত্রে বলা হইতেছে। গুণের পরিণামক্রমের পরিসমাপ্তি অর্থে—তাহাদের আর উদ্ভব হয় না। (৩১)

পূর্ব্বসূত্রোক্ত ক্রমের লক্ষণ এই—যাহা ক্ষণের প্রতিযোগী ও পরিণামের অবসান পর্য্যন্ত গ্রাহ্য, তাহাই ক্রম। অত্যল্প কালকে ক্ষণ বলা হয়। ক্রম ক্ষণ হইতে বিলক্ষণ, অথচ ক্ষণসমূহের প্রচয়ে উহা আশ্রিত। এই জন্য তাহাকে ক্ষণ-প্রতিযোগী বলা হইল।

তবে ক্রমের জ্ঞান হয়। এইজন্য তাহাকে পরিণামাপরান্তনির্গ্রাহ্য অর্থাৎ পরিণামের অবসান পর্য্যন্ত গ্রাহ্য বলা হইল। ফল কথা, ক্ষণসমূহের অনুভূতি না হইলে ক্রমের অনুভূতি হইতে পারে না। (৩২)

এক্ষণে সূত্রকার শাস্ত্রের উপসংহার করিতেছেন। কৈবল্যই যোগের ফল। তাহার অনন্যসাধারণ লক্ষণ কি, তাহা বুঝাইবার জন্য সূত্রকার বলিতেছেন—পুরুষার্থশূন্য গুণসমূহের প্রতিপ্রসবই কৈবল্য; অথবা চিতিশক্তির স্বরূপপ্রতিষ্ঠাই কৈবল্য। ইহার তাৎপর্য্য এই—ভোগ এবং অপবর্গই হইল পুরুষার্থ। গুণসমূহের যখন পুরুষের ভোগাপবর্গরূপ প্রয়োজন শেষ হইয়া যায়, তখন তাহাদের প্রতিলোম পরিণামের অবসান হয়, সুতরাং আর তাহাদের বিকার উৎপন্ন হয় না। ইহাকেই পুরুষের কৈবল্য বলে। অথবা চিৎশক্তি যখন আর চিত্তবৃত্তির সারূপ্য অবলম্বন করে না, তখন তাহা স্বস্বরূপে অবস্থান করে; এই প্রকার অবস্থানকেও পুরুষের কৈবল্য বলা হইয়া থাকে। (৩৩)

তুলনায় সমালোচনা

প্রতিজ্ঞাত যোগের স্বরূপ, লক্ষণ, উপায় ও ফল বিবৃত ও ব্যাখ্যাত হইল। এক্ষণে যোগদর্শনের প্রতিপাদ্য বিষয় যে নানা আকারে অন্যান্য দর্শনেও গৃহীত হইয়াছে, তাহা প্রদর্শন করিয়াই আমরা বৃত্তির উপসংহার করিব।

বৃত্তিকার বলিতেছেন, কৈবল্যদশায় ক্ষেত্রজ্ঞ আত্মা যে এইরূপে চিদ্রূপে অবস্থান করেন, তাহা যে কেবল যোগদর্শনেরই কথা, এমন নয়। অনুসন্ধান ও আলোচনা করিয়া দেখিলে অন্যান্য দর্শনেও আমরা এই তত্ত্বের উদ্দেশ পাইব। এ সম্বন্ধে একটু আলোচনা করা যাইতেছে।

যখন আত্মা সংসারী, তখন তিনি জীবের কর্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্বের অনুসন্ধাতা বা সংযোগসাধকরূপে প্রতীয়মান হন। যদি এই প্রকার একজন ক্ষেত্রজ্ঞকে অনুসন্ধাতারূপে স্বীকার না করা যায়, তাহা হইলে এই ব্যাঘাত ঘটে যে, এক ক্ষণে উৎপন্ন যে জ্ঞান এবং পরক্ষণে উৎপন্ন যে জ্ঞান, এই দুয়ের মাঝে সংযোগ সাধন করিবার কেহ থাকে না। জ্ঞানক্ষণসমূহ যদি এইরূপ অসংযুক্ত অবস্থায় থাকে, তাহা হইলে কোন্ কর্ম্মে কিরূপ ফলের উৎপত্তি হইবে, তাহার কোনও নিয়ম থাকে না। ইহাতে কৃতহানি ও অকৃতাভ্যুপগমরূপ দোষ উপস্থিত হয় অর্থাৎ স্বীকৃত বিষয় বাধিত হয় এবং অস্বীকৃত বিষয়কেও স্বীকার করিয়া লইতে হয়।

শাস্ত্রে যে কর্ম্মের উপদেশ দেওয়া হইয়াছে, তাহার যে কর্ত্তা, সেই তাহার ভোক্তা—অনুসন্ধাতা ক্ষেত্রজ্ঞ স্বীকার করার ফলে যদি এইরূপ ব্যবস্থা হয়, তাহা হইলেই অহিতকর বিষয় পরিত্যাগ করিতে ও হিতকর বস্তু গ্রহণ করিতে সকলেই প্রবৃত্তিযুক্ত হইতে পারে। অর্থাৎ ব্যবহারিক জগৎ তখন সুশৃঙ্খলার সহিত চলিতে পারে। ব্যবহার অর্থই হইল আমার অভিলষিত বস্তু গ্রহণ এবং অনভিলষিত বস্তু পরিত্যাগ। এই দুইটী ব্যাপারই পরস্পরের বিরোধী এবং ক্ষণে ক্ষণে তাহাদের উদ্ভব হয়। যদি ইহাদের মূলে সংযোগসাধনের একটী নিমিত্ত স্বীকার না করা যায়, তাহা হইলে

ক্রমিক সং
শ্রেণী সং

হইলে ব্যবহার কি করিয়া সার্থক হইতে পারে? ইষ্টগ্রহণ যদি এক কর্ত্তার কর্ম্ম হয়, আর অনিষ্ট বর্জ্জন যদি আর এক কর্ত্তার কর্ম্ম হয়, কিম্বা একই ইষ্টগ্রহণরূপ কর্ম্মের বিভিন্ন ক্ষণে যদি বিভিন্ন কর্ত্তা স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে কর্ম্মফলের ভাগী হইবে কে? জ্ঞানের ক্ষণ সমূহ পরস্পর ভিন্ন। তাহারা স্বয়ং আপনাদের মাঝে সংযোগ সাধন করিতে পারে না। তাহাদের মাঝে যদি কোনও সংযোগ না থাকে, তাহা হইলে ব্যবহারও চলিতে পারে না। এই জন্যই জ্ঞানক্ষণ সমূহের অনুসন্ধাতা বা সংযোগসাধক একজন কর্ত্তা ও ভোক্তা স্বীকার করিতে হয়। ইহাকে আত্মা বলা হয়।

গ্রাহক বিষয়ী এবং গ্রাহ্য বিষয় লইয়াই হইল ব্যবহার। মোক্ষদশায়, গ্রাহ্য গ্রাহক ভেদ না থাকায় কোনও ব্যবহারই থাকে না। সুতরাং আত্মারও তখন চৈতন্যমাত্র অবশিষ্ট থাকে। আবার এই চৈতন্যকেও কেবল মাত্র চিতিস্বরূপে—উক্তসকরূপে গ্রহণ করিতে হইবে। ইহা যে আত্মসংবেদক, অর্থাৎ নিজকে বিষয় করিয়া নিজকে জানে, এমন কথা স্বীকার করা যায় না। বিষয় গ্রহণের সামর্থ্যই হইল চিৎশক্তির স্বরূপ, উহা নিজের গ্রাহক নহে। কেন নহে, তাহা বলা যাইতেছে।

চৈতন্য যখন বিষয় গ্রহণ করে, তখন বিষয় সমূহ "ইদং" আকারেই উপস্থিত হইয়া থাকে। এই বিষয় গ্রহণ করিবার সময় "অহং" আকারে চৈতন্য আত্মস্বরূপ গ্রহণ করিতে পারে না। কেননা ইদংজ্ঞান ও অহংজ্ঞান রূপ দুইটী ব্যাপারের গতি দুই মুখ, একটী বহির্মুখী অপরটী অন্তর্মুখী। সুতরাং পরস্পরবিরুদ্ধ বলিয়া যুগপৎ ইহাদের গ্রহণ করা সম্ভব নয় (১৯ সূত্র দ্রষ্টব্য)। অতএব একই সময়ে বিরুদ্ধ দুইটী ব্যাপারের সংঘটন অসম্ভব বলিয়া চিৎশক্তির কেবল মাত্র চিদ্রূপতাই স্বরূপ বলিয়া ব্যবস্থিত হইল। সুতরাং মোক্ষদশায় যখন গুণসমূহের অধিকার নিবৃত্ত হইয়া যায়, তখন কেবল চিৎস্বরূপ আত্মাই অবস্থিতি করেন, ইহাই যুক্তিসঙ্গত। আবার সংসারদশায় এই আত্মাকেই কর্ত্তা, ভোক্তা ও অনুসন্ধাতারূপে স্বীকার করিলে সকল গোল মিটিয়া যায়।

প্রকৃতি ভোগ্য, আত্মা ভোক্তা। পরস্পরের এই সম্বন্ধ অনাদি ও নৈসর্গিক। প্রকৃতিপুরুষের বিবেক খ্যাতির অভাবই ইহার কারণ। এই সম্বন্ধবশতঃ প্রকৃতির পুরুষার্থ সম্পাদনরূপ কর্ত্তব্য সমুপস্থিত হয়। তাহাতে প্রকৃতিতে অনুলোম ও প্রতিলোম পরিণামরূপ দুইটী শক্তি আবির্ভূত হয়। প্রকৃতি যখন মহদাদি ক্রমে পরিণতি লাভ করে, তখন আত্মা অধিষ্ঠাতারূপে বুদ্ধিতে চিচ্ছায়া সংক্রামিত করিয়া থাকেন। বুদ্ধিসত্ত্বেও আত্মপ্রেরিত চিচ্ছায়া গ্রহণ করিবার সামর্থ্য উদ্ভূত হয়। চৈতন্য দ্বারা অনুপ্রাণিত ও নিয়মিত বুদ্ধির তখন কর্ত্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্বের অধ্যবসায় জন্মে। এক্ষণে যদি আত্মাকে এই কর্ত্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্বের অনুসন্ধাতারূপে স্বীকার করি, তাহা হইলেই তো সমস্ত ব্যবহারিক ব্যাপারের সুন্দর মীমাংসা হইয়া যায়। তাহা হইলে আর বৃথা কল্পনাজাল বিস্তার করার প্রয়োজন কি?

কিন্তু এই ব্যাপারের এই মীমাংসাও চরম নহে। আত্মাকে যদি পরমার্থতঃ কর্ত্তা বলিয়া

স্বীকার করি, তাহা হইলে আত্মা পরিণামী হইয়া যান। আত্মা পরিণামী হইলে তিনি অনিত্য—সুতরাং তাঁহাকে আত্মা বলিয়াই স্বীকার করা যায় না। তাহা ছাড়াও একটি কথা আছে।

একই সময়ে একই রূপে পরস্পরবিরুদ্ধ অবস্থার অনুভব হইতে পারে না। যে অবস্থায় আত্মসমবায়ে সুখ উৎপন্ন হইলে তাহার অনুভব হয়, সেই অবস্থাতেই দুঃখের অনুভব হইতে পারে না। অবস্থাসমূহ ভিন্ন ভিন্ন হইবেই, অথচ সকল অবস্থাতেই—যাহার অবস্থান্তর, সে অনুবৃত্ত থাকিবে। সুতরাং অবস্থার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাহারও পরিবর্ত্তন হইবে। অবস্থার নানাত্বে অবস্থাবানের নানাত্ব স্বীকার করিলে তাহাকে পরিণামী বলিতে হয়। এইরূপ পরিণামীকে আত্মা বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে না, নিত্যও বলা যাইতে পারে না। এই জন্য শান্তব্রহ্মবাদী সাংখ্যেরা—কি সংসারদশায়, কি মোক্ষদশায়—সকল অবস্থাতেই আত্মাকে একরূপ স্বীকার করিয়া থাকেন। ব্যবহারদশাতেও আত্মা অনুসন্ধাতা মাত্র—চিৎস্বরূপে তিনি বিষয় উদ্ভাসিত করেন, কিন্তু স্বরূপকে সংবেদিত করেন না। সুতরাং তখনও তাঁহাকে চিন্মাত্ররূপে ব্যবস্থিত বলিয়া প্রতীয়মান হয়। আবার মোক্ষদশায় সমস্ত ব্যবহারের বিলয় হওয়াতে আত্মা চিন্মাত্রস্বরূপেই পর্য্যবসিত থাকেন। সুতরাং উভয়ত্রই আত্মাকে একরূপ বলিয়াই স্বীকার করিতে হইবে।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

দিব্য দর্শন

ছেলেরা যা কিছু দেখে-শোনে, সকলকেই মানুষের মত মূর্ত্তিমান করে তোলে। মেঘ ডাকলে তারা বলবে, আকাশের উপর বসে কে রাগে গর্জ্জন করছে। বুড়ো ছেলেরাও কিন্তু তেমনি যার সংস্পর্শে আসে, তাকেই টুঁটো করে দেয়। যখন একটা গোলমাল বাধে, তখন প্রেমের আইনে নিজকে আমরা দুরন্ত করতে চাই না—আমরা যাই পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে ঝগড়া করতে। এ যেন টেলিফোঁতে বসে কার কাছ থেকে একটা কলটাকে দিলাম ভেঙ্গে—কেননা যে খবরটা শুনিয়েছিল, সে তো কলের আর এক মাথায়, চোখের আড়ালে, তার উপর তো আর ঝাল ঝাড়া যায় না!

অষ্ট্রেলিয়ার কৃষ্ণকায় অধিবাসীদের বিশ্বাস, তারা "মেলকা" করে অর্থাৎ কি কতগুলো তুক্ তাক্ করে মন্ত্র পড়ে বলেই বৃষ্টি হয়। একজন প্রসিদ্ধ ভ্রমণকারী লিখেছিলেন, "পথ চলতে চলতে একবার খুব জোর ঝড়বৃষ্টি

আমাদের সঙ্গে

কতগুলো লোক যাচ্ছিল। আমাদের চাকরেরা তো তাদের উপর ভয়ানক চটে গেল। কারণ তাদের বিশ্বাস, ওরাই বৃষ্টি নামিয়েছে।" যারা অপরের দোষ দেখলে কেবল খুঁতখুঁত করে, ছটফটিয়ে মরে, এই আদিম অসভ্যদের মত তাদের মনের মাঝেও অবিদ্যার বাসা। বৃষ্টি যে হচ্ছে, তার মূলে আছে প্রকৃতির অশরীরী বিধান। ফুল ফুটছে, তার মূলেও সেই একই প্রাকৃতিক আইন। খৃষ্টের কুশিষ্য জুডাস্ যে প্রেমের বিধানদ্বারা প্রণোদিত হয়েই তার ছলনাময় শেষ চুম্বন দিয়েছিল, তা সে জানত না। সেই ছলভরা চুম্বনের অব্যবহিত পরেই যা ঘটল, তাতেই না খৃষ্টকে আজ সকলে মনে করে রেখেছে—নইলে তাঁর কথা কোন্ দিন লোকে ভুলে যেত।

যোশেফ তাঁর অনুতপ্ত ভাইদের বলেছিলেন, "ভাই, তোমরা তো আমাকে কুয়োর মাঝে ফেলনি। মিশরে আমার মান বাড়াবার জন্য আমার প্রেমের ঠাকুরই এই ব্যবস্থা করেছেন—খুঁজে খুঁজে আমার ভাইদের মত আমার আপন জন তিনি আর পেলেন না।"

চোখের সামনে দেখ্ছি, কিছুই থাকছে না, ধোঁয়ার মত সব কোথায় মিলিয়ে যাচ্ছে। আমি তো কোনও বস্তুকেই শাশ্বত, অব্যয় বলে জানছি না, তবে আমি নিন্দা করি কার? বিদ্যুৎচমকে দেখলাম, একখানা রেলগাড়ী—হয়ত পূর্ণবেগে সে ছুটছে; কিম্বা একখণ্ড মেঘ দেখলাম—ভেসে যাচ্ছে। মুহূর্তের জন্য দেখা, কাজেই মনে করলাম, ওটা বুঝি স্থির হয়েই আছে। কিন্তু একটু অনুসন্ধান করলেই জানতে পারি—যা ভেবেছিলাম, তা নয়। মানুষও তেমনি মায়ার আলোকে জগৎটা দেখছে, আর তারই ভিত্তির উপর নিত্যই তার ব্যক্তিত্বের প্রতিষ্ঠা করছে। একেই বলে সংসারবুদ্ধি। তোমার মাঝে যে অনন্তস্বরূপ, সত্যস্বরূপ রয়েছেন, তাঁর জ্যোতিঃতে সব উদ্ভাসিত দেখ, তবেই চিরশান্তি লাভ করবে।

মানুষ যত তর্কবিচার করে, সবই মিছা। তর্ক করে' যখন মতের সামঞ্জস্য করবার চেষ্টা করা হয়, তখন অতৃপ্তি, অসন্তুষ্টি আর বিরোধ কেবল বেড়েই চলে। কেন? ইমারত গড়বার আগে ভিত যে পাকা হয়নি। আগে হৃদয় জয় কর, তারপর যুক্তি দেখাও। যুক্তি যেখানে হাল ছেড়ে দিয়ে বসে থাকে, প্রেম সেখানেও পথ দেখতে পায়। গল্পে পড়েছিলাম, পবনে পথিকের জামা ছাড়াতে পারল না, কিন্তু সূর্য্য পারল।

হাঁ, সব কুসংস্কার একে একে তোমায় ছাড়তে হবে—ধন-জন, বাসনা কামনার সব কুসংস্কার ঝেড়ে ফেলতে হবে। নিজকে আগে না ঘিরে নিলে পরকে বেড়ায় বাইরে রাখবে কি করে? এই যে দুঃখময় বৈরাগ্যের রাগজাল, এতেই আনন্দসিন্ধুর মহাসম্পদ্ লাভ হবে। রামের কাছে ভগবানের "হরি"-নামটী সব চেয়ে মিষ্টি লাগে। কিন্তু "হরি" মানেই হচ্ছে ডাকাত। মধুমাখা এই হরিনাম! কেউ কেউ আপত্তি করতে পারে, দুর্মনুকে যদি আমি ভালবেসে আত্মসমর্পণ করি, তাহলে সে যে আমাকে মেরে ফেলবে। কিন্তু রাম বলছেন, "আরে বোকা চালাক, ওটা কি এক-আধবার পরখ করে দেখেছিলে?"

জীবনের দুয়ারের উপর লেখা রয়েছে—"টান"—কিন্তু তুমি ভুল করে সেটাকে পড়লে "হান"—আর দুয়ার ঠেলতে সুরু করে দিলে। এমন করলে দুয়ার খুলবে কেন? ঠেলাঠেলিটাই হচ্ছে তর্কের পথ। আর প্রেমের বলে নিজের বুকে আকর্ষণ করা হচ্ছে টানার পথ। হৃদয় হচ্ছে উৎসবের উজ্জ্বলের মাণমন্দিরে প্রবেশপথ, আর মস্তক হচ্ছে তার নির্গমনপথ। প্রেমে প্রাণ জাগায়; আর মাথার কাজ হচ্ছে যুক্তি ব্যাখ্যা করা। ভাবনার আগে ভাব জাগে, যেমন পোষাকের আগে হল দেহ। একটা লোকের ভাব বদলে দাও, দেখবে, তার ভাবনাচিন্তার ধারা একেবারে ওলট-পালট হয়ে গিয়েছে।

জীবনটা কি? শুধু কতকগুলি বাধার সমষ্টি। হাঁ, যারা উপরভাসা রকমে জীবন কাটায়, তাদের কাছেই জীবনটা বাধ বাধ ঠেকে, কিন্তু জীবনকে যারা প্রেমে পূর্ণ করে নিয়েছে, তাদের কিন্তু তা মনে হয় না। যারা গল্পবাজ, যারা এত চালাক যে খোসা দেখেই শাঁস চিনে নেয়, কেবল নির্লজ্জের মত ভুয়ো মানের বড়াই করতে পারে—এদের সঙ্গ একেবারে বিষ। কিন্তু প্রেমের আসন যেখানে, সেখানে বাজে লোকের গতিবিধি হতে পারে না। তবে কারু সঙ্গ এড়িয়ে যাওয়ার প্রয়োজন হবে না। তুমিই তাদের চালিয়ে নেবে। বাজে লোকের যখন প্রয়োজন হবে, তখন তুমিই তাদের কাছে ডাকবে। তা ছাড়া অন্য সময়ে যদি ওদের তোমার কাছে আসবার দুঃসাহস হয়, তবে জানব, বিধির বিধান মিথ্যা, প্রকৃতির আইন নিরর্থক।

পাঞ্জাবের গণিমৎ তাঁর "নয়রঙ্-ই-ইশ্ক্" নামক গ্রন্থে আজিজ্ নামে এক গুরুমশায়ের কথা লিখে গিয়েছেন। আহা, বেচারী শাদিদ্ নামে তার এক পড়ুয়ার প্রেমে পড়েছিল। শাদিদ্ সবে মাত্র ইস্কুলে এসেছে, তার হাতের লেখা এমন অপরিষ্কার আর বিশ্রী, অথচ সেই শাদিদই হল যেন আজিজের গুরু। তার হাতের লেখার আদর্শেই কাণ্ডজ্ঞানহীন গুরুমশাই অপর পড়ুয়াদের লেখা সংশোধন করে দিত, আর শাদিদের লেখা দেখে বলত, "বাহবা! তোফা! কেয়াবাৎ!" প্রেম না থাকলে চোখে যে দৃষ্টিবিভ্রম হয়, তাতেই অপরের খুঁতগুলো চোখে পড়ে। কিন্তু প্রেম এসে যখন হৃদয়সিংহাসন জুড়ে বসে, তখন দিনের পর দিন আসে, আর মনে হয়—আকাশে যেন নূতন করে এক একটা সূর্য্যের উদয় হচ্ছে।

ভাবে আর মতে মিল হোক্, এর জন্য মানুষ বড় বেশী ব্যস্ত হয়ে পড়ে। প্রাণের মিলের জন্য তারা অপেক্ষা করতে চায় না। কাউকে তলিয়ে বোঝা মানে—বাইরের হাব-ভাব চালচলনের তলে তলিয়ে গিয়ে বোঝা। ভালবাসা না থাকলে তা হবার যো নাই। সবার দরদ না বুঝতে পারলে সবাইকে জানতেও পারবে না। ভাবতে হবে না—ডুবতে হবে। প্রেমে যদি আইন ভাঙে, তবে ওতেই জানবে, আইন করা সার্থক হল। তা ছাড়া অপর কিছুতে যদি আইন ভাঙে, তবে তা হল গোঁড়ামী বা বিদ্রোহ। প্রেমই হচ্ছে একমাত্র দিব্যবিধান। আর সব বিধান হচ্ছে দস্তরমত রাহাজানি। বিধি লঙ্ঘন করবার ক্ষমতা একমাত্র প্রেমেরই আছে। প্রেমে জয় করা হল দেবতার

কাজ—আর আইন দিয়ে জয় করাটাই হচ্ছে বে-আইনী।

ভাই রাজনৈতিক, তুমি তো ক্ষুরধার সমালোচনা আর মর্ম্মদাহী অভিযোগের পন্থা অবলম্বন করেছ, কিন্তু দিনের পর দিন সবই যে উল্টা পথে চলছে। আমাদের এখন সোজা পথে ঘুরে আসবার সময় হয়েছে। প্রতিপক্ষ দল যদি একটা অন্যায় করল, তবে তার বদলে আমরা আর একটা অন্যায় করলে কেবল কালোর উপর আর এক পোঁছ কালী লেপে দেওয়া হল মাত্র—তাতে তো চুণকাম করা হল না। একজন প্রৌঢ় ভদ্রলোক, একটি বালক তাঁকে অসম্মান করেছে বলে তাকে ধমকিয়ে বলেছিলেন, "হতমূর্খ, কি করে ভদ্রব্যবহার করতে হয়, জানিস্ না?" ছেলেটী উত্তর দিল, "আজ্ঞে আপনিই তো বললেন, আমি হতমূর্খ, তাই তো আমি অসভ্যের মত ব্যবহার করেছি; তা আপনি যখন মহাপণ্ডিত, তখন পণ্ডিতের মত ব্যবহারটা একবার দেখিয়ে দিন না।"

বিদ্যুৎসংস্পৃষ্ট একটা পিণ্ড যদি আর একটা পিণ্ডের কেবল কাছে যায়, দুটায় যদি ঠেকা-ঠেকি না-ও হয়, তা হলেই শেষোক্ত পিণ্ডটার মাঝে বিজাতীয় বিদ্যুতের সঞ্চার হতে থাকে। আবার দুটায় যদি গায়ে গায়ে লেগে থাকে, তাহলে সজাতীয় বিদ্যুৎ সঞ্চার হয়। তেমনি যুক্তিতর্ক আর ন্যায়শাস্ত্রের দোহাই দিয়ে যখন তুমি একটা ব্যাপারের মীমাংসা করতে চাও, অথচ এদিকে জাতি অভিমানের কাচে দুটী হৃদয়ই ঢাকা থাকে, আবরণ ভেদ করে কেউ কারু সঙ্গে মিলতে পারে না, তখন বুঝতে হবে, এই দুই হৃদয়ের সন্নিকর্ষ বড় ভীষণ হয়েছে। এর ফল যা হবে, তা তুমি যা করতে চাও, ঠিক তার বিপরীত। ভাল না বাসলে মানুষ চেনা যায় না। যুক্তিতে যেখানে কুলায় না, ভালবাসায় সেখানে কাজ হয়।

ধর্ম্ম বল, সম্প্রদায় বল, উপাধি বল—সবই যেন মানুষের সর্ব্বসিদ্ধিকবচের মত। বিজ্ঞাপন পড়লে মনে হয়, ওতে না মিলবে, এমন বস্তু নাই, অথচ শেষকালে ছিটেটা-ফোঁটাটা যা মিলল, তা হয়ত ওই সাধের মাদুলী গলায় না ঝুলালেও মিলত। এই সমস্ত কুসংস্কারের জাল ছেদন করে মনুষ্যত্বের গৌরবে আমাদের উদ্বুদ্ধ হতে হবে। নাম-রূপের খেলনা নিয়ে আর কতদিন মজে থাকবে ভাই?

এমন লোক আছে, যারা শুচিতার দোহাই দিয়ে প্রেমের বিরুদ্ধে লাঠি ধরে। তারা ভাবে না যে প্রেম ছাড়া শুচিতা এক মুহূর্ত্তও টিকবে না। কেউ প্রেমে মরে, আবার কেউ মরে ঈর্ষ্যায়। প্রেমে কলঙ্ক হোক, তবু তা যদি খাঁটী হয়, তবে তার তুলনায় শুচিতার দম্ভে ঘৃণার ভাব পোষণ করাকে আমি অতি জঘন্য পাপ বলব। অশুচির দাস জগতে অনেকই আছে, কিন্তু নীতিধর্ম্মের দোহাই দিয়ে নিজের দুর্ব্বলতা গোপন করে যারা শুচিতার দাস হয়ে ফিরছে, তারা অশুচিদের চেয়েও ভয়ানক লোক। খাঁটী হও, আত্ম-প্রবঞ্চনা করো না। নিজের অনুভূতির উপর জীবন গড়ে তোল। তোমার অনুভূতি-অভিজ্ঞতার চেয়ে বড় ওস্তাদ আর তোমার নাই।

নিজের অভিজ্ঞতার কষ্টিপাথরে যাচাই না করে কেউ কখনও নির্ম্মল হতে পারেনি।

শৌচাচারের যে সমস্ত বাজে খুঁটিনাটি, সেই গুলিকেই খুব বড় করে দেখলে, কিম্বা পুরুষ হয়ে স্ত্রীলোককে ঘৃণা করলে বা স্ত্রী হয়ে পুরুষকে ঘৃণা করলে—এতে প্রকৃত শৌচ থেকে বহু দূরে পড়ে থাকবে। আত্মজ্ঞানই হল বাস্তবিক শৌচ। যৌনজ্ঞানের উচ্ছেদের দিকেই অত্যন্ত ঝোঁক দিয়ে ক্লীবত্বসাধনের দিকে দৃষ্টি রাখলে মূল লক্ষ্য হতে ভ্রষ্ট হয়ে একপেশে হয়ে চলা হয়।

যারা কৃত্রিম নীতিজ্ঞানের ব্যবসা করে বেড়ায়, তারা যদি মানুষকে একটু রেহাই দিত, তা হলে স্বাস্থ্যনীতির আইন মেনে অতি সহজ ও স্বাভাবিক ভাবে মানুষ যেমন গা হাত পা ধু'তে শিখে, তেমনি সহজে দেহ-মনের শৌচ রক্ষা করতেও তারা শিখ্‌ত। ইন্দ্রিয়-পরতা নিয়ে বেশী হৈ-চৈ করতে গিয়ে মানুষের দিব্যস্বভাবের মাঝে যে জিনিষটা ছিল না, সেইটাই গড়ে তোলা হয়। তোমার সমস্ত শক্তি অতীন্দ্রিয় ব্যাপারের অনুশীলনে নিযুক্ত কর, দেখ্‌বে পশুত্বের কথা চিন্তা করবারও তোমার অবসর থাকবে না।

অনেক ইস্কুল আছে, যেখানে ছেলেদের নিজে নিজে ভাবতে শিখানো হয় না, তাদের রীতিমত বুদ্ধির দেউলিয়া করে তোলা হয়। তেমনি খালি উপদেশ ঝাড়্‌লেও মানুষকে নীতির দেউলিয়া করা হবে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের মাঝে জোর করে সাম্প্রদায়িক ভাব ঢুকিয়ে দিলে তারা অধ্যাত্মজ্ঞানের দেউলিয়া হবে। আধ্যাত্মিক কাঙালপনা আর সাম্প্রদায়িক গোঁড়ামী, দুটাই হচ্ছে একই রোগের নিষ্ক্রিয় ও সক্রিয় অবস্থা।

সব নদী এক সমুদ্রে গিয়ে পড়ছে। সব প্রেম এক প্রেমপ্রবাহে মিশে যাচ্ছে। ভগবানের বুকে সৌন্দর্য্যের উৎস। ব্রহ্মের নাভিপদ্ম হতে এই কমলার উদ্ভব। যে সৌন্দর্য্যলক্ষ্মীকে লাভ করতে চায়, তাকেই অর্ণবশায়ীর কাছ থেকে তাকে অর্জ্জন করতে হবে। বাস্তবিক সৌন্দর্য্যই হল ভাবের প্রাণ—সৌন্দর্য্য আত্মার আহার। যে হৃদয়ে সৌন্দর্য্যের অনুভূতি নাই, সে হৃদয় জানে শুধু বিশ্বাসঘাতকতা, ফন্দিবাজী আর রাহাজানি। কিন্তু সৌন্দর্য্য কোথায়? সে কি শুধু কালো আঁখির চপল চাউনীতে, রাঙ্গা ঠোঁটে, কোকিলকণ্ঠে? সৌন্দর্য্য কি শুধু নিসর্গের শোভায়, আর কলাবিদের ওস্তাদীতে? এ সকলে সৌন্দর্য্য আছে বটে, কিন্তু তার একটা সীমা আছে। যদি বসন্তলক্ষ্মীকে পেতে হলে সারা দুরন্ত শীতটা প্রতীক্ষায় কাটাতে হয়, তবে অমন সৌন্দর্য্যানুভূতিকে কখনও বড় বলতে পারি না। যে গান ভালবাসে, অথচ নিস্ক্রিয় নিরিখে শুধু তার গুণদোষ বিচার করে, একটা খাঁটী সুর শুনবার আগে একশ'টা বেসুর তার কাণে বাজ্‌বে; এমন করে গানের সৌন্দর্য্য উপভোগ করাকে দুর্দ্দৈব ভিন্ন আর কি বলব? প্রাকৃতিক শোভা, ফুলের বাগান, ইয়ার-মোসাহেব ইত্যাদি বাইরের জিনিষের উপর যার সুখ নির্ভর করছে, তাকে অসুখী ভিন্ন আর কি বলব?

সে-ই মুক্ত, যার অন্তর্জ্জ্যোতিঃ চারদিকে সৌন্দর্য্যের ছটা বিকিরণ করছে, যার চারদিক থেকে কেবল প্রেমের আলো বিচ্ছুরিত হচ্ছে। চৈতন্য মহাপ্রভুর সামনে খুনে-মাতালেরও অন্তর্নিহিত ব্রহ্মস্বভাব স্ফুরিত হয়ে উঠেছিল।

আকাশপথে চল্‌তে চল্‌তে সূর্য্যদেব চির-কাল কেবল আলোই দেখে এসেছেন।

যোগদর্শনের একটি সূত্রে উল্লেখ আছে, "অহিংসাপ্রতিষ্ঠায়াং তৎসন্নিধৌ বৈরত্যাগঃ" —অর্থাৎ যাঁরা মুক্ত, তাঁদের প্রেমের শক্তিতে হিংস্র পশুর অন্তরেও সুপ্ত প্রেম জেগে ওঠে। সকল ধর্ম্মেই স্বর্গ কল্পনা করেছে; এই জীবন্ত প্রেমই যদি সে স্বর্গ না হলো, তবে স্বর্গ মিথ্যা স্বপন মাত্র।

শুচিতা কি? ভেদবুদ্ধি, অহংজ্ঞান, বাসনা কামনার সঙ্কোচ—ইত্যাদির স্পর্শ হতে আমাদের ব্রহ্মত্বকে অকলুষিত রাখাই হল শুচিতা, বাইরের কোনও প্রভাবদ্বারা প্রভাবান্বিত না হওয়াই যথার্থ পূর্ণ শুচিতা। যিনি শুদ্ধ-বুদ্ধ, মুক্ত-স্বভাব, যাঁর মাঝে ভেদদৃষ্টি নাই—সেই পরম পুরুষকে উপলব্ধি করে সংসারের রাগ-বিরাগে নির্ব্বিকার থাকা, মানুষের আদরে ভ্রূকুটীতে সমচিত্ত থাকা, আকর্ষণ বিকর্ষণে অটল থাকা—এই হল চিত্তশুদ্ধি। যাঁরা এমনি পরিশুদ্ধস্বভাব, তাঁরা তাঁদের অন্তর্নিহিত স্বর্গরাজ্যের ছবিকে বাইরের নামরূপের দর্পণে সর্ব্বদা প্রতিফলিত দেখতে পান—তাই দর্পণে আপনার সৌন্দর্য্য দেখে যেমন সুন্দরীর মুখে হাসি ফুটে ওঠে, তেমনি প্রকৃতির মনোরম দৃশ্য দেখে তিনিও অতুল আনন্দ অনুভব করেন। প্রকৃতিকে ভোগ করবার অধিকার একমাত্র তাঁরই আছে। তোমরা যেখানে প্রেমে "পড়", শুদ্ধস্বভাব ব্যক্তি সেখানে প্রেমে "ওঠেন"—অর্থাৎ তাঁর প্রেম অপরকে এবং নিজকে প্রবুদ্ধ করে—সে প্রেম কেবল আসক্তির মত চিত্তকে দুর্ব্বল করে না, বা সে কেবল কামনার জঞ্জালে ভরা ভাব-প্রবণতা নয়। যথার্থ পরিশুদ্ধিই যথার্থ প্রেম, আর যথার্থ প্রেমই যথার্থ চিত্তশুদ্ধি। কখনও কখনও নৈতিক দুর্ব্বলতা শুদ্ধির নামে চলে, যেমন কখনও বা আসক্তিকেই আমরা প্রেম নাম দিই।

একটা বস্তুতে যদি আসক্ত হও, তবে আর তাকে ভোগ করবার অধিকার তোমার থাকবে না। নিঃস্বার্থ প্রকৃতির উপাসকই পুষ্পোদ্যানের শোভা যথার্থ উপভোগ করতে পারেন। বাগানের মালিক যে, তার কাছে এত পুষ্পসম্ভার কেবল সতর্ক প্রহরা আর দুর্ভাবনার বিষয়মাত্র। শুদ্ধি বা প্রেম মাত্র আমাদের প্রয়োজন, তাই হল বিশ্বচেতনা; এই বস্তুটী লাভ করলে আর সবই আপনা থেকে এসে জুটবে।*

---

* স্বামী রামতীর্থ

বেদান্ত-সার

[চতুর্থ খণ্ড—বিবৃতি—সাধনবিচার]

মুমুক্ষুত্ব

সাধনসম্পদের মাঝে তিনটীর কথা ইতিপূর্ব্বে বলা হইয়াছে, এখন বাকী রহিয়াছে চরম সাধন মুমুক্ষুত্ব। মোক্ষবিষয়ক ইচ্ছা থাকাকে মুমুক্ষুত্ব বলে। মোক্ষ কি? বিদ্যা অর্থাৎ জ্ঞানের ফলে অবিদ্যা বিদূরিত হইয়া যখন ব্রহ্মভাবে অবস্থান করা সম্ভব হয়, তখনই জীবের মোক্ষ। এ বিষয়ে শ্রুতি বলিতেছেন—"যদা সর্ব্বে প্রমুচ্যন্তে কামা যেঽস্য হৃদি শ্রিতাঃ। অথ মর্ত্ত্যোঽমৃতো ভবতি"—হৃদয়ে যে সমস্ত কামনা সঞ্চিত রহিয়াছে, তাহার সকলগুলিই যখন ছাড়িয়া যায়, তখন এই মরজগতের মানুষই অমর হয়। (বৃহদারণ্যক, ৪, ৪, ৭)

তাহা হইলে শ্রুতিপ্রমাণে বলিতে পারি, কামনাত্যাগই মোক্ষ। কথাটা শুনিতে সহজ হইলেও কাজে কিন্তু সহজ নয়। শ্রুতি সকলপ্রকার কামনাত্যাগের কথাই বলিয়াছেন। কামনার মাঝেও স্থূল-সূক্ষ্ম ভেদ আছে। সকল কামনাই বন্ধনস্বরূপ, সুতরাং মুমুক্ষু ব্যক্তি কামনামাত্রেই পীড়িত হন। কিন্তু মোক্ষেচ্ছার তীব্রতার উপর এই পীড়নের পরিমাণ নির্ভর করে। অতি সূক্ষ্মতম কামনাকে প্রথমেই পীড়াদায়ক বলিয়া মনে হয় না, সুতরাং তাহাকে ত্যাগ করিবার জন্যও কোনও চেষ্টা করা চলে না। যে নূতন লক্ষ্য বিঁধিতে শিখে, সে যেমন প্রথমে একটা স্থূল বস্তুকেই শরব্য করিয়া তীর ছুঁড়িতে আরম্ভ করে এবং যতই হস্ত লঘু ও শিক্ষিত হয়, ততই সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্ম বস্তুকে শরব্য করিয়া তীর ছোঁড়া অভ্যাস করে, সাধনরাজ্যেও ঠিক এমনই করিতে হয়। সকল কামনার স্বরূপ আমরা জানি না, সুতরাং প্রথমে স্থূল কামনাগুলিকে নিরসন করাই আমাদের কর্ত্তব্য বলিয়া গণ্য হইবে।

শ্রুতি অন্যত্র বলিয়াছেন, মানুষের সাধারণতঃ তিনটী এষণা বা খুঁজিবার বস্তু থাকে—পুত্রৈষণা, বিত্তৈষণা ও লোকৈষণা। কথাটা খুব গভীর। বলিতে গেলে সংসারজীবন এই তিনটী এষণা বা কামনার পরিপূরণের জন্য ছুটাছুটী মাত্র। পাশ্চাত্য পণ্ডিত বলিবেন, জীবমাত্রেরই দুইটী প্রেরণা রহিয়াছে—প্রথমতঃ আত্মরক্ষা; দ্বিতীয়তঃ বংশবিস্তার। শ্রুতিতেও প্রথমতঃ দুইটী এষণার কথা—বিত্তৈষণা ও পুত্রৈষণা। বিত্ত বলিতে টাকাকড়ি, ধনজন

সবই বুদ্ধি। এগুলি দরকার কিসের জন্য? —না: উদরপূরণের দু'মুঠা অন্নের জন্য বা শরীরের একটা কিছু আচ্ছাদনের জন্য। নিত্য চাই খাওয়া-পরার বিলাসিতার জন্য। খাওয়া-পরা আত্মরক্ষার জন্য। সুতরাং বিত্তৈষণা পাশ্চাত্য পণ্ডিতের selfpreservation instinctএর সামিল। পুত্রৈষণা, বংশবিস্তারের জন্য (propagation of race)।

এই দুইটা হইল লৌকিক এষণা। কীট-পতঙ্গ হইতে মানুষ পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রই এই দুইটী এষণা আছে। সংসারের দুইটী আকর্ষণ—এক উদরের আর এক শিশ্নের। শিশ্নোদর-পরায়ণ জীব অজ্ঞানান্ধকারে ডুবিয়া আছে। এই আকর্ষণ হইতে রক্ষা পাইবার জন্যই বাল্যে সংযমের ব্যবস্থা—তাহাই হইল গুরুগৃহে অবস্থান করিয়া ব্রহ্মচর্য্যানুষ্ঠান। বাল্যকালের সংযমেও যাহাদের কুলাইল না, তাহারা সংসারে থাকিয়া, সংযত ভোগের সাহায্যে ওই শিশ্নোদরকেই দমিত করিতে চেষ্টা করিবে—ইহারই নাম গার্হস্থ্যাশ্রম। সুতরাং এই দিক দিয়া দেখিলে বলিতে পারি—আমরা সবাই মুমুক্ষু, ব্রহ্মচারীও মুমুক্ষু, গৃহস্থও মুমুক্ষু। বানপ্রস্থী আর সন্ন্যাসীর তো কথাই নাই।

কিন্তু স্থূলতঃ বিচার করিতে গেলেও দেখি, মানুষের মাঝে তো কেবল দুইটী এষণাই নয়—তার যে আর একটা এষণা আছে—লোকৈষণা। অন্যান্য জীবে এটা নাই, আছে কেবল মানুষের মাঝে। পুত্রৈষণা ও বিত্তৈষণা হইল ইহলৌকিক, আর লোকৈষণা হইল পারলৌকিক। অন্যান্য জীবের মাঝে পরলোকের জন্য চিন্তা নাই, তাহাদের গতি-মুক্তি প্রকৃতির-আশ্রিত। কিন্তু মানুষের মাঝে স্বাধীন চিন্তার স্ফূর্ত্তি হইয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে তাহার আশা আকাঙ্ক্ষা ইহলোক ছাড়িয়া পরলোকের দিকেও ছুটিয়াছে। সুখ সবাই খোঁজে—পশু পাখীর মত মানুষেও খোঁজে। কিন্তু অপরে হাতের কাছে যে সুখটুকু পায়, তাই ভোগ করে—যা পায় না, তার জন্য কামনা করে—এই পর্য্যন্ত। কিন্তু মানুষ এখন সুখ না পাইলেও পরে পাইবে ভাবিয়া, কিম্বা ইহলোকে না পাইলেও পরলোকে পাইবে বলিয়া আপাততঃ দুঃখ স্বীকার করিতেও পরাঙ্মুখ নহে। এইটুকু মনুষ্যবুদ্ধির বাহাদুরী। পরে সুখ পাইব বলিয়া এখন দুঃখ স্বীকার মানুষ ছাড়া অন্য জীবে করিতে জানে না। তাই মানুষের সুখাকাঙ্ক্ষার সীমানা দৃষ্ট জগতে কুলায় নাই, কাজেই অদৃষ্ট জগতের পানে সে হাত বাড়াইয়াছে। এই জন্য পরলোকে বিশ্বাস মানুষের মজ্জাগত। বৈজ্ঞানিক মানুষ প্রত্যক্ষে বা যন্ত্রাদিতে ধরা পড়ে না বলিয়া পরলোক উড়াইয়া দিতে পারে, কিন্তু একটা দেশে বৈজ্ঞানিক কয়টা? গুটিকতক নাস্তিবাদী বৈজ্ঞানিক ছাড়া জগতে সবাই পরলোকে কিছু না কিছু বিশ্বাস রাখে এবং কিছু আশাভরসাও করে। সুতরাং শ্রুতি যে লোকৈষণার কথা বলিয়াছেন, মানুষের পক্ষে সেটাও একটা প্রবল আকর্ষণ। তার জন্যই কাম্য কর্ম্মের ও যাগযজ্ঞাদির অনুষ্ঠান।

স্থূল দৃষ্টিতে দেখিতেছি, শ্রুতিও বলিতেছেন, এই তিনটী এষণা হইতে "ব্যুত্থায় ভিক্ষাচর্য্যং চরন্তি"—অর্থাৎ এই তিনটী এষণার পঙ্ক হইতে উঠিয়া ভিক্ষার ঝুলি

কাঁধে লইবে। কিন্তু ইহাও হইল মোক্ষ-সাধনের হাতে খড়ি মাত্র।

প্রথমতঃ এই তিনটী স্থূল বন্ধন ছেদন করিবে। অসহ্য না হইলে কেহ বাঁধন ছিড়ে না। সুতরাং যে ভিক্ষাবী হইয়াছে, বুঝিতে হইবে সংসারে কামনার দুঃখ অসহ্য হইয়াছে বলিয়াই সে সংসার ছাড়িয়াছে। তাহার মাঝে বিবেক ও বৈরাগ্য নিশ্চয়ই জন্মিয়াছে। বিবেক হইল জ্ঞানের পূর্ব্বরাগ। বিবেক জন্মিলেই বুঝিতে হইবে সংসারে অরুচি ধরিয়াছে, ভাল-মন্দ বিচারের ক্ষমতা জন্মিয়াছে। বিচার যতই পরিপক্ব হইবে, রুচি ততই মার্জ্জিত হইবে, তখন পূর্ব্বে যে কাম্য বস্তু ভাল লাগিত, তাহা বিষ বলিয়া মনে হইবে। এইরূপে সূক্ষ্মভাবে আত্মানুসন্ধানের ফলে ক্রমে সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর কাম্য বস্তুর প্রতি অশ্রদ্ধা জন্মিবে, তাহাদের অসার বলিয়া মনে হইবে। বৈরাগ্য বিবেকের সহচারী। বিবেক যাহাদিগকে অসার বলিয়া স্থির করিবে, বৈরাগ্য তাহাদের উপর বিতৃষ্ণা জন্মাইয়া দিবে। এইরূপে বিবেক বৈরাগ্যের দুইটী পক্ষ অবলম্বন করিয়া মোক্ষান্বেষী হইতে হইবে।

বিবেক-বৈরাগ্য অনুশীলনের ফলে কামনার স্বরূপ প্রকাশিত হইবে। শেষে মনে হইবে, এই শরীর ধারণই তো কামনা-সম্ভূত। বাসনার বশে জন্মে জন্মে কত যোনির ভিতর দিয়া আবর্ত্তিত হইতেছি। কিন্তু তবুও তো তৃষ্ণার ক্ষয় হইল না। অণুমাত্র কর্ম্মস্পৃহা অন্তরে থাকিতে মুক্তির কথা প্রলাপমাত্র। কর্ম্ম গুণের পরিপোষক, বন্ধনের দৃঢ়তা-সম্পাদক। কর্ম্মবাসনা পরিত্যাগ করিতে পারিলে আর গুণ সকল হইবে না, সুতরাং ফল ভোগের জন্য দেহ পরিগ্রহ করিবারও প্রয়োজন হইবে না।

আবার শুধু স্থূল দেহের অভিমানই নয়, সূক্ষ্ম ও কারণ দেহও আমাদের স্বরূপের আবরক। এই তিনটী দেহের অভিমান ত্যাগ করিয়া নির্ম্মুক্ত হইতে হইবে। যিনি অশরীরী, অর্থাৎ দেহাভিমান রহিত, শ্রুতি বলিতেছেন, তাঁহার প্রিয় কিম্বা অপ্রিয় কিছুই নাই, হর্ষশোক নাই, তিনি পরম সাম্য লাভ করিয়াছেন।

এখন বুঝিতে পারি, কামনাত্যাগেই মোক্ষ, এই কথার অর্থ কতদূর ব্যাপক। কামনা অর্থে দেহ-কামনা পর্য্যন্ত গ্রহণ করিতে হইবে। স্থূল সূক্ষ্ম, কারণ কোনও দেহেরই আশ্রয় চাই না—এমন কোনও সঙ্কল্প আমার মাঝে নাই, যাহার জন্য আমাকে দেহ অবলম্বন করিতে হইবে। আমি আপ্তকাম, এতএব সর্ব্বকাম—মোক্ষকাম ও উদারধী। (ভাগবত)

এইখানেই একটা প্রশ্ন উঠে। সকল কামনা হইতে মুক্ত হইলে যখন মোক্ষের অধিকার মিলে, তখন বেদান্তাধিকারীর পক্ষে মোক্ষেচ্ছারূপ বিশেষণ সঙ্গত হয় কি? মোক্ষের ইচ্ছাও তো ইচ্ছা, সুতরাং কামনা; তাহা হইলে মোক্ষকামনা থাকিতেই বা মোক্ষ কোথায়?

এই স্থলে শ্রুতির তাৎপর্য্যকে সাধনার কষ্টিপাথরে যাচাই করিয়া দেখিতে হইবে। অবশ্য বেদান্ত যে মোক্ষকে লক্ষ্য করিয়াছেন, সেখানে বন্ধন-মোক্ষেরও কোনও কথা উঠিতে পারে না—সেখানে বলা চলে, "ন বন্ধো ন মোক্ষশ্চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহম্।" কিন্তু বন্ধন যাহার পক্ষে অচ্ছেদ্য সত্য; তাহার কাছে

মোক্ষও অবশ্যই একটা কামনার বিষয়। আসলে বন্ধন-মুক্তি কল্পনাই মিথ্যা, তাহা মানি। কিন্তু সে তো শুধু মুখে বলিলেই হইবে না। আমার এখনকার অবস্থাটা কি, তাহাই দেখিতে হইবে। আমি বদ্ধ কি না? যদি বদ্ধ বলিয়া নিজকে বুঝিতে পারি, তবে মোক্ষকল্পনা করিতেই হইবে। এখন স্থূল বন্ধন হইতে মুক্ত হইবার জন্য কামনা করিব, ক্রমে সংস্কারের বন্ধন কাটাইতে চেষ্টা করিব—অবশেষে বন্ধন-মুক্তিকল্পনারূপ চরম সংস্কারকেও প্রত্যাখান করিয়া স্বরূপসিদ্ধি লাভ করিতে প্রযত্ন করিব। মানুষ কাঁটা দিয়া কাঁটা তোলে, শেষে দুইটা কাঁটাই ফেলিয়া দেয়। সত্যান্বেষীকেও এইভাবে চলিতে হইবে। দ্বৈতের রাজ্যে যখন রহিয়াছি, তখন অদ্বৈতকে লক্ষ্য বলিয়া জানিলেও দ্বৈত ছাড়া তাহার সাধন কল্পনা করিতে পারি না।

এই জন্যই বলিতে হয়, শ্রুতি যে কামনা-ত্যাগকেই মোক্ষাধিকার বলিয়াছেন, তাহা আত্মবিষয়ক কামনাকে লক্ষ্য করিয়া নয়, অনাত্মবিষয়ক কামনাই ত্যাগ করিতে হইবে। অনাত্মবিষয়ক যে কামনা, তাহাই প্রকৃত কাম। মোক্ষ আত্মবিষয়ক, সুতরাং মোক্ষবিষয়ক ইচ্ছাকে কামনা বলা যাইতে পারে না। বৃহদারণ্যকোপনিষদ বলিতেছেন, "অথাকাময়মানো যোঽকামো নিষ্কাম আত্মকাম আপ্তকামঃ" (৪, ৪, ৬)। এখানে অকামের সঙ্গে সঙ্গে আত্মকাম ও আপ্তকাম এই দুইটী বিশেষণ জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। সুতরাং বুঝা যাইতেছে, এই তিনটি বিশেষণ একই অবস্থার দ্যোতক বলিয়া তুল্যার্থক। যিনি অকাম অর্থাৎ অনাত্মবিষয়ক কামনা যাহার নাই, তিনিই আত্মকাম অর্থাৎ সংসার না চাহিয়া তিনি আত্মাকেই লাভ করিতে চাহেন; এবং পরিশেষে আত্মকাম বলিয়াই তিনি আপ্তকাম অর্থাৎ আত্মাকে চাহিয়াছেন বলিয়াই তিনি সব পাইয়াছেন—সুতরাং তাঁহার আর চাহিবারও কিছু নাই।

ইহা হইতে প্রমাণিত হইল, মোক্ষাধিকারে যে কামনাত্যাগের কথা রহিয়াছে, তাহার লক্ষ্য অনাত্ম বিষয়। সুতরাং মুমুক্ষুত্ব বা মোক্ষবিষয়ক কামনা বেদান্তাধিকারীর পক্ষে অসঙ্গত বিশেষণ নহে।

শ্রুতি-স্মৃতির প্রমাণ

বিবেক, বৈরাগ্য, ষট্‌কসম্পত্তি ও মুমুক্ষুত্ব—এই চারিটি সাধনের কথাই বলা হইয়াছে। তন্মধ্যে বিবেক, বৈরাগ্য ও ষট্‌কসম্পত্তির অন্তর্গত উপরতি সম্বন্ধে শ্রুতিস্মৃতির প্রমাণ উল্লিখিত হইয়াছে। এক্ষণে সমষ্টিতঃ ষট্‌কসম্পত্তি ও মুমুক্ষুত্বের প্রমাণ প্রদর্শিত হইতেছে।

বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ বলিতেছেন, "শান্তো দান্ত উপরতস্তিতিক্ষুঃ সমাহিতো ভূত্বা আত্মন্যেবাত্মানং পশ্যেৎ"—এই বিবেকটী কাণ্বশাখার পাঠ। ইহাতে আমরা শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা ও সমাধি এই পাঁচটি সম্পত্তির বিধি পাইতেছি। আবার এই বাক্যেরই মাধ্যন্দিন শাখার পাঠে "সমাহিতো ভূত্বা"র স্থানে আছে—"শ্রদ্ধাবিত্তো ভূত্বা।" দুইটি পাঠকেই প্রমাণ বলিয়া মানিয়া লইলে গুণোপসংহার ন্যায় অনুসারে শ্রদ্ধারূপ ষষ্ঠ সম্পত্তির বিধিও পাওয়া যায়। ভিন্ন ভিন্ন স্থানে যদি একই বিষয়ের

আলোচনা থাকে, তাহা হইলে আলোচনাকারীদিগের মনোবৃত্তি অনুযায়ী কোনও কোনও প্রসঙ্গের যেমন পুনরুক্তি ঘটিবে, তেমনি নূতন নূতন প্রসঙ্গের উত্থাপনও সম্ভরপর হইবে। এই অবস্থায় আলোচ্যমান বিষয়টীর সমগ্র তথ্য জানিতে হইলে সাধারণ প্রসঙ্গগুলির সহিত অসাধারণ প্রসঙ্গগুলিও জুড়িয়া দেওয়া সঙ্গত। ইহাকেই বলে গুণোপসংহার ন্যায়। ষট্‌কসম্পত্তির বেলাতেও এই ন্যায় খাটাইয়া সম্পত্তির ছয় সংখ্যা পূরণ করা হইয়াছে।

ষট্‌কসম্পত্তির সাধারণভাবে শ্রুতিপ্রামাণ্য উদ্ধৃত হইয়াছে। এক্ষণে স্মৃতি হইতে এক একটী সম্পত্তির প্রমাণ নির্দ্দেশ করা হইবে। স্মৃতিসমূহের মধ্যে গীতার প্রামাণ্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। সেই গীতাই শম সম্বন্ধে বলিতেছেন—

/০ "যোগারূঢ়স্য তস্যৈব শমঃ কারণমুচ্যতে"—যোগে আরূঢ় সাধকের পক্ষে শমই হইল ইষ্টসিদ্ধির কারণ। (৬, ৩)

"অশান্তস্য কুতঃ সুখম্?"—শমরহিত ব্যক্তির সুখ কোথায়? (৬, ৭)

৵০ দম সম্বন্ধে গীতার উক্তি—

"যদা সংহরতে চায়ং কূর্ম্মোঽঙ্গানীব সর্ব্বশঃ।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যস্তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা॥"

—কূর্ম্ম যেমন তাহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলিকে সঙ্কুচিত করিয়া রাখে, তেমনি ইন্দ্রিয়ের বিষয় হইতে সর্ব্বতোভাবে ইন্দ্রিয়সমূহকে যিনি সংহৃত করিয়া আনেন, তাঁহারই প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠা লাভ করে। (২, ৬৬)

৶০ উপরতি সম্বন্ধে গীতা বলিতেছেন—

"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ"—হে অর্জ্জুন, তুমি সমস্ত ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া একমাত্র আমাতেই শরণ লও, (তুমি তাহাতেই শ্রেয়ঃ লাভ করিবে)। (১৮, ৬৬) এখানে ভগবান্ কর্ম্মসন্ন্যাসরূপ উপরতির কথা বলিতেছেন।

।০ গীতায় তিতিক্ষার উপদেশ—

"মাত্রাস্পর্শাস্তু কৌন্তেয় শীতোষ্ণসুখদুঃখদাঃ।
আগমাপায়িনোঽনিত্যাস্তাংস্তিতিক্ষস্ব ভারত॥"

—হে ভারত, ইন্দ্রিয়ের বিষয়সংযোগ হইতেই শীত-গ্রীষ্ম, সুখ-দুঃখ প্রভৃতি দ্বন্দ্বের উৎপত্তি। ইহারা যেমন আসে, তেমনি চলিয়া যায়—সুতরাং ইহারা অনিত্য। তুমি তিতিক্ষা সহায়ে ইহাদিগকে পরাভূত কর। (২, ১৪)

।/০ সমাধির প্রসঙ্গে গীতা বলিতেছেন—

"সমাধাবচলা বুদ্ধিঃ"—সমাধিতে বুদ্ধিকে স্থির (রাখিতে হইবে)। (২, ৫৩)

"ময্যেব মন আধৎস্ব, ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয়।"—আমাতেই চিত্ত আহিত কর, আমাতেই বুদ্ধি নিবিষ্ট কর। (১২, ৮) এখানে চিত্তকে একাগ্র করিয়া সমাধি সাধনার উপদেশ দেওয়া হইয়াছে।

।৵০ শ্রদ্ধার কথায় গীতা বলেন—

"শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ।"—যিনি শ্রদ্ধাবান্, তৎপর ও সংযতেন্দ্রিয়, তিনিই জ্ঞানলাভ করিয়া থাকেন। (৪, ৩৯)। এখানে প্রসঙ্গক্রমে সমাধি ও দমের কথাও বলা হইয়াছে।

"অজ্ঞশ্চাশ্রদ্দধানশ্চ সংশয়াত্মা বিনশ্যতি"
—যাহারা অজ্ঞান, শ্রদ্ধাহীন ও সংশয়ী, তাহারা বিনষ্ট হয়। (৪, ৪০)

—*—

চরম সাধন মুমুক্ষুত্ব সম্বন্ধে শ্রুতি বলিতেছেন—"মুমুক্ষুর্বৈ শরণমহং প্রপদ্যে"—আমি মুমুক্ষু হইয়া তাঁহার শরণ লইতেছি। (শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ ৬, ১৮)

গীতা বলেন—

"ততঃ পদং তৎ পরিমার্গিতব্যং
যস্মিন্ গতা ন নিবর্ত্তন্তি ভূয়ঃ।
তমেব চাদ্যং পুরুষং প্রপদ্যে
যতঃ প্রবৃত্তিঃ প্রসৃতা পুরাণী॥"

—তারপর যেখানে গেলে আর ফিরিয়া আসিতে হয় না, সেই স্থানটী খুঁজিয়া লইতে হইবে। যাঁহা হইতে চিরকাল এই সংসার-প্রবৃত্তির ধারা বহিয়া চলিয়াছে, সেই আদিপুরুষের আমি শরণ লইলাম। (১৫, ৪)। এটী মুমুক্ষুর আকুল প্রার্থনা।

১ম অনুবন্ধের উপসংহার

অধিকারী নিরূপণ বেদান্তশাস্ত্রের প্রথম অনুবন্ধ। অধিকারীর লক্ষণ নির্দ্দেশ করিতে যাইয়া এক স্থানে বলা হইয়াছিল—"সাধন-চতুষ্টয়সম্পন্ন প্রমাতাই অধিকারী।" সাধন-চতুষ্টয় কি, তাহা লইয়া এতকাল বিচার চলিতেছিল। এক্ষণে আবার আমরা মূল প্রসঙ্গে ফিরিয়া যাইব।

সাধনচতুষ্টয়ের আলোচনা হইতেই আমরা বুঝিতে পারিয়াছি, বেদান্তের অধিকারীর কি কি গুণ থাকা প্রয়োজন। এ সম্বন্ধে সিদ্ধবচনও রহিয়াছে—

প্রশান্তচিত্তায় জিতেন্দ্রিয়ায় চ
প্রহীনদোষায় যথোক্তকারিণে।
গুণান্বিতায়ানুগতায় সর্ব্বদা
প্রদেয়মেতৎ সততং মুমুক্ষবে॥

—যিনি প্রশান্তচিত্ত অর্থাৎ শমসম্পন্ন, জিতেন্দ্রিয় বা দমসম্পন্ন, যিনি দোষহীন অর্থাৎ যাঁহার চিত্ত অতীব নির্ম্মল, যিনি যথোক্তকারী অর্থাৎ কাম্য ও নিষিদ্ধ কর্ম্ম বর্জ্জন করিয়া নিত্যকর্ম্ম ও উপাসনার অনুষ্ঠানে ভগবানের প্রতি যিনি প্রীতিসম্পন্ন হইয়াছেন, যিনি গুণবান—কি না বিবেক, বৈরাগ্য, উপরতি, তিতিক্ষা ও সমাধিযুক্ত, যিনি শ্রদ্ধাসহকারে সর্ব্বদা গুরুর অনুগত হইয়া চলেন, এমন মুমুক্ষু অধিকারীকেই গুরু সর্ব্বদা বেদান্তপ্রতিপাদ্য ব্রহ্মজ্ঞান প্রদান করিবেন।

এই একটী শ্লোকের মধ্যে আমরা বেদান্তাধিকারীর সমস্ত লক্ষণই পাইলাম।

বিচিত্র প্রসঙ্গ

—*—

অবতার-প্রসঙ্গ

গীতাতে "যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানিঃ" বলে যে দুটী শ্লোক আছে, শ্রীকৃষ্ণ তার বক্তা। অবতারতত্ত্বের ওই দুটী শ্লোকই হল বীজ। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ কোন্ ভূমি থেকে কথাগুলো বলেছেন, তাই নিয়েই গোল।

বৈরাগীরা এখানে তিনটী কৃষ্ণ দাঁড় করাতে চান। ঠিক তিনটীও নয়, তাঁদের মতে দুই কৃষ্ণ। একজন কুরুক্ষেত্রে লীলা করেছেন, আর একজন করেছেন বৃন্দাবনে। কিন্তু আমরা অত-শত বুঝি না। আমরা জানি, এক কৃষ্ণেরই দুইভাবে লীলা—ঐশ্বর্য্য ভাবে আর মাধুর্য্য ভাবে। ভগবানে এই দুই ভাবের সামঞ্জস্য হয়েছে। তিনি ষড়ৈশ্বর্য্যশালীও, আবার তিনি প্রেমস্বরূপও। এক এক ভক্ত তাঁর এক এক ভাবের উপাসনা করে। যারা শাক্ত, তারা তাঁর ঐশ্বর্য্যভাবের উপাসনা করে, আর যারা বৈষ্ণব, তারা মাধুর্য্যভাবের উপাসনা করে। একটা বিশ্লেষণপথ, আর একটা সংশ্লেষণপথ। শক্তি অনন্ত, তার প্রকাশেও অনন্ত বৈচিত্র্য। কিন্তু ভাব এক—অখণ্ড। অথচ শক্তি ও ভাব দুই-ই ওতপ্রোত হয়ে রয়েছে।

ভগবানের যখন অবতার হয়, তখন কর্ম্মের সমষ্টি আশ্রয় করে হয়। তিনি নিজে দেহ ধারণ করেন না—দেহ তৈরী হয় জগতের কোনও মহাপুরুষের। জগতের হিত কামনা করতে করতে যাঁরা জগতের কোনও বিশেষ অধিকার পেয়েছেন, যাঁরা আধিকারিক পুরুষ, তাঁদের দেহেই তিনি আবির্ভূত হন। একটা দেহ আশ্রয় করতে হলেই তার কারণ বা বীজ থাকা চাই। তা থেকে সূক্ষ্মের সৃষ্টি হবে—তারপর স্থূল। কিন্তু ভগবানের তো কামনা বা বাসনা নাই—যাতে তাঁর কারণদেহ থাকবে। তাই মহাপুরুষদের যে জগতের হিত করবার কামনা, তাই আশ্রয় করে ভগবানের ইচ্ছার উদ্ভব হয়। সেই কারণ হতেই ক্রমে তাঁর আবির্ভাব সম্ভব হয়। কাজেই জগতের যে যেখানে যা কিছু হিত কামনা করছে, তার মাঝেই ভগবানের আবির্ভাব হচ্ছে।

অবতার আর গুরুতে তফাৎ এই যে, গুরু ব্যষ্টিকে নিয়ে, আর অবতার সমষ্টির কর্ম্মকে নিয়ে। তাই গুরু কৃপা করেন দু'চার জনকে, কিন্তু অবতার কখনও দু'চার জনের জন্য আসেন না। তিনি আসেন সমস্ত জগতের অধোগতির স্রোত রুদ্ধ করতে। তাই তিনি সার্ব্বভৌম। তবে দেশভেদে তাঁর ভেদ হয় বটে। এক এক দেশের প্রয়োজন অনুসারে তিনি আসেন। তিনি মহম্মদ হয়ে আরবদেশে এসেছিলেন, যিশু হয়ে ইউরোপে এসেছিলেন, জরাথুস্ত্র হয়ে পারস্যে এসেছিলেন, আবার কত রূপ ধরে আমাদের এ দেশে এসেছেন।

শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণ অবতার। নারায়ণ ঋষির দেহে তাঁর আবির্ভাব হয়েছিল। আর অন্যান্য পুরাণের অবতার গুণাবতার। ভাগবতে তার সংখ্যা দিয়েছে চব্বিশ

পুরাণে দশাবতারের কথা আছে। এগুলো জগতের ক্রমবিকাশের স্তর। আধুনিক বিজ্ঞানের সঙ্গেও এটা বেশ মিলে যায়।

স্বেদজের কথা ধরা হয়নি। প্রথমতঃ অণ্ডজের মাঝে মাছের কথা ধরা হল। মাছ জলচর। তার পর এল কূর্ম্ম। সে জলচর স্থলচর দুইটাই। তার পর বরাহ—সম্পূর্ণ স্থলচর। তার পর নৃসিংহ—অর্দ্ধেক মানুষ, অর্দ্ধেক পশু। তরপর বামন—সে মানুষ বটে, কিন্তু তখনও তার মাঝে মনুষ্যত্বের পূর্ণ বিকাশ হয়নি—তাই সে খর্ব্বাকার। তারপর তিন রাম। দাশরথি রামেই মনুষ্যত্বের চরম বিকাশ। তাই তিনি গৃহস্থের আদর্শ সমাজের আদর্শ। রামায়ণখানাও তাই আদর্শ সমাজচিত্র।

প্রাণায়াম-প্রসঙ্গ

প্রাণায়াম করতে হলে তিনটী জিনিষের দিকে লক্ষ্য রাখতে হয়—সংখ্যা, মাত্রা আর টান। সংখ্যার কথা সবাই জানে, যেমন ৪।১৬।৮, ৮।৩২।১৬ বা ১৬।৬৪।৩২। এর বেশী আর সংখ্যার প্রয়োজন হয় না। কিন্তু সংখ্যা না বাড়াতে পারলেও মাত্রায় আমরা প্রাণায়াম বড় করতে পারি। যেমন এক, দুই, তিন, চার—এমন করে সংখ্যা গোণা যায়; আবার তার চেয়ে বড় মাত্রা নিতে হলে এক; দুই; তিন; চার—এমনও গোণা যায়। তার চেয়েও বড় মাত্রায়—এক। দুই। তিন। চার—এমনও গোণা যায়। এমনি করে একটা প্রাণায়ামই হয়ত এক মিনিট কাল পর্য্যন্ত করা যায়।

তারপর হচ্ছে টান। দেখো, নিঃশ্বাস টানবার সময় সাধারণতঃ আমাদের নাভিতে টান পড়ে। কিন্তু, বাস্তবিক নিঃশ্বাসটা বুক পর্য্যন্তই নামে, তার বেশী যায় না। এখন, প্রাণায়ামে যোগীর লক্ষ্য থাকবে, এই নিঃশ্বাসকে আর নীচে যেতে না দেওয়া। কাজেই নিঃশ্বাস টানবার সময় পেট চাক করে যাতে নিঃশ্বাস না টানা হয়, তার দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। তাতে বুকের উপরই একটা চাপ পড়বে, আর কোথাও নয়। ক্রমে এই নিঃশ্বাসকে আরও উপরের দিকে তুলে নিতে হবে। তারপর শেষে এমন হবে যে, নিঃশ্বাস আর কণ্ঠের নীচে নামবে না। এই হচ্ছে টানের বিশেষত্ব।

প্রাণায়ামের সময় কোনও কঠোর পরিশ্রম করতে নাই। তবে সামান্য পরিশ্রমের কাজ করা যায়। কিন্তু তারও কৌশল আছে। প্রাণায়াম দুই রকম—বহিঃপ্রাণায়াম আর অন্তঃপ্রাণায়াম। বায়ুটা ভিতরে টেনে নিয়ে আর বের করলাম না, এ ও যেমন কুম্ভক, তেমনি ছেড়ে দিয়ে আর ভিতরে টানলাম না—এ-ও তো কুম্ভক। সাধারণ কোনও পরিশ্রম করতে হলে দেখবে আমরা বায়ুটা ভিতরে নিই, তারপর কাজটা করি যেমন কোদাল মারতে হলে কোপ ওঠাবার সময় যে বাতাসটা টেনে নিলাম, কোপটা দিয়ে তবে আমরা তাকে ছাড়ি। কিন্তু যদি তা না করে বাতাসটা ছেড়ে দিয়ে তবে কোপটা দিই, তা হলেই ঠিক হবে—প্রাণায়ামকারীর তাতে কোনও অনিষ্ট হবে না।

তারপর স্বভাবতঃই যাদের নিঃশ্বাস খুব বড় বড় হয়ে পড়ে, তাদের বিশেষ সময় প্রাণায়াম করা ছাড়াও দেখতে হবে যে, সব সময়ে নিঃশ্বাসটা ঠিক তাল তালে

পড়ে কি না। তারা অমনি হয়ত বসে রয়েছে, তখনও নিঃশ্বাসটা সাধারণ ভাবে ছেড়ে না দিয়ে একটু ধরে রেখে রেখে ছেড়ে দিতে হয়। এতে প্রাণায়াম সাধনার খুব সাহায্য হয়।

বিজ্ঞান-প্রসঙ্গ

বিজ্ঞান করছে কি? শুধু জড়কে নিয়েই তো নাড়াচাড়া করছে। একটা প্রবন্ধ পড়েছিলাম—"জীবনটা কি?" তার গোড়াতে লেখক রসিকতা করে বলছিলেন, "জীবনটা তো দেখি কিছুই না—একটা কেবল ইঃ, একটা উঃ, আর একটা আঃ।" কিন্তু তাই বলে লেখক যে মীমাংসা দিলেন, সেও তো তেমনি একটা ইঃ, একটা উঃ, আর একটা আঃ—সেও তো কিছু না।

ওরা জীবন বুঝতে গিয়ে কেবল জড় আর প্রাণের পার্থক্যটুকু দেখিয়েছে। যেমন এই চৌকীটা নির্জ্জীব বস্তু, আর তুমি আমি সজীব বস্তু; কিন্তু এই নির্জ্জীবই যে কেমন করে সজীব হল, তার তো কোনও মীমাংসা নাই। প্রাণ কি, তা তো তারা বোঝাতে পারেনি। হিন্দু বলবে, প্রাণ আত্মারই শক্তি।

এই সমস্ত বিজ্ঞান মানুষকে কেবল বহির্মুখী করে দেয়। আগে একটা কিছু দেখে লোকে যেমন ভগবানের লীলা বলে অধ্যাত্মের সঙ্গে তাকে যোগ করে নিত, বিজ্ঞানের যুগে আর তা হয় না। কেননা, বিজ্ঞান তো সকলই বিশ্লেষণ করতে শিখেছে। তাই লোকের মাঝে অশ্রদ্ধা এসে পড়েছে। অথচ ওরা যা জানছে, তাও অসম্পূর্ণ। আজ একজন যে সিদ্ধান্ত করছে, বিশ বছর পরে আর একজন সে সিদ্ধান্ত উল্টে দিচ্ছে।

কিন্তু ওদের চিত্তের একাগ্রতা আছে এই যারা বিজ্ঞানের গবেষণা করছে, তারা সব দিক হতে মনটাকে গুটিয়ে এনে, তবে তো তার তত্ত্ব বুঝতে চেষ্টা করেছে। তাই তাদের মাঝে একটা শক্তির সাধনা হচ্ছে। সেটা সংযম সাধনা।

কিন্তু এ সংযম সাধনাতেও সত্য দর্শন হয় না। হিন্দুর যে সংযম-প্রয়োগ, সে আরও উঁচু। তাতে কোনও একটা বস্তু জানতে হলে, সে বিষয়ে মনকে একাগ্র করে, তার পর মনকে নিরুদ্ধ করে সমাধি আনতে হয়; তবে তা হতে সত্য ফুটে ওঠে। ওরা মনকে একাগ্র করে মাত্র। কিন্তু মনকে নিরুদ্ধ না করলে তো সত্য জাগবে না। কেননা মনে তো সংস্কার থেকে যায়—সুতরাং একাগ্র মনে যে দর্শন হবে, তাতেও তো তোমার সংস্কারের ছাপ থেকে যাবে।

এই যেমন ধর, এই থামটা। এর সম্বন্ধে যদি আমাকে সত্য জানতে হয়, তা হলে প্রথমে সব দিক হতে মনকে গুটিয়ে এনে এতে আমাকে ধারণা করতে হবে। এই হল প্রথম step। তারপর যখন তন্ময়তায় আমার মনটাও তদাকারকারিত হয়ে যাবে, শুধু থামটাই আমার মনে জাগবে, তখন হবে দ্বিতীয় step। এই হল ধ্যানের অবস্থা বা একাগ্র ভাব। কিন্তু তার পরেও যদি মনকে আমি নিরুদ্ধ করি, থামটার সঙ্গে যদি আমার একাত্মভাব হয়, তাহলেই তার সম্বন্ধে যা সত্য, তা আমি জানতে পারব। তখনই এই থামটার তত্ত্ব জানা হল।

তাই আমাদের মতে জগতের সকল জিনিষেরই চারটা রূপ আছে—স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ আর তুরীয়। তুরীয়ে না গেলে সত্য দর্শন হয় না।

কিন্তু পাশ্চাত্য বিজ্ঞান যে পথ ধরেছে, তা ঠিকই ধরেছে। জড়কে জানতে হলে, তার উপায়ও তেমনি হওয়া চাই। নইলে অধ্যাত্মদৃষ্টি দিয়ে দেখতে গেলে এত বড় জিনিষ জেগে ওঠে, যার কাছে এ সমস্ত তুচ্ছ হয়ে যায়। তবে এদের অনুসন্ধানও বেশী দূর পর্য্যন্ত এগুবে না।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং

আরণ্যক

"যজ্ঞেন বাচঃ পদবীয়মায়ন্ তামন্ববিন্দন্ ঋষিষু প্রবিষ্টাম্॥"

—ঋগ্বেদ সংহিতা ১০।৭১।৩

অক্ষমা, অত্যাচারের পীড়নে হতজ্ঞান হইও না। নির্ব্বাক্ নির্ব্বিকার হইয়া দুঃখকে সহ্য করিতে হইবে। একদিন দুঃখ দূর হইয়া সুখের দিন আসিবে, এমন আশাও করিতে নাই। দুঃখ যেমন চাহি না, তেমনি সুখও চাহিব না। দুঃখ-সুখ কালের দুইটী চরণ—একটী পিছাইয়া থাকিলে আর একটী আগাইয়া যাইবেই, নতুবা জগৎ যে পঙ্গু হইয়া এক জায়গায় বসিয়া থাকিত। দুঃখ-সুখকে সমদৃষ্টিতে দেখিতে শিখাই হইল জ্ঞানীর কাজ। তা ছাড়া আর একটা কথা আছে। যেখানে দেখিবে, দুঃখের উপর দুঃখ পুঞ্জীভূত হইতেছে, অথচ প্রতীকারের প্রার্থনাও নাই, সম্ভাবনাও নাই, জানিবে, সেইখানেই ভগবৎ-শক্তির বিশেষ প্রকাশ হইবে। শ্রীকৃষ্ণ ভারতের ভাগ্যনিয়ন্তা। ঝড়-ঝঞ্ঝা বজ্রপাতের মাঝে কারাগারের অন্ধতম কক্ষে তাঁহার জন্ম হইয়াছিল। আমাদেরও এই নিয়তি। যেখানে দেখিবে, অসহনীয় দুঃখ, অসীম নির্য্যাতন, অথচ যেখানে অতুল তিতিক্ষা—সেইখানেই ভগবান নামিয়া আসিবেন—দুঃসহ কারাগারের অন্ধ কক্ষ আলো করিয়া তিনি ফুটিয়া উঠিবেন। দুঃখীর দুঃখের এর চেয়ে আর কি প্রতিদান হইতে পারে?

*

আত্মসমর্পণের ভাব মূলে না থাকিলে জপ হয় না। কেবল মনে মনে একটা কিছু আওড়ানোই জপ নয়। মাকে না দেখিলে শিশু যেমন ব্যাকুল হইয়া কেবল মা মা বলিয়া ডাকে—অথচ সে

যেমন জানে, কেবল ডাকিয়া কাঁদিয়া মায়ের মনে মমতা জাগাইয়া তাঁহাকে কাছে আনা ছাড়া তাহার আর কোনও সাধ্য নাই—তেমনি প্রপন্ন হইয়া সমস্ত প্রাণ লুটাইয়া দিয়া জপ করিতে হইবে। এই তদ্‌গত চিত্তের জপ সব সময় চলিতে পারে। ইহার জন্য শুচি-অশুচি বিচারের কোনও প্রয়োজন নাই। প্রতি নিঃশ্বাসে নিঃশ্বাসে জপ চলিবে। নিঃশ্বাস যেমন সর্ব্বদাই বহিতেছে, যতদিন বাঁচিয়া থাকিবে, ততদিন অবিরাম বহিবেই, জপও তেমনি অবিরাম ও অনায়াস হওয়া চাই। ইহার মূলে বৈজ্ঞানিক যুক্তিও আছে। নিদ্রা, মৃত্যু, প্রলয়—তিনটাই আচ্ছন্নের ভাব। ইহাদের আবর্ত্তে পড়িলে আর কাহারও স্বাতন্ত্র্য থাকে না এবং স্বাতন্ত্র্য থাকে না বলিয়াই অবশ হইয়া প্রকৃতির আবর্ত্তনে আবর্ত্তিত হইতে হয়। প্রকৃতির আবর্ত্তন হইতে নিস্তার পাইতে হইলে নিদ্রা জয় করিতে হইবে, মৃত্যু জয় করিতে হইবে। জপ তাহার সহায়। মানুষ মরিলে সব পড়িয়া থাকে, কেবল মাত্র শ্বাস বা প্রাণকে অবলম্বন করিয়া আত্মা বাহির হইয়া যান। অবিরাম জপ দ্বারা যদি শ্বাসের সঙ্গে মন্ত্রকে গাঁথিয়া লওয়া যায়, তবে নিদ্রাতে যেমন শ্বাসের তালে তালে জপ হইবে, তেমনি মৃত্যুকালেও শ্বাসের সহিত মন্ত্র আমাদের সঙ্গে থাকিবে। মৃত্যুর পর যদি মন্ত্র স্মরণ থাকে, তবে গুরুও স্মরণ থাকিবে। তাঁহাকে স্মরণ করা মাত্রই তিনি আসিয়া পথ দেখাইয়া দিবেন—মৃত্যুর আচ্ছন্ন ভাব কাটিয়া যাইবে—জীবন হইতে মরণে নয়—জীবন হইতে নব জীবনে আমাদের যাত্রা সুরু হইবে—সাধনার সূত্রে ইহলোকের সহিত পরলোকে যোগ হইবে।

*

উচ্চভাব সুদৃঢ় হইলেই তাহা উন্নত সংস্কারে পরিণত হয়। উন্নত সংস্কারের সমষ্টিই আদর্শ জীবন। এই আদর্শ জীবন গঠন করিতেই সচেষ্ট হইও। যে যত ভাবুক, সংসারের ঘাত-প্রতিঘাতও তার পক্ষে তত অধিক বেদনার কারণ হইয়া উঠে; ইহার মধ্যে ভগবানের মঙ্গল ইঙ্গিত জানিয়া আনন্দ কর। তাঁর উপর নির্ভর কর, তবেই নির্ভয় হইবে। নিজকে যন্ত্রস্বরূপ মনে কর, তবেই মিথ্যা অহমিকা দূর হইয়া যাইবে। তোমার শুদ্ধ আনন্দ ও স্বরূপলাভের এই পথ।

*

একটা বিশেষ দিন ক্ষণে ভগবানের দেখা পাইব, এমন কল্পনার কি প্রয়োজন? নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস আমাদের পক্ষে যেমন সহজ, তিনিও তেমনি সহজ—সব সময়েই তিনি বুক জুড়িয়া আছেন। বর্ত্তমানের মাঝে সদাজাগ্রৎ থাকিয়া এইটুকু বুঝিতে পারাই হইল পুরুষার্থ। তাঁর কৃপা হঠাৎ একদিন অনেকখানি করিয়া পাইব, এমন ভরসায় বসিয়া না থাকিয়া এই নিত্যকার জীবনের সুখ দুঃখের মাঝেই তাঁর লীলা কিরূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহাই অনুভব করিতে শিখ। আনন্দ সংবিদের গাঢ়তাই হইল সাধনার উন্নতির পরিমাপক। সে সংবিদ্ নির্নিমিত্ত, বাহিরের কিছুর উপর তাহার প্রতিষ্ঠা নয়। চিত্তের গঠন ও শুচিতা অনুযায়ী একই ব্যাপার হইতে নানা জনে নানা রস দোহন করিয়া লয়, একই ব্যাপারে আনন্দের গভীরতার তারতম্য হয়। ইহা হইতেই প্রমাণ হয়, সত্তা অন্তরে। সে যে কখন কোন রূপে কাহার মাঝে দেখা দিবে, তাহা আমরা জানি না। কিন্তু বাহিরের

কোনও বস্তুকে অবলম্বন করিয়া সে ফুটিবে না। অবশ্য সামান্য বুদ্ধিতে আমরা মনে করি, উদ্দীপক পাইলে বুঝি আনন্দ শীঘ্র জাগে। কিন্তু এ কথার কোনও মূল্য নাই। উদ্দীপক থাকা সত্ত্বেও আনন্দ হইতেছে না—এমন ঘটনা নিত্য দেখিতেছি। বাস্তবিক, জগৎ চলে কার্য্য-কারণের শৃঙ্খলা ধরিয়া, কেননা তাহার স্বাতন্ত্র্য নাই—কিন্তু সত্য; আনন্দ চলে রাজার মত, তার খেয়াল-খুসীর পথে। অন্তরের অন্তর দিয়া তাহার পথ। সুতরাং নিজকে সেইখানে উন্মুক্ত রাখিতে হইবে—যে গোপন পথে রাজা চলেন, সেই পথের ধারে বসিয়া হাত পাতিতে হইবে। আমার পথে তিনি আসেন না—তাঁর পথেই আমাকে যাইতে হইবে। তাই বলিতেছিলাম, বাহিরের ভরসা ছাড়িয়া দিয়া তদ্‌গত হও—নতুবা তাঁর দেখা পাইবে না।

*

জগতে আসিয়াছ সত্য, কিন্তু জগৎটাকেও চিনিলে না, নিজকেও বুঝিলে না। এই আসার পিছনে যে মহদুদ্দেশ্য রহিয়াছে, সে কথা তো আর মনে নাই—সে স্মৃতির মাঝে দেহের আড়াল পড়িয়া গিয়াছে, তাই আজ তুমি দিশেহারা, বিভ্রান্ত। দাসত্বেই তোমার দিন কাটিতেছে—দেহের দাস তুমি, মনের দাস তুমি, বুদ্ধির দাস তুমি। অবরোহণের পথ হইতে আরোহণের পথে তোমাকে চলিতে হইবে, নিজে নিজকে পূর্ণরূপে উপভোগ করিতে হইবে। অজ্ঞান আঁধারের কোলে আরামে শয়ন করিয়া তাহা সম্ভব নয়। তাই শিবের তৃতীয় নেত্রের মত তোমার জ্ঞাননেত্র ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়া যতদিন না এই সৃষ্টির চির-রহস্যান্ধকারকে দূর করিবে, যতদিন এই জগৎ ও তোমার জীবন করামলকবৎ সহজভাবে প্রতীত না হইবে, ততদিন তোমার দাসত্ব কিছুতেই ঘুচিবে না। এই তো তোমার অপরাধ। তুমি যে প্রভু, সে কথাটা ভুলিয়া থাকাটাই তো মহাপাপ। এই প্রভুত্বে প্রতিষ্ঠিত না হইলে তোমার দৈন্য দুর্ব্বলতা তো কোনোদিন ঘুচিবে না। কত বিভিন্ন দিক দিয়া কত বিচিত্র ভাবে এই অপরাধের শাস্তি—এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত, তোমাকে বহন করিয়া চলিতে হইবে।

*

নিজকে দুর্ব্বল ভাবাই হচ্ছে সব পাপের সেরা পাপ। এ পাপকে কেহ ক্ষমা করিতে চায় না। সে জন্য তুমি যতই মানুষের উপর অভিমান বা বিরক্তি প্রকাশ কর না কেন, যতই জগৎটাকে বিচারহীন দয়ামায়া-পরিশূন্য স্থির করিয়া তাহাকে দোষী সাব্যস্ত কর না কেন, কিছুতেই স্বস্তি পাইবে না। বাস্তবিকই কি তুমি দুর্ব্বল? বাস্তবিকই কি তুমি অসমর্থ বা দীন? না, তা তো নয়। জন্মজন্মান্তরের সংস্কারজ আবর্জ্জনা ঠেলিয়া ফেলিয়া উঠিতে যে চেষ্টাটুকু প্রয়োজন, তাহা হইতে বাঁচিবার জন্য দৈহিক মানসিক ক্ষণস্থায়ী আরামটুকুকে কেন্দ্র করিয়া যে মন গড়িয়া উঠিয়াছে, তোমার অশক্তি সেই মনেরই আলস্যপ্রসূত জড়তা। ইহাকে প্রশ্রয় দিয়া নিজকেই কেবল প্রতারণা করিতেছ।

*

ভুল হয় কখন?—যখন মনে করি, জগৎ এক দিকে, আর আমি একদিকে। বাস্তবিক এই মনে করিয়াই তো আমরা কাজ করি-

তেছি। সব কাজে, সব কথায় কেবল "হাম্বা" রব। সুখ দুঃখ, আশা-নিরাশা—সবই আসিয়া "আমাকে"ই বিঁধে। অথচ এই আমির মূল্য কতটুকু? কতগুলি বিশিষ্ট অনুভব আর বেদনা লইয়াই তো আমি। এমন আমি তো একা আমার নয়—সবার মাঝেই তো 'আমি' আছে। আর সকলের মাঝে যেমন ক্রিয়া হয়, আমার মাঝেও তেমনি হইতেছে। তবে আর বিশেষ করিয়া আমার আমির উপর মমতা কেন? আমার আমিকে বড় করিবার জন্য অপরের আমিকে ঠেলিয়া ফেলিবার অবিরাম চেষ্টাই বা কেন? অপরের আমিকে যদি বড় হইতে না দিই, তবে আমার আমিকেও বড় হইতে দিব না। আর যদি মমতা করিয়াই চলিতে হয়, তবে শুধু আমার আমির উপরই মমতা কেন—সবার আমির উপরই মমতা থাকিবে। ফল কথা, তোমার আমিকে দশের সামিল করিয়া দাও—আর দশজনের ব্যবহার তোমার কাছে যেমন লাগে, তোমার ব্যবহার তোমার কাছে ঠিক তেমনি লাগুক—দেখিবে, এক নূতন দৃষ্টি খুলিয়া গিয়াছে।

*

হৃদয়কে মহান্ কর, প্রশান্তিতে পূর্ণ কর। সর্ব্বদাই সব কাজের মাঝে একটা বৃহৎভাবে প্রতিষ্ঠিত থাক। সুখের কারণ ঘটিলে, যদি উল্লসিত হও, তবে দুঃখের কারণ ঘটিলেও যন্ত্রণা অনুভব করিবে, ইহা স্বাভাবিক। "দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ" না হইলে ভাবের বন্ধন কোনদিন চিরস্থায়ী ও সুদৃঢ় হইবে না। জীবন যখন অনুকূল মনে হয়, চারিদিকে সুখের হাওয়া বহিতে থাকে, তখন কল্পলোকে বসিয়া বড় বড় ভাবের মাঝে ডুবিয়া থাকা যায়। কিন্তু জীবন যখন আবার প্রতিকূল হইয়া উঠে—মনের মাঝে অশান্তির আগুণ ছড়াইয়া পড়ে, তখন ভাবের চেয়ে অভাববোধটাই বেশী তীব্র হইয়া উঠে—অন্তরের সমস্ত রস, সমস্ত কোমলতা শুকাইয়া যায়। তাই বলি, সুখের উপরও স্পৃহা রাখিও না, কোনও কামনাকে বা সঙ্কল্পকে একান্তভাবে জড়াইয়া ধরিও না—দুঃখকেও দুঃখ মনে করিও না—তবেই জীবন সহজ হইবে।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থ
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং
কলিকাতা

সংবাদ ও মন্তব্য

আশ্রম-সংবাদ

বিগত ২৪শে ফাল্গুন শ্রীমৎ পরমহংসদেব উত্তরবঙ্গ পরিভ্রমণে বাহির হইয়াছেন। তিনি জলপাইগুড়ি, কুচবিহার, বগুড়া, রংপুর প্রভৃতি অঞ্চল হইয়া চৈত্রের শেষভাগে কলিকাতা পৌঁছিবেন।

ওঁ তৎ সৎ

আর্য্য-দর্পণ

(সনাতন ধর্ম্মের মুখপত্র)

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং
কলিকাতা

১৩শ বর্ষ } চৈত্র { ১২শ সংখ্যা

স জনাস ইন্দ্রঃ

—*—

[ঋগ্বেদ সংহিতা—২।১২।১]

যো জাত এব প্রথমো মনস্বান্
দেবো দেবান্ ক্রতুনা পর্য্যভূষৎ।
যস্য শুষ্মাদ্ রোদসী অভ্যসেতাং
নৃম্ণস্য মহ্না স জনাস ইন্দ্রঃ॥

যঃ পৃথিবীং ব্যথমানামদৃংহদ্
যঃ পর্ব্বতান্ প্রকুপিতাঁ অরম্ণাৎ।
যো অন্তরীক্ষং বিমমে বরীয়ো
যো দ্যামস্তভ্নাৎ স জনাস ইন্দ্রঃ॥

যো হত্বাহিমরিণাৎ সপ্তসিন্ধূন্
যো গা উদাজদপধা বলস্য।
যো অশ্মনোরন্তরগ্নিং জজান
সংবৃক্ সমৎসু স জনাস ইন্দ্রঃ॥

যেনেমা বিশ্বা চ্যবনা কৃতানি
যো দাসং বর্ণমধরং গুহাকঃ।
শ্বঘ্নীব যো জিগীবাঁ লক্ষমাদদ্‌
অর্য্যঃ পুষ্টানি স জনাস ইন্দ্রঃ॥

নিখিলের আদি-জাত যে দেবতা মনস্বী উদার,
ত্রিদশমণ্ডলে যাঁর বীরকীর্ত্তি হল অলঙ্কার।
কাঁপে দ্যাবা—কাঁপে পৃথ্বী বীর্য্য যাঁর করিয়া স্মরণ,
মহতী সেনার পতি—তিনি ইন্দ্র, জেনো জনগণ।

ব্যথাতুরা পৃথিবীরে দৃঢ়বলে করিয়া অচল,
গতিহীন করিলেন প্রকুপিত পর্ব্বতের দল;
অন্তরীক্ষে দিকে দিকে করিলেন যিনি প্রসারণ,
স্তব্ধ দ্যাবা বীর্য্যে যাঁর—তিনি ইন্দ্র, জেনো জনগণ।

অহিহন্তা যে দেবতা মুক্ত করে সপ্তসিন্ধু-ধার,
বলের কবল হতে গবীগণ করেন উদ্ধার,
গণ্ডশিলা অন্তরেতে অবহেলে সৃজে হুতাশন,
অরিঘাতী যুদ্ধে যিনি—তিনি ইন্দ্র, জেনো জনগণ।

কিমায়ায় রচিলেন এই বিশ্ব—নিত্য ক্ষয় যার,
অধম দাসের জাতি গুহালীন লীলায় তাঁহার;
বিঁধি লক্ষ্য ব্যাধ হেন, অরিপুষ্টি করেন হরণ
বিজয়ী বীরের গর্ব্বে—তিনি ইন্দ্র, জেনো জনগণ।

প্রেমের বিধান

বর্ত্তমানে তুমি যে অবস্থাতেই থাক না কেন, তাকেই উঁচু নজরে দেখ—বর্ত্তমানকে উজ্জ্বল করে তোল, তবেই ব্রহ্মভাব অনায়াস মহিমায় তোমার মাঝে ফুটে উঠবে। তার জন্য কোনও কিছুকে ধ্বংস করবার প্রয়োজন নাই, কেননা স্বরূপানুভব সে তো দূরের কোনও জিনিষ নয়। ছেলে যে ছেলেমানুষী করে, আবদার করে, তাতেই ক্রমে তার ছেলেমানুষী ছেড়ে যায়, সে পাকা হয়—বুড়োর নকল করলেই ছেলে বুড়ো হয় না।

ত্যাগই সুন্দর। ত্যাগ কি? স্বার্থপর জীবনের নিরসন। অভিমানে স্ফীত জীবনের মোহ কাটাতে পারলেই অনন্ত জীবনের অধিকারী হওয়া যায়—এ একেবারে অতি নিশ্চিত কথা। সূর্য্যকিরণের মাঝে যতগুলি রং রয়েছে, সবগুলি স্বার্থপরের মত শুষে নেবার মতলব যার আছে, তাকেই আমরা কালো কুৎসিৎ দেখি। আর যে রং ছাড়তে পারে, সেই শুভ্র হয়, উজ্জ্বল হয়। সূর্য্য হলেন সকল শক্তির এবং মাধ্যাকর্ষণের কেন্দ্র —তিনি অবিরাম চারদিকে আলো ছড়িয়ে দিচ্ছেন, তাপ বিকিরণ করছেন।

ছেলেরা মিষ্টি, কেননা আমিত্বের পচা ডোবায় তারা আটকে থাকেনি। আত্ম-ত্যাগের, নিঃস্বার্থ ভালবাসার নিদর্শন যেখানে দেখব, সেখানেই আমরা মুগ্ধ হব। প্রেমিককে সবাই ভালবাসে। দূর হয়ে যাক্ শাস্ত্রযুক্তি আর দার্শনিকের তর্ক! আমি ও সবের মূল্য জানি। সৌন্দর্য্যই প্রেম, প্রেমই সৌন্দর্য্য। আর এ দুটীই হচ্ছে ত্যাগ। ইংলণ্ডের সন্ন্যাসী কার্পেণ্টারের কথায় বলতে গেলে "নিজের কথা ভাবা একদম ছেড়ে না দিলে আর তোমার স্বস্তি নাই। কিন্তু সেটাও আধাআধি করে হবার নয়। অভিমানের একটী দানা থাকলেও সব নষ্ট হয়ে যাবে। এ যে কঠিন নয়, এমন কথা আমি বলছি না—কিন্তু এ ছাড়া আর কোনও মীমাংসাও খুঁজে পাচ্ছি না।"

মানুষ, যতদিন বেঁচে আছ, ততদিন প্রেমস্বরূপ হয়ে তোমার বাঁচা উচিত। বুদ্ধ, খৃষ্ট, স্বামী উপাধিধারী সন্ন্যাসী বা অতীতে যাঁরা পূজা পেয়ে এসেছেন, তাঁদের অপূর্ণ আদর্শে নিজকে আচ্ছন্ন করে রেখো না। মানুষের ইচ্ছার সামনে ইতিহাস সঙ্কুচিত হয়ে যায়—সে এখন একের ইচ্ছাই হোক্ না কেন। কাল আর কার্য্য-কারণের ধাঁধায় আঁৎকে উঠো না। প্রেমস্বরূপ হয়ে জীবন যাপন কর, দেখবে, বিধির সমস্ত বিধানকে তুমি আত্মসাৎ করেছ। অন্তরের সুরের সঙ্গে সুর মিলিয়ে নাও, দেখবে কাল তার তাল ঠিক রেখে চলেছে।

ওই তো, ঘড়ির ছোট কাঁটা দুটী! লৌহমুষ্টিতে তারা জগৎটাকে শাসন করছে। অমর মানুষের জীবনটা ওইটুকু বেষ্টনীর মাঝে আটকা পড়ে কালের কাছে দাসখত লিখে দিয়েছে—এ যেন মানুষের উপর কালের

নিদারুণ প্রতিশোধ। কি আশ্চর্য্য মানুষের ভাগ্যবিবর্ত্তন। প্রকৃতির সংহততন্ত্রে ও তার ঐক্যনীতিতে বিশ্বাস নাই বলে মানুষ ভয়ে আতুর হয়ে রয়েছে। হায় রে অবিশ্বাস! ভয় করছ কেন, এ ঘটে কি তুমি ছাড়া আর কেউ রয়েছে? রাগে কখনো ঘড়ি কাছে রাখেন না—কিন্তু তা বলে তাঁর কখনো সময় উৎরে যায়নি। ভালবাসার সম্মোহন যেখানে আছে, কাল সেখানে কখনো গরহাজির হবে না। একটা হাওয়ার যাঁতাকল যদি ঠিক ঠিক বসিয়ে দাও, তবে দশ দিকের হাওয়াই মিলে-জুলে তাকে চালাতে থাকবে। প্রকৃতিও তেমনি স্বেচ্ছায় তোমার হয়ে খাটবে। প্রেমে যখন প্রতিষ্ঠা লাভ করবে, তখন সকল রকম আশ্চর্য্য ব্যাপারই তোমার দ্বারা সম্ভব হবে।

আমরা যখন রফা করি, ভদ্রতা দেখাই, ভগবান তখন মনে মনে হাসেন। আমার নিকটতম প্রতিবেশী হচ্ছেন আত্মা, তাঁর কাছে বিশ্বাসঘাতক হয়ে দরদূরান্তের প্রতিবেশীর ইমানদার হতে যাই—এমনি আমাদের মতিভ্রম; শুনলে হাসি পায় না?

এক ভিখারী এসেছিল এক ভদ্রমহিলার কাছে ভিক্ষা চাইতে। ভিখারীর ঘরবাড়ী চালচুলো কিছুই নাই; কিন্তু তবুও তার স্বচ্ছন্দ বিচরণ দেখে মহিলার হিংসা হল। ভিখারী চলে গেলে পর তিনি তাঁর স্বামীর কাছে মিথ্যা করে বললেন যে, তাঁর মা মরেছে বলে আজ চিঠি পেয়েছেন। হয়ত শাশুড়ী টাকা-পয়সা রেখে গিয়েছেন মনে করে স্বামী স্ত্রীকে সেই সন্ধ্যাতেই বাপের বাড়ী যাবার অনুমতি দিলেন। মহিলাটী কাছের ইষ্টিসনে গিয়ে একখানা টিকিট কিনলেন। কিন্তু তিনি বাপের বাড়ী না গিয়ে, খাঁচার পাখী বহুদিন খাঁচায় আটকা থেকে ছাড়া পেলে যেমন করে বনের দিকে উড়ে যায়, তেমনি করে তিনি বনের পানে ছুটে চললেন। এতদিন ধরে সংসারের যে দুঃসহ বোঝা বয়ে এসেছেন, বনে গিয়ে প্রাণ খুলে হেসে আজ যেন তাঁর সে বোঝা হাল্কা হয়ে গেল। তিনি ইচ্ছা-সুখে ঘুরে বেড়াতেন, চাষীদের কাছে খাবার চেয়ে খেতেন, আর সূর্য্য ডুবলে তাদেরই একটা খড় গাদার তলায় শুয়ে ঘুমাতেন।

একদিন সকাল বেলায় মনের আনন্দে তিনি ঘুরে বেড়াচ্ছেন, এমন সময়, সর্ব্বনাশ! ও কার গলার আওয়াজ? এ যে তাঁর স্বামীর গলা—সেই সে দিনকার ভিখারীটার সঙ্গে তিনিও বেরিয়ে পড়েছেন। স্ত্রীর মত তাঁর কাছেও জীবনটা দুঃসহ রকম একঘেয়ে হয়ে উঠেছিল, তাই কিছুদিনের জন্য তিনিও মুক্তি চান। কিন্তু পরস্পর পরস্পরের কাছে বিশ্বাসঘাতক হবেন বলে কেউ সে কথা কারু কাছে ভাঙ্গেননি। আমরা যে পরকে খুসী করবার জন্য এত সব করি, তার মূল্য মাত্র এইটুকু। নিজের কাছে তুমি খাঁটী হও—তা হলে রাতের পর দিন আসা যেমন ধ্রুব, তেমনি তুমিও যে কারু কাছে বেইমান হবে না—এ-ও ধ্রুব। আদম আর হবার মত লজ্জা ঢাকার প্রবৃত্তি হতেই সমস্ত পাপের উৎপত্তি। পরমাত্মাই একমাত্র ঈশ্বর। তিনি থাকতে অপরকে মানাই হচ্ছে চরম নাস্তিকতা। পরমাত্মার কাছে যিনি খাঁটী রয়েছেন, তিনিই জগজ্জ্যোতিঃ। চরম ব্যক্তিত্ববাদই হচ্ছে চরম বিশ্বাত্মবাদ। বাস্তবিক সর্ব্বভূতহিতকে বিশ্বাত্মবাদ বলাটাই মহাভ্রম। আমরা পরোপকার করছি বলে

যে রব তুলি, তাতে নিজেরাই কেবল কেন্দ্রচ্যুত হয়ে পড়ি। নিউটন মাধ্যাকর্ষণতত্ত্ব আবিষ্কার করে জগতের মহা উপকার করেছিলেন, কিন্তু আবিষ্কারের সময় নিশ্চয়ই তিনি কারু উপকার করছেন, এমন কথা ভাবেন নি। নামের গোলমাল যেন আমাদের কখনও না হয়—যে জিনিষটা যা, তাকে যেন তাই বলে ডাকি। ডাক্তার জনসন্ বলতেন, "একটা ছেলে এক জানালার দিকে তাকিয়ে যদি আর একটার দিকে তাকিয়েছে বলে, তবে আচ্ছা করে তাকে বেত লাগাও।"

রাম কেবল আইনের মসাবিদা দেখিয়ে তোমাদের বোঝাতে চান, না ঘটনা-পরম্পরার যুক্তিই তাঁর কাছে প্রামাণ্য। যদি শোন, কেউ বলছে—"আইনে এমন কথা আছে"—তা হলেই বুঝবে, লোকটা একটা গণ্ডগোল বাধালো বলে। প্রেমে যাঁর জীবনের প্রতিষ্ঠা, তিনি আইনকে আইন বলে মানেন না। প্রেমে প্রতিষ্ঠিত হওয়া মানে নিজের কাছে নিজে খাঁটী থাকা। আমিই তো আমার আইন। আমাকে আইন বাৎলাতে হলে আইনকে যে আমা হতে পৃথক্ করা হল। শিশুর উপর কি এমন কোন আইন খাটে, যাতে তাকে নিঃশ্বাস ফেলবার, খেলাধূলা করবার বা বেঁচে থাকার হুকুম দেওয়া চলে? তার বেঁচে থাকাটাই তো তার কাছে আইন। শিশু পাখীর মত মুক্ত—আপন খুসীমত গাইছে, হাসছে, কথা বলছে। ওস্তাদী করে যদি কেউ তাকে হাসাতে বা কথা বলাতে আসে, তবে অমনি সে চুপ হয়ে যায়। তার হাসিখুসী ভাবটা যে তা হতে পৃথক, এ কথাটা বোঝাতে গেলেই শিশুর স্বভাবসিদ্ধ হাসি-খুসীও অস্বাভাবিক হয়ে দাঁড়ায়। জীবন যাঁর মুক্ত, নিজের কাছে যিনি খাঁটী, লীলানন্দে যিনি বিভোর হয়ে আছেন, তিনি উচ্ছৃঙ্খলতা প্রকারে চললেও জগতের সকল বিধান তাঁর অনুগত হবে—কেননা বিধি আর তিনি যে এক। তিনি কাউকে ভয়ান না, কাউকে দেখে তাঁকে ভয়ঠেন না, কিছুতেই পিছু হটেন না।

ব্যাধি কি?—প্রেমের অভাবে যে চিত্তের সঙ্কোচ, তাই হল ব্যাধি। তাতেই ছায়া দেখলে মানুষ চমকে উঠে, দিন দুপুরে বিপদের স্বপ্ন দেখে কেঁদে ওঠে। সর্ব্বদিকে, সর্ব্বকালে, সর্ব্বদেশে একমাত্র পরমাত্মারই সত্তা—আর সেই পরমাত্মাই আমি। আমি ভয় করব কাকে? আমার কাছে দিনও যা, রাতও তা। কতদিন রামের সারারাত কেটে গিয়েছে, অথচ দুটী চোখের পাতা এক হয়নি, কিন্তু তাতে ঘুম হয়নি বলে সারাদিনের মাঝে রামের বিন্দুমাত্রও অবসাদ আসেনি—কেননা অবসাদ অনিদ্রায় হয় না, অবসাদ আসে ঘুমের জন্য চেষ্টা ব্যস্ত হলে। প্রেমের প্রেরণায় যখন জেগে থাকি, তখন কি আনন্দে রাত কেটে যায়। দেহের মাঝে খাওয়ার আকাঙ্ক্ষা যখন প্রবল হয়, তখন খেতে পেলেই মানুষ খুসী হয়; আবার কখনও কখনও খাওয়ার ইচ্ছা মোটেই থাকে না—তখন উপোস করেই আনন্দ। অশ্রুর ধারাবর্ষণেও আনন্দ হয়, যদি প্রেম সে বর্ষণের নিয়ন্তা হয়। প্রাণ খুলে হাসছ; কিন্তু আনন্দের অশ্রুতে যে সুখ, হাসিতে কি তার চেয়ে বেশী সুখ? আমি কাকে প্রত্যাখ্যান করব? কার কাছে থেকে পালিয়ে যাব? আমিই যে সব। এই তো পরমানন্দের মত্তা।

জ্বর আসলে আমি ব্যস্ত হয়ে পড়ি না—আমি তাকে বন্ধু বলে গ্রহণ করি। আর অন্য সময় যে সব সত্য প্রকাশ হওয়ার সম্ভাবনা ছিল না, সেই সমস্ত আধ্যাত্মিক তত্ত্ব তখন আমার কাছে ফুটে ওঠে। কাজেই সবই স্বাস্থ্যকর। জাগরণ স্বাস্থ্যের এক লক্ষণ, নিদ্রা আর এক লক্ষণ প্রশান্তি এক মনোরম লক্ষণ, আবার জ্বরের প্রবল উত্তাপও স্বাস্থ্যের আর এক বিশিষ্ট মনোহারী রূপ। শিবস্বরূপে বিশ্বাসই যথার্থ আস্তিকতা। যে স্বপ্ন এবং বিশ্বাস, ঝড়ের গর্জ্জনও তার কাণে বীণার ঝঙ্কারের মত।

মন্দ্রনির্ঘোষে এই সত্য প্রচার কর—যতক্ষণ পর্য্যন্ত বাইরের চাপ থাকবে, বা "করতে হবে" কি "করতে হবে না" বলে অনুশাসনের জুলুম থাকবে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত আধ্যাত্মিক উন্নতি বা সাত্ত্বিকতার আশা সুদুরপরাহত। এই যে লোট্ বিভক্তির মধ্যম পুরুষটী—এই আমাদের মাঝে সঙ্কীর্ণ ব্যক্তিত্ববোধকে বাঁচিয়ে রাখে। যেখানেই সঙ্কোচ, আনন্দ সেখানে নিশ্চয়ই নাই; সেখানে আকর্ষণ-বিকর্ষণ, অনুরাগ-বিরাগ, চিত্তচাঞ্চল্য ও প্রলোভনেরও আর অন্ত নাই। যতক্ষণ পর্য্যন্ত বিশিষ্ট এক দেশে সীমাবদ্ধ একটী দেহপিণ্ড থাকবে, এবং সেই পিণ্ড হতে ব্যতিরিক্ত অন্যান্য পিণ্ডও তাকে পরিবেষ্টন করে রাখবে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত মাধ্যাকর্ষণের আইনকে ঠেকিয়ে রাখবে কে?—কাজেই আকর্ষণ বিকর্ষণের চোখে ধুলা দিয়ে, প্রকৃতি ঠাকুরাণীকে ঠকিয়ে বাইরের প্রভাব থেকে কেউ মুক্ত থাকতেও পারবে না।

একটা দেহের মাঝেই বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের বিভিন্ন কার্য্য হচ্ছে, অথচ মানুষ একমাত্র অহং-অভিমান নিয়ে তাদের উপর কর্ত্তৃত্ব করছে—সেই একই "আমি" দেখছে, শুনছে, চলছে ইত্যাদি। তেমনি, যিনি জীবন্মুক্ত তিনি সমস্তটা জগৎকে জড়িয়ে নিয়ে বিশ্বাত্মা রূপে অদ্বিতীয় চেতনায় প্রতিষ্ঠিত রয়েছেন; যেমন একই দেহে খাদ্য পরিপাক, কেশোদ্গম প্রভৃতি বিভিন্ন ক্রিয়া একই কর্ত্তার অধীনে চলছে, তার কাছেও তেমনি একের মাঝেই নানার ভেদ দেখা দিচ্ছে। নিজকে যখন অনন্তস্বরূপ বলে উপলব্ধি হয়, সবার সঙ্গে যখন একাত্মভাব হয়, নর-নদী গ্রহ-নক্ষত্র সব যখন আমার বলে মনে হয়, প্রেমে যখন সকলকে আপন করে নিতে পারি, তখনই আর আমাদের কোনও প্রলোভনে লুব্ধ করতে পারে না।

স্বয়ং সূর্য্য যখন আলো দেয়, জোনাকীর আলোতে আর তখন কতটুকু আলো হয়? সবই যখন আমার কাছে সুন্দর, আর আমিই যখন সব, তখন পেছুনে পেছুনে ছুটব কার? প্রলোভনের বস্তুর সঙ্গে যে এক হয়ে গিয়েছে, জগতে এমন কি সম্পদ আছে, যাতে সে প্রলুব্ধ হতে পারে?

যে নিজকে ব্রহ্মস্বরূপ বলে অনুভব করে না, পরমাত্মার কাছে বেইমান হয়ে যে আত্মহত্যা করে বসেছে, মিথ্যার আবরণে জ্যোতিঃর জ্যোতিঃকে যে ঢেকে রাখতে চায়—সে চোর কি অপকারই না জগতের করেছে, আর কতই না জানি করবে।

দেহের পাপকর্ম্ম বা পুণ্যকর্ম্ম, মনের ধর্ম্মাধর্ম্ম, যশ-অপবাদ, নিন্দা-স্তুতি—কিছুই আমাকে স্পর্শ করতে পারে না। অনন্ত জ্যোতিঃ, অনন্ত আনন্দ যখন আমার মাঝেই ফুটে উঠেছে, তখন আমি ভরসা করব কার—ধন্যবাদই বা দিব কাকে?*

---

* স্বামী রামতীর্থ

যোগসূত্রবৃত্তি

কৈবল্যপাদ

যোগীদের মতে আত্মার স্বরূপ কি, তাহা ব্যাখ্যাত হইয়াছে। এক্ষণে অন্যান্য দর্শনে আত্মাকে কি ভাবে গ্রহণ করা হইয়াছে, তাহার আলোচনা করা যাউক।

বেদান্ত-মত

বেদান্তীরা বলিয়া থাকেন, মোক্ষকালে আত্মা চিদানন্দময় স্বরূপে অবস্থান করেন। যোগমতাবলম্বী বৃত্তিকার এই সম্বন্ধে আপত্তি করিয়া বলিতেছেন, বেদান্তীর এই মতবাদ যুক্তিযুক্ত নহে। কেন তাহা বলিতেছি।

আনন্দ অবশ্য সুখস্বরূপ। সুখ সর্ব্বদাই আমাদের নিকট সংবেদ্য অর্থাৎ জ্ঞানের বিষয়-রূপে প্রতিভাত হইয়া থাকে। আবার সংবেদনরূপ ব্যাপার না থাকিলে কোনও বস্তুকে সংবেদ্য বলা যায় কি করিয়া? সুতরাং বাধ্য হইয়া বেদান্তবাদীকে এখানে সংবেদন ও সংবেদ্য—এই দুইটী তত্ত্ব স্বীকার করিতে হয়। দুইটী তত্ত্ব মানিলে আর অদ্বৈতবাদ টিকে কি?

যদি বেদান্তী বলেন, 'আত্মাকে আমি সুখময় বলিব না, তাঁহাকে সুখাত্মক বলিব। তাহা হইলে একই স্থানে বিরুদ্ধ ধর্ম্মের অধ্যাস হইবে; তাহাও তো যুক্তিযুক্ত নয়। কেননা—সুখময়ই বল আর সুখাত্মকই বল, সুখ যে সংবেদ্য, ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। তবে কিনা আত্মাকে সুখাত্মক বলিয়া সংবেদ্যকে আত্মসাৎ করা হইল মাত্র। কিন্তু তাহা হইলেও তো সংবেদ্য এবং সংবেদন একই হইয়া দাঁড়ায়। এইরূপ বিরুদ্ধ ধর্ম্মের অধ্যাস কি যুক্তিসঙ্গত?

অদ্বৈতবাদীদিগের মতবাদ সম্বন্ধে আর একটা আপত্তি আছে। ইহারা কর্ম্মাত্মা ও পরমাত্মা ভেদে দুইপ্রকার আত্মা স্বীকার করেন। কর্ম্মাত্মা যেমন ইহাদের মতে সুখ দুঃখের ভোক্তা, পরমাত্মাও যদি ঠিক তাহাই হন, তবে কর্ম্মাত্মার মত পরমাত্মাও পরিণামী ও অবিদ্যাস্বভাব হইবেন। ইহা দেখিয়া বেদান্তী যদি বলেন, আমরা পরমাত্মার ভোক্তৃত্ব স্বীকার করি না, পরমাত্মা উদাসীন অধিষ্ঠাতারূপে থাকিয়া ভোগের কৃতার্থতা সম্পাদন করিতেছেন, এই কথাই বলিতে চাই; তাহা হইলে বেদান্তী তো আমাদের সিদ্ধান্তই মানিয়া লইতেছেন। তাহা হইলে তাঁহার দর্শনে মৌলিকতা কোথায়?

তারপর আর এক আপত্তি। কর্ম্মাত্মা যদি অবিদ্যাস্বভাব হইলেন, তবে কাজে-কাজেই তাঁহাকে নিঃস্বভাবই বলিতে হয়, কেননা অবিদ্যা তো অসতী। কর্ম্মাত্মা নিঃস্বভাব হইলে শাস্ত্রাধিকারী কে হইবে? পরমাত্মা নিত্যমুক্ত স্বভাব, সুতরাং তাঁহাকে শাস্ত্রাধিকারী বলা চলে না; অবিদ্যাস্বভাব

কর্ম্মাত্মাও শাস্ত্রাধিকারী হইবেন না। তাহা হইলে শাস্ত্র রচনা করাটাই তো বৃথা।

তারপর বেদান্তী বলেন, জগৎ অবিদ্যাময়। তাহা হইলে সেটা কার অবিদ্যা? পরমাত্মার অবিদ্যা তো বলাই যায় না, কেননা পরমাত্মা নিত্য এবং বিদ্যাস্বরূপ। আর কর্ম্মাত্মাও যখন বাস্তবিক শশকশৃঙ্গের মত নিঃস্বভাব মিথ্যা পদার্থ, তখন তাঁহার সহিতই বা অবিদ্যার যোগ হইবে কি করিয়া?

বেদান্তী যদি বলেন, এই যে বিচারহীন অবস্থায় জগৎকে পরম রমণীয় বলিয়া বোধ হয়, ইহাই অবিদ্যার স্বভাব। যেমন সূর্য্য-কিরণের স্পর্শে শিশির শুকাইয়া যায়, তেমনি বিচারের ফলে আর যাহার অস্তিত্ব খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, তাহাকেই বলি অবিদ্যা। কিন্তু এমন কথাও বলা চলে না। যে বস্তু দিয়া কোনও একটা কাজ হয়, তাহা নিশ্চয়ই অপর কোনও বস্তুর সহিত ভিন্ন অথবা অভিন্ন। অর্থাৎ ভেদ আশ্রয় করিয়াই হউক, অথবা অভেদ আশ্রয় করিয়াই হউক, তাহার স্বতন্ত্র সত্তা স্বীকার করিতেই হইবে। সুতরাং অবিদ্যাকে নিতান্ত অসৎ বলা যায় কি করিয়া? তা ছাড়া, অবিদ্যা যে এই সংসার রূপ কার্য্যের কর্ত্রী, এ কথা তো স্বীকার করিতেই হইবে। এই সমস্ত আপত্তির উত্তর দিতে না পারিয়া যদি অবিদ্যাকে অনির্ব্বচনীয় বলিয়া এড়াইয়া যাইতে চাও, তাহা হইলে জগতে কিছুকেই তো আর বচনীয় বলা চলে না। তাহা হইলে তোমার ব্রহ্মও অনির্ব্বচনীয়!

কাজেই দেখিতেছি, বেদান্তী যাহাই বলুন না, আত্মাকে অধিষ্ঠাতা বলা ছাড়া আর উপায় নাই। আর চিদ্রূপই হইল অধিষ্ঠাতৃত্ব, কেননা চরমে ইহা ছাড়া অন্য কোনও ধর্ম্মের প্রামাণ্য স্বীকার করা যুক্তি-যুক্ত হয় না। (কৈবল্যপাদ ২৩ সূত্র দ্রষ্টব্য)

ন্যায় মত

আবার নৈয়ায়িকেরা বলেন, আত্মা অচেতন, চেতনা-গুণের যোগে তিনি সচেতন হন। আত্মা ও মনের সংযোগে চৈতন্য উৎপন্ন হয়। ব্যবহারদশায় আত্মার সহিত মনের সংযোগে আত্মাতে ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রযত্ন, প্রভৃতি গুণসমূহের উৎপত্তি হয়। এই সমস্ত গুণের যোগে আত্মা জ্ঞাতা, কর্ত্তা, ভোক্তা বিশেষণে অভিহিত হন। মোক্ষদশাতে যখন মিথ্যা জ্ঞানের নিবৃত্তি হয়, তখন তাহার মূলে যে দোষসমূহ বর্ত্তমান ছিল, তাহাদেরও নিবৃত্তি হয়। তখন পূর্ব্বোল্লিখিত বুদ্ধি প্রভৃতি বিশেষ গুণসমূহের উচ্ছেদ হওয়াতে আত্মা স্বরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। এই হইল নৈয়ায়িকদিগের মত। কিন্তু এই মতও যুক্তিযুক্ত নহে।

নৈয়ায়িক মোক্ষদশাতে আত্মাকে নিত্য ও ব্যাপক বলিয়া থাকেন। কিন্তু তাঁহাদের মতেই, আকাশাদিও তো নিত্য এবং ব্যাপক; তাহা হইলে মোক্ষদশায় আত্মা ও আকাশাদি কি এক হইয়া যাইবে? যদি উভয়ের পার্থক্য রক্ষা করিতে হয়, তাহা হইলে বাধ্য হইয়া আত্মাকে চিদ্রূপ বলিতে হয়। মোক্ষদশাতে আত্মা নিত্য চিৎ, কিন্তু আকাশ তাহা নয়। কিন্তু একথা স্বীকার করিলে নৈয়ায়িকের আত্মা আর অচেতন রহিলেন কি করিয়া?

নৈয়ায়িক বলিতে পারেন, আত্মা আকাশাদির ন্যায় নিত্য ও ব্যাপক হইলেও তাঁহাতে আত্মত্বরূপ জাতির সম্বন্ধ রহিয়াছে, সুতরাং আকাশাদি নিত্য ও ব্যাপক সত্তা হইতে উহা

বিলক্ষণ। কিন্তু আত্মত্বরূপ জাতি-যোগ তো সকল সত্তারই হইবে, কেননা আত্মা সার্ব্বভৌম সত্তা—সত্তাবান্ বস্তু মাত্রকেই আত্মবান্ বলা চলে। অতএব আত্মার বৈশিষ্ট্য নিরূপণ করিতে হইলে জাতি হইতে পৃথক একটা কিছু স্বীকার করিতেই হইবে। আমরা বলি, আত্মার অধিষ্ঠাতৃত্বই তাঁহার আকাশাদি হইতে বৈলক্ষণ্যের হেতু। আবার চিদ্রূপ ছাড়া আর কেহ অধিষ্ঠাতা হইতে পারে না। সুতরাং নৈয়ায়িকের মত অপেক্ষা আমাদেরই মত সারবান।

মীমাংসা-মত

মীমাংসকেরা আত্মাকে যুগপৎ কর্ত্তা ও কর্ম্মরূপে স্বীকার করিয়া থাকেন। কিন্তু তাঁহাদের মতও যুক্তিসঙ্গত নহে। তাঁহারা বলেন, যাহা অহং প্রত্যয়ের বিষয়, তাহাই আত্মা। তাহা হইলে অহং প্রত্যয়ে আত্মাই কর্ত্তা, আত্মাই কর্ম্ম—কেননা আমিই আমাকে আমি বলিয়া জানিতেছি। কিন্তু এ কথা বিরুদ্ধ বলিয়া প্রামাণ্য হইতে পারে না। কর্ত্তা হইলেন প্রমাতা, আর কর্ম্ম হইল প্রমেয়। একই ধর্ম্মীতে এইরূপ যুগপৎ বিরুদ্ধ ধর্ম্মের অধ্যাস হইতে পারে না। যেখানে বিরুদ্ধ ধর্ম্মের অধিষ্ঠান, সেখানে আশ্রয় পদার্থের সত্তা সাধিত হইতে পারে না—যেমন ভাব ও অভাব একই অধিকরণে থাকিতে পারে না। কর্ত্তৃত্ব ও কর্ম্মত্বও বিরুদ্ধ, সুতরাং তাহাদেরও একত্রাবস্থান হইতে পারে না। মীমাংসক বলিবেন, কর্ত্তৃত্ব ও করণত্বেই বিরোধ হইতে পারে. কর্ত্তৃত্ব ও কর্ম্মত্ব কেন বিরোধ হইবে? কিন্তু এ কথা অশ্রদ্ধেয়। উভয়স্থলেই যখন একই ভাবে বিরুদ্ধ ধর্ম্মের অধিষ্ঠান হইতেছে, তখন কেবলমাত্র কর্ত্তাতে-করণে বিরোধ হইবে, কর্ত্তাতে কর্ম্মে হইবে না, এমন কথা কে বলে? কাজেই আমরা বলি, আত্মাকে অহং-প্রত্যয়-গ্রাহ্য না বলিয়া অধিষ্ঠাতাই বলা উচিত। অধিষ্ঠাতা হইলেই তিনি চেতন।

আর্হত-মত

আর্হতেরা আত্মাকে অব্যাপক, দেহ-পরিমাণ ও পরিণামী বলিয়া থাকে। ইহাদের কথা লইয়া আর বিচার করিব কি? আত্মা যদি পরিণামী হন, তাহা হইলে আর চিদ্রূপ হইবেন কি করিয়া? আর চিদ্রূপ না হইলে সে আবার কেমন আত্মা? আত্মাকে আত্মা বলিতে হইলে তাঁহাকে চিদ্রূপ স্বীকার করিতেই হইবে। চিদ্রূপ হইলেই তিনি নিশ্চয়ই অধিষ্ঠাতা।

জ্ঞানক্রিয়াবাদ

বিষয়ের সন্নিকর্ষ হইলে জ্ঞানরূপ ক্রিয়া উৎপন্ন হয়। বিষয় জ্ঞান তাহার ফল। সেই ফলরূপ জ্ঞানের স্বরূপ প্রকাশরূপে প্রতিভাত হয়। তখন বিষয় হয় গ্রাহ্য এবং আত্মা হন গ্রাহক, কেননা "আমি এই বস্তুটা জানিতেছি", তখন এইপ্রকার জ্ঞানই উৎপন্ন হইয়া থাকে। ক্রিয়ার কারণ কর্ত্তা—অতএব আত্মাই কর্ত্তা এবং ভোক্তা। কিন্তু এই মত বিচারসহ নহে। আত্মা যে জ্ঞানরূপ ক্রিয়াসমূহের কর্ত্তা, তাঁহার সে কর্ত্তৃত্ব কি যুগপৎ হয়, না ক্রমশঃ হইয়া থাকে? যুগপৎ কর্ত্তৃত্ব হইতে পারে না, কেননা তাহা হইলে ব্যবহিত ক্ষণসমূহে কর্ত্তা হইবে কে? যদি ক্রমিক কর্ত্তৃত্ব স্বীকার করা হয়, তবে কর্ত্তা একরূপ

থাকিতে পারেন না। আর যদি কর্ত্তা একই রূপে কর্তৃত্ব করেন বল, তাহা হইলে সর্ব্বদা একই রূপ ক্রিয়ার সন্নিহিত থাকায় সমস্ত ফলও একরূপ হইবে। কিন্তু বাস্তবিক তাহা হয় না। আবার কর্ত্তা নানারূপেই কর্তৃত্ব করিয়া থাকেন, এমন কথা বলিলে কর্ত্তাকে পরিণামী স্বীকার করিতে হয়। তাহা হইলে আর তাঁহাকে চিদ্রূপ বলি কি করিয়া? অতএব আত্মাকে চিদ্রূপ স্বীকার করিতে হইলে তাঁহাকে সাক্ষাৎ কর্ত্তা বলা চলে না। আত্মাকে কূটস্থ, নিত্য, চিদ্রূপ স্বীকার করিয়া আমরা যেরূপ কর্তৃত্বের ব্যবস্থা করিয়াছি, তাহাই যুক্তিসঙ্গত।

গ্রাহকত্ব-বাদ

কেহ কেহ বলেন আত্মা স্বপ্রকাশ বটে, তবে বিষয়জ্ঞানরূপ ব্যাপার অবলম্বন করিয়া তাঁহাতে গ্রাহকত্বের অভিব্যক্তি হইয়া থাকে। আত্মার গ্রাহকত্ববাদ কিরূপে নিরাকৃত হইয়াছে, তাহা উপরেই আমরা উল্লিখিত করিয়াছি।

বিমর্শবাদ

"আবার কেহ বলেন, আত্মা বিমর্শাত্মক, তাই তিনি চিন্ময়। তাঁহাদের মতে বিমর্শ ব্যতিরেকে আত্মাকে চিদ্রূপ বলিয়া প্রতিষ্ঠিত করাই চলে না। আত্মা চিদ্রূপ মানে তিনি জড় হইতে বিলক্ষণ। বিমর্শ না থাকিলে কিরূপে আত্মাকে জড় হইতে পৃথিক বলিয়া বুঝিতাম?—কিন্তু ইহাদের বিরুদ্ধে আমাদের বক্তব্য এই—"এই বস্তুটী এইরূপ"—এই যে বিচার, ইহাকেই তো তোমরা বিমর্শ বল? কিন্তু অস্মিতা না থাকিলে এই বিমর্শ দাঁড়াইবে কিসের উপর? ধর, আত্মা সম্বন্ধেই বিমর্শ করা হইল; আমি এইরূপ"—এই বলিয়াই উহার জ্ঞান হইবে তো? তখন আত্মারূপ বিষয় অহংশব্দের সংহিত সংযুক্ত হইয়া স্ফুরিত হওয়ায় উহা বিকল্পবৃত্তি বলিয়া অভিহিত হইবে (শব্দজ্ঞানানুপাতী বস্তুশূন্যো বিকল্পঃ—১।৯ সূত্র দ্রষ্টব্য)। বিকল্প অধ্যবসায়াত্মক, সুতরাং উহা বুদ্ধিরই ধর্ম্ম, চিত্তের ধর্ম্ম নহে। সুতরাং আত্মাকে বিমর্শাত্মক বলা চলে না। তা ছাড়া আত্মা কূটস্থ, নিত্য হইলে তাঁহাতে অহঙ্কারের স্থান হইতে পারে না। সুতরাং আত্মা সবিমর্শ, যাঁহারা এই মত স্থাপন করিতে চাহেন তাঁহারা আত্মভ্রমে বুদ্ধিকেই প্রতিপাদিত করিয়া থাকেন—প্রকাশাত্মক পরম পুরুষের স্বরূপ তাঁহারা জানেন না।

*

এইরূপে আলোচনা করিয়া আমরা দেখিলাম, সমস্ত দর্শনেই আত্মাকে অধিষ্ঠাতারূপে স্বীকার করা ছাড়া আর কোনও পথ নাই। আত্মা অধিষ্ঠাতা অর্থে তিনি চিদ্রূপ। যাহা জড় হইতে বিলক্ষণ, তাহাই চিৎস্বরূপ। তিনি চিদ্রূপে যাহাতে অধিষ্ঠিত হন, তাহাকেই ভোগ্য করিয়া থাকেন। আবার যাহা চেতনের অধিষ্ঠান, তাহারই সর্ব্ববিধ ব্যাপার নিষ্পাদনের যোগ্যতা আছে। প্রকৃতি যখন কৃতার্থ হইয়া সর্ব্ববিধ ব্যাপার হইতে নিবৃত্ত হন, তখন কাজেই পুরুষ কৈবল্য স্বরূপে অবস্থান করিয়া থাকেন। আমাদের এই সিদ্ধান্ত অন্যান্য দার্শনিকদিগকেও স্বীকার করিতে হইবে, নতুবা উপায় নাই।

সুতরাং চরম সূত্রে সূত্রকার যে বলিয়াছেন, চিতিশক্তি যখন বৃত্তির তুল্যরূপতা পরিহার করিয়া স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হন, তখনই কৈবল্য—এই সিদ্ধান্ত অতি যুক্তিযুক্ত।

—•—

বস্তু সংক্ষেপ

কৈবল্যপাদে এই সমস্ত বিষয় আলোচিত হইল।—সমাধিসিদ্ধি অন্যান্য সিদ্ধি হইতে পৃথক অথচ সমস্ত সিদ্ধির মূলীভূত। প্রকৃতির আপূরণই সিদ্ধিবিশেষের কারণ। ধর্ম্ম প্রভৃতি কেবল মাত্র প্রতিবন্ধক নিবৃত্তি করিতে সমর্থ। নির্ম্মাণচিত্তসমূহ অস্মিতা হইতে উৎপন্ন। বহু নির্ম্মাণচিত্তের যোগিচিত্তই অধিষ্ঠাতা। যোগিচিত্ত অন্যান্য প্রাকৃত চিত্ত হইতে বিলক্ষণ। যোগীর কর্ম্মসমূহও অলৌকিক। বিপাকানুযায়ী বাসনাসমূহের অভিব্যক্ত হইবার সামর্থ্য রহিয়াছে। কার্য্যকারণে ঐক্য আছে, সুতরাং জন্মান্তর দ্বারা ব্যবহিত হইলেও বাসনাসমূহের আনন্তর্য্য অব্যাহত থাকে। বাসনা অনন্ত হইলেও হেতুফলাদি দ্বারা তাহাদের হান সম্ভব। ধর্ম্মসমূহ অতীতাদি তিন কক্ষাতেই প্রবিষ্ট হইতে পারে। বিজ্ঞানবাদ যুক্তিসহ নহে, জগতের সাকারবাদই প্রামাণ্য। পুরুষই জ্ঞাতা। চিত্তদ্বারাই সমস্ত ব্যবহারের নিষ্পত্তি হইয়া থাকে।

এই সমস্ত আলোচনার অন্তে সূত্রকার পুরুষের প্রামাণ্য স্থাপিত করিয়া দশটী সূত্রে কৈবল্য-নিরূপণের উপযোগী নানা কথার অবতারণা করিয়াছেন। অবশেষে, অন্যান্য শাস্ত্রেও যে এই কৈবল্যই প্রকারান্তরে ব্যাখ্যাত হইয়াছে, বৃত্তিকার তাহাই নিরূপণ করিতে চেষ্টা করিয়া শাস্ত্রের উপসংহার করিলেন।

ইতি যোগসূত্রবৃত্তিতে কৈবল্যপাদ।

যোগসূত্রবৃত্তি সমাপ্ত।

ওঁ শ্রীগুর্ব্বর্পণমস্তু।

শ্রীশ্রীরূপ-সনাতন

[শ্রীমন্মহাপ্রভুসূচিত—অভিধেয় সাধনভক্তিতত্ত্ব]

রাগানুগা ভক্তি

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে—বৈধী ও রাগানুগা ভেদে সাধনভক্তি দুই প্রকার। তন্মধ্যে বৈধী ভক্তির কথা ইতিপূর্ব্বে বিবৃত হইয়াছে। এক্ষণে রাগানুগা ভক্তির আলোচনা করা যাউক।

রাগানুগা ভক্তি বুঝিতে হইলে আগে দেখিতে হইবে, রাগ কাহাকে বলে। ভক্তি-রসামৃতসিন্ধুতে শ্রীমৎ রূপ গোস্বামী বলিতেছেন—"ইষ্টে স্বারসিকী রাগঃ পরমাবিষ্টতা ভবেৎ।"—ইষ্টে যে স্বারসিকী পরমাবিষ্টতা, তাহাই রাগ। অর্থাৎ আমি যাহা পাইতে চাই, তাহার মাঝে স্বভাবতঃই যদি আমার চিত্ত মজিয়া যায়, তবে তাহাকেই বলিব রাগ। তাহা হইলে রাগে তিনটী বস্তু থাকা চাই—প্রথমতঃ পাওয়ার অভিলাষ, দ্বিতীয়তঃ চিত্তের তন্ময়তা এবং তৃতীয়তঃ আকর্ষণের স্বাভাবিক স্ফুরণ। প্রেমের স্বাভাবিক স্ফুরণ অথবা ইষ্টে গাঢ়তৃষ্ণাই হইল রাগের স্বরূপ লক্ষণ। আর ইষ্টে তন্ময়তা হইল তাহার তটস্থ লক্ষণ। স্বরূপ লক্ষণ ও তটস্থ লক্ষণে পার্থক্য এই—স্বরূপ লক্ষণ সোজাসুজি বস্তুটী নিরূপিত করিয়া দেয়; আর তটস্থ লক্ষণ অন্য কোনও একটী নিদর্শন ধরিয়া তাহার সাহায্যে বস্তুটী সঙ্কেতিত করে। যেমন, বৈদান্তিক যদি বলেন, ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দ, তাহা হইলে উক্ত ব্রহ্মের স্বরূপ লক্ষণ বলা হইল; কেননা এই লক্ষণ দিয়া ব্রহ্ম স্বরূপতঃ কি, তাহাই সোজাসুজি বলিয়া দেওয়া হইল। কিন্তু যদি বলা হয়, যাঁহা হইতে এই জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-লয় হইতেছে, তিনিই ব্রহ্ম—তাহা হইলে উক্ত ব্রহ্মের তটস্থ লক্ষণ হইবে। কেননা এখানে সোজাসুজি ব্রহ্ম কি, তাহা বলা হইল না, পরন্তু জগৎকে ধরিয়া ব্রহ্মের সঙ্কেত করা হইল। প্রকৃত প্রসঙ্গে রাগের স্বরূপ ও তটস্থ লক্ষণকেও এই ভাবে বুঝিতে হইবে। রাগ বস্তুটী স্বরূপতঃ বাঞ্ছিতের প্রতি গাঢ় প্রেমময় তৃষ্ণা; আবার যাহার যে বস্তুতে রাগ জন্মিয়াছে, সে বস্তুতে তাহার প্রাণ মন তন্ময় হইয়া গিয়াছে। ইহার মাঝে পূর্ব্বের অবস্থাটী স্বসংবেদ্য, সুতরাং উহাই রাগের স্বরূপ এবং পর অবস্থাটী স্ব-পরসংবেদ্য হইয়া পূর্ব্বের অবস্থাটী সূচিত করিতেছে, সুতরাং স্বরূপের দ্যোতক বলিয়া উহা রাগের তটস্থ লক্ষণ।

এই রাগময়ী যে ভক্তি, তাহাই রাগাত্মিকা ভক্তি। যথা শ্রীমৎ রূপগোস্বামীর উক্তি, "তন্ময়ী যা ভবেৎ ভক্তিঃ সাত্র রাগাত্মিকো-

দিত।" ব্রজবাসীরা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি যে গাঢ় প্রেমতৃষ্ণা অর্পণ করিয়াছিলেন, তাহাই রাগের আদর্শ। এই প্রকার রাগকে আশ্রয় করিয়া মানবের হৃদয়ে যে ভক্তির স্ফুরণ হয়, তাহাই, রাগাত্মিকা ভক্তি। সোজা কথায়, ব্রজবাসীর মত প্রাণ ঢালিয়া শ্রীভগবানকে ভালবাসিতে পারিলে রাগাত্মিকা ভক্তির প্রকাশ হইবে।

কিন্তু তেমন প্রাণোন্মাদী ভালবাসা কয় জনার হয়? আছে, সবার মাঝেই সবের বীজ আছে। কিন্তু জন্মজন্মান্তরের সাধনার বলে আবরণ ক্ষয় হইলে তবে তাহা অঙ্কুরিত হয়। আমার ভিতরে যে প্রাণারাম ঠাকুরটী লুকাইয়া রহিয়াছেন, তাঁহার সহিত আমার যে কি মধুর সম্বন্ধ, তাহা আমি জানি না। এমন কি, আমিই যে তাঁহাকে কতখানি ভালবাসি, তাহাও জানি না। সোজা কথায় একটা দৃষ্টান্ত দিতে পারি। এই যেমন ধর, আমাদের এই দেহটা। আপাততঃ আমরা তো ইহাতেই মজিয়া রহিয়াছি, কিন্তু তাও কি সজ্ঞানে মজিয়া থাকি! দেহ আমাদের খুবই আপনার, কিন্তু তবুও কত উদাসীন ভাবে ভ্রূক্ষেপহীন চিত্তে ইহাকে খাটাইয়া লইতেছি—ইহার উপর যে কতখানি দরদ তাহা সব সময় বুঝিয়া উঠিতে পারি না। কিন্তু যদি কখনও এই দেহের উপর এমন প্রাণান্তিক আঘাত আসিয়া পড়ে, যাহাতে মনে হয়, এই বুঝি মর্ম্মের বাঁধন ছিঁড়িয়া গেল, তাহা হইলে তখন বুঝিতে পারি, এই দেহের উপর আমার কতখানি মায়া—তাহাকে বাঁচাইবার জন্য আমার কি মর্ম্মান্তিক আকুলি-বিকুলি। ভগবানের সঙ্গে আমাদের এমনি সম্পর্ক। আজ তাঁহাকে স্বচ্ছন্দে ভুলিয়া ধনে ও জনে মত্ত হইয়া রহিয়াছি, কিন্তু তিনি যে আমাকে অচ্ছেদ্য বন্ধনে বাঁধিয়া অনন্ত প্রেমরসে রসিয়া অন্তরাসন আলো করিয়া রহিয়াছেন, সে কথা কয়দিনই বা ভুলিয়া থাকিব? ভাগ্যে থাকিলে এই জীবনেই হয়ত এমন পরীক্ষা আসিবে, যাহাতে প্রাণ ফাঁফর হইয়া উঠিবে—দেখিব, যত ঠাঁইর যত আশা ভরসা সব টুটিয়া গিয়াছে—সে ছাড়া বুকে তুলিয়া লইবার, প্রাণের জ্বালা জুড়াইবার আর কেহ নাই। তখন দেখিব, এতদিন যে সংসারকে ভালবাসিয়াছি বলিয়া মনে করিতাম, সে মিছা কথা—তাহাকে ছাড়া আর কাহাকে ভালবাসিবার ক্ষমতা আমাদের নাই—রূপে রূপে তাঁহাকেই ভালবাসি, তাহার জন্যই পাগল হইয়া ফিরি। এই, স্বভাবের কথাটা যে বুঝিতে পারি না—এই তো হইল অবিদ্যা।

অন্তরে রস আছে বলিয়াই রসের কথা শুনিলে, রসের দৃশ্য দেখিলে, জীবের লোলুপ চিত্ত নাচিয়া উঠে। জন্মজন্মান্তরের সাধনবলে অর্জ্জিত সুকৃতির ফলে আজ চিত্তশুদ্ধি হইয়াছে, শুভমতি দেখা দিয়াছে, আর ভগবানও অমনি সময় বুঝিয়া তাঁহার অপার প্রেমলীলার একটী স্বপ্নময় আলেখ্য বিদ্যুতের মত চোখের সমুখে একবার খেলাইয়া লইয়া গেলেন—ক্ষণেকের দর্শনে পিপাসা বাড়িয়া উঠিল, ছলনাময় বঁধুর প্রেমের ফাঁদে মুগ্ধ জীব পা দিল। "এমনি করিয়া ব্রজবাসীরা বুকে বুকে মুখে মুখে চোখে চোখে তাঁহাকে পাইয়াছিল, প্রাণের ঠাকুরকে প্রেমের ডোরে বাঁধিয়া এমনি করিয়া তাহারা হাসাইয়াছে, কাঁদাইয়াছে, নাচাইয়াছে; নিজেরাও কত হাসিয়াছে, কাঁদিয়াছে, নাচিয়াছে—আহা,

আমার কি কখনও এমন ভাগ্যে হইবে না? আমি কি অমন করিয়া কখনও তাঁহাকে পাইব না?"

বহু জন্মের সুকৃতির ফলে কোনও ভাগ্যবান জীবের মনে এইরূপে ব্রজভাব পাইবার জন্য লালসা জাগিয়া উঠে। ইহাই হইল রাগানুগা ভক্তির লক্ষণ। শ্রীরূপগোস্বামী বলিতেছেন—

"বিরাজন্তীমভিব্যক্তং ব্রজবাসিজনাদিষু।
রাগাত্মিকামনুসৃতা যা সা রাগানুগোচ্যতে॥"

—ব্রজবাসী জনে যে ভাব সুস্পষ্ট ফুটিয়া উঠিয়াছে, সেই রাগাত্মিকা ভক্তির অনুসরণে যাহার স্ফুরণ হয়, তাহাকে রাগানুগা ভক্তি বলে।

শ্রীমৎ গোস্বামীঠাকুর আরও বলিতেছেন—

"তত্তদ্ভাবাদিমাধুর্য্যে শ্রুতে ধীর্যদপেক্ষতে।
নাত্র শাস্ত্রং ন যুক্তিঞ্চ তল্লোভোৎপত্তিলক্ষণম্॥"

—ব্রজবাসীর ভাবের প্রতি লোভ কি করিয়া হয়? যখন ব্রজবাসীদিগের ভাবাদিমাধুর্য্যের কথা শুনিয়া চিত্ত তাহাই পাইতে চায়—এ বিষয়ে আর শাস্ত্র-যুক্তির অপেক্ষা রাখে না—তখনই বুঝিতে হইবে, লোভের সঞ্চার হইয়াছে।

রাগাত্মিকা ভক্তিই রাগানুগা ভক্তির আদর্শ স্থানীয়। ভক্তির বিষয়, আশ্রয় এবং বিষয়াশ্রয়, এই তিনটী উপকরণ আছে। যাঁহাকে ভক্তি করা যায়, তিনিই ভক্তির বিষয়, যিনি ভক্তি করেন, তিনি আশ্রয় এবং এই ভক্তিলীলা যে লোকে আবির্ভূত হয়, তাহা বিষয়াশ্রয়। রাগাত্মিকা ভক্তির বিষয় শ্রীকৃষ্ণ এবং আশ্রয় ব্রজবাসী জনগণ। ব্রজধামই উহার বিষয়াশ্রয়। এই ব্রজধাম পরিদৃশ্যমান মায়িক জগতের অতীত, উহা নিত্য চিদানন্দময় প্রেমরসে অধিষ্ঠিত। ব্রজবাসীদের দেহও প্রাকৃত দেহের সহিত তুলনীয় নহে—তাঁহাদের অপ্রাকৃত ভাবময়ী তনু। এই তনুকে আশ্রয় করিয়া ভাব প্রকাশ পায়, সুতরাং উহাও বিষয়াশ্রয়।

এই অপ্রাকৃত ভাব পাইবার জন্য প্রাকৃত দেহ ও জগতের আশ্রয়ে যে ভক্তির সাধনা, তাহাই রাগানুগা। ব্রজবাসীরা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি যে রাগ পোষণ করিয়াছিলেন, আমিও তাহার অভিলাষী। কিন্তু তাহা পাইবার উপায় কি? আমি প্রাকৃত দেহধারী মায়িক জীব, আমাতে সে ভাবের অধিষ্ঠান হইবে কি করিয়া? ব্রজবাসী ভিন্ন ব্রজের ভাব কেহ পাইতে পারে না। সুতরাং আমাকেও ব্রজবাসীর অপ্রাকৃত চিন্ময় তনু অর্জ্জন করিতে হইবে। সে কি করিয়া হইবে? শ্রীমদ্ভাগবত বলিতেছেন, যে যাহাকে তদ্‌গত চিত্তে ধ্যান করে, সে তাহার স্বরূপ প্রাপ্ত হয়। সুতরাং আমিও যদি ব্রজবাসী ভক্তের আনুগত্য, সেবা ও ধ্যান করি, তবে আমিও নিশ্চয়ই তাঁহার স্বরূপ প্রাপ্ত হইব। ইহা বিজ্ঞানসম্মত কথা।

কিন্তু এখন কথা হইতেছে, সাক্ষাৎভাবে ব্রজবাসী ভক্তের দেখা পাইব কোথায়?—কিন্তু এ বিষয়েও ভগবান ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছেন। সাধনাজগতে পরম্পরাক্রমে একটী ধারা চলিয়া আসে। আজ আমার মনে যে সাধনার প্রতি অনুরাগ জন্মিয়াছে, পূর্ব্বেও নিশ্চয়ই কাহারও তাহা জন্মিয়াছিল এবং তিনিও নিশ্চয়ই সাধনায় সিদ্ধ হইয়াছিলেন। যিনি যাহা পাইয়াছেন, তিনি

অপরকেও তাহা দিতে পারেন। ইহাকেই বলি গুরু। শ্রীগুরুই ব্রজবাসী ভক্তের স্বরূপ। ভাগ্যবানের নিকট প্রেমিক গুরু দুর্লভ নহেন। এই নর জগতে নরচক্ষেই তাঁহার দর্শন পাইয়া কৃতার্থ হইতে পারি। সুতরাং রাগানুগা ভক্তির সাধন করিতে হইলে প্রপন্ন হইয়া শ্রীগুরুর চরণাশ্রয় করিতে হইবে। তখন শ্রীগুরুই ব্রজবাসী ভক্তস্বরূপে ভক্তির বিষয় হইবেন, শ্রীগুরুর অনুগত শিষ্য হইবেন উহার আশ্রয় এবং এই প্রাকৃত জগতই হইবে বিষয়াশ্রয়। বলা বাহুল্য, শ্রীগুরু স্থূলদৃষ্টিতে জড় দেহধারী হইলেও তিনি অপ্রাকৃত চিন্ময় অন্তর্দেহে ভূষিত।

এইরূপে সাধনার আরম্ভ হইবে। দুই এক স্থলে পুনরুক্তির আশঙ্কা থাকিলেও, একটা সুস্পষ্ট ধারণা হইবে বলিয়া আমরা রাগানুগা ভক্তির সাধনা ক্রমানুসারে বর্ণনা করিতেছি।

ভক্তি নিত্যসিদ্ধ বস্তু। তথাপি গুণের আবরণে আবৃত থাকায় উহা সাধারণ জীবের অনুভবগোচর হয় না। এই নিত্যসিদ্ধ বস্তুকে হৃদয়ে প্রকট করার নামই সাধনা। জন্ম জন্ম ধরিয়া আমাদের এই সাধনা চলিয়া আসিতেছে। প্রথমতঃ বহির্মুখী জীব অন্তর্মুখী সাধনায় স্বারসিকী রুচি অনুভব করে না। অথচ তাহার চরম অপ্রাকৃত স্বরূপাবাপ্তির কথা স্মরণ থাকিলে, যিনি জীবের হিতাকাঙ্ক্ষী, তিনি কখনও বর্তমান বিরূপ অবস্থাতেও তাহাকে নিশ্চেষ্ট থাকিতে দিবেন না। এই জন্য সাধুরা এবং শাস্ত্রসমূহ বিধি প্রণয়ন করিয়া বলপূর্ব্বকও জীবের হৃদয়কে তাহার চরমাভীষ্টের প্রতি আকর্ষণ করিয়া থাকেন। এই প্রকার বিধিদ্বারা অনুশাসিত ভক্তির সাধনাকেই বৈধী ভক্তি বলা হয়। উহা সাধনসাপেক্ষ।

জন্মজন্মান্তর বৈধী ভক্তির সাধনার চিত্ত শুদ্ধ ও ভাবগ্রহণের অনুকূল হইলে সুকৃতিবশতঃ কোনও ভাগ্যবান্ সাধুশাস্ত্রের মুখে ভগবানের অপ্রাকৃত প্রেমলীলা ও ভক্তের লোকোত্তর ভাবাদিমাধুর্য্যের কথা শুনিয়া নিজেও তাহা আস্বাদ করিবার জন্য ব্যগ্র হন। তখন তাঁহার চিত্তের এইরূপ দ্রবীভাব উপস্থিত হয় যে, শাস্ত্র-বিধি কিম্বা যুক্তির অনুশাসন তাঁহাকে আর বাঁধিয়া রাখিতে পারে না, স্বভাবের আকর্ষণেই তিনি শাস্ত্র-যুক্তির পরপারে যে চিন্ময় সৌন্দর্য্যরাশি ফুটিয়া রহিয়াছে, তাহা পাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠেন। চিত্তে এইপ্রকার লোলুপতা জন্মিলেই সাধক রাগানুগা ভক্তির অধিকারী হন।

অধিকারী ব্যক্তিমাত্রেই অভীষ্ট বস্তু পাইবার উপায় অন্বেষণ করিয়া থাকেন। রাগানুগা ভক্তির অধিকারীও কিরূপে ব্রজভাব লাভ করিতে পারা যায়, তাহার উপায় অন্বেষণ করিয়া সাধু ও শাস্ত্রের শরণাপন্ন হন। তার পর তাঁহাদের প্রসাদে তিনি জানিতে পারেন, অপ্রাকৃত ব্রজভাব লাভ করিবার পক্ষে গুণময়ী সাধনা পর্য্যাপ্ত নহে,—গুণের সাধনায় নির্গুণ ভাব পাওয়া যায় না। একমাত্র ব্রজবাসীর কৃপাতেই ব্রজভাব হৃদয়ে স্ফুরিত হইতে পারে। সাধক তখন বুঝিতে পারেন, কৃপাই যেখানে অভীষ্টসিদ্ধির প্রযোজক, সেখানে শাস্ত্রযুক্তি বা লোকাচারের অপেক্ষা কোথায়? এই জন্য সাধক তখন সর্ব্বপ্রকার বিধিনিষেধের প্রতি উদাসীন হইয়া একমাত্র ব্রজবাসী ভক্তস্বরূপ শ্রীগুরুর চরণেই আত্মসমর্পণ করিয়া থাকেন।

বৈধী ভক্তিতে শ্রবণকীর্ত্তনাদি যে সমস্ত অঙ্গসাধনার কথা বলা হইয়াছে, রাগানুগা ভক্তির সাধনাতেও তাহারা উপযোগী। যে পর্য্যন্ত ভাবের আবির্ভাব না হইবে, সেই পর্য্যন্ত বৈধীভক্তির অধিকার। রাগানুগা ভক্তির সহিত বৈধী ভক্তির পার্থক্য এই যে, বৈধী ভক্তির প্রয়োজক ভয়, আর রাগানুগা ভক্তির প্রয়োজক লোলুপতা। কিন্তু সাধনাঙ্গ হিসাবে উভয়ের মাঝে কিছু দূর পর্য্যন্ত সমতা রহিয়াছে। বাহ্য সাধন উভয়েরই এক।—

"বাহ্যে সাধক দেহে করে শ্রবণ কীর্ত্তন।"

—ইহাই রাগানুগা ভক্তির বাহ্য সাধন।

আবার রাগানুগা ভক্তির আন্তর সাধনও রহিয়াছে। শ্রীমৎ কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাহার স্বরূপ বর্ণনা করিতেছেন—

"মনে নিজ সিদ্ধ দেহ করিয়া ভাবন।
রাত্রিদিনে করে ব্রজে কৃষ্ণের সাধন॥"

শ্রীমৎ রূপগোস্বামীও বলিতেছেন—

"সেবা সাধকরূপেন সিদ্ধরূপেণ চাত্র হি।
তদ্ভাবলিপ্সুনা কার্য্যা ব্রজলোকানুসারতঃ॥"

—ব্রজবাসীর অনুগত হইয়া তাঁহার ভাব পাইতে ইচ্ছুক হইয়া সাধকরূপে ও সিদ্ধরূপে সেবা করিতে হইবে। প্রাকৃত দেহদ্বারা যে শ্রীগুরুর সেবা, উহাই সাধকরূপে সেবা। আবার ব্রজলোকে শ্রীকৃষ্ণের যে প্রিয়তম নিজজনের ভাব তুমি পাইতে চাও, তাঁহার অনুগত হইয়া তাঁহার সেবার উপযোগী যে দেহ অন্তরে অন্তরে ইষ্টচিন্তা দ্বারা তুমি গড়িয়া তুলিবে, উহাই হইবে সিদ্ধদেহ। সিদ্ধদেহ দ্বারা সেবাই সিদ্ধরূপে সেবা। শ্রীমৎ কৃষ্ণদাস কবিরাজ বলিতেছেন—

"নিজাভীষ্ট কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ পাছে ত লাগিয়া।
নিরন্তর সেবা করে অন্তর্মনাঃ হঞা॥"

শ্রীরূপগোস্বামী বলিয়াছেন—

"কৃষ্ণং স্মরন্ জনঞ্চাস্য প্রেষ্ঠং নিজসমীহিতং।
তত্তৎ কথারতশ্চাসৌ কুর্য্যাদ্বাসং ব্রজে সদা॥"

—শ্রীকৃষ্ণকে, এবং তোমার অভীষ্ট এমন কোনও শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তম জনকে সর্ব্বদা স্মরণ করিবে, সর্ব্বদা তাঁহাদের প্রসঙ্গ আলোচনা করিবে ও তাঁহাদের লীলাভূমি ব্রজধামে বাস করিবে। স্থূলদেহে যদি ব্রজে বাস না ঘটে, তবে মনে মনে ব্রজবাস করিতেছ, অন্ততঃ এরূপ চিন্তাও করিবে। ইহাতেই রাগানুগা ভক্তির পারিপাট্য হইবে।

তোমার অভীষ্ট, এমন শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তম জন কাহারা ?—

দাস সখা পিত্রাদি প্রেয়সীর গণ।
রাগমার্গে নিজ নিজ ভাবের গণন॥

শ্রীমদ্ভাগবত বলিতেছেন—(৩, ২৫, ৩৮)

যেষামহং প্রিয় আত্মা সুতশ্চ
সখা গুরু সুহৃদো দৈবমিষ্টম্॥

ইহার টীকায় ভক্তিসন্দর্ভকার বলিতেছেন—বিষয়ী ব্যক্তির স্বভাবতঃই বিষয়ের প্রতি যে প্রেম, যাহাতে সর্ব্বদা বিষয়সঙ্গ করিবার জন্য নিরতিশয় ইচ্ছা হইয়া থাকে, তাহাই রাগ—যেমন সৌন্দর্য্যের প্রতি চক্ষুর স্বাভাবিক লোলুপতা বা রাগ রহিয়াছে। ভগবানের প্রতিও যদি ভক্তের এইরূপ ভাব জন্মে, তবে তাহাও রাগ। এই রাগই বিশেষণভেদে বহু প্রকারে অভিব্যক্ত হয়। গোপী ও মহিষীদিগের নিকট ভগবান্ প্রিয়রূপে রাগের পাত্র। সনকাদির নিকট তিনি

আত্মা। শ্রীনন্দ-যশোদার কাছে তিনি পুত্র। শ্রীদামাদির তিনি সখা। প্রহ্লাদাদির নিকট তিনি গুরু। তিনি পাণ্ডবদিগের সুহৃদ্‌, উদ্ধবের ইষ্টদেব।

ইঁহাদের এক একজন রাগানুগা ভক্তি-সাধকের অভীষ্ট হইবেন। ভাবের গণনা করিয়া রাগানুগা ভক্তিতে প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়—এক সম্বন্ধানুগা, দ্বিতীয়তঃ কামানুগা। যাঁহারা শ্রীনন্দযোশোদা প্রভৃতি গুরুজনের কিম্বা শ্রীদামাদি বয়স্যগণের ন্যায় শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা রস আস্বাদন করিতে চাহেন, তাঁহাদের সেই সেই সম্বন্ধানুযায়ী ভক্তিকে সম্বন্ধানুগা ভক্তি বলে। আর যাঁহারা গোপী কিম্বা মহিষীদিগের ন্যায় শ্রীকৃষ্ণের সহিত শৃঙ্গাররস আস্বাদনের জন্য তদনুরূপ ভাবের অনুকরণ করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগের সেই কামাত্মক ভক্তিকে কামানুগা বলে।

কামানুগা ভক্তি আবার দুই ভাগে বিভক্ত—এক সম্ভোগেচ্ছাময়ী, অপর তদ্ভাবেচ্ছাময়ী। যাঁহারা মহিষীদিগের ভাবের অনুগত, তাঁহাদের ভক্তিকে সম্ভোগেচ্ছাময়ী বলে। এই ভক্তিতে মহিষীদিগের মত কিয়ৎ-পরিমাণে আত্মসুখেচ্ছা, মহিমজ্ঞান, লোক-ধর্ম্মাপেক্ষা প্রভৃতি ভক্তিবোধক ভাব বিদ্যমান থাকে। আর যাঁহারা লৌকিক বৈদিক সমস্ত ধর্ম্ম ছাড়িয়া ঐহিক পারত্রিক সকল সুখে জলাঞ্জলি দিয়া গোপীদিগের নিষ্কাম ভাব ও সরস প্রেমময় স্বভাবের অনুকরণ করেন, তাঁহাদিগের ভক্তিকে তদ্ভাবেচ্ছাময়ী বলে।

সংক্ষেপে রাগানুগা ভক্তির বিবরণ দেওয়া হইল। পরিশেষে স্মরণ রাখিতে হইবে, রাগানুগা ভক্তি রাগাত্মিকা ভক্তির আদর্শ দ্বারা অনুপ্রাণিত। সুতরাং উহা পরিপুষ্ট হইলে রাগাত্মিকা ভক্তিতেই পর্য্যবসিত হইয়া থাকে। তখন রাগানুগা ভক্তি বিষয়াশ্রয় ও সিদ্ধি লাভ করিয়া রাগাত্মিকা ভক্তির বিষয়াশ্রয়স্বরূপে আত্মপ্রকাশ করেন।

—:•:—

শ্রীগুরুর চরণ স্মরণ করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুস্থাপিত সাধনভক্তিতত্ত্ব সবিস্তার বর্ণনা করিতে প্রয়াস করিয়াছি। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীমৎ সনাতনকে এই সমস্ত গুহ্যতত্ত্ব উপদেশ করিয়াছিলেন। ইহার পর মহাপ্রভু প্রেমভক্তি ব্যাখ্যা ও ভাগবতের সুপ্রসিদ্ধ আত্মারাম শ্লোকের অর্থ বর্ণনা করিয়া সনাতনকে শুনাইয়াছিলেন। অতি গম্ভীরার্থ বলিয়া আমরা এখানে সে প্রসঙ্গের অনুসরণ না করিয়া পৃথক পৃথক প্রবন্ধাকারে প্রকাশিত করিব মনে করিয়াছি।

শ্রীমৎ সনাতন গোস্বামীর জীবনে তাঁহার শিক্ষা প্রসঙ্গই সর্ব্বাপেক্ষা মনোহর ও গৌরব-ময়। এই গৌরবময় অধ্যায়ের কিঞ্চিৎ আস্বাদ ভক্তজনকে প্রদান করিয়া আমরা বিদায় হইলাম। শ্রীভগবান, ভক্ত ও ভাগবতের জয় হউক। ওঁ শান্তিঃ।

...পরিষদ...

দুই পথ

জগতে দুইটী পথ রহিয়াছে—এক প্রবৃত্তি, অপর নিবৃত্তি। প্রবৃত্তিপথ আমাদের স্বাভাবিক, তাহার জন্য কোহাকেও উপদেশ দিতে হয় না। কিন্তু নিবৃত্তিপথের জন্য উপদেশ বা শাসনের প্রয়োজন। আবার উপদেশ বা শাসন প্রাকৃত জনের উপরেই খাটে। যাঁহারা উন্নত্য সংস্কার লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের পক্ষে নিবৃত্তি পথই স্বাভাবিক। তথাপি তাঁহাদের পথকে যখন নিবৃত্তি মার্গ বলিয়া স্বীকার করিতেছি, তখন তাহার বিপরীত প্রবৃত্তি মার্গকে স্বীকার করিতে হয়; আগে প্রবৃত্তি না থাকিলে নিবৃত্তি হইবে কাহার? সুতরাং নিবৃত্তি পথের পথিককেও এমন একটা শক্তি সঞ্চয় করিতে হয়, যাহা নিরোধের দিকেই প্রবর্ত্তিত হয়। সেজন্য নিরোধেচ্ছার দৃঢ়তা থাকা চাই। স্বভাবের ক্রিয়াকে যিনি যত দৃঢ় সঙ্কল্প সহকারে নিরোধ করিতে পারিবেন, তিনি ততই অধ্যাত্মরাজ্যের উন্নত স্তরে আরোহণ করিবেন, ইহাই হিন্দুশাস্ত্রের সিদ্ধান্ত।

এইখানে প্রশ্ন করিতে পারি, প্রবৃত্তির পথ যখন সম্মুখে সুবিস্তৃত ও অনায়াসগম্য দেখিতে পাইতেছি, তখন নিবৃত্তিপথকে স্বীকার করি কোন প্রমাণে? প্রবৃত্তিমুখী জীবের পক্ষে নিবৃত্তিপথ নিশ্চয়ই ক্লেশকর। ভবিষ্যতে এই ক্লেশসহিষ্ণুতার একটা পুরস্কার না থাকিলে, কেনই বা এখন প্রবৃত্তিদমনের কষ্ট স্বীকার করিতে যাই?

ইহার পরোক্ষ এবং অপরোক্ষ দুইটী প্রমাণ দেওয়া যাইতে পারে। প্রথমতঃ প্রত্যক্ষই দেখিতে পাইতেছি, প্রবৃত্তিমার্গে বিচরণশীল জীবের মাঝেও নিবৃত্তির প্রতি একটা স্বাভাবিক শ্রদ্ধা আছে। যে নিজে চোর, সেও অপরের চুরীর নিন্দা করে। নিজে অন্যায় করিয়া মানুষ যখন অনুতপ্ত হইতে চাহে না, তখন বুঝি, তাহার প্রবৃত্তির আকর্ষণ তাহার পক্ষে বলবৎ হইয়াছে। আবার অপরের মাঝেই সেই অন্যায় দেখিলে সে যখন তাহার নিন্দা ও প্রতিবাদ করে, তখন বুঝি, ইহা নিবৃত্তির প্রতি তাহার অন্তর্নিহিত শ্রদ্ধারই ফল। হইতে পারে, অন্যায়ের নিন্দা কতকটা সামাজিক শিষ্টাচারের অন্তর্গত এবং অনেকের পক্ষে উহা স্বভাবের প্রেরণায় না হইয়া অভ্যাসের দ্বারা নিষ্পন্ন হইয়াছে। কিন্তু তথাপি সামাজিক আচারের মূল হইতে যখন আমরা ইহাকে বিচ্ছিন্ন করিতে পারি না, তখন ইহাকে মানবজীবনের অঙ্গীভূত বলিয়া স্বীকার করিতেই হয়।

আবার এই সমাজের দিকে চাহিয়া বিচার করিলেও বুঝিতে পারি, নিছক প্রবৃত্তির উপর সমাজ দাঁড়াইতেই পারে না। অতি জড়বুদ্ধির মত আত্মরক্ষা ও স্বার্থরক্ষাকেও যদি সমাজের বনিয়াদ বলিয়া স্বীকার করি, তবুও দেখিতে পাই, স্বার্থে স্বার্থে সংঘাতের বিষময় ফল হইতে আত্মরক্ষা করিবার প্রবৃত্তি

প্রবৃত্তিকে নিবৃত্তি দিয়া বাঁধিতে হয়। তার পর সমাজের উন্নতির কথাও বিবেচনা করিতে হইবে। সকলেই যদি কেবল আপনার প্রবৃত্তির ইন্ধন জোগাইতে থাকে, তাহা হইলে সমাজের উন্নতি হওয়া অসম্ভব। পশুসমাজ আর মনুষ্যসমাজে এইখানেই পার্থক্য। পশুসমাজ কেবল প্রবৃত্তির তৃপ্তি দ্বারা পরিচালিত হইয়াছে বলিয়া সৃষ্টির পর হইতে এ পর্য্যন্ত তাহার মাঝে কোনও উন্নতির লক্ষণই প্রকাশ পায় নাই। পক্ষান্তরে মহান্ স্বার্থত্যাগের উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া মনুষ্যসমাজ দিন দিন উজ্জীবিত ও বর্দ্ধিষ্ণু হইয়া উঠিতেছে। প্রবৃত্তি অপেক্ষা নিবৃত্তির শ্রেষ্ঠতা সমাজের মাঝে এই রূপে প্রত্যক্ষ হইয়া দেখা দিয়াছে।

তার পর আর এক কথা। শুধু লাভ লোকসানের বিচার করিলেই যে নিবৃত্তি পথের প্রয়োজনীয়তা বুঝিতে পারি, তাহা নয়। নিবৃত্তির আনন্দ বহুল পরিমাণে আমাদের স্বয়ংসংবেদ্যও বটে। মানব-শিশুর মত প্রবৃত্তিপরতন্ত্র জীব বোধ হয় আর নাই। সকলেই জানেন, শিশু প্রবৃত্তির অনুকূলে যাহাকে ভাল বলিয়া বুঝিয়াছে, তাহার বিপরীত দিকটা কোনও যুক্তি দিয়াও কেহ তাহাকে বুঝাইতে পারে না। নিঃস্বার্থ আত্মত্যাগ, ক্ষমা বা সহিষ্ণুতার মহত্ত্ব সে কিছুতেই বুঝিতে চাহে না। কিন্তু কোনও উপায়ে যদি তাহার চিত্ত দ্রবীভূত করা যায়, তখন দেখা যায়, স্বার্থত্যাগ করিয়া ভাল বাসিয়া শিশুর মত বোধ হয় কেহ সুখী হইতে পারে না। এ বিষয়ে তাহার আগ্রহ যত স্বাভাবিক ও অকপট ভাবে প্রকাশিত হয়, তাহাতে বাধ্য হইয়া এই সিদ্ধান্ত করিতে হয় যে, নিবৃত্তির আনন্দ মানুষমাত্রেরই প্রবৃত্তির আনন্দ অপেক্ষা শ্রেয়ঃ এবং একবার তাহার আস্বাদ পাইলে তাহার শ্রেষ্ঠতা স্বীকার করিতে সে কিছুতেই কুণ্ঠিত হইবে না। শিশুর দৃষ্টান্ত এই জন্য দিলাম যে, শিশুর মাঝে সামাজিক সংস্কারের ছাপ পড়ে নাই—সুতরাং মানবের আদিম প্রকৃতির স্বরূপ তাহার মাঝেই সমধিক পরিস্ফুট।

নিবৃত্তি পথের শ্রেষ্ঠতা সম্বন্ধে এই গুলি হইল অপরোক্ষ প্রমাণ। এগুলি কাহারও মন গড়া কথা নহে—ইহাদের সত্যতা আমাদের নিত্য পরীক্ষিত। কিন্তু দার্শনিক, নিবৃত্তির শ্রেষ্ঠতা সম্বন্ধে ইহা অপেক্ষাও বলবত্তর প্রমাণ উপস্থিত করিতে পারেন। সূক্ষ্মাভিনিবেশসম্পন্ন চিত্তের কাছে দার্শনিক প্রমাণও করামলকবৎ প্রত্যক্ষ বটে, কিন্তু উহা সর্ব্বসাধারণের অধিগম্য নহে বলিয়া স্থূল দৃষ্টিতে উহাকে আমরা পরোক্ষ আখ্যাই দিলাম।

প্রথম কথাই উঠিবে জন্মান্তর নিয়া। একমাত্র হিন্দু সমাজ ছাড়া বৌদ্ধ হয় আর কোনও সভ্যসমাজেই জন্মান্তর স্বীকৃত হয় নাই। ইহা মানবজীবনের সম্বন্ধে অভিনিবেশের অভাব এবং অজ্ঞতারই পরিচায়ক। যে সমস্ত জাতি একবার মাত্র জন্মপরিগ্রহকেই মানবের পূর্ণবিকাশের পক্ষে পর্য্যাপ্ত বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে, তাহাদের মাঝে পরলোক সম্বন্ধে একটা শিথিল ধারণা নিশ্চয়ই জন্মিয়াছে এবং পরলোকের তুলাদণ্ডে ইহলোকের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের পরিমাণ করিবার প্রয়োজন দেখা দেয় নাই। ফলে ইহলোকের ভোগকেই তাহারা চরম মনে করিয়া তাহারই উৎকর্ষে শক্তিনিয়োগ করাকে পরম পুরুষার্থ ভাবিয়াছে। ইহাদের নিকট প্রবৃত্তিপথ

ইহলোকের বিচারে শ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে বলিয়া তাহার ইহলোক-নিরপেক্ষ কোনও মূল্য নির্দ্ধারিত হয় নাই।

কিন্তু হিন্দুসমাজের কথা স্বতন্ত্র। হিন্দু-সমাজে জন্মান্তর স্বীকৃত হইয়াছে বলিয়া জীবনের পরিধি বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি সম্বন্ধে তাহার ধারণা অপর হইতে পৃথক হইয়াছে। কিন্তু এইখানে কেহ প্রশ্ন করিতে পারে, হিন্দু সমাজের স্বীকৃত সিদ্ধান্তই যথার্থ কিনা অর্থাৎ জন্মান্তরের সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অনুমান ও আপ্ত তিন প্রকার প্রমাণই প্রযুক্ত হইতে পারে কিনা। ইহাদের মাঝে অনুমান প্রামাণ্য লইয়াই আমাদের অপরের সঙ্গে বিবাদ চলিতে পারে। জন্মান্তরের স্বপক্ষে ও বিপক্ষে অনুমানমূলে বহু যুক্তির অবতারণা করা হইয়াছে—উহাদের উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু এই সমস্ত যুক্তিতর্কের গতি কোন দিকে, তাহা বুঝাইবার জন্য এই বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, আজ কাল পাশ্চাত্য দার্শনিকেরাও জন্মান্তরবাদ সাহায্যে মনুষ্যজীবনের কার্য্যকারণশৃঙ্খলা-নিরূপণের একটা সুমীমাংসা পাওয়া যায় বলিয়া উহাকে সাদরে গ্রহণ করিতেছেন।

অনুমানের চেয়ে আমাদের কাছে আপ্ত-বচনের প্রামাণ্য বেশী। হিন্দু তার্কিক বলিবেন, অনুমান লিঙ্গ, ব্যাপ্তিজ্ঞান, পরামর্শ প্রভৃতির উপর নির্ভর করে। এর কোনটী-কেই অভ্রান্ত বলিয়া বিশ্বাস করা যায় না। আবার অনুমানের যুক্তি সন্নিবেশেও ভুল থাকিতে পারে। এমন কি অনুমানের মূলে যে প্রত্যক্ষ, তাহাকেও প্রামাণ্য বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না—আমাদের কোনও প্রত্য-ক্ষকেই চরম বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না। ইন্দ্রিয়সহায়ে জ্ঞান সংগ্রহ করি—ইন্দ্রিয় কি ভুল খবর দিতে পারে না? সুতরাং তাত্ত্বিকের কাছে ইন্দ্রিয় বা বুদ্ধি কাহারও প্রমাণই বিশ্বাসযোগ্য নহে।

অবশ্য প্রত্যক্ষই শ্রেষ্ঠ প্রমাণ—বিশেষতঃ অপরোক্ষানুভূতি সমস্ত প্রমাণের শ্রেষ্ঠ। কিন্তু সে প্রত্যক্ষ, সাধারণ মানুষের প্রত্যক্ষ হইলে চলিবে না—তাহা হইতে উৎপন্ন অনু-মান পর্য্যন্ত অপ্রমাণ হইয়া যাইবে। তবে কাহার প্রত্যক্ষকে প্রমাণ মানিব? যিনি দিব্যচক্ষু ও তত্ত্বজ্ঞ, তাঁহার অলৌকিক যোগজ প্রত্যক্ষই সত্য। অবশ্য তাঁহার প্রত্যক্ষ আমাদের প্রত্যক্ষ হইবার উপায় নাই—কিন্তু আমরা অলৌকিক প্রত্যক্ষের কথা তাঁহার কাছে শুনিতে পারি, শুনিয়া বিশ্বাস করিতে পারি। এই বিশ্বাসযোগ্য আপ্ত-বচনই শ্রেষ্ঠ প্রমাণ। যদি ইহাকে সন্দেহ কর, তবে অপরোক্ষানুভূতির পথ খোলা রহিয়াছে—আপ্ত ব্যক্তির শরণ লইয়া তাঁহার নির্দ্দিষ্ট পথে তুমিও দিব্যদৃষ্টিসম্পন্ন অপরোক্ষানুভূতি লাভ কর—সকল সংশয় মিটিয়া যাবে। হিন্দুর প্রমাণ শাস্ত্রের এইটী হইল আসল কথা।

এই আপ্ত প্রমাণই আমাদের বলিয়া দেয়, পরলোক আছে, পরজন্ম আছে। আমাদের সমাজে এগুলি মজ্জাগত বিশ্বাসে পরিণত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু এ বিশ্বাস অসভ্য সমাজের কুসংস্কারের কথা নয়। এখনও এই বিশ্বাসের সত্যতা পরীক্ষা করি-বার পথ রহিয়াছে, পথপ্রদর্শকও রহিয়াছে, চোখের সামনে দেখিতে পাইতেছি—বিশ্বাসের পরীক্ষা আজও চলিতেছে। এই প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়াই বলিতেছি, পরলোক

আছে, পরজন্ম আছে। যদি বৈজ্ঞানিক ইহাতে খুসী না হন, তবে আমরা নাচার। নিজের চোখের দেখাকে বিশ্বাস করিব—না বিজ্ঞানের চুঙ্গীর ভিতর দিয়া দেখাকে বিশ্বাস করিব?

থাক্ সে কথা. বলিতেছিলাম, নিবৃত্তিপথ যে সত্য, তাহার প্রমাণ জন্মান্তরবাদে। কেমন করিয়া তাহা বলিতেছি। ক্রম-বিকাশ সকলেই জানেন, বিশেষতঃ আধুনিক বৈজ্ঞানিক তো মানিবেনই। কিন্তু সেই ক্রমবিকাশ কি শুধু জড়ের রাজ্যে আর প্রাণের রাজ্যেই চলিতেছে? আর মনের রাজ্যে কি তাহা শুধু সমষ্টি চেতনা বা সমাজ চেতনাকে আশ্রয় করিয়াই চলিতেছে? ব্যষ্টি চেতনার আশ্রয়ে ক্রমবিকাশের একটা ধারা খুঁজিবার কি কোনও প্রয়োজন নাই?—আবার কিন্তু আমরা তর্কের পথে আসিয়া পড়িতেছি। কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তর্ক মিথ্যা. সুতরাং তর্ক করিব না। একটু চিত্ত সমাহিত করিয়া সংস্কারমুক্ত হইয়া চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারিব, মাত্র তিন কুড়ি কি চারিকুড়ি বছরের মাঝে আমার সব শেষ হইয়া গেলে, যে আমির মহত্ব ও স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠা করিবার জন্ম আজকালকার যুগে এত আস্ফালন, তাহার প্রতি কোন্ সুবিচারটা করা হইল?

আমার আমিকে দেশে, কালে ব্যাপ্ত করিয়া ভাবিতে পারিলেই একটা আনন্দ পাই —যা অতি সহজ—ঠিক যেন বদ্ধবায়ু গৃহে রুদ্ধশ্বাস হইয়া, বাহিরের মুক্ত বাতাসে আসিয়া হাঁপ ছাড়ার মত। আর এই যে মুক্তির সোয়াস্তি, ইহাতে তো কাহারও কোনও ক্ষতি নাই—জগতের যেখানে যাহা ছিল, তাহা সেখানেই থাকিল, আমারও কোনও দিক্ দিয়া কোনও লোকসান হইল না, শক্তির অপচয় ঘটিল না—অথচ একটা প্রকাণ্ড তৃপ্তিতে জীবন পূর্ণ হইয়া উঠিল। এই ভাবটুকু যখন পাওয়া যায়, তখন আর জীবনকে ক্ষুদ্র পরিধির মাঝে আটকাইয়া রাখা যায় না —দেশের আর কালের সীমা তখন অসম্ভব রকম বাড়িয়া যায়। এখন আর দেশ কাল-জ্ঞান আমাদের কতটুকু বিস্তৃত? বড় জোর দুই-দশ মাইল বা দুই-দশ দিনের ব্যাবধানটা করামলকবৎ প্রত্যক্ষ করিতে পারি। তার পর দেখি, শুধু অঙ্কের হিসাব দিয়া—তখন এক লাখের উপর আর এক লাখ চাপাইলেও অনুভূতির মাঝে কোনও তারতম্য ঘটে না। কিন্তু সংস্কারের বন্ধন হইতে একবার মুক্ত হইতে পারিলে আর ভাবনা নাই—বিস্তৃতির জ্ঞানটা তখন আপনা হইতেই হু হু করিয়া ভিতরে আসিয়া পড়ে—দিন পক্ষ মাসের বেড়া ডিঙ্গাইয়া, ক্রোশ যোজনের হিসাব ছাড়াইয়া। এমনিতর চিত্তের আবহাওয়া দিয়া বুঝি, দেহ নশ্বর অথচ আত্মা অমর, লীলা অফুরন্ত—অতএব পরলোক আছে, পরজন্ম আছে।

অথচ এই ভাবটুকু অর্জ্জিত সংস্কার বলিতে পারিব না। বরং বলিব, এটা আমাদের বর্জ্জিত সংস্কার। ~~মনকে আর~~-নাকে জোর করিয়া না হয় তোমার ভিতর না-ই ঢুকাইলে, তুমি শুধু ছোটর ভাবনা ছাড়িয়া দাও—দেখিবে মহৎভাব তার অকুণ্ঠিত সত্তা লইয়া তোমার মাঝে প্রবেশ করে কি না। জগতে ছোটখাট ব্যাপারগুলিই কেবল চোখে পড়িতেছে, আর তোমার বুদ্ধির মাপে তাহাদের একটা দামও কষিয়া রাখিতেছ। তাই তোমার কাছে এখন ছোটই বাস্তব, বড় বাস্তব নয়, তবে নেতি মূলে তাহার একটা অবাস্তব সামঞ্জস্য মাত্র স্বীকার

কর। যে ইন্দ্রিয় দিয়া দেখে, সে অতীন্দ্রিয় যে ইন্দ্রিয়ের অতীত এইটুকু মাত্রই বোঝে—কিন্তু ইন্দ্রিয়ের অতীত হইয়া যে সেটা কি বস্তুতে দাঁড়াইল, তাহার স্বরূপ বুঝিতে পারে না। ব্রহ্ম, ভগবান, অনন্ত ইত্যাদি বহু বস্তুই আমাদের কাছে এইরকম আবছায়া। কিন্তু ওই আবছায়ার ভাবটা দূর করিতে হইবে—যাহা ক্ষুদ্র, যাহা অল্প, তাহা একেবারে ভুলিয়া যাও বৃহৎ যে কি বস্তু, তাহার স্বরূপ দেখিতে পাইবে—শুধু ক্ষুদ্রের বিরোধী বলিয়া তাহাকে কল্পনামাত্রে পর্য্যবসিত রাখিবার প্রয়োজন হইবে না। তাই বলিতেছিলাম, ভূমার ভাব আমাদের অর্জ্জিত সংস্কার নয়, উহা আমাদের বর্জ্জিত সংস্কার।

জীবনের এইপ্রকার বিস্তৃতিবোধ সহজেই নিবৃত্তির দিকে চিত্তকে উদ্বুদ্ধ করিবে। শুধু সংসারের গোণা কয়টা দিনের মাঝেই জীবনের পরিণতিকে আবদ্ধ রাখিয়া যাহার তৃপ্তি নাই, তাহার জন্য জন্মান্তরের প্রয়োজন আছে। অবশ্য অনন্ত সত্তার সংস্কার যাঁহার মাঝে সিদ্ধস্বরূপে দেখা দিয়াছে, তাঁহার এবার বন্ধন কাটিলেই ছুটী। কিন্তু যে আভাস মাত্র পাইয়াছে, কিন্তু সাধনা সম্পূর্ণ করিতে পারে নাই, তাহার পক্ষে কি গতি হইবে? দেহ ছোট, ভাব বড়। বৃহৎ ভাবকে ফুটাইবার উপযোগী করিয়া দেহটাকে মাজিয়া ঘষিয়া নির্ম্মল করিয়া তুলিলাম, এমন সময় যদি তাহার মেয়াদ ফুরাইয়া যায়, তবে আবার অসমাপ্ত সাধনার জন্য অধিকতর যোগ্যতা লইয়া শুচি ও শ্রীমানের গৃহে জন্ম পরিগ্রহ করিতে হইবে, এরূপ ব্যবস্থা অসঙ্গত নহে। যে বৃহত্তর জীবনের আস্বাদ পাইয়াছে, সে এরূপ ব্যবস্থা চায়। যাহা অসম্ভব বা দুর্লভ, তাহার জন্য যুগযুগান্তর ধরিয়া মানুষের মাঝে একটা সার্ব্বভৌম আকাঙ্ক্ষার উৎপত্তি হইতে পারে না। মানুষ একান্ত প্রাণে যাহা চায়, তাহার বীজ তাহার স্বভাবের মাঝে। স্বভাবের অনুসন্ধান ও অনুসরণ কর—দুরূহ সমস্যাও সহজ হইয়া আসিবে।

কিন্তু ভবিষ্যতে যাহাই হউক, আমাদের বর্ত্তমানে কর্ত্তব্য কি, তাহাই বিচার করিতে হইবে। আবৃত্তির কথা মান আর না মান, জীবনের পরিধিকে বিস্তৃত করিয়া দেখিতে শিখ। শৈশব ছিল তোমার আঁধারের যুগ, যৌবনে আলোর সন্ধান পাইয়াছ, আবার বার্দ্ধক্যের সন্ধ্যায় সকল আঁধার হইয়া আসিবে। এই যে আলো আর আঁধারের আবর্ত্তন, ইহার ফের হইতে কোনও রকমে কি বাঁচা যায় না? ইন্দ্রিয়শক্তির পূর্ণবিকাশে আলোর মালায় সাজিয়া যৌবন আসিয়া যখন দেখা দিয়াছে, তখন ইহাকে পলাইয়া যাইতে দিবে কেন? কোনও উপায়ে কি এই উদ্বুদ্ধ চেতনাকে চিরন্তন করা যায় না? তোমার অল্পপরিসর জীবনের মাঝে যৌবনের অধিকার আর কতটুকু? কিন্তু একবার যদি শক্তিমানের অধিকার পাইয়াছ, তখন এই শক্তিরই সাধনা করিয়া যুগান্তরে তাহাকে ব্যাপ্ত করা যায় না কি?

মন বলে, যায়। ভাবনা দ্বারা শক্তির পরিপুষ্টি করা যায়। তোমার চালচলন যেমন আছে, না হয় তেমনই থাকুক—কিন্তু তুমি একবার এই বর্ত্তমান শক্তির স্ফুরণকে সীমাহীন কালের চক্রবালে বিলীন করিয়া দাও! ভাব—"আমার অতীতের সূচনা নাই, ভবিষ্যতের সমাপ্তি নাই—আছে শুধু মহা-

শক্তির প্রসাদে অনুপ্রাণিত মহাবর্ত্তমান। আমি কোনও দিন বালক ছিলাম না—কোনও দিন বৃদ্ধ ছিলাম না।—আবার কোনও দিন শৈশব বা বার্দ্ধক্যের ফাঁদে আবদ্ধ হইব না—এই মহানন্দময়, মহাশক্তিময় যৌবনই আমার স্বরূপ। দেহ তাহার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে চায়, সংস্কারী মন তাহার বিদ্রোহী হইয়া উঠে—হউক, এই বিদ্রোহকে, দমন করাই আমার কাজ, যৌবনে আমার স্বরূপ জাগিয়াছে, কালের মলিন স্পর্শে ইহাকে বিরূপ হইতে দিব না।"

ভাবিতে গেলেই নিজের ভিতর হইতে অনেক কিছু বাদ দিতে হইবে। অথচ, আনন্দ তাহাতে কমিবে না। বরং ভারমুক্ত চিত্ত স্বাধীনতার স্ফূর্ত্তিতে যে আনন্দ উপভোগ করিবে, অন্যত্র তাহার তুলনা মিলিবে না। দেহ একটা ভার, সংস্কারী মন বুদ্ধি আর একটা ভার—আর তাহার ঊর্দ্ধে সর্ব্বভার-বিনির্মুক্ত আমি রাজাধিরাজের মত স্বাধীন—জন্মজন্মান্তরব্যাপী বিরাট্ জীবনের সাধনায় এই ভাবের সামঞ্জস্য ও পরিণতি।

নিবৃত্তির এই হইল শ্রেষ্ঠ প্রমাণ। বাহিরে নয়, তর্কে নয়, তোমার অনুভূতির মাঝে এই প্রমাণ নিহিত রহিয়াছে। তোমার সঙ্কীর্ণ জীবনের কল্পনার মাঝেই প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি পরস্পর বিরোধী। তাই ভোগলোলুপ চিত্ত ত্যাগের কথা শুনিলে আতঙ্কে শিহরিয়া উঠে। কিন্তু অনন্তপ্রসারিত জীবন ত্যাগই যে অভিনব পরমানন্দময় ভোগের রূপে দেখা দিতেছে। অবোধ তুমি, ভোগের জন্য পাগল হইয়াছ, এই সঙ্কীর্ণ আধারে কতটুকু ভোগ তোমার সম্ভব? আর সেই ভোগেরও কি সীমা নাই? বিপত্তি নাই? অতৃপ্তির হাহাকার নাই? কিন্তু জীবনকে উদার কর, মহাকালের সঙ্গে যুক্ত কর, ভোগের সঙ্কীর্ণতা দূর হইয়া আনন্দের দ্যুতিতে তাহা চমকিয়া উঠিবে—প্রবৃত্তির মাধ্যাকর্ষণ কাটাইয়া নিবৃত্তির দিকে অদম্য অনাহত গতিতে জীবন ছুটিয়া চলিবে। তখন কে না বলিবে, নিবৃত্তিই জীবনের যথার্থ প্রবৃত্তি—ত্যাগই যথার্থ ভোগ?

দেশের ও দশের কথা

একটী বৎসর চলিয়া গেল—কালের ছন্দঃ-প্রবাহে আবার একটী যতি পড়িল। যদি অতীতের দিকে তাকাই, তবে মহাকালের আদির সন্ধান পাই না—যদি ভবিষ্যতের দিকে তাকাই, তবে অন্ত দেখি না। কিন্তু এই আদি-অন্তহীন কাল-সত্তাকে ধারণ করিতে গেলে হৃদয় অবসন্ন হইয়া পড়ে—আমাদের ক্ষুদ্র জীবনের সুখ-দুঃখের বোঝা নামাইয়া একটু বিশ্রাম করিবার ঠাঁই যদি কোথাও না পাই, তবে বিরামহীন অনন্ত যাত্রার কথা স্মরণ করিয়া চিত্ত আতঙ্কে শিহরিয়া উঠে। তাই মহাকালের বুকে, প্রবাহের বুকে রেখার মত একটা সীমারেখা কল্পনা করিয়া আমরা দীর্ঘ পথযাত্রার অন্তরালে একটু মাথা গুঁজিবার মত ঠাঁই করিয়া লইয়াছি। এইখানে আসিয়া আবার সম্মুখ পানে চাহিয়া দেখি, কতদূর যাইতে হইবে। সম্মুখে পিছনে অনন্ত দীর্ঘ পথ ধু ধু করিতেছে, তার মাঝে দূরে দূরে দেখি, মানুষের সুখ-দুঃখের সাক্ষী, জীবনের মানদণ্ডস্বরূপ এক একটী বৎসরের ছেদ—দেখিয়া কেহ বা দুঃখের বোঝা লঘু বলিয়া অনুভব করি, কেহ বা সুখের আশায় উৎফুল্ল হই। এমনি করিয়া কালের বক্ষে সীমার রেখা টানিয়া মায়ার হাট বসাইয়াছি—অসীমকে সসীম করিয়া আনন্দকে খণ্ডিত করিয়া সুখ দুঃখের সৃষ্টি করিয়াছি। এ আমাদের আপন হাতের সৃষ্টি, তাই এই ই আমাদের ভাল লাগে। কিন্তু চিরদিন নীড়ে বসিয়া থাকিলে তো পাখীর চলিবে না—অন্তহীন নীলিমার কোলও যে তাহাকে আহ্বান করিতেছে—সে আহ্বান সে উপেক্ষা করিবে কি করিয়া? সেখানে বিশ্রামের ঠাঁই নাই বলিয়া ভয় করিলে চলিবে না—ভগবান পাখা দিয়াছেন নীড়ে বসিয়া তাহাদিগকে পঙ্গু করিবার জন্য নয়—উড়িবার জন্য। উড়িয়া উড়িয়া শ্রান্ত হইয়া আবার নীড়ে আসিয়া বিশ্রাম কর, তাহাতে আপত্তি নাই—কিন্তু হে বিহঙ্গ, স্মরণে রাখিও, একদিন তোমার এ সুখের নীড় মহাকালের রুদ্র নিঃশ্বাসে কোথায় উড়িয়া যাইবে—তখন ওই অসীম ব্যোমতলে পক্ষ ঝাপটিয়া মরা ছাড়া তোমার আর উপায় থাকিবে না। আর বিশ্রামের ঠাঁই থাকিবে না—সঙ্গে সাথী থাকিবে না—অসীম নীলাকাশে নিরুদ্দেশ অনন্ত যাত্রায় বাহির হইয়া পড়িতে হইবে! ভয় কি?—সে তো তোমার মরণপথে যাত্রা নয়—সে যে অনন্ত জীবনপথে যাত্রা! ভাবিতেছ, এই দুটী পাখার বল বুঝি সেদিন টুটিয়া যাইবে—নিরাশ্রয় মৃত্যুর কোলে বুঝি ঢলিয়া পড়িতে হইবে। তা নয়—এই শক্তিহীন পক্ষেই সেদিন মহাশক্তির আবির্ভাব হইবে—অনন্ত পথশ্রমই অনন্ত বিশ্রামে রূপান্তরিত হইবে—অসীম আকাশই তোমার নীড় হইবে। হে বিহঙ্গ, সেই নীড়ের কথা স্মরণ করিয়া আজ এ নীড় ভাঙ্গিবার আয়োজন কর—আর

ধরণীর বুকে বিশ্রামের ঠাঁই রচনা করিও না—
স্মরণ করিও, মাটী তোমাকে রূপ দিয়াছে—
কিন্তু আকাশ দিয়াছে অভিনব শক্তির বিলাস,
বন্ধহীন বিচরণের আনন্দ !

—*—

দেশের কথা মনে হইলেই আগে আমাদের রাজনীতির কথা মনে পড়িয়া যায়, অর্থাৎ মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক মনে পড়িবার আগে, রাজার সঙ্গে প্রজার কি সম্পর্ক, আমরা তাহারই মামলা জুড়িয়া বসি। কিন্তু রাজাও মানুষ, প্রজাও মানুষ—উভয়ে মানুষেরই বিশিষ্টরূপ। এক্ষণে বিচার করিতে হইবে, জীবনের মূল্য ও কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিব—মানুষে মানুষে যে সার্ব্বভৌম সম্বন্ধ, তাহাই আশ্রয় করিয়া, না রাজা মানুষ আর প্রজা মানুষের বিশিষ্ট সম্বন্ধ লইয়া? আজকালকার শিক্ষিত মানুষ শেষের সম্বন্ধটাকেই বড় করিয়া দেখিতেছেন। দেখুন, তাহাতে আপত্তি নাই—কিন্তু এই দৃষ্টিতে বর্ত্তমান শিক্ষার যে গতি ও প্রকৃতি প্রকাশ পাইতেছে, তাহাকেই কি শ্রেয়ঃ বলিয়া মানিয়া লইব? সবিশেষের আসন কি নির্ব্বিশেষেরও উপরে দিতে হইবে? হইতে পারে, কর্ত্তব্যকে রাজনীতির গণ্ডীকাটিত মানিয়া না লইলে সভ্য জগতে আমাদের নিন্দা হইবে; এমনও হইতে পারে, রাজনীতি ছাড়া আমাদের অন্নবস্ত্র-সমস্যা মীমাংসারও উপায় নাই। কিন্তু তবুও সন্দেহ হয়, মানব-সমাজের ভিত্তি কি রাজায় রাজত্বের উপর, না মানবের মনুষ্যত্বের উপর? মানুষের প্রতি মানুষের যে সার্ব্বভৌম কর্ত্তব্য, তাহার কতটুকু আমরা সম্পাদন করিয়াছি? যদিই বা আমরা রাষ্ট্রীয় অধিকার পাই, তবে কি মনুষ্যত্বের ভিত্তির উপর তাহাকে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিব? আমাদের মাঝে প্রকৃত মনুষ্যত্ববিশিষ্ট কয়টা মানুষ জন্মিতেছে? মনুষ্যত্ব অব্যাহত ও উপচিত করিবার জন্য আমরা কোন্ আন্তরিক চেষ্টাটাই বা করিয়াছি?—যাঁহারা নিজকে শিক্ষিত বলিয়া অভিমান করেন, এগুলি তাঁহাদেরই কর্ত্তব্য—ডিপ্লোম্যাসি নীতি বা জেরবার নীতি ছাড়িয়া যদি এইদিকে তাঁহাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট ও শক্তি নিয়োজিত হয়, তবেই না তাঁহাদের শিক্ষার সার্থকতা। অবশ্য রাজার প্রজার বোঝাপড়ার আবশ্যকতা আছে, তাহা কোনও কালেও অস্বীকার করা যাইবে না। কিন্তু সে বোঝাপড়াও তো মানুষেরও সাথে মানুষেরও বোঝাপড়া হওয়া উচিত—অন্ততঃ তাহার একপক্ষ মনুষ্যত্বের গৌরব ও অধিকার লইয়া বুঝিবে। কিন্তু আমরা দেশের লোককে মানুষের মত মানুষ করিবার জন্য কি চেষ্টাই বা করিয়াছি, নিজেরাই বা কতটুকু মনুষ্যত্ব অর্জ্জন করিয়াছি? স্বার্থের দিকে না চাহিয়া, যশের আকাঙ্ক্ষা না করিয়া, বিলাসিতা বর্জ্জন করিয়া, অভিমান ও দলাদলি ছাড়িয়াই বা ক'জন রাষ্ট্রসেবা করিতে অগ্রসর হইয়াছি?

—*—

ধর্ম্ম, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, শিল্প—এই সমস্ত বিষয়ে আমাদের সকল দৈন্য দূর হওয়া আবশ্যক। এই প্রসঙ্গে রাজার সহায়তা ছাড়া নিজেদের কারবারও যথেষ্ট রহিয়াছে। অবশ্য রাষ্ট্রীয় অধিকার লাভের অনুপাতে দেশের শ্রীবৃদ্ধি করিবার সুযোগ আমাদের অধিক পরিমাণে মিলিবে। কিন্তু তাহার পূর্ব্বে স্বাবলম্বনের উপর নির্ভর করিয়া

মরাই বা কতটুকু করিতে পারি, তাহা বা করা এবং তদনুসারে চেষ্টা করা উচিত। ীয় আন্দোলনের প্রয়োজন নিশ্চয়ই আছে ঃ একশ্রেণীর লোকের শুধু তাহা লইয়াই যুক্ত থাকা প্রয়োজনও বটে। কিন্তু শিক্ষিত ের অধিকাংশ শক্তি যদি কেবল ফাঁকা ওয়াজ করিতেই ব্যয়িত হইয়া যায়, তবে াতে কি দেশের স্থায়ী কোনও হিত ? কাউন্সিলে ভোটের জোরে কোনও প্রস্তাব নাকচ হইল কি বাহাল ল, তাহা লইয়া যতখানি হৈ চৈ হয়, াহাতে অনুমান হইতে পারে, বুঝি দেশের হিতাহিত, সমস্ত উহার উপরেই নির্ভর করেছে। কিন্তু আমাদের মনে হয়, ইহা কেহ যদি কোনও গণ্ডগ্রামে একটী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করেন, কিম্বা স্থানে একটী জলাশয় প্রতিষ্ঠিত ন, কিম্বা কোনও নষ্ট শিল্পের উদ্ধারকল্পে মাত্রও চেষ্টা করেন—তবে এই সমস্ত বাক্য- বাগাড়ম্বর চেয়ে ঐ নীরব কর্ম্মীর ের সেবাই অধিকতর মূল্যবান্ হইবে। ত রাষ্ট্রীয় আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা কার করা হইতেছে না—কিন্তু তাহার আমাদের ঘরোয়া কাজের তাগিদ যে , তাহাই বলা হইতেছে মাত্র।

—•—

কাজের চেয়ে কথা আমরা চিরদিনই ভালবাসি—কথায় বাজী মাৎ হইলেই রা খুসী। নিজের শক্তির পরিমাণ বিচার করিয়া যাহারা কেবল আস্ফালন করিতেই , তাহারা অন্তঃসারশূন্যতারই পরিচয় থাকে মাত্র। ইদানীন্তন অনেক ক্ষেত্রেই আমাদের অত্যধিক পরিমাণ বাগাড়ম্বর প্রকাশ পাইতেছে। কিছুদিন পূর্ব্বে মহাত্মা গান্ধীর কারামোচন উপলক্ষ্যে সংবাদপত্রসমূহে যে সমস্ত গরম গরম প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা পড়িয়া মনে হইত, মহাত্মার কারামুক্তির সমস্তটুকু কৃতিত্বই বুঝি আমাদের—এইভাব আর ভাবনা নাই আমরা স্বরাজের দিকে ঘনাইয়া আসিয়াছি। অথচ যতদিন মহাত্মা কারাগারে ছিলেন, ততদিন তাঁহার সঙ্কল্পিত ও আরব্ধ কার্য্যের কতখানি উন্নতি হইয়াছিল, তাহাও কাহারও অবিদিত নাই। কার্য্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যহীন অসম্বদ্ধ উচ্ছ্বাসবাক্যে ধীর শ্রোতা যে কেবল লাঞ্ছিত হইয়া থাকেন, তাহা নহে, বক্তার অন্তঃসারশূন্যতার কথা ভাবিয়া তাঁহার দুঃখও হয়।

—•—

সংবাদপত্রে পুনঃ পুনঃ নারীনিগ্রহের কথা পাঠ করিয়া ও দেশের নৈতিক অধোগতির কথা ভাবিয়া হৃদয় অবসন্ন হইয়া পড়ে। এই নারীনিগ্রহ যে কেবল দেশের নৈতিক অস্বাস্থ্যের পরিচায়ক তাহা নহে, অদূর ভবিষ্যতে উহা হিন্দু মুসলমানের মধ্যে জাতীয় বিদ্বেষের আকারে দেখা দিবে বলিয়া মনে হয়। অত্যাচারীদিগের মধ্যে মুসলমানই অধিক বটে, কিন্তু হিন্দুরও একান্ত অভাব নাই। যে ব্যাপারটার মাঝে জবরদস্তীর মাত্রা বেশী, সেইটাই আদালতে উঠে। কিন্তু আবরুর আড়ালে যে কত কিছু হইতেছে, তাহার খবর সে আর দেশবিদেশে ছড়াইয়া পড়ে না। ঘরের খবর আমরা অনেকেই হজম করিয়া চুপ করিয়া বসিয়া আছি। দেশে দিন দিন অন্নসমস্যা কঠিন হইতেছে, তাহার উপর রোগের তাড়নায় দেশবাসীর স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে—ইহার উপর যদি

ইন্দ্রিয়পরতার প্রকোপ দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে থাকে, তবে পরিণামে কি হইবে, তাহা ভাবিয়া আর কূলকিনারা পাওয়া যায় না। দেশটা মুসলমানের বলিয়া হিন্দুরা তো আর পাশ কাটাইয়া যাইতে পারিবে না—কেননা দেশটা যে উভয়েরই। তারপর, শুধু হিন্দুমুসলমানের জাতিবিচার করিয়া নয়, নারী-পুরুষের সম্পর্ক বিচার করিয়াও ইহার একটা মীমাংসা প্রয়োজন।

—•—

সংযম ও শুদ্ধাচার ব্যতীত শক্তি জাগে না। কিন্তু সে কথা আমরা আজ ভুলিয়া গিয়াছি। আলো-হাওয়ার মত বিলাসিতা ও ইন্দ্রিয়তৃপ্তির উপকরণ সংগ্রহও আমাদের নিকট এখন একটা নিত্যপ্রয়োজনীয় ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহার জন্য যেমন বিলাতী সভ্যতার সার্টিফিকেট আছে, তেমনি দেশী স্মৃতিরও সার্টিফিকেট আছে, ক্ষেত্র বিশেষে ডাক্তারী সার্টিফিকেটও আসিয়া জোটে। কলসীতে ফুটো রাখিয়া আমরা তাহাতে জল ঢালিতেছি, আর অবাক্ হইয়া ভাবিতেছি, কলসী পূরে না কেন? এই অনাচার ও অসংযমের সহিত ভাবুকতা ও কর্ম্মবিমুখতা আসিয়া জোগান দিতেছে। এমন জাতির যদি দুর্দ্দশা না ঘটে, তবে কাহার ঘটিবে? ইহার প্রতীকার সভা-সমিতি বা কাউন্সিলের বৈঠকে হইবে না-প্রত্যেককে আপনার বোঝা আপনি বহি[তে] হইবে। একটী পরিবারে, দেশের ভ[বিষ্যৎ] আশাস্থল একটী যুবক বা বালকে [যিনি] সংযমের বীজ বপন করিয়া শক্তির উ[দ্বোধন] করিবেন, দেশোদ্ধারকারী মহানায়ক [অপেক্ষা] তাঁহার উপরেই আমাদের শ্রদ্ধা ও ভরসা [বেশী] হইবে।

—•—

পৌরুষের পরিচয় পাইলাম পঞ্জা[বের] পুণ্যভূমিতে। ধর্ম্মের জন্য অবিচলিত [চিত্তে] যাহারা মৃত্যুকে বরণ করিয়া লইল, তাহ[ারা] সমগ্র জগতের নমস্য। বিশ্বাসে প্রাণ দে[ওয়া] সহজ কথা নয়। পাটোয়ারী বুদ্ধি থাকি[লে] কেহ তাহা পারে না। এত নির্য্যাতন করিয়াও যে শিখ জাতি তাহাদের [ধর্ম] অটুট রাখিয়াছে—"শির দিয়া তভী সার দিয়া"—ইহাই মনুষ্যত্বের প্রকৃত পরিচয় এই মনুষ্যত্বের নিদর্শন ভারতের মান রাখি[য়া]ছে—অহিংসানীতির বিপুল শক্তি [জগৎ] সমক্ষে প্রচার করিয়াছে। এই প্রসঙ্গে আম[া]দের দেশের কথা মনে হয়—বোধ [হয়] বুদ্ধিমান বাঙ্গালী এত সরল বিশ্বাসে [নি]মিছি পৈতৃক প্রাণটার অপব্যয় করিত [না;] দেশের জন্য "নন্দলালে"র মত কোনও র[কমে] না কোনও রকমে টিকিয়া থাকিতই।

—•—

আরণ্যক

—*—

"যজ্ঞেন বাচঃ পদবীয়মায়ন্ তামন্ববিন্দন্ ঋষিষু প্রবিষ্টাম্ ॥"

—ঋগ্বেদ সংহিতা ১০।৬।৩

—*—

বিশ্বাস কর—বিশ্বাসই সকলের মূল। চোখ বুজে কেউ কোনও দিন বিশ্বাস করতে পারে না।—ওসব বাজে কথা। তুমি চোখ মেলে দেখছ বলে সেটাকে প্রত্যক্ষ বলছ—বিবেকী বলবেন, ওটাও তো তোমার বিশ্বাস। বিশ্বাস অর্থ অন্তশ্চক্ষু দিয়ে, দিব্যচক্ষু দিয়ে দেখা—সে স্থূল প্রত্যক্ষের চেয়েও বড় কথা।

*

তুমি ভাবছ, তোমার চেষ্টায় জগতের একটা কিছু পরিবর্ত্তন ঘটাবে—অর্থাৎ খোদার উপরেও তুমি খোদকারী করবে। কিন্তু আসলে পরিবর্ত্তন হয় তোমার দৃষ্টির—জগতের নয়। একই ব্যাপার আশার চোখে দেখলে এক রকম ঠেকে; আবার নিরাশার চোখে ঠেকে আর এক রকম। তা হলে শোধরানো দরকার কাকে—জগৎকে, না তোমাকে?

*

তোমার ভিতরেই সব আছে—চেষ্টা করলেই ফুটবে। তবে গুরুর কৃপা চাই। কিন্তু জগতে গুরুর অভাব কোনও দিন হয় না। লোকে বলে, গুরুর দেহান্তর ঘটে। তা নয় সদ্গুরুই জগদ্গুরু। সময় হলে সেই জগদ্গুরুই এসে তোমার মাঝে সব ভাব জাগিয়ে তুলবেন।

*

পাঁজি-পুঁথি দেখে ভাল হতে গেলে চ না। মনে যে মুহূর্ত্তে ভাল হবার ইচ্ছা হ সেই মুহূর্ত্তেই কাজে লেগে যাবে—তা যতটুকু হয়, তাই তোমার লাভ। তো মন তো তোমার নয়। আজ সে ভ আছে, কাল বিগড়াতে আর কতক্ষ তাই শুভ মুহূর্ত্তের সুযোগ ছেড়ে দিতে না মন একদমে ভাল হয় না বটে, কিন্তু যে শি তাকে দাও না কেন, তা সে তোলে তাই ক্ষণেকের সংশিক্ষারও একটা মস্ত প্র আছে।

*

তুমি আনন্দ চাও—কিন্তু কতটুকু আনন্দ ধারণ করবার শক্তি তোমার আছে? একটু মাত্রা চড়লেই যে এই দেহটা চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যেতে পারে—অসহ্য আবেগে মন রুদ্ধশ্বাস হয়ে যেতে পারে। তাই দেহ আর মনকে আগে আনন্দ ধারণার যোগ্য করতে হয়—সমস্ত ক্লেদ বের করে দিয়ে এ দুটিকে স্বচ্ছ ও লঘু করতে হয়। দেহ মন এমন করবে যে, চিমনীর ভিতর দিয়ে আলোর মত

আনন্দ তার ভিতর দিয়ে জগতে ছড়িয়ে পড়বে। এর উপায় হচ্ছে আহারশুদ্ধি— দেহের আহার, মনের আহার, দুই-ই শুদ্ধ হওয়া চাই।

*

মুখ বাঁকা কোরো না—হাসতে শেখ। হাসি না আসলেও জোর করেই হাসতে হবে। জগতে নিরানন্দের কি আছে? ছেলেবেলায় খেলা করনি? তখন তো আঘাত পেয়ে চোখে জল ঝরেছে, তবুও মুখে হাসিটী লেগে রয়েছে—কিম্বা খেলার মত আঘাতকে গ্রাহ্যই করনি। বড় হয়ে কি খেলা ভুলে গিয়েছ? হাজার বড় হলেও এখনও তো সেই মায়ের ছেলেই আছ—আর সেই খেলাই খেলছ। তবে আর কান্নাটা তোমার কাছে সত্যি হবে কেন? আগেও যেমন হাসতে—এখনও তেমনি শিশুর মত সরল প্রাণে হাস।

সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং
কলিকাতা

সংবাদ ও মন্তব্য

আশ্রম সম্বাদ

মঠাধিষ্ঠাতা শ্রীমৎ পরমহংসদেব কুচবিহার, আলিপুরদুয়ার, সৈদপুর প্রভৃতি স্থান ভ্রমণ করিয়া ভক্তগণের আহ্বানে সম্প্রতি জলপাইগুড়ির মফঃস্বল পরিভ্রমণে গিয়াছেন। বর্ত্তমান মাসের শেষভাগে তাঁহার কলিকাতা অঞ্চলে যাওয়ার কথা আছে, ইহা আমরা পূর্ব্বেই বিজ্ঞাপিত করিয়াছি। যাঁহারা দর্শনার্থী, তাঁহারা হাওড়া ২০৩ পঞ্চাননতলা রোড, শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ মিত্র উকীল মহাশয়ের নিকট অনুসন্ধান করিবেন।

বার্ষিক মহোৎসব

আগামী বৈশাখ মাসের ২৪শে তারিখ বুধবার অক্ষয়তৃতীয়া তিথিতে অত্র সারস্বত মঠান্তর্গত শান্তি আশ্রমের ১৭শ বার্ষিক উৎসব আরম্ভ হইবে; তদুপলক্ষে ঐ দিন শ্রীশ্রীগুরুব্রহ্মের আবাহন ও অর্চ্চনা, ২৫শে তারিখ শাস্ত্রব্যাখ্যা ও আলোচনা এবং ২৬শে তারিখ পঞ্চমী তিথিতে জগদ্‌গুরু শ্রীমদ্ভগবৎপাদ শঙ্করাচার্য্যের আবির্ভাব উপলক্ষে সারস্বত মঠে তদীয় আসন পূজা আরত্রিক, হোম ও বেদপাঠাদি হইবে। সমস্ত দিন ব্রহ্মনাম যজ্ঞ এবং দরিদ্র নারায়ণের সেবা পূজা হইবে। এই মহোৎসবে যোগদান করিবার জন্য আমরা সাধু সন্ন্যাসী, ভক্তবৃন্দ এবং আমাদের "আর্য্যদর্পণের" গ্রাহক অনুগ্রাহক ও পাঠকগণকে নিমন্ত্রণ করি, সাদরে আহ্বান করিতেছি।

পরলোকে

অত্রস্থ সারস্বত মঠের অন্তর্গত শ্রীগৌরাঙ্গ সেবাশ্রমের খড়্গপুরস্থিত শাখাশ্রমের কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী স্বরূপানন্দজী বিগত ২৭শে ফাল্গুন নশ্বর দেহ পরিত্যাগ করিয়া শ্রীগুরুর চরণাশ্রয় প্রাপ্ত হইয়াছেন। আমরা বারান্তরে তাঁহার সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

গ্রন্থ-পরিচয়

গতবারের মত এবারও আমরা ৪৫ আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটস্থিত "স্বাস্থ্য ধর্ম্মসঙ্ঘ" হইতে এক খণ্ড ১৩৩১ সালের স্বাস্থ্যধর্ম্ম গৃহপঞ্জিকা উপহার প্রাপ্ত হইয়াছি। এবারেও গত বর্ষের ন্যায় অভিনব হরপার্ব্বতী সংবাদ সন্নিবেশিত হইয়াছে। ইহা ছাড়া আদর্শ ব্যায়াম প্রণালী, সংক্ষিপ্ত শরীরগঠন ও ক্রিয়াতত্ত্ব, আকস্মিক বিপদের প্রাথমিক চিকিৎসা, রোগীর সেবা, গার্হস্থ্য ভেষজ উদ্যান, সহজ মুষ্টিযোগ, স্বাস্থ্যপ্রচারার্থ, বিবিধ প্রসঙ্গ গৃহস্থালীর টুকরা জ্ঞান, শাকসব্জীর কথা, কারাকিৎ, গো চিকিৎসা এবং পরিশেষে সংবাদকোকে সহজ প্রয়োজনীয় বার্ত্তাজ্ঞাপক বিষয় সঙ্কলিত হইয়াছে। প্রায় দুই শত

যা এই সমস্ত নিত্য প্রয়োজনীয় বিষয় সংকলিত হইয়াছে। উহাতে পত্রিকাখানি, প্রত্যেক গৃহস্থের নিত্যসঙ্গী বলিয়া বিবেচিত হইবে, তাহা বলাই বাহুল্য। হাতে লইলে ৵১০, মফঃস্বলবাসীর পক্ষে। আমরা স্বাস্থ্যধর্মসম্বন্ধে দেশবাসীকে এই অভিনব চেষ্টার জন্য অভিনন্দিত করিতেছি।

—•—

বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলন

আগামী ৬ই ও ৭ই বৈশাখ (১৩৩১) ১৯এ ও ২০এ এপ্রিল শনি ও রবিবার সনাকুল কৃষ্ণনগর সমাজের আহ্বানে স্বর্গীয় রাজা রামমোহন রায় মহোদয়ের জন্মস্থান হুগলী জেলার অন্তর্গত রাধানগরে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের পঞ্চদশ অধিবেশন হইবে। প্রবন্ধ লেখকগণ অনুগ্রহ করিয়া ২৮শে চৈত্রের মধ্যে তাঁহাদের প্রবন্ধ ও তাহার চুম্বক অভ্যর্থনা সমিতির সম্পাদক কবিরাজ শ্রীযুক্ত কিশোরী মোহন গুপ্ত এম্ এ, মহাশয়ের নিকট ৭৩।২ হরিঘোষ ষ্ট্রীট ঠিকানায় পাঠাইয়া বাধিত করিবেন। সাহিত্যিক অনুষ্ঠান ও পাঠাগার প্রভৃতি যাঁহারা সম্মিলনে প্রতিনিধি পাঠাইবেন, তাঁহারা উক্ত সম্পাদক মহাশয়ের নিকট ১০শে চৈত্রের মধ্যে প্রতিনিধির নাম ঠিকানা প্রভৃতি পাঠাইয়া দিবেন। টাকাকড়ি যিনি যাহা পাঠাইবেন অভ্যর্থনা সমিতির সম্পাদকের নিকট উপরি-লিখিত ঠিকানায় অথবা কোষাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু এম্ এ মহাশয়ের নিকট ১৮নং বলরাম ঘোষ ষ্ট্রীটে পাঠাইবেন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য

শ্রীগুরুর কৃপায় বর্ত্তমান চৈত্রমাসে আর্য্যদর্পণের ষোড়শ বর্ষ পূর্ণ হইল। আগামী বৈশাখমাস হইতে আর্য্যদর্পণের সপ্তদশ বর্ষ আরম্ভ হইবে। নানা দৈবদুর্ব্বিপাকে এই বৎসর চেষ্টা করিয়াও আমরা সকল মাসেই যথারীতি পত্রিকা প্রকাশ করিতে সমর্থ হই নাই। মফঃস্বল হইতে, বিশেষতঃ সুদূর আসামের মফঃস্বল হইতে পত্রিকা পরিচালনা করা যে কি দুরূহ ব্যাপার, তাহা ভুক্তভোগী ভিন্ন অপরে বুঝিতে পারিবে না। যাহা হউক, তথাপি আমাদের অনিচ্ছাকৃত ত্রুটীর জন্য আমরা সবিশেষ দুঃখিত। আগামী বৎসর যাহাতে পত্রিকা প্রকাশে কোনও বিশৃঙ্খলা না ঘটে আমরা তাহার জন্য সচেষ্ট থাকিব।

প্রতিবৎসরেই আমরা নির্দ্দিষ্টসংখ্যক পত্রিকা মুদ্রিত করিয়া থাকি, কিন্তু বৎসর শেষ হইবার বহুপূর্ব্বেই তাহা নিঃশেষিত হইয়া যায়। ইহা দেশবাসীর স্বধর্ম্মানুরাগের পরিচায়ক সন্দেহ নাই। শ্রীগুরুর আশীর্ব্বাদ মস্তকে ধারণ করিয়া আর্য্যদর্পণ দেশের হিতকল্পে আত্মনিয়োগ করিতে পারিয়াছে বলিয়া নিজকে কৃতার্থ মনে করিতেছে। সত্য ধর্ম্মের জয় হউক—শ্রীগুরুর চরণে ইহাই প্রার্থনা।

যাঁহারা আগামীবর্ষে পত্রিকা লইবেন, তাঁহাদিগের পক্ষে মনিঅর্ডার যোগে মূল্য প্রেরণ করাই সুবিধা, নতুবা ভিঃ পিঃতে পত্রিকা পাইতে বিলম্ব হইবে এবং খরচও বেশী পড়িবে। ১০ই বৈশাখের মধ্যে পত্রিকার মূল্য কিম্বা নিষেধসূচক পত্রাদি না পাইলে আগামী বর্ষের পত্রিকা বৈশাখের তৃতীয় সপ্তাহে গ্রাহকদিগের নিকট ভিঃ পিঃতে প্রেরিত হইবে। যাঁহারা আগামী বৎসরে গ্রাহক থাকিবেন না, তাঁহারা অনুগ্রহপূর্ব্বক ১০ই বৈশাখের মধ্যেই আমাদিগকে জানাইবেন। গ্রাহকদিগের নিকট হইতে ভিঃ পিঃ ফেরত আসিলে, তাঁহাদিগের কোনও ক্ষতিই হয় না; কিন্তু আমাদিগকে নিরর্থক ডাকখরচ দিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয় এবং যাতায়াতে পত্রিকাখানিও নষ্ট হইয়া যায়। গ্রাহকদিগের অনবধানতায় পত্রিকা ফেরত আসিলে আমাদিগকে কতখানি ক্ষতি সহ্য করিতে হইবে, তাহা চিন্তা করিয়া অনিচ্ছুক গ্রাহকগণ যেন অনুগ্রহ করিয়া পূর্ব্বাহ্ণেই একখানা কার্ড লিখিয়া আমাদিগকে পত্রিকা পাঠাইতে নিষেধ করেন। ভরসা আছে, আমাদের এই অনুরোধ উপেক্ষিত হইবে না।